ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

৩৫৬৪

ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(তৃতীয় ভাগ)

Gayatri

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মুদ্রণ-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নিবেদিতা

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নিবেদিতা

১

আমার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন ছয়মাসের একটি স্তন্যপায়িনী বালিকার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। পিতামহীর মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম এবং আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে ভাবীশ্বশুরের গৃহ হইতে একটা বড় গোছের 'তত্ব' আসাতে, সেই বয়সে বিবাহসম্বন্ধে যতটা বুঝিবার বুঝিয়া লইয়াছিলাম। 'তত্বে'র মিষ্টান্নাদি উদরস্থ করিবার সময়ে, মিষ্টান্নের মধুরতার মধ্য দিয়া, আমার 'কনে'র অস্তিত্ব-মাধুর্য্যও যেন কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার মনে আছে, একখানা চন্দ্রপুলি মুখে পুরিয়াই আমি পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"ঠাকুর মা! কবে আমার কনের সঙ্গে বিয়ে হবে?" তখন চন্দ্রপুলিটার অধিকাংশ আমার মুখের ভিতরে ছিল! প্রশ্ন করিতে গিয়া আমি এমন 'বিষম' খাইয়াছিলাম যে, আমাকে সুস্থ করিতে পিতামহীর অনেকগুলা মৃদু চপেটাঘাত ও তীব্র ফুৎকার আমার মাথার উপরে পড়িয়াছিল। এই বিষম-খাওয়ার রহস্যও আমি পিতামহীর নিকটে বিদিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—"তুই যেমন 'কনে'কে স্মরণ করিতেছিস, 'কনে'ও তেম্‌নি তোকে স্মরণ করিতেছে।"

পিতামহীর সমবয়সী এক প্রতিবেশিনী ঠানদিদিও সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় যে সমস্ত মিষ্ট রহস্যে আমাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এ কালে তাহা আর আপনাদের শুনাইবার উপায় নাই।

এইমাত্র বলিয়া রাখি, 'সম্বন্ধে'র বিষয় এই আমি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছি। তিন বৎসর বয়সে কি হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র আমার স্মরণে ছিল না। অথচ শুনিয়াছি এই 'সম্বন্ধ' ব্যাপার অনেকটা সমারোহের সহিতই নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

অষ্টমবর্ষ বয়সে আমার উপনয়ন হইল। নবম বৎসরে আমার বিবাহের আয়োজন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, এমন সময় সহসা হৃদ্‌রোগে আমার পিতামহের মৃত্যু হইল। ঘটনা এতই আকস্মিক যে, তিনি মৃত্যুকালে কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ পান নাই। পিতাও সে সময় গৃহে ছিলেন না। বি, এ, পাসের পর একটা মাষ্টারি চাকুরী লইয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাকেই করিতে হইয়াছিল।

শ্মশানে আমাদের প্রতিবেশী-আত্মীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমি কেবল এক কমনীয়-কান্তি অপরিচিত ব্রাহ্মণের মধুর আপ্যায়নে ও আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আত্মীয়গণও পিতামহের মৃত্যুতে যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কথা সেই ব্রাহ্মণের কথার মত মিষ্ট লাগে নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছিল, আমার পিতামহের মৃত্যুতে আমাদের অপেক্ষাও বুঝি তাঁহার শোক অধিক হইয়াছে।

২

কলিকাতার চৌদ্দ-পনেরো ক্রোশ দক্ষিণে, একটি মাঝারী গোছের গণ্ডগ্রাম—আমার জন্মভূমি। আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা যাতায়াত এখন যতটা সুগম হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সোনারপুর পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিকেই জলাভূমি, মাঠের মধ্যে কোথাও সরু সরু খাল। এই সকলের মধ্য দিয়া 'শাল্‌তি'র সাহায্যে, আমরা তখন সোনারপুরে গিয়া রেল ধরিতাম। কলিকাতা পৌঁছিতে প্রায় পুরা একদিন লাগিত।

পিতাকে সংবাদ দিতে এবং সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতে সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছিল। যাই হ'ক, অবস্থাযোগ্য সমারোহের সহিত তিনি পিতামহের শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল হইতে বহুলোক নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু

সেই লোক-সমাগমমধ্যে আমি যাহাকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণকে কেবল দেখিতে পাই নাই।

সমারোহের উল্লাসে দিনান্তে তাঁহার কথা ভুলিয়া গেলাম।—কতক উল্লাসের নেশায়, কতকটা পিতামহের অদর্শনে, অন্তরে অন্তরে অনুভূত অপরিস্ফুট বেদনায় বিবাহের কথাও বিস্মৃত হইলাম। পিতামহের আকস্মিক মৃত্যুতে পিতামহী এতই শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের অনাগমন লক্ষ্য করেন নাই। যখন তাঁহার কথা পিতামহীর মনে উদয় হইল, তখন পিতা আবার কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সেইদিন, তাঁহারই মুখে ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইলাম। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আবার আমার মনে 'কনে' দেখিবার সাধ জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু সাধ মিটিবার আর অবসর হইল না। পিতামহের আকস্মিক মৃত্যু ও সেই সঙ্গে পিতার আকস্মিক ডেপুটীগিরি পদপ্রাপ্তি—এই দুয়ে মিলিয়া আমার ও আমার ভাবীবধুর মিলনপথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

পিতার কলিকাতা যাইবার তিনদিন পরে প্রাতঃকালে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আমি বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে বসিয়া স্কুলের পড়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় পড়ান বন্ধ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"শীঘ্র বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা আসন লইয়া আইস এবং তোমার ঠাকুরমাকে গিয়া বল যে, 'সার্ব্বভৌম' মশায় আসিয়াছেন।"

আমি তাঁহাকে দেখিয়া, কি জানি কেন, যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। পণ্ডিতমহাশয়ের কথা আমার কানে প্রবেশ করিয়াও করিল না!

আমি উঠিলাম না দেখিয়া, পণ্ডিতমহাশয় কিঞ্চিৎ কঠোরতার সহিত আমাকে বলিলেন, "আমার কথা কি শুনিতে পাইলে না? শীঘ্র তোমার পিতামহীকে সংবাদ দাও, আর একখানা আসন লইয়া আইস।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "থাক্; আর বালককে উৎপীড়িত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বসিব না। একস্থানে আমাকে যাইতে হইবে। যাইবার পথে বলিয়া আমি একবার বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

পণ্ডিতমহাশয় উত্তর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণের আগমন, বোধ হয় তিনি দূর হইতে অগ্রেই দেখিতে পাইয়াছিলেন; কেন না, বাক্যের সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়াই একখানি আসন পাতিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে তদুপরি বসিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ, পিতামহীর অনুরোধ সত্বেও, আসনে বসিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন,—"সে কি মা! তোমার দত্ত আসনে আমি বসিব?"

পিতামহী বলিলেন,—"সে কি! আপনি সর্ব্বপূজ্য। আমার বংশের ভাগ্য, আপনার কন্যা আমার গৃহে আসিবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে উপবেশন করুন।"

তথাপি ব্রাহ্মণ সে আসনে বসিলেন না। তখন সেই আসন, পূর্ব্বরক্ষিত স্থান হইতে উঠাইয়া, অন্যত্র রাখিবার জন্য পিতামহী কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইলাম।

এইবারে আমি উঠিলাম এবং পিতামহীর ইচ্ছামত আসন স্থানান্তরিত করিলাম। ব্রাহ্মণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইলে, পিতামহী আমাকে বলিলেন,—"হরিহর! তোমার শ্বশুরমহাশয়কে তুমি প্রণাম করিয়াছ ত?"

আমি আসনই ত্যাগ করি নাই, তা প্রণাম করিব! সুতরাং পিতামহীর প্রশ্নে আমি উত্তর দিলাম না।

পিতামহী আমার অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইতে আমাকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"থাক্, বালক—প্রণাম না করিল, তাহাতে দোষ কি?"

পিতামহী বলিলেন, "সে কি ঠাকুর, এই বয়স হইতে যদি সদাচরণ না শিখে, ত আর কবে শিখিবে! যদি গুরুজনের মর্য্যাদা রাখিতে না শিখিল, ত ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়া লাভ কি হইল!"

পিতামহী, আমাকে প্রণাম করাইয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন—"বৈকুণ্ঠ! বালক না হয় ভুল করিয়াছে। তুমি বুড়ো মিন্‌সে, ছেলেকে পড়াইতেছ, তুমি কি বালককে এটা বলিয়া দিতে পার নাই?"

পিতা, পিতামহ উভয়েই বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না বলিয়া পিতামহ বাড়ীতে আমার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী আমাদেরই গ্রামে—আমাদেরই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যে স্কুলে আমি পড়ি, তিনি সেই স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ করিতেন।

এক গ্রামে বাড়ী, তাহার উপর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী—সবার উপর সে সময়ে গ্রামে স্কুলের পড়া পড়াইবার যোগ্য লোক ছিল না বলিয়া, পিতামহ বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকেই আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের অসংখ্য বালক তাঁহার কাছে পড়িয়াছিল। পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই

পণ্ডিতমহাশয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা দেশমধ্যে প্রচার করিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রার্থনা' নামক কবিতার প্রারম্ভেই লেখা আছে,—"না মাগি সুন্দরকায়, অর্থে মন নাহি ধায়, ভোগ-সুখে চিত্ত রত নহে।" কোনও সময় পণ্ডিতমহাশয় নাকি কবিতার অর্থ করিয়াছিলেন—"মাগী সুন্দর কায় নয়।" এই জন্য সময়ে সময়ে বালকেরা তাঁহাকে 'নামাগি' পণ্ডিত বলিত। অবশ্য, পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্র পৃষ্ঠদেশে পতিত হইবার ভয়ে, কেহ তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলিতে সাহস করিত না। বালকদের মধ্যে যা কিছু বলা-কওয়া তা তাঁহার অন্তরালেই হইত। পণ্ডিতমহাশয় কিন্তু নিজের এ সুখ্যাতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারই মুখে আমরা শুনিতাম, তদানীন্তন বাংলা ভাষায় রুচিবিরুদ্ধ যতপ্রকার বাক্য আছে, তাহাদের মধ্যে তাঁর উপাধিব্যঞ্জক কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

পিতামহীর প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"বলি নাই? বার বার বলিয়াছি! তোমার নাতী আমার কথায় কান দিল না—যতই উঠিতে আদেশ করি, ততই বালক, যেন দমভারী হইয়া, আরও জোর করিয়া বসিয়া রহিল।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—"কই, বৈকুণ্ঠ তোমার মুখে ত একটিবারও সে কথা শুনি নাই! আমি এইজন্য তোমারই উপর বিরক্ত হইতেছিলাম। তোমরা বালককে গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা শিখাও নাই, বালকের অপরাধ কি?

পণ্ডিতমহাশয় তথাপি বলিলেন, "আমি বলিয়াছি, আপনি শুনিতে পান নাই।"

ব্রাহ্মণ এ কথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। একবার পণ্ডিতমহাশয়ের মুখের পানে চাহিলেন—এই মাত্র। কিন্তু সেই দৃষ্টিই তাঁহার পক্ষে উত্তরের অপেক্ষা অধিক হইল। পিতামহী যে সময় ব্রাহ্মণের গৃহের কুশলাদির পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় তিনি নিম্নস্বরে আমাকে পড়িতে আদেশ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সামান্য ত্রুটীস্বীকারে যাহার মীমাংসা হইত, এমন কার্য্যেও সত্য বলিতে যাহার সাহস নাই,—এমন লোকের কাছে বালক কি শিক্ষা করিবে?"

পিতামহী বলিলেন—"কি করি!—গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ স্কুলের পড়া তইরি করিবার এক জন লোকের প্রয়োজন। অঘোরনাথ ত বাড়ীতে থাকিতে পারে না।"

তখন পণ্ডিতসম্বন্ধে কথা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ আমার পিতৃসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পিতামহীর মুখে যখন তিনি শুনিলেন,—শ্রাদ্ধান্তে পিতা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি পিতামহীকে নমস্কার এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন,—"অঘোরনাথ যখন ঘরে নাই, তখন আমার আগমনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না।"

পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহসম্বন্ধে কি জানিবার কিছু ইচ্ছা ছিল?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তাই। বিবাহের দিন স্থির করিবার একান্ত প্রয়োজন। শিরোমণি মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। বুঝিতেই ত পারিতেছ, যজমানের গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহাতেই যোগেযাগে আমাকে কন্যাটি পাত্রস্থা করিতে হইবে। দিনটা স্থির হইয়া গেলে, আমি আগে হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি।"

পিতামহী বলিলেন—"আমারও ইচ্ছা তাই। এ শুভকার্য্য যত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়, ততই উভয়পক্ষের মঙ্গল। নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

এই বলিয়াই তিনি পিতামহের উল্লেখ করিয়া একবার চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বলিলেন,—"তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, পৌত্র-বধূর মুখদর্শন করেন। তাঁহার ভাগ্যে এ আনন্দ ভোগ হইল না বলিয়া, আমার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। এখন আমি যাহাতে হরিহরের বউকে দুই চারিদিন নিজ হাতে খাওয়াইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। কেন না, আমার মনে হয়, আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আর বাঁচিতেও আমার সাধ নাই। অঘোর-হরিহরকে রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই আমার মঙ্গল।"

"বিবাহ দিতে পারিলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণীরও একান্ত ইচ্ছা,—কন্যাকে যত শীঘ্র পারেন, গোত্রান্তরিতা করেন।"

"তা হইলে অঘোর আসুক। আসিলেই আপনাকে সংবাদ দিব। আপনারা উভয়ে মিলিয়া একটা দিন স্থির করিবেন। কিন্তু কালাশৌচের ভিতর কি বিবাহ হইতে পারে?

"হইতেই হইবে। অঘোরনাথের কালাশৌচ, তাতে হরিহরের কি? ইহাতে তাহার ও তাহার পিতার সত্যরক্ষা হইবে।"

"বাধা না থাকিলেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি জানি না বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিজ্ঞ পণ্ডিত—আপনি যখন 'হইবে' বলিতেছেন, তখন না হইবে কেন? তা হ'লে আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন,

আমি পাঁজি লইয়া আসিতেছি। আপনি—এ মাসে আর হইবে না—আগামী মাসে একটা দিন স্থির করুন। অঘোর আসিলেই তাহাকে বলিব এবং আপনাকে সংবাদ পাঠাইব।"

পিতামহী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম। বিবাহের কথা শুনিয়া নবম-বর্ষীয় বালক সে সময় হৃদয়ে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই বৃদ্ধের "আমি"র পক্ষে অনুমানে আনা একেবারেই অসম্ভব। তবে আনন্দের যে অবধি ছিল না, এটা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কেন না, পাঁজি আনিবার কথা শুনিয়াই, আমি বলিয়া উঠিলাম—"আমি ছুটিয়া পাঁজি লইয়া আসিতেছি।"

আমার কথা শুনিয়া পিতামহী হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণেরও গম্ভীরমুখে হাসি আসিল।

পিতামহী বলিলেন,—"দেখিতেছেন, আপনার জামাতারই আর বধূর অদর্শন সহ্য হইতেছে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বিবাহ যে কি বস্তু, তাহা ত বালকের বোধ নাই!—কাজেই উহার লজ্জা-সঙ্কোচও কিছু নাই।"

পড়া ছাড়িয়া উঠিলে মায়ের কাছে তিরস্কৃত হইব, এই ভয় দেখাইয়া পিতামহী পাঁজি আনিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। মায়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে, আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি তাড়াতাড়ি মাদুরে বসিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পড়?"

আমি তখন মধ্য-ইংরাজী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি। কি কি পুস্তক পাঠ করি, তাঁহাকে বলিলাম। পাঠ্যপুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, স্কুলের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ একেবারে গণ্ডমূর্খ।

ব্রাহ্মণ ও আমার মধ্যে যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যতগুলা আমার স্মরণ আছে, আমি বলিতেছি।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইংরাজী পুস্তকখানার নাম কি?"

প্যারীচরণ সরকারের সেকেণ্ড বুক শেষ করিয়া ডগ্-লাস্ রীডার তৃতীয় ভাগ তখন সবেমাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি পুস্তকের নাম বলিলাম।

"নামের মানে কি?"

"নামের আবার মানে কি?"

"সে কি? পুস্তকের নাম থাকিলে, সে নামের একটা অর্থ থাকিবে না?"

স্কুলে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভাবী-শ্বশুরের কাছে পরাভবটা আমার তেমন মনোমত হইল না। আমি কথার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম—'ডগ্' মানে কুকুর, আর 'লাস্' মানে বালিকা, 'রীডার' মানে পাঠক।"—এক সঙ্গে মানে হইল কি? "কুকুর-বালিকা-পাঠক— নম্বর তিন।"

আমার মানে করা শুনিয়াই শ্বশুর ঠাকুরের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তার পর, একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হুঁ! পুস্তকের ভিতর আছে কি?"

"ঈগল পক্ষীর গল্প আছে।"

"ঈগল পক্ষী!—সে আবার কি রকম?"

"সে এক প্রকাণ্ড পক্ষী—পণ্ডিতমহাশয় বলেন, সে ছাগল-ভেড়া ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া যায়।"

এই বলিয়াই, আমি বই খুলিয়া ঈগল পক্ষীর ছবি ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলাম। একটা ঈগল পক্ষী মেষ-শিশু নখে বিঁধিয়া আকাশে উড়িতেছে, পুস্তকে তাহারই চিত্র অঙ্কিত ছিল।

ব্রাহ্মণ ছবিটিকে দেখিলেন—বেশ করিয়া দেখিলেন। একটি শ্যামল তৃণক্ষেত্র—তৃণক্ষেত্রের একস্থানে দলবদ্ধ মেষ ও মেষশিশু; পার্শ্বে যষ্টিহস্তে, ঊর্দ্ধমুখে, ঈগলের প্রতি চাহিয়া, বিলাতী এক মেষপালক। দূরে নীলবর্ণ পাহাড়; সেই পাহাড়ের শৃঙ্গে ঈগলের বাসা। ঈগল মেষশিশু পায়ে ধরিয়া, বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া, সেই পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে।

ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে সেই ছবি দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—"এ পক্ষী কোন্ দেশে থাকে?"

"এ বিলাতী পক্ষী। এ দেশে কখন আসে নাই।"

"ছবিতে আসিয়াছে; আসে নাই কি হরিহর? জীবন্ত পক্ষী সে দেশে কেবল ছাগল ভেড়া ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়; এই ছবির পক্ষী দুগ্ধপোষ্য বালকগুলির মাথায় ছোঁ মারিতে এইদেশে আসিয়াছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুস্তকখানা মুড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি?"

"আমরা মানুষ। আমাদের দুই হাত, দুই পা। আমরা বানরের মত চতুর্হস্ত নই; অথবা পশুর মত চতুষ্পদ নই; কিংবা বাদুড়ের মত কর-পক্ষ নই। আমাদের মাথা আছে, সে মাথায় বুদ্ধি আছে। পণ্ডিতমহাশয় বলেন—'মানুষ আর কিছু নহে,—এক বাক্পটু জন্তু'।"

"তা নয়—কি জাতি?"

"আমরা ককেসিয়ান্।"

ঠিক এই সময়ে পিতামহী পাঁজি লইয়া উপস্থিত

হইলেন। পাঁজি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে বলিলেন "আগামী বৈশাখ মাসে যে কয়টা ভাল দিন আছে, আপনি দেখিয়া রাখুন। অঘোর আসিলে, তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যে দিন সুবিধা মনে করিব, সেই দিনেই বিবাহ দিব।"

ব্রাহ্মণ পাঁজি হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"পাঁজি ত লইয়া আসিলে, অঘোরের মা; কিন্তু কাহাকে কন্যা দিব?"

পিতামহী এই কথায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এ কথা বলিলেন কেন?"

"তোমার পৌত্রকে কি জাতি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—'আমরা ককেসিয়ান্।' এতকাল পূজা-আহ্নিক যোগযাগ করিয়া, শেষকালে মেয়েটাকে একটা ককেসিয়ানের হাতে দিব?"

পিতামহী তখন আমার পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সে কি রে! কি জাত বলিয়াছিস্?"

"কেন, মাষ্টারমশায় বলিয়াছেন, আমরা ককেসিয়ান।"

"আরে ছিঃ!—ও কথা বলিতে নাই।"

"না, বলিতে নাই! না বলিলে যে মাষ্টারমশায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবেন।"

ব্রাহ্মণ, পিতামহীকে বলিলেন—"শিরোমণি কি বালককে এ সব শিখান নাই?"

"শিখাইয়াছিলেন বৈ কি, আমি নিজেও শিখাইয়াছি।"

এই বলিয়াই পিতামহী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমরা ব্রাহ্মণ কতকাল?" এই কথা শুনিবামাত্র পিতামহী আমাকে শৈশবে গল্প শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে, যে শ্লোক শিখাইতেন, সেই শ্লোক আমার মনে পড়িল। যেমন পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ কত কাল?" অমনি আমি অভ্যাসবশে বলিয়া উঠিলাম— "চন্দর-সুযি যতকাল। চন্দর-সুযি গগনে, আমি জান্‌ব কেমনে? যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবাঃ, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবৎ বিপ্রকুলে বয়ম্।" উভয়েই আমার উত্তর শুনিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পিতামহী বলিলেন—"সে কি! নিজেই বালককে এ সমস্ত শিখাইয়াছি, সে ককেসিয়ান্ বলিবে কি! আর ও কথা বলিয়ো না, ভাই!"

"না বলিলে, মাষ্টারমশায় যখন বেত মারিবে? তখন তুমি কি আমার হইয়া মার খাইবে?"

"তা হ'ক; স্কুলে তুমি যা ইচ্ছা বলিয়ো। বাড়ীতে কখনও অমন কথা মুখে আনিয়ো না। যখনি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তুমি কি?' তুমি অমনি জোরের সহিত বলিবে, 'আমি ব্রাহ্মণ'। ও নাস্তিকগুলার কথা শুনিয়ো না।"

স্কুলে আমার বুদ্ধির একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের যিনি ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহার উপাধি ছিল বিশ্বাস।' তবে তিনি জাতিতে কি ছিলেন, তাহা আমি বলিব না। তিনিই আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন—'আমরা - অর্থাৎ, তিনি ও বালকবৃন্দ সকলে ককেসিয়ান্ জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান্ শাখা।' যদিও 'জাতি' শব্দটা বর্ণের একটা নামান্তর নহে, তথাপি আমরা জাতি বলিতে তখন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কিংবা শূদ্র—এইমাত্র বুঝিতাম। মাষ্টারমহাশয় আমাদের সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার সেই ভ্রমে পড়িতে হইবে? 'ব্রাহ্মণ' বলিলে মাষ্টারের কাছে মার খাইতে হইবে; 'ককেসিয়ান্' বলিলে বিয়ে হইবে না!—কি করি? অনেক ভাবিয়া পিতামহীকে বলিলাম—"আমি স্কুলে ককেসিয়ান্, আর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ।"

উত্তর শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, —"শিরোমণির পৌত্র বটে! বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সাহেব-পড়ান পণ্ডিতের নাতী—মা! কথায় তুমি তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।"

পিতামহী এই মন্তব্যে উৎসাহিত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি ব্রাহ্মণ?"

"কুলীন ব্রাহ্মণ।"

"কুলের লক্ষণ কি?"

"কুলের 'কুল' হইলে, কুল দুই প্রকার—দেশী কুল, আর নারকুলে কুল। প্রথমের লক্ষণ গোল, দ্বিতীয়ের লম্বা; প্রথম টক্, দ্বিতীয় না-টক্ না-মিষ্ট, তবে দুয়েই শাঁস আছে ইত্যাদি। আর ঘরের 'কুল' হইলে—

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্॥"

এই তিন প্রকার কুলের লক্ষণ শুনিয়া, ব্রাহ্মণ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আমার মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন। তখনও স্নেহ-প্রদর্শনে মস্তক-আঘ্রাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে লোকের অজ্ঞাতসারে, সে প্রথার এখন বিলোপ হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমার বংশের মধ্যে এইপ্রকার স্নেহাভিব্যক্তি আমিই শেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণের স্নেহাভিনয় পিতামহী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বলিলেন—"কি দেখিতেছ অঘোরের মা? —কাল বড় বিষম আসিতেছে!—বুঝিতে পারিতেছ না?

এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্ সন্তান ইহার পরে ব্রাহ্মণ্য-প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহ।"

স্কুলে যাইবার সময় হইতেছে বুঝিয়া, পিতামহী আমাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ পাঁজি লইয়া বিবাহের দিন দেখিতে বসিলেন—আমিও সেলেট্ বই বগলে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণের কথায় তিনি যে কি উত্তর দিলেন, তাহা আর আমি জানিতে পারিলাম না।

৩

আমার এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া এখন অনেকেরই মুখে হাসি আসিবে। কিন্তু কুলপ্রথানুযায়ী আমাদের সমাজে কুলীনদিগের মধ্যে প্রায় ঐরূপ বয়সেই বর-কন্যার মধ্যে 'সম্বন্ধ' স্থাপিত হইত। অবশ্য বিবাহ যে তখন হইত না, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবাহ হইতে চারি পাঁচ বৎসরের অধিক বিলম্ব হইত না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ—উভয়েই কেবল বালকের উপনয়ন-সংস্কারের অপেক্ষা করিত।

আমরা দাক্ষিণাত্য-শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ—কুলীন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আমাদের সমাজের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ কুলীন। আমার পিতামহ এরূপ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন গৌরবের বিষয় মনে করিয়াই আগ্রহের সহিত ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। আমার ভাবী শ্বশুরও অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। যাজনক্রিয়ায় যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কোনও রকমে তাঁহার দিনপাত হইত।

দরিদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের প্রদেশে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহ ছিল না। শুনিয়াছি, ষড়্দর্শনেই তিনি সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, সকলেই তাঁহাকে এক জন তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমীদারই কায়স্থ। তাঁহারা সে সময়ে তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃত কলেজে চাকরী লইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি অনুরোধ রাখেন নাই—"ম্লেচ্ছের" চাকরী স্বীকার করেন নাই।

তাঁহার নাম ছিল শিবরাম সার্ব্বভৌম। কিন্তু "সাভ্যোম" মহাশয় বলিয়া দেশের মধ্যে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিচয়ের জন্য তাঁহার নামের আর বড় একটা প্রয়োজন হইত না।

আমার পিতামহ রামসেবক শিরোমণিও একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যে তিনি 'সাভ্যোম' ম'শায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। তবে 'সাভ্যোম' অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি বেশী ছিল। দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া সাহেবের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন অনেক সিবিলিয়ানকে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছিল ও ইংরাজ মহলে প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটিয়াছিল। দেশে বাগান-বাগিচা, দুই দশ বিঘা জমি প্রভৃতি সম্পত্তি করিয়া তিনি পরিবারবর্গকে অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। পিতারও ভবিষ্যৎ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় রাখিয়া তিনি পিতাকে সংস্কৃত-কলেজে পড়াইতেন এবং যে বৎসর পিতা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার পর-বৎসরেই তাঁহার এক ছাত্র উচ্চ-পদস্থ কোনও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে ধরিয়া পিতার ডেপুটিগিরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তবে ভাগ্যবশে পিতার হাকিমী দেখা পিতামহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিয়োগপত্র আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিল।

পিতার হাকিমী-প্রাপ্তির চেষ্টা পিতামহ এতই গোপনে করিয়াছিলেন এবং পিতাকেও এ কথা এমন গোপনে রাখিতে বলিয়াছিলেন যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও জানা দূরে থাক, বাড়ীর কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। পিতামহী পর্য্যন্ত এ কথার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। মা বোধ হয়, পিতার কাছে কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর পিতার চাকরী হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মায়ের কথাবার্ত্তায় ও আচরণে কতকটা তাহা অনুমান করিতে পারি; কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখি, মা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অন্য অন্য দিন যখন পড়া শেষ করিয়া ভিতরে আসি, তখন মায়েরও রান্না একরূপ শেষ হইয়া যায়। আজ আর পড়া হয় নাই, সেই জন্য সকাল সকাল উঠিয়াছি।

যেখানে স্কুল, সে স্থান আমাদের গ্রাম হইতে পাকা এক ক্রোশ দূরে। আমাদের গ্রাম হইতে আরও পাঁচ ছয় জন বালক সেই স্কুলে পড়িতে যাইত। আমরা এই কয়জন প্রায় প্রত্যহ স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা আগে গ্রাম হইতে যাত্রা করিতাম। যাইবার সময় দলবদ্ধ হইয়া চলিতাম। ইহাদের মধ্যে একটি প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক, আমাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যাইত। আমি কোনও দিন তাহার আগে প্রস্তুত হইতে পারি নাই।

সে দিন মনে করিলাম, আমি আগে প্রস্তুত হইয়া আমার সহচরকে ডাকিতে যাইব।

এই মনে করিয়া আমি রন্ধনশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম এবং মাকে বলিলাম—"মা! আমাকে ভাত দে। আমি আজ রামপদকে ডাকিয়া যাইব।"

মা উনান হইতে হাঁড়ি নামাইতেছিলেন। তিনি আমার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আমি আবার বলিলাম, "আমার কথা শুনতে পেলিনি?" মা এবারও কোন উত্তর দিলেন না। আপনার মনে কি বলিতে বলিতে হাঁড়ির ভিতর কাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন।

দুইবার উত্তর না পাইয়া আমার রাগ হইল। আমি রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটু জোর করিয়া বলিলাম,—"ভাত দিবি ত দে। নইলে আমি না খেয়ে স্কুলে চলিয়া যাইব।"

এইবারে মা উত্তর করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়াছেন। কেবল ক্রোধের বশে আমার কথার উত্তর করেন নাই। মা বলিলেন,—"স্কুলে যাইয়া কি করিবি? পড়াশুনা তো কিছু হইল না।"

এইরূপে কথা আরম্ভ করিয়া মা ব্রাহ্মণ ও পিতামহীর ব্যবহারের উপর অনেক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পিতার সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ভয় দেখাইলেন এবং বলিলেন,—"একবার সেখানে পাঠাইলে আর দশবছরের মত তোকে এ-মুখো হইতে দিব না।"

আমি শৈশব হইতে পিতামহীর আশ্রয়েই পালিত। আমার শাসনে মায়ের কোনও অধিকার ছিল না। সুতরাং মায়ের এই সকল কথা শুনিয়াও আমাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। আমি অন্নের জন্য বারংবার মাকে পীড়ন করিতে লাগিলাম। স্কুলে যাইবার সময় একান্ত উপস্থিত হইল দেখিয়া অগত্যা তিনি আমাকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। সবে মাত্র একটি গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়াছি, এমন সময়ে পিতামহী রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া মাকে ডাকিলেন,—"বৌমা!"

আমার বেলায় যেমন মা প্রথমে কোনও উত্তর দেন নাই, এবারেও তিনি তাই করিলেন। পিতামহীর ডাকে উত্তর দিলেন না।

পিতামহী আবার বলিলেন,—"বৌমা!"

মা এবারে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখ না ফিরাইয়াই কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন—, "কেন?"

"মুখ তুলিতেছ না কেন?

"কি বলিবে বল না।"

"তুমি হাঁড়ীর দিকে মুখ করিয়া থাকিলে কি বলিব!"

"হাঁড়ীমুখটা কিসে দেখিলে?" এই বলিয়া মাতা মুখ ফিরাইলেন।

"হাঁড়ীমুখ ত বলি নাই মা, হাঁড়ীর দিকে মুখ বলিয়াছিলাম। তবে এখন দেখিতেছি তাই, মুখ হাঁড়ীর মতন হইয়াছে। কেন মা, এরূপ হইবার কারণ? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে?"

"কা'র কি করিয়াছি, তা বলিবে?

"তবে মুখ গম্ভীর হইল কেন?"

"তুমি নিজেই যখন নাতীর পরকাল নষ্ট করিতে কোমর বাঁধিয়াছ, তখন মুখে হাসি আনি কেমন করিয়া?"

"আমি পরকাল নষ্ট করিলাম!"

"তা নয় ত কি? ও বামুন সকাল বেলায় কি করিতে আসিয়াছিল? ছেলের পড়া হইল না। বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত বাড়ী যাইবার সময় বলিয়া গেল—'সাভ্যোম আসিয়া হরিহরের পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইল। আমি আর কথা-শেষের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না—ঘরে চলিলাম। আজ যদি হরিহর স্কুলে পড়া বলিতে না পারে, তার জন্ত আমাকে যেন দায়ী করিবেন না'।"

"কই এ কথা সে আমাদের বলিল না কেন? আমরা জানি, সে পড়ানো শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর আমাদের কথায় তাহার পড়ানো বন্ধ করিবার ত কিছু প্রয়োজন ছিল না।"

"তোমাদের মতন তোমরা বুঝিলে, সে তাহার মতন বুঝিয়াছে। এই কচিবালকের কাছে বিবাহের কথা লইয়া তোমরা কিচকিচি করিবে, বালকের কি তাতে মনঃস্থির থাকিতে পারে, না, পণ্ডিতই মনোযোগ দিয়া পড়াইতে পারে?"

"না মা, আসল কথা তা নয়।" এই বলিয়া পিতামহী ঘটনা বিশদরূপে মায়ের কাছে বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন,—"সে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীর কাছে কচিছেলেকে পড়াইতে দিলে তাহার শিক্ষার কিছুই ফল হইবে না।"

"তা কচিছেলেকে যার তার কাছে মাথা নোয়াইলেই বা ছেলের কি শিক্ষা হইবে? পণ্ডিতকে বামুন যা ইচ্ছে তাই বলিয়াছে। সে কেমন করিয়া সেখানে থাকিবে? তাহাকে ছেলে নমস্কার করে নাই, তাহাতেই একেবারে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে?"

মা এই সকল কথা বলিতেছেন, পিতামহী বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন,

আর আমি এক-ডেলা-ভাত-হাতে তাঁহাদের উভয়েরই পানে চাহিয়া আছি। তাঁহাদের এ বাদানুবাদ আমার কেমন ভাল লাগিতেছে না।

পিতামহের জীবদ্দশায় ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের এরূপ কথাবার্ত্তা কখন শুনি নাই। তখন কার্য্যের দোষ উপলক্ষ করিয়া পিতামহীই মাঝে মাঝে মাকে মৃদু তিরস্কার করিতেন। আজ প্রথম আমি পিতামহীকে মায়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দেখিলাম। মায়ের এ ভাব দেখা আমার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এ ভাব আমার ভাল লাগিল না। পিতামহীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, অন্তর হইতে বিষাদ যেন সবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে। পিতামহী প্রাণপণ চেষ্টায় ভাব সংবরণ করিতেছেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না।

মা পিতামহীর মুখের ভাব দেখিয়া, মাথা অবনত করিলেন। চোখের পানে চাহিয়া কথা কহিতে, আর বোধ হয়, তাঁহার সাহস হইল না।

তখন আমার দিকে চাহিয়া, আমাকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বলি, পড়ার দফাতো রফা হইয়াছে। স্কুলেও কি আজ যাইতে হইবে না? বাবু আসিলে তাঁর সঙ্গে তোকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব। এখানে পাঁচজনের দৌরাত্ম্যে তোর পরকাল ঝরঝরে হইয়া যাইবে।"

পিতাকে বাবু নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া পিতামহী বলিলেন,—"বাবু কে গো?"

মা এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। পিতামহী বলিতে লাগিলেন,—"কা'ল পর্য্যন্ত কর্ত্তা ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি না মরিতে মরিতেই তাঁর ছেলে বাবু হইয়া গেল! এখনও যে ঘরের চালে খড় ঘুচে নাই। গরীব বামুনের ছেলেকে বাবু বলিতে শুনিলে, পাড়ার লোকে যে গায়ে ধুলো দিবে।"

মা তথাপি নিরুত্তর। আমিও নিঃশব্দে আহারে নিযুক্ত। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় রামপদ আসিয়া আমাকে ডাকিল,— "হরিহর!"

মা ও পিতামহীর বৃথা বাদানুবাদে সেদিন আমার আর আসল কথা শুনা হইল না।

৪

সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতামহী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বেলা অপরাহ্ণ। মা ঘর-দোর ঝাঁট দিয়া, কাপড় কাচিয়া, ঘরের দাওয়ায় চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। প্রতিবাসিনী সেই পূর্ব্বোক্ত ঠানদিদি, মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছেন। আমি স্কুল হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া 'জল খাবার' খাইতে বসিয়াছি। উপনয়ন হইবার আগে আমি বিকালে দুধ-মাখা ভাত খাইতাম। এখন একস্থিতিতে দুইবার অন্নাহার নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ উপনয়নের পর এখনও এক বৎসর অতীত হয় নাই। সুতরাং আচমনীয় কোনও বস্তু অর্থাৎ মুড়ি অথবা অপর কোনও ভাজা জিনিস বিকালে খাইবার আমার অধিকার ছিল না। পিতামহী সেই জন্য ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি অনাচমনীয় মিষ্টান্ন আমার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।

আমি তাই খাইতেছি, আর চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা ও ঠানদিদিতে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহাই শুনিতেছি।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন,—"হাঁ বৌমা, হরিহরের বিবাহের কি হইল?"

মা বলিলেন,—"চুলো জানে। ও সব কথা গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিও। আমি বাড়ীর ঝি বই ত নয়।"

ঠানদিদি। সে কি মা,—তুমি ঘরণী গৃহিণী—বউ, তুমি ঝি হ'তে যাবে কেন?"

মা। সে তোমরা দূর থেকে দেখ্‌ছ। ভিতরের মর্ম্ম ত জান না।

ঠানদিদি। কেন, দিদি তোমাকে কিছু বলিয়াছেন নাকি?

"বল্‌বে আবার কি? বলবার আমি কার ধার ধারি?"

ঠানদিদি। কেন দিদি ত সে রকম লোক নয়।

মা। এই যে বল্লুম, বাইরে থেকেই ওই রকম দেখতে। ঘরজ্বালানি পাড়া-তোলানি। মুখের বচন ত শোননি খুড়ীমা! তবু যদি আমার গতর না থাক্‌তো। সারাদিন মুখে-রক্ত-উঠা খাটুনি। কোথায় দু'টো মিষ্টি কথা শুন্‌বো, তাও আমার বরাতে নেই। একটা ঝি নেই, চাকর নেই—ইনিও ঠাকুর মরবার পর থেকে একেবারে হাত-পা এলিয়ে দিয়েছেন। কেবল বাকিটি বেড়েছে।

ঠানদিদি। তা হ'লে ত দিদির বড় অন্যায়! তবু তো তোমাদের বাসন মাজবার, গরুর সেবা করবার, লোক আছে। আমার আবার তাও নেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে ঠাকুর-পূজো পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে হাতে করতে হয়। বউটি একটি কুটো পর্য্যন্ত নাড়বে না। তবু আমি তাকে কিছু বলি না।

মা। তোমার মতন শাশুড়ী ক'জনের হয়! আমার

বাবা আমার পিছনে তিনটা ঝি রাখিয়াছিলেন। বাড়ীর একটিও কাজ তিনি আমাকে করিতে দিতেন না। পেয়াদারা ছেলেবেলায় মাটীতে আমাকে পা দিতে দিত না।

ঠানদিদি। তা কি আর বুঝি না মা! হাকিমের পেশকারী—সে কত বড় চাকরী! আমার বাপের বাড়ীর দেশে নবীন চৌধুরী পেশকারী ক'রে জমীদারী ক'রে গেছে।

মা। খেটে খেটে গতর চূর্ণ করছি, তাতেও দুঃখ নেই—যদি মুখের একটুও মিষ্টতা পেতুম।

ঠানদিদি। পরের মেয়ে। তাকে নিয়ে ঘর করতে হবে। খিটখিটে হ'লে চলবে কেন?

মা। এই যে বললুম খুড়ীমা, অনেক তপস্যা করলে তবে তোমার মতন শাশুড়ী পাওয়া যায়। সেদিন সকাল বেলায়—পণ্ডিত ছেলেটাকে পড়াচ্ছে, এমন সময় সেই বামুনটা—

ঠানদিদি। কোন্ বামুন?

মা। ওই যে গো—শ্বশুর যার মেয়ের সঙ্গে নাতীর সম্বন্ধ করেছেন।

ঠানদিদি। কে সাভ্যোম ম'শায়?

মা। হাঁ—ওই তোমাদের সাভ্যোম। মিন্সের কি একটুও আক্কেল নেই গা! কচিছেলে পড়ছে, তার কাছে ব'সে বিয়ের কথা পেড়ে বসল! শাশুড়ীও তেমনি—এক পাঁজী নিয়ে নাতীর সামনে দিন দেখতে ব'সে গেল। ছেলেটার পড়া হ'ল না। এই কথা বলেছি ব'লে শাশুড়ী তিন দিন আমার সহিত কথা কয় নি।

ঠানদিদি। না, এ ভাল কথা নয়। নাতীর বিয়ের দিন দেখতে হয়, অন্য সময় দেখ। ছেলের পড়া বন্ধ হবে, এ কি কথা! তাই কি বিয়ের কথা তোলবার এই সময় পড়ল! কা'ল অমন সোয়ামী গেল, আমরা হ'লে ত এক বছর মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতুম। তা বিয়ের কি ঠিক হ'ল?

মা। কে জানে! আমি আর কথা কইনি। যার ছেলে, সে আস্থক—সে বুঝবে।

এবারেও আসল কথা আমার শোনা হইল না। কেবল বসিয়া বসিয়া মায়ের কতকগুলা মিথ্যা উক্তি শুনিতেছিলাম, এমন সময় পিতা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে ডাকিলেন,—"হরিহর!" মাতাঠাকুরাণী অমনি অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিলেন।

ঠানদিদি বলিলেন,—"তুমি অনেক কাল বাঁচিবে অঘোরনাথ! আমরা সবে মাত্র তোমার নাম করিয়াছি, আর অমনি তুমি উপস্থিত হইয়াছ।"

আমি তাড়াতাড়ি ভোজন সাঙ্গ করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

সে দিন পিতার বাড়ী আসিবার দিন নয়। মা সেইজন্য তাঁহার অত শীঘ্র আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন,—"তুমি আগে কেশ-বিন্যাস সারিয়া লও, আমি পরে বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার হাত হইতে ব্যাগ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ব্যাগ যথাস্থানে রক্ষা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন,—"তোমার ঠাকুর-মা কোথায়?"

আমিও স্কুল হইতে আসিয়া ঠাকুরমাকে দেখি নাই। বৈকালে প্রায়ই প্রত্যহ তিনি প্রতিবেশী গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠ শুনিতে যাইতেন। সেইখানেই তাঁর থাকা বিশেষ সম্ভব মনে করিয়া আমি পিতাকে বলিলাম,—"ঠাকুরমাকে ডাকিয়া আনিব?" পিতা বলিলেন "আন।"

আমি পিতামহীকে ডাকিতে গোবিন্দ-ঠাকুরদার গৃহাভিমুখে চলিলাম।

৫

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, গোবিন্দঠাকুরদা' একখানা চৌকীতে পাতা আসনের উপর একখানা বটতলার রামায়ণ রাখিয়া চোখে চারিদিকে-সূতা বাঁধা এক চসমা লাগাইয়া স্বরের সহিত পাঠ করিতেছেন।

যেখানে বসিয়া তিনি পড়িতেছিলেন, সেটা তাঁহাদের সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপ। তাঁহারা জ্ঞাতিতে অনেক ঘর। সাধারণের পূজাদি কার্য্য উক্ত চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহারাই সে সময়ে শ্রীমান্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জ্ঞাতিরই জমীজমা ও নগদ সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া দেবকার্য্যের জন্য সাধারণের একটা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। তাহারই আয় হইতে দুর্গাপূজাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা শাক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবসম্মত দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের যদিও তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু দুর্গাপূজা ও কালীপূজাতেই ঘটাটা বিশেষ রকমে হইত। দুর্গোৎসবে নবমী পূজার দিনে এবং কালীপূজার রাত্রিতে দশ বারোটা মহিষ ও শতাধিক ছাগ বলি হইত। এ কয়দিন গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র কাহাকেও ঘরে হাঁড়ী চড়াইতে হইত না। দেশের অনেক ধনী কায়স্থ জমীদার তাঁহাদের শিষ্য ছিল। এই কারণেই তাঁহারা উক্তরূপ ধনী ছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ-ঠাকুরদা' আবার ধনে মানে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ অভাব এবং কার্পণ্যের কিঞ্চিৎ দুর্নাম ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দোষের

কথা আমরা শুনি নাই। বরং অতি সজ্জন বলিয়াই গ্রামমধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

গোবিন্দ-ঠাকুরদা', আমার পিতামহের সমবয়স্ক ছিলেন। দুইজনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বাল্যাবস্থায় পিতামহ দরিদ্র ছিলেন। শুদ্ধমাত্র পুরুষকারে তিনি অবস্থার উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। উপার্জ্জনের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এইজন্য সম্পত্তি ক্রয় করিতে তিনি উপার্জ্জনের টাকা গোবিন্দ-ঠাকুরদা'র কাছে পাঠাইতেন। সেই টাকা হইতে তিনি পিতামহের নামে লাভবান্ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিতেন এবং পিতামহের অনুপস্থিতিতে আমাদের গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেন।

পরবর্ত্তীকালে গ্রামবাসীদের ভিতরে যেমন ঈর্ষ্যাদ্বেষের প্রাবল্য হইয়াছিল—গ্রামের মধ্যে কেহ কাহারও উন্নতি দেখিতে পারিত না—তখন ততটা হয় নাই—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে এ ভাবটা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখনও চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া বিষয়াদির আদানপ্রদান চলিত।

ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ তখনও জানিত না যে, তাহাকে চাকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে। অর্থ না থাকিলেও যজমান ও বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ-জমীদারদিগের কল্যাণে কাহারও বড় একটা অন্নাভাব ঘটিত না। অনেকেরই পিতৃ-পিতামহের প্রাপ্ত ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল। ব্রাহ্মণের চাকরী-স্বীকার তখন একটা বড় লজ্জার কথাই ছিল। চাকরী করিবে কায়স্থ। ব্রাহ্মণ তাহাকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পেট পূরাইবে। আর অবকাশে যথাশক্তি শাস্ত্রচর্চ্চা করিবে। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই বিধি প্রচলিত ছিল। কাজেই চাকরী-স্বীকারকারী পিতামহের অর্থোপার্জ্জনে কাহারও তখনও কুটিল দৃষ্টি পড়ে নাই। পিতামহও এদিকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া গ্রামবাসিগণের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। লোকের মনে বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যা জন্মিবার তিনি অবকাশ দিতেন না। এই এই জন্য সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি কোঠা-বাড়ী প্রস্তুত করান নাই। খোড়োঘরগুলির একটু শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন—এই মাত্র।

চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া দেখি, গোবিন্দ-ঠাকুরদা' পূর্ব্বোক্তভাবে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন, আর পাড়ার অনেকগুলি বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহাকে ঘেরিয়া তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শুনিতেছেন।

যেখানে হনুমানের অশোকবনস্থা সীতার অন্বেষণের কথা আছে, ঠাকুরদা' সেইখানটা পড়িতেছিলেন। আর স্ত্রীলোকেরা পাছে বুঝিতে না পারে, এই জন্য স্থানে স্থানে দুই একটা দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।

হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াও সীতার সন্ধান পাইতেছেন না। অগত্যা তাঁহার অবস্থিতিস্থান নির্ণয়ের জন্য তিনি যে কোন উচ্চবৃক্ষের অন্বেষণ করিতেছিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন, একটা শিমুলগাছ শূন্যে সবার উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখি উচ্চতর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥"

এই দুইটি কবিতার চরণ তিনি পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মহাবীর শংসপার গাছে উঠিলেন মেনে।"

শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে জনৈক মহিলা প্রশ্ন করিলেন,—"শংসপার গাছটা কি?" অপর এক মহিলা ঠাকুরদা'র হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ আর বুঝতে পারলিনি। যে গাছে খুব শাঁস আছে,—মানে কি না, খুব শাঁসালো গাছ।"

ঠাকুরদা' চসমাখানা চোক হইতে খুলিয়া বইএর উপর রাখিলেন। তার পর প্রশ্নকারিণী মহিলার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"হাঁ, শাঁসালো গাছ বটে। তবে শাঁসটা মাথার দিকে নয়, পায়ের দিকে। মানে কি না—গোড়ার দিকে। কেন না, কথাটা হচ্চে শাঁস—পা, অর্থাৎ শাঁকালু।"

অপর এক মহিলা বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি ঠাকুরপো! শাঁকালু গাছে চড়বে কি? শাঁকালু ত লতানে গাছ।"

ঠাকুরদা' বলিলেন,—"আগে কি লতানে ছিল? তখন এই গুঁড়ি—এই ডাল। মহাবীর স্বয়ং চেপে ঝাঁকারি দিয়েছেন, সাধ্য কি তার খাড়া থাকে। সেই অবধি মাথা নুইয়ে বাছাধন মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ছেন। ফল তার আজও প্রাণভয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে আছে।"

আমি তখন চণ্ডীমণ্ডপের সমস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র রোয়াকের উপর পা দিয়াছি। তখনও পর্য্যন্ত আমি কাহারও লক্ষ্য হই নাই। ঠাকুরদাদার মানে করা শুনিয়া আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"ও কি বল্‌ছেন ঠাকুরদা'! শিংশপা মানে যে শিমুল গাছ।" অমনি সকলে আমার পানে চাহিল।

ঠাকুরদা' চসমাখানি আবার চোখে তুলিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তাহা আর তাঁর করা হইল না। "মুখ্‌খু পণ্ডিতগুলো বলিয়াছে বুঝি? আরে শালা, সে সময় কি শিমুল গাছ লঙ্কায় ছিল? রাবণ রাজা কুস্তি ক'রে শিমুল গাছে পিঠ ঘসত, তাইতেই শিমুলগাছ

একেবারে তেল।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিলেন।

ঠাকুর-মা চণ্ডীমণ্ডপের একটি কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে তিরস্কারচ্ছলে কহিলেন;—"হাঁরে গাধা, ইস্কুলে পড়িয়া তোমার কি এই বিদ্যা হইতেছে? গুরুজনের উপর কথা কওয়া! নাও, কান মলিয়া ঠাকুরদাদার পদধূলি গ্রহণ কর।"

ঠাকুরমার আদেশটা আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার উপরে কি এক রকম শক্তি প্রকাশ করিত, আমি তাহা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদা'কে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন,—"বালকের কথা—শুনিতেই মিষ্টি।"

তখন আমার কথা লইয়া, বুদ্ধি লইয়া, লক্ষণ লইয়া মহিলামণ্ডলীর ভিতরে অনেক কথা হইয়া গেল।

সকলে নীরব হইলে ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আমি পিতামহীকে পিতার আগমনবার্ত্তা শুনাইলাম এবং তাঁহাকে গৃহে আসিতে কহিলাম।

এই কথায় আবার পাঠ বন্ধ হইল। ঠাকুরদা' এবারে বই মুড়িয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সপ্তাহ যাইল না, এরই মধ্যে যে অঘোরনাথ ফিরিয়া আসিল?"

ইহার পূর্ব্বে পিতা প্রায় মাসান্তে একবার করিয়া বাড়ী আসিতেন। সুতরাং সপ্তাহমধ্যে তাঁহার আসা সকলেরই বিস্ময়ের বিষয় হইল।

পিতামহী বলিলেন,—"কেন আসিয়াছে, তাহা তো বলিতে পারি না।"

তখন কেহ বলিলেন—"মনটা ভাল নয়, তাই কলিকাতায় থাকিতে পারে নাই।"

কেহ বলিলেন,—"মন খারাপ হইবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! অমন বাপ গেল, তা তাকে দেখিতে পাইল না।"

তৃতীয়া বলিলেন,—"আর তার বিদেশে থাকিবার দরকার কি? বুড় মাও কোন দিন হঠাৎ ঘরে মরিয়া থাকিবে!"

ঠাকুরদা' বলিলেন,—"বল কি গো! চার চারটে পাশ করিয়া ছোকরা ঘরে বসিয়া থাকিবে?"

তৃতীয়া উত্তর করিলেন,—"বাপ ত আজন্ম বিদেশে কাটাইয়া কিছু রাখিয়া গিয়াছে। তাই বাড়ীতে বসিয়া দেখিলে যে যথেষ্ট হয়।"

ঠাকুরদা। কি এমন রাখিয়া গিয়াছে? তার যা কিছু করা, সে সমস্ত আমারই হাত দিয়ে ত। একটা বই নাতী নেই তাই রক্ষা। ওর ওপর আর একটি দুটি হ'লে হাতে মাখিতে কুলাইবে না।

তৃতীয়া। বেশ ত, দেশের ইস্কুলে মাষ্টারী ত করিতে পারে। বামুনের ছেলে চাকুরী বৃত্তি ধরিলে, তার তেজ নষ্ট হইয়া যায়।

ঠাকুরমা এতক্ষণ এই সকল মতামত নীরবে শুনিতে-ছিলেন। এইবারে কথা কহিলেন। তৃতীয়া মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি ঠিকই বলিয়াছ ঠাকুর ঝি। তবে আমার স্বামীর সংসার-নির্ব্বাহের অন্য উপায় ছিল না বলিয়া তিনি চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঠাকুরদা। চাকুরীই বা তাকে কেমন করিয়া বলিব। সাহেবদের পড়াইত এইমাত্র।

ঠাকুরমা। সে যাই করুন, তবু তাকে চাকরীই বলিতে হইবে। আর সেই জন্যই তিনি একটি বিশেষ দুর্ব্বলতার কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরদা। কি কাজ! কই আমি ত কিছু জানি না!

ঠাকুরমা। তুমিও জান বইকি ঠাকুরপো, তবে তোমার মনে নাই।

ঠাকুরদা। কি বল দেখি?

ঠাকুরমা। সময়ান্তরে বলিব। আর বলিতেই বা হইবে কেন, এর পরে আপনিই বুঝিতে পারিবে।

এ হেঁয়ালীর মত কথা কেহ বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং শুনিয়াও তুষ্ট হইল না।

তৃতীয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলিতে কি আপত্তি আছে?"

ঠাকুরমা। না থাকিলে ত বলিতাম। তবে তোমাদের তা অবিদিত থাকিবে না। এ কথার পর আর কেহ সে কথা জানিতে জিদ করিল না। সুতরাং হেঁয়ালি—হেঁয়ালিই রহিয়া গেল। আমি পিতামহীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

৬

হেঁয়ালি বুঝিতে পারি আর নাই পারি, পিতামহীর কথার ভাবে আমি তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি! সেদিন প্রাতঃকালে মা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়াছি। এইমাত্র, পিতার আসিবার পূর্ব্বক্ষণে, মা ও ঠানদিদির কথোপকথনও শুনিলাম। আমি ইহাতেই বুঝিলাম, মা আমার অসাক্ষাতে নিশ্চয়ই পিতামহীর অমর্য্যাদা করিয়াছে।

পথে চলিতে চলিতে আমি পিতামহীকে একবার

জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ ঠাকুর মা, মা কি তোমাকে কটু কথা কহিয়াছে?"

পিতামহীও বিস্মিতভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লি বল দেখি?"

"তোমার কথার ভাবে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

পিতামহী হস্ত দ্বারা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন—"যদিই করে, তা হ'লে তুই কি করিবি?"

তাই ত! আমি তা হ'লে কি করিব? আমি কি-ই বা করিতে পারি? আমি পিতামহীর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলাম। পিতামহী আমার মুখ দেখিয়া কি বুঝিলেন। বলিলেন—'না ভাই, অমর্য্যাদা করিবে কেন? অমর্য্যাদা করিতে তাহার ক্ষমতা কি?"

"তবে চণ্ডীমণ্ডপে ও কথা বলিলে কেন?"

"সে ত তোমার পিতামহ সম্বন্ধে কথা। সে নিগূঢ় কথা তোমাকে শুনিতে নাই।"

"তবে শুনিব না।"

"আর দেখ, তুমি সন্তান। ব্রাহ্মণ-সন্তান—লেখাপড়া শিখিতেছ। এর পরে তুমিও তোমার বাপের মতন চার পাঁচটা পাশ করিবে। তুমি মাকে যেন কোনও কটু কথা কহিয়ো না।"

"আমি কি কটু কথা কহিয়াছি?"

"তুমি মাকে 'তুই' বলিয়ো না। গর্ভধারিণী সকলের চেয়ে গুরু—তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতে হয়। তুমি তাহা কর না বলিয়া তোমার মা আমার কাছে অনুযোগ করে।"

"তা আমায় বলে না কেন?"

"সেইটিই ত তাঁর দোষ। যাহাকে যাহা বলিবার, তাহা তার সুমুখে বলিলেই হয়। তুমি ছেলে, তোমাকে বলিবে, এ সাহসও তার নাই। দুর্ব্বল-ঘরের মেয়ে—নিজে কল্পনায় ভিতরে দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে। সে মনে করে, আমি তোমাকে অমর্য্যাদা দেখাইতে শিখাইয়া দিই।"

"তবে কি এবার থেকে তাঁকে 'আপনি' বলিব ঠাকুর-মা?"

"না ভাই, অত করিতে হইবে না। সেটা বাড়াবাড়ি হইবে। বংশের নিধি তুমি। তুমি 'তুমি' বলিলেই যথেষ্ট হইবে।"

আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করিলাম, মাকে এবার হইতে 'আপনি' বলিয়া ডাকিব।

বাড়ীর দ্বার-সমীপে আসিয়া, পিতামহী পাদ-প্রক্ষালনের জন্য পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। আমাকে বলিয়া গেলেন—"তুমি আগে যাও। গিয়া তোমার বাপকে বল, আমি আসিতেছি।"

আমি একাই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলাম। উঠানে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে ঠানদিদিকে দেখিলাম। তিনি মায়ের চুলবাঁধা কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট রেকাবিতে কতকগুলি মিষ্টান্ন। বুঝিলাম, পিতা ব্যাগের ভিতর পূরিয়া কলিকাতা হইতে কিছু খাদ্য-সামগ্রী আমাদের জন্য আনিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ ঠানদিদির প্রাপ্য হইয়াছে। সেরূপ মিষ্টান্ন আমাদের দেশে পাওয়া যাইত না। পিতামহ যখনই কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতেন, তখনই বড়-বাজার হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাবার আমার জন্য লইয়া আসিতেন। রাতাবী সন্দেশ, গুঁজিয়া, বরফী, পেঁড়া, ক্ষীরের গোলাপজাম, যাহা আমাদের দেশের লোক চোখে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না, পিতামহের মমতায় তাহা আমি কতবার উদর পূরিয়া আহার করিয়াছি। পিতামহের জীবদ্দশায় পিতা এ সকল সামগ্রী আনেন নাই। আনিবার আর লোক নাই বলিয়া পিতা আজ পিতামহের মমতার অনুসরণ করিয়াছেন।

আমি মিষ্টান্ন-পাত্রের দিকে চাহিয়াছি দেখিয়া ঠানদিদি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—"আর দেখিতেছ কি ভাই, তোমার সমস্ত খাবার তোমার বাপ আজ আমাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।"

"তা আর দিতে হয় না।"

"আর দিতে হয় না। তুমি যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর।"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে না দিতে পিতা আমাকে ডাকিলেন।—"হরিহর! ঠানদিদি তখন প্রস্থান-মুখে আমাকে বলিলেন—"না হে ভাই, ভয় নেই। তোমার মা তোমার জন্য আগে তুলে রেখে, তবে তোমার কাকাকে এই খাবার দিয়েছেন।" এই বলিয়াই ঠানদিদি চলিয়া গেলেন। আমি পিতার কাছে চলিলাম। তিনি হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় একটা চৌকীর উপর বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। আর বৃদ্ধ চাকর সদানন্দ চৌকীর পাশে বসিয়া একটা কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতেছিল। ফুঁ শেষ করিয়া হুঁকাটির উপর কল্‌কেটি বসাইয়া সবে মাত্র সে পিতার হাতে দিয়াছে, এমন সময়ে আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

মা অন্যদিকে মুখ করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কি কাজ করিতেছিলেন। তিনি আমার উপস্থিতি দেখিতে পান নাই। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই পিতাকে কি বলিতেছিলেন। আমি সে কথার কিয়দংশ শুনিতে পাইলাম।

মা বলিতেছিলেন—"খুড়ী মা আমার সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে।"

পিতা আমাকে দেখিয়াই হউক, অথবা অপর কোন কারণেই হউক, মায়ের কথার অন্য কোন উত্তর দিলেন না। বলিলেন—"আচ্ছা, সে সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন যা করিতেছ, কর।" এই বলিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর-মার দেখা পাইলি?"

"ঠাকুর-মা ঘাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে।"

"হাঁ রে গাধা, তুমি দিন দিন অসভ্য হইতেছ? তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে রূঢ় কথা বল?"

এইবারে মা কথা বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আমি পিতার প্রশ্নে কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া গেলাম। রূঢ়বাক্য বস্তুটা কি এবং তাহা মায়ের প্রতি কোন্ সময়ে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা, কখন আপনাকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছি?"

পিতা মায়ের মুখপানে চাহিলেন। মাও পিতার মুখপানে চাহিলেন এবং ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন—"আমার মুখপানে চাহিতেছ কি! ও সয়তান, ওর ভাব বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নয়।"

পিতা তখন আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"হাঁ রে গাধা! তবে ত তুমি সমস্তই জান। গুরুজনের সঙ্গে কিরূপ কথা কহিতে হয়, জানিয়াও তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে 'তুই' বলিয়াছ!"

আমি নিরুত্তর। সত্যই ত মাকে 'তুই' বলিয়াছি! পিতা শাসনস্বরূপ আমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন। বলিলেন—"এখানে থাকিলে তুমি অসৎ-শিক্ষায় ও অসৎসঙ্গে অসভ্য হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে আর এখানে রাখিব না।"

প্রথম প্রথম পিতামহের মুখে কলিকাতার কথা শুনিয়া কলিকাতা দেখিতে অথবা তথায় বাস করিতে আমার আগ্রহ হইত। এ আগ্রহ শৈশবে কতবার পিতামহের কাছে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু আজ শাসনের সঙ্গে পিতার মুখে কলিকাতার নাম শুনিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

শৈশবের কল্পনায় যতটুকু শক্তি, সেই শক্তিতে কলিকাতার এক বিভীষিকাময় ছবি আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। মুহূর্ত্তের ভিতরে আমি তন্ময় হইয়া গেলাম।

সদানন্দ এই সময়ে পিতার সঙ্গে কি কথা কহিল। আমার বোধ হইল, তাহাও কলিকাতার কথা। সদানন্দকে বোধ হয় পিতার সঙ্গে যাইতে হইবে। সদানন্দ কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছে না। পিতার কাছে এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সে তিনদিনের অবসর প্রাপ্ত হইল। সদানন্দ চিন্তা-ভারাক্রান্তের মত যেন টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল। আমি দ্বিগুণ ভীত হইলাম। পিতাকে কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ইত্যবসরে পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

পিতামহীকে দেখিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে, এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী আসিয়াছেন।

৭

পিতামহী গৃহে আসিলে, পিতা ও তাঁহাতে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, এখনকার বয়স ও এই কালোচিত মতি হইলে, আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া, সেই কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই। বালক 'আমির' বুদ্ধির দোষে বৃদ্ধ 'আমির' সে অমূল্য কথোপকথন শুনা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই সময় কতকগুলি খেলুড়ে সঙ্গী আমাকে ডাকিতে আসিল। আমি অমনি সকল ভুলিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলাম। পিতা-মাতা অথবা পিতামহী কেহই আমাকে নিষেধ করিলেন না।

কবি বলেন, বালক 'আমি' বৃদ্ধ 'আমির' জনক। বৃদ্ধ 'আমি' বালক আমির বুদ্ধিমত্তা লইয়া যত কেন রহস্য করুন না, অনেক সময় তাহার শাসন-বাক্য দূর-অতীত-সীমান্ত হইতে আসিয়া এমন কঠোরতার সহিত বৃদ্ধের কর্ণে ধ্বনিত হয় যে, তাহার জন্য বৃদ্ধ 'আমি'কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

মনে হয়, যে কোন উপায়ে হউক, একবার সেই বালকের কাছে ফিরিয়া যাই এবং তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে এই বৃদ্ধের বিজ্ঞতা অঞ্জলি দিয়া আসি। বালক বৃদ্ধ হয়, কিন্তু হায়, এ সংসারে কয়জন বৃদ্ধ বালক হইতে পারিয়াছে? কবি কাতরকণ্ঠে জননীর কাছে ভিক্ষা করিয়াছেন—"হে জননি! কর পুনঃ বালক আমায়।" সংসারে মান-যশ-প্রতিষ্ঠাজনিত অহঙ্কারে উচ্চ কোলাহলের মধ্য হইতে অসংখ্য বৃদ্ধের অন্তর এক একবার বলিয়া উঠিতেছে—"হে শিশুমূর্ত্তি গুরু! আমাকে যে কোন উপায়ে তোমার চরণসমীপে উপস্থিত কর।"

কিন্তু ফিরিবার উপায় নাই।—অন্ততঃ আমার নাই।

এই সুদীর্ঘ জীবন-পথে চলিতে চলিতে অন্যের শাসনে অথবা নিজের ইচ্ছায় এত কণ্টক-লতার কুঞ্জরচনা করিয়াছি। কেমন করিয়া ফিরিব? অনুকূল ঋতুবশে সেগুলা এত বড় ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে যে, ফিরিবার কথা মনে উঠিতেই বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। বাঘ-আঁচড়ার কাঁটা—উলঙ্গ হইয়া সে দূরদেশে ফিরিতে গেলে, শুধু হাড় কয়খানি ফিরিবে। এতদিনের সযত্নরক্ষিত দেহাবশেষ শুধু ক্ষুধার্ত্ত চিতাভূমির ব্যাদিতমুখে বিশ্রামলাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছে। ফিরিবার কথা মনে আনিতেই সে মজ্জার ভিতর হইতে স্পন্দন তুলিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ফেলে।

কাপড় পরিয়া ফিরিতে গেলে, একাংশের কণ্টক মুক্ত করিতে সহস্রাংশ কণ্টকযুক্ত হইবে। এক জননী—একমাত্র শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা জননী—মা! তুমি ভিন্ন সে মন্দাকিনীর তরঙ্গাকুলিতদেশে আর কেহ যে ফিরাইতে পারিবে না। তোমার কোল হইতে উঠিয়া তোমারই কোলে শুইতে চলিয়াছি। স্থিতিকে গতি-কল্পনা করিয়াছি। মা! এ মোহ ঘুচাইয়া দাও—আমাকে বালক কর।

পিতামহীর কথা অমূল্য—শুনি নাই, কিন্তু বুঝিয়াছি। তখন নয়—তখন বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না—বুঝিবার প্রয়োজনও ছিল না। যখন প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, তখন অনুমান করিয়াছি. অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। চিন্তার বিভিন্নমুখ স্রোতের মধ্যেও এক একটা মাথা-ভাঙ্গা ঢেউ সময়ে সময়ে এই হৃদয়-তটভূমিতে আঘাত করিয়া অনুমানকে নিশ্চয়াত্মক করিয়াছে। কথা অমূল্য—শুনিতে পাই নাই—শুনিতে পাইব না—তবু বুঝিয়াছি—কথা অমূল্য।

খেলার শেষে যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আমি বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতামহী তাঁহার ঘরের দাওয়ায় আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। সে সময় তাঁহার কাছে যাইবার আমার অধিকার ছিল না। আমি পিতার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, মা চোখে আঁচল দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিতা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা মায়ের অঞ্চল মৃদু আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছেন—"কেঁদো না। আমি দেখিতেছি, আমার পিতার মৃত্যুতে মায়ের মাথা খারাপ হইয়াছে।"

মায়ের চক্ষু অঞ্চলেই চাপা রহিল, পিতা কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি আবার বলিলেন,—"মাথা খারাপ না হইলে আমি পাঁচটা পাস করিয়াছি,—মূর্খ স্ত্রীলোক আমাকে উপদেশ দেয়!"

এই সময় পিতা আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিলেন—"নাও, চোখ খোল। হরিহর আসিয়াছে। তাহার আহারের ব্যবস্থা কর।"

তথাপি মা উত্তর করিলেন না। চক্ষু অর্দ্ধাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মায়ের এই ভাব দেখিয়া আমি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পিতা আমাকে বলিলেন—"যা হরিহর, তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে যা; বল্, আমাকে খেতে দাও।" আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে বাবা?"

"কিছু হয় নাই। তোর ঠাকুর-মা কি বলিয়াছে। সেইজন্য ওঁর দুঃখ হইয়াছে।"

"আমি ঠাকুরমাকে বকিব?"

"না না, তোকে কিছু বলিতে হইবে না। তুই ওঁর সঙ্গে যা।"

আমি পিতার আদেশমত মাতার অনুসরণে যাইতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ্ হরিহর! তোর ঠাকুর মা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা—তুই বল্‌বি, আমি জানি না। যদি কোন উপদেশ দেয় ত সে কথা কানেও তুলিস্ নি। ওরা সেই পূর্ব্বকালের অসভ্য, লেখাপড়া কিছু জানে না। তুই কালে লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইবি, আমার মত হাকিম হইবি। ও বুড়ীর কথা শুনিলে কিছুই হইতে পারিবি না। কেবল তোর গর্ভধারিণী তোকে যা উপদেশ দিবে, সেইমত কার্য্য করিবি। তোর ঠাকুরমার অমূল্য উপদেশ শুনিলে তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে। যা—শিগ্‌গির যা। উনি কোথায় গেলেন, দেখিয়া আয়। তাঁহাকে ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া যা।"

আমি ঘরের বাহির হইয়া দেখিলাম, মা আগে হইতেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি, মায়ের পরিবর্ত্তে ঠানদিদি রাঁধিতেছেন। আর মা রন্ধনের পরিবর্ত্তে অঞ্চলে নাসিকা-হুঙ্কার পরিত্যাগ করিতেছেন।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠানদিদি চুলী পশ্চাতে রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"কি হ'ল বৌমা?"

এমন সময়ে আমি উপস্থিত। মা চক্ষু অঞ্চলমুক্ত করিয়া বলিলেন—"পরে বলিব।" মায়ের মুখে না জানি কত ঝুড়ি দুঃখের চিহ্নই চাপানো রহিয়াছে। কিন্তু ও মা! তা নয়! মায়ের অন্তরের আনন্দ-উৎসব অধর-প্রান্ত দিয়া বাহির হইবার জন্য যেন যুদ্ধ করিতেছে। ঠানদিদিও তাহা দেখিলেন। দুইজনের চোখে চোখে

কি ইঙ্গিত হইল। তিনি আবার রাঁধিতে বসিলেন। আমি তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আহারে বসিলাম।

বালকের চক্ষু পাখীর চক্ষুর সঙ্গে তুলনীয়। আহারান্তে দেখি, পিতামহী তখনও আহ্নিকে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি তাঁহার উঠিবার অপেক্ষা না করিয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভিভূত হইলাম।

আমি পিতামহীর ঘরেই শুইতাম। শুধু শুইতাম কেন, আহারাদি যাবতীয় ব্যাপার আমার পিতামহীর নিকটেই নিষ্পন্ন হইত। মা শুধু গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আমার লালন-পালনের ভার পিতামহীর উপরেই পড়িয়াছিল। শিশুর উৎপাত-অত্যাচার যা কিছু একমাত্র পিতামহীই সহ্য করিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু'চারিটা কথাবার্ত্তা ছাড়া আমার অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না।

সেই পিতামহীর সম্বন্ধে পিতার মত-প্রকাশে বালকের মন যতটা ব্যাকুল হইবার হইয়াছিল। পিতার কথায় ও মাতার পূর্ব্বোক্তভাবে অবস্থিতিতে কি বুঝিয়াছিলাম, জানি না। কিন্তু মনের অন্তরালে চিরাবস্থিত রহিয়া, যিনি বালক-বৃদ্ধকে এক করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বোধ হয় সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মন, সমস্ত ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে যেন মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইতেছিল।

আমি পিতামহীর আহ্নিকাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, জানি না। রাত্রিও কত হইয়াছে, বলিতে পারি না। সহসা কি জানি কেন, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখি, পিতামহী একটি দীপ আমার মুখের কাছে ধরিয়া আমার মাথার শিয়রে তক্তাপোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন।

শয্যায় মূত্রত্যাগ আমার রোগ ছিল বলিয়া পিতামহী প্রতিদিন মধ্যরাত্রে আমাকে ঘুম হইতে উঠাইতেন। কিন্তু উঠাইতে তাঁহাকে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা আর আপনাদের কি বলিব? প্রথম প্রথম তিনি আমার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা রাখিতেন না। ঘুমন্ত আমাকে কাঁধে তুলিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইদানীং আমিও কিছু ডাগর হইয়াছি, তিনিও অধিকতর বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এতই কৃশ হইয়াছে যে, এক বৎসর যে তাঁহাকে দেখে নাই, সে এখন ঠাকুরমাকে চিনিতে পারিবে না।

সুতরাং ইদানীং আমার ঘুম ভাঙ্গাইতে তাঁহাকে অনেক পদাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিতে হইত। তথাপি তিনি আমাকে না উঠাইয়া ছাড়িতেন না। আজিও বোধ হয়, তিনি সেইরূপ করিতে আমার মাথায় শিয়রে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু আজ আর ঠাকুরমাকে উঠাইতে হইল না। আমার মুখের কাছে আলো ধরিতে না ধরিতে আমি জাগিয়াছি। জাগিয়াই বুঝিলাম, আমাকে কি করিতে হইবে। বুঝিবামাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিলাম!

শয্যা পুনর্গ্রহণের সময় ঠাকুরমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ রে ভাই, তোর বাপ মা কি তোকে কোন তিরস্কার করিয়াছে?"

পিতা-মাতার কথা দূরে থাক্, তাঁদের স্মৃতি পর্য্যন্ত আমার ঘুমচাপা পড়িয়াছিল। পিতামহী জিজ্ঞাসা করিতে মনে পড়িল। আমি উত্তর করিলাম—"না ঠাকুর মা, আমাকে বাবা মা কিছু বলেন নাই।"

"আমাকে বলিয়াছে? তা বলুক। তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। তবে তোমাকে কিছু বলিলে আমার কষ্ট হইবে। কেন না, আমার কাছেই তোমার ভালমন্দ যা কিছু শিক্ষা। তোমার বাপ মা তোমাকে বড় একটা দেখে নাই।"

এই বলিয়াই পিতামহী চুপ করিলেন এবং আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল, ঠাকুরমার মনে যেন বড়ই একটা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মনে হইল যেন, একটা নিশ্বাস-তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া আমার কপোল স্পর্শ করিতেছে।

আমি বলিলাম—"কই, মা, বাবা তোকে বকিয়াছে, এ কথা ত তোকে বলি নাই!"

"তুমি বলিবে কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া জানিয়াছি। তুমি আপনা আপনি জাগিতে, তাহা বুঝিয়াছি। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তোমার বাপ তোমাকে তিরস্কার করিয়াছে। যা হোক ভাই, তোমার দাদার স্বর্গে যাওয়ার পর আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে, এ সংসারে এমন আর কেহ রহিল না। এখন দেখিলাম, আছে। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার দুঃখে দুঃখী হইতে আমার অঞ্চলের নিধি তুমি রহিয়াছ।"

"দেখ্ মা, তোকে কেউ কিছু বলিলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"তবে আর আমার কিসের দুঃখ! কিন্তু ভাই, দেখ, যেন কখন কোন কারণে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দেখাইও না। তা করিলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল

হইবে। কখনও দুঃখ পাইতে হইবে না। পিতামাতার মত গুরু আর নাই।"

আমি শৈশবে ঠাকুরমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতাম। বাবা যা বলিতেন, মা যা বলিতেন, আমি তাই শুনিয়াই ওই কথা বলিতে শিখিয়াছিলাম। আর পিতামহীর সম্বোধনের অনুকরণে মাকে 'বৌমা' বলিতাম। বৎসর খানেক হইতে মা ও বাবা উভয়েই আমার এই সম্বোধনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে অনুনয়, তাহার পর আদেশ, শেষে এই কদভ্যাস দূর করিতে তাঁহারা আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

পিতামহীও আমাকে নিষেধ করিতেন। সকলের পীড়াপীড়িতে অভ্যাসটা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে পিতামহীর অগাধ স্নেহে আত্মহারা হইয়া, তাঁহাকে ঠাকুরমা বলিতে ভুলিয়া যাই। আজ ভুলিয়াছি। অন্য সময়ে ভুলিলে পিতামহী তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু আজ কি জানি কেন, তিনি তাহা করিলেন না। সুতরাং মনের আবেগে আমি তাঁহাকে বারংবার মাতৃ-সম্বোধন করিলাম এবং তাঁহার মমতার্দ্র কোমল স্নিগ্ধ করকমল-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৮

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই শুনিলাম, আমার পিতা হাকিম হইয়াছেন। পিতামাতার মুখে শুনি নাই—তাঁহারা তখনও পর্য্যন্ত ঘুম হইতে উঠেন নাই। পিতামহীও আমাকে বলেন নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ঠানদিদির মুখে।

আমি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চোখ দু'টা হস্ত দ্বারা মার্জ্জিত করিতেছিলাম। চোখে তখনও পর্য্যন্ত ঘুমের ঘোর ছিল। সহসা ঠানদিদির কথার মত কথায় চমকিয়া উঠিলাম। চোখ মেলিয়া দেখি, সত্য সত্যই ঠানদিদি! অত প্রত্যূষে তাঁহাকে কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখি নাই। আজ প্রথম দেখিলাম।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন—"কি রে ভাই, সকালে এক চোখ দেখাইতেছিস কেন? আমার সঙ্গে কি ঝগড়া করিবি? তা ভাই, তোর সঙ্গে ঝগড়া হইলে বুড়ো ঠানদিদিরই বিপদ্। তোর বাপ হাকিম। সে ত আর তোর ঠানদি'দি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে না। একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া জিঞ্জিরে পাঠাইয়া দিবে। দে ভাই দু'চোখে হাত দে।"

আমি চক্ষু হইতে হাত অপসারিত করিয়া ঠানদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাকিম কি ঠানদিদি?"

"সে কি রে শালা, শুনিস্‌নি?"

"কই না!"

"তোর বাপ, মা, কিংবা ঠাকুরমা, কেউ তোকে কিছু বলে নি?"

"কই, না ত ঠান্‌দি!"

"তা হ'লে দে ভাই, আমাকে কি বক্‌শিস দিবি দে। আমিই সকলের আগে তোকে এ সুখের সমাচার শুনাইলাম।"

"হাকিম কি ঠান্‌দি?"

"তা ভাই আমি জানি না। সে তোর বাপ্‌ কিংবা মাকে জিজ্ঞাসা করিস্। আমি ভাই তোমার গরীব ঠান্‌দিদি। চরকায় পৈতার সুতো ভেঙে দিন চালাই। হাকিম যে কি, তা আমি কেমন করিয়া বলিব!"

এই সময় মা দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠান্‌দিদি বলিলেন—"বৌমা! তোমার ছেলেকে হাকিম কি বুঝাইয়া দাও। সে বেছে বেছে তোমার চরকা-ভাঙ্গা খুড়্‌শাশুড়ীকে হাকিম বোঝাবার লোক ধরিয়াছে। দারোগা হইলেও না হয় কতক মতক বুঝাইতে পারিতাম।"

মাতা ঠান্‌দিদির এ কথাতে কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপোকে বলিয়াছ?"

"আর বলাবলি কি! সে ত তোমাদেরই। তাহাকে যখন যা' হুকুম করিবে, সে তাই করিবে। সে কি 'না' বলিতে পারে! তোমার হরিহরও যেমন, সে-ও তেমন। খাইতে না পাইলে, তার খাওয়া-পরার ভার তোমাদেরই লইতে হইবে।"

"বেশ, তা'হলে এখানে যদি তার কোন কাজকর্ম্ম সারিবার থাকে, সারিয়া লইতে বল। বাবু বোধ হয় কালই এখান হইতে রওনা হইবেন।"

"কাজকর্ম্ম সারিবার তার আর কি আছে। খায়, ঘুমায়—আর তাস-পাশা খেলিয়া দিন কাটায়। এইবারে তোমাদের কৃপা পাইয়া যদি সে মানুষ হয়।"

"বাবুর মন জোগাইয়া চলিতে পারিলে হইবে বই কি। বাবু ত এখন যে সে লোক ন'ন। ইচ্ছা করুলে রাজাকে ধ'রে জেলে দিতে পারেন।"

"বল কি বৌমা, অঘোরনাথ আমাদের এমন লোক হয়েছে?"

"এখন ওঁর কাছে যে সে লোক যখন তখন আর আসিতে পারিবে না। কোম্পানী বাবুকে অট্টালিকার মত বাড়ী দিবে। বাড়ী-ঘেরা বাগান, বাগান-ঘেরা

ঝিল, আর ঝিল-ঘেরা আকাশের চেয়েও উচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের উপরে শান্ত্রী পাহারা। তাহারা চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল তরোয়াল খুলে পাহারা দিতেছে। যে সে লোকের কি আর বাবুর কাছে পৌছিবার যো থাকিবে!"

"সে কি বৌমা, তা হ'লে কি অঘোরনাথকে কোম্পানী কয়েদ করিয়া রাখিবে?"

এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। ঠান্‌দিদি তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাসিয়ো না বৌমা, আমি মূর্খ স্ত্রীলোক। তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মূর্খ ছেলেটাকে অঘোরনাথ সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছে বলিয়াই বলিতেছি। তোমার বাবুই যদি কয়েদ হয়, তা হ'লে সে মূর্খটাকে কি কোম্পানী অমনি ছেড়ে দিবে?"

এই কথা শুনিবামাত্র মায়ের হাসি দ্বিগুণ স্বরে চড়িয়া উঠিল। মা বলিলেন—"কয়েদ! আমার সোয়ামীকে কয়েদ দিতে পারে, এমন লোক কি আর ভারতে আছে। তিনিই কত লোককে যে কয়েদ দিবেন, তার ঠিক কি!"

"কেন মা, অঘোরনাথ তাদের কয়েদ দিবে কেন?"

"কেন, এ কথা বলা বড় শক্ত। আর বলিলেও তুমি বড় বুঝিবে না। ওঁর চাকরীই হচ্ছে কেবল কয়েদ দিবার জন্ত!"

"তাই বল! অঘোরনাথ তা হ'লে দারগা হইয়াছে!"

"যাও যাও—তুমি বুঝিবে না, খুড়ীমা! দারগা বাবুকে দেখিলে ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিবে। দূর হইতে তাঁহাকে সেলাম করিবে। বাবুর কি চাকুরী তা তুমি কেন, এ গ্রামে এমন কেউ নেই যে, বুঝিতে পারে। আমার বাবা হাকিমের পেসকারী করে। তাঁরই ভয়ে বাঘে গরুতে জল খায়। লাট সাহেব কাকে বলে, শুনেছ কি খুড়ীমা?"

ঠানদিদি মাথাটা একেবারে কটিদেশের নিকট পর্য্যন্ত হেলাইয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিলেন - "ও! তাই বল্ না বউমা! অঘোর আমার লাট হইয়াছে!"

মাতা ঈষৎ স্মিতমুখে বলিলেন—"একেবারে ততটা নয়। লাট ত আর বাঙ্গালীর হইবার যো নাই। তবে অনেকটা সেই রকম। লাটসাহেব হচ্ছে মুলুকের লাট। আমাদের বাবু হবেন, জেলার লাট।"

এই কথা শুনিবামাত্র ঠানদিদির চক্ষু একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। মুখ ব্যাদিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মা বলিলেন—"আমাকে কি বাবা এই অসভ্য জঙ্গলীদের দেশে বিবাহ দিতেন! বাবুর ঠিকুজী দেখিয়া তিনি জানিয়াছিলেন, তিনি কালে হাকিম হইবেন! তাই তিনি ইঁহাদের বাড়ীতে আমার বিবাহ দিয়াছেন।"

ঠানদিদি এতক্ষণে যেন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাকে, বাবাকে ও আমাকে যত পারিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাবা ও আমি তাঁহার মাথার কেশ-প্রমাণ পরমায়ু লাভ করিলাম। মা তাঁহার ভবিষ্যতের শুভ্রমস্তকে সিন্দূর ধারণের অধিকার পাইলেন। আশীর্ব্বা-দান্তে তিনি বলিলেন—"তা এ চাকরী আমাদের এ জঙলা দেশের লোক কেমন করিয়া বুঝিবে! বাঙ্গালী এ দেশে সর্ব্বপ্রথম এই চাকুরী পাইয়াছে। ভোগ কর মা—ভোগ কর। স্বামি-পুত্র লইয়া, নাতিপুতি লইয়া, তুমি মনের মতন সুখভোগ কর। তবে মা, তোমার গরীব দেওরটিকে কৃপা-নয়নে দেখিয়ো। তা হ'লেই আমি ধন্ত হইব।"

মা ঠানদিদিকে ধন্ত করিবার আশ্বাসটা না দিয়া বলিলেন—"অসভ্য জঙলার দেশ না হইলে, মা কখনও সন্তানের সুখে ঈর্ষ্যা করে?"

ঠানদিদি এ কথার উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পিতামহী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মা ও ঠানদিদি তাঁহার আগমন আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। বাটীর অঙ্গনে প্রবেশমাত্র তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথোপকথন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঠাকুরমা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মাকে বলিলেন,—"অঘোরনাথকে ঘুম হইতে তুলিয়া দাও, তাহাকে বল, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক তার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করিতেছে।" এই বলিয়া পিতামহী তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই ঘরের দাওয়াতেই বসিয়া-ছিলাম। তিনি আমাকে দেখিলেন না, কি দেখিতে পাইলেন না, সেটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন না, তিনি আমার সঙ্গে কোন কথা কহিলেন না।

ঠাকুরমার সঙ্গে আমার কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল। মা ও ঠানদিদির কথোপকথন শুনিয়া আমি কতকটা হতভম্বের মত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের অনেক কথা জানিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত কথা ভাল-রূপ বুঝি নাই। মায়ের কাছে বুঝিতে চাহিলে তিরস্কার মাত্র লাভ হইবে। তিনি যে আমাকে কিছু বুঝা-ইয়া বলিবেন, এটা আমার বিশ্বাস ছিল না। বাবাকে ভয় করিতাম। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ সব কথা কহিতে আমার সাহস নাই। ঠানদিদি নিজেই বুঝিতে অপারগ। তখন সে আমাকে কি বুঝাইবে! তা' হইলে একমাত্র ঠাকুরমা ভিন্ন আর কাকে সুধাইব?

কিন্তু ঠাকুরমা আমার সঙ্গে কথা কহিল না। হঠাৎ কি জানি, কেন মনে একটা দুঃখ উপস্থিত হইল।

ঠাকুরমা দোষী কি না, বিচার করিবার আমার অবকাশ হইল না। আপনা আপনি তাঁহার উপরে আমার অভিমান জাগিল। আমি আর ঠাকুরমাকে না ডাকিয়া উঠিলাম। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে তাহারা আসিয়াছে, মনে করিলাম, তাহাদের একবার দেখিয়া আসি। ইহার পূর্ব্বে পিতার আগমনে তাহারা ত কই আসিত না। কিন্তু আজ আসিয়াছে। এক আধ জন নয়। পিতামহী বলিলেন, অনেক। বাবা হাকিম হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা বাবাকে দেখিতে আসিয়াছে। আমি চণ্ডীমণ্ডপে যাইবার জন্য দাঁড়াইলাম।

পিতামহী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখিলে খুড়ীমা ব্যাপারটা!"

ঠানদিদি উত্তর করিলেন—"দেখিতে ত পাচ্ছি মা। কার মন কি, কেমন করিয়া বুঝিব! ছেলের সুখে মা ঈর্ষ্যা করে, এ ত কোনও কালে শুনি নাই। সত্যকথা বলিতে কি মা, আমার ছেলের যদি আজ এ অবস্থা হইত, আমি দু' বাহু তুলে নাচিতাম। আর শত দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া কপাল ঢিপি করিয়া ফেলিতাম। ছেলেটাকে একটু বেশী রকমের ভালবাসি বলিয়া অমনি অমনি ত পাড়ার লোক কত কথা বলে। দশ মাস দশ দিন গর্ভে-ধরা, কত কষ্টে মানুষ-করা ছেলে—সে সুখী হবে, এর চেয়ে মায়ের সুখ আর কি আছে! না মা—আমরা গরীব—আমরা বড় মেজাজের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

এই সময় পিতা গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। মা ও ঠানদিদির কথোপকথন বন্ধ হইল। ঠানদিদির পুত্রকে প্রস্তুত থাকিবার উপদেশ দিয়া মা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, মা পিতাকে বাহিরে জনাগমের সংবাদ দিলেন। পিতা তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া বাহিরে চলিলেন। মাতা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমিও পিতার অনুসরণে বাহিরে যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কই হরিহর, এখনও বই লইয়া পড়িতে ব'স নাই?"

আমার অবস্থাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম—"পণ্ডিত ম'শাই এখনও আসেন নাই।"

"এখনও বৈকুণ্ঠ আসে নাই? মাসে মাসে মাহিনা লইবার ত খুব তাড়া আছে। কিন্তু পড়ায় সে কতক্ষণ? কাজে ফাঁকি দেয়, সেই জন্যই হতভাগ্যের উন্নতি হয় না।"

পিতা বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকে উপলক্ষ করিয়া আরও দুই চারিটা উপদেশ দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিতেছ?"

"বৈকুণ্ঠ কত বেলায় পড়া'তে আসে? তুমি তাহাকে কিছু বল না, না?"

"কি বলিব? সে যেমন সময় আসিবার, প্রতিদিনই তেমনি সময়ে আসে। আজই কেবল আসে নাই। বোধ হয়, সে আর আসিবে না।"

"কেন?"

"কেন আমি জানি না। জানিতে হয়, নিজে তার কাছে গিয়া জানিয়া আইস।"

এই উগ্রযুক্ত ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃবাক্য শুনিবামাত্র পিতা চুপ করিলেন। এই সময়ে পিতামহী গৃহ হইতে বাহির হইয়াই বলিলেন—"কখন আসেনি মা, এরূপ সময়ে বৈকুণ্ঠ কখন আসেনি। আজ তুমি ভুলে একটু সকালে উঠে পড়েছ, তাই তাকে দেখিতে পাও নাই।"

মাতা। ভুলে উঠিয়াছি কি রকম? ঠেস না দিয়া কি কথা কহিতে জান না?

পিতামহী। ঠেস কাকে দিব? আর দিবার প্রয়োজন কি? সত্য কথা বলিব। তাতে কাকে ভয় করিয়া বলিব? নিত্য যে সময়ে উঠ, সেই সময়ে উঠিলেই বৈকুণ্ঠকে দেখিতে পাইতে। সে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবার সময় জানে।

পিতা তখন অনুচ্চকণ্ঠে উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কি কর—কি কর! বাহিরে ভদ্রলোক সকল আসিয়াছে। এখনি আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হইবে।"

মাতা একটু বিশেষ রকমের রুক্ষস্বরে পিতাকে বলিয়া উঠিলেন—"আজই যদি তুমি আমাকে কলিকাতা লইয়া না যাও, তা হ'লে তোমার অতি বড় দিব্য রহিল।"

পিতা কেবল হস্ত-সঞ্চালনে ও ইঙ্গিতে মাতাকে চুপ করিতে অনুরোধ করিলেন। কে সে অনুরোধ শুনে! মা ইঙ্গিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"যদি না নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি এ বাটীতে জলগ্রহণ করিব না।"

পিতার ইঙ্গিতমাত্র অবলম্বন। তিনি তারই সাহায্যে মাকে যথাসাধ্য নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া এবং বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিতে আমার উপর আদেশ দিয়া, বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বাহির হইলাম। ভিতরে মা ও পিতামহীতে আর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা হইল কি না, জানিতে পারিলাম না।

সেই দিনেই থানার দারোগার হাতে পিতার নিয়োগ-পত্র আসিল। আমাদের দেশে এরূপ চাকরীর কথা লোকে বড় একটা শুনে নাই। সুতরাং পিতাকে দেখিবার জন্ম গ্রাম ও গ্রামান্তর হইতে নরনারী আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

৯

বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোক ও বাড়ীর বাহিরে পুরুষ-জন সমাগমে আর কোলাহলে সমস্ত দিনটাই প্রায় কাটিয়া গেল। মা, পিতা, পিতামহী—কেহ কাহারও সহিত কথা কহিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইলেন না। আমিও স্কুলে যাওয়া, অথবা পড়াশুনা, কিছুই সে দিন করিতে পারি নাই। সে দিন শনিবার। স্কুলে না গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া পিতা আমার না-যাওয়াতে কোন আপত্তি করিলেন না। আমাকে বাড়ীতে রহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দভোগের অবসর দিলেন।

আর এ দেশের স্কুলে যাইয়া বা কি করিব? ঠিক বুঝিয়াছি, দুই চারি দিনের মধ্যেই আমাকে স্কুল ছাড়িয়া পিতার অনুগামী হইতে হইবে। মা-ও তাই মনে করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আর এক দিনের জন্তও এ বাটীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন।

কিন্তু মায়ের প্রতিজ্ঞা রহিল না। বেলা এগারটা না বাজিতে বাজিতেই ঠানদিদির ও পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি জলও গ্রহণ করিলেন, অন্নও গ্রহণ করিলেন। কেবল রন্ধনটাই নিজে করিলেন না। পূর্ব্বদিন হইতে রন্ধনকার্য্যের ভার ঠানদিদিই গ্রহণ করিয়াছেন। পিতামহী মাকে অনুরোধও করেন নাই, মা আহার করিলেন কি না দেখেনও নাই।

সন্ধ্যার কিছু পরে, পিতা পিতামহীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতামহী তখন সবেমাত্র আহ্নিক সমাপন করিয়াছেন। আমিও আহার শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে সবে মাত্র প্রবেশ করিয়াছি। আমি ঘরের মধ্যে নিজের বিছানায় শয়ন করিলাম। বাবা ও ঠাকুরমাতে কি কথা হয়, শুনিবার জন্ম উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের ভিতরে মায়ের সম্বন্ধ লইয়াই কথাবার্ত্তা হইবে। কেন না, প্রাতঃকালের সেই বচসার পর উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। পিতাও পিতামহীর কাছে সে সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই, অথবা প্রকাশ করিবার অবকাশ পান নাই। এমন সুখের দিনে, আমার উভয় গুরুজনের মধ্যে মনোমালিন্য আমার পক্ষে বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছিল। বাস্তবিক বলিতে গেলে আমি সারাদিন সুখেও সুখ পাই নাই। এখন আমি আগ্রহসহকারে পিতার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন প্রার্থনা করিতেছিলাম।

কিন্তু পিতা পিতামহীর কাছে মায়ের কথা আদৌ উত্থাপিত করিলেন না। তিনি প্রথমেই পিতামহীর কাছে কথোপকথনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"মা তোমার আহ্নিক শেষ হইয়াছে?"

ঠাকুরমা বলিলেন—"কি বলিতে চাও, বলিতে পার।"

"আমাকে কিছু টাকা যে দিতে হবে।"

পিতার এই কথায় পিতামহীর কোনও উত্তর শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম, তবু শুনিতে পাইলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পিতা আবার বলিতে লাগিলেন—"নূতন চাকরীস্থানে যাইতে হইবে, চাকরীর উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিতে হইবে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।"

পিতামহী এইবার বলিলেন,—"কেন, টাকা ত তোমার কাছে আছে।"

"কই, কোথায় টাকা? টাকা থাকিলে তোমার কাছে চাহিব কেন?"

"তুমি ত গত মাসের মাহিনা আমায় দাও নাই।"

পিতা এই কথা শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সে টাকা? সে কি আছে তা তোমাকে দিব!"

"কিসে সে টাকা খরচ হইল?"

"এত বড় একটা শ্রাদ্ধের হাঙ্গাম গেল। কিসে খরচ হইল, তা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

"শ্রাদ্ধের খরচ তোমাকে কি করিতে হইয়াছে?"

"কি হইয়াছে, তা তোমাকে কি বলিব? আমি কি হিসাব রাখিয়াছি? আর সে কত টাকা? সামান্য ষাট টাকা বই নয়। এই চাকুরী যোগাড় করিতে কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তা কি তুমি জান? আজই চৌকিদারকে দুই টাকা বক্‌সিস দিতে হইল। ষাট টাকা, সে কোন কালে ধূলোর মত উড়িয়া গিয়াছে। আমাকে আজই টাকা না দিলে চলিবে না।"

"কত টাকা?

"অন্ততঃ পাঁচশো।"

"বল কি! এত টাকা!"

"এ আর এত কি! যে চাকরী পাইয়াছি, তাহাতে এ আমার এক মাসের আয় বই ত নয়।"

"তা হ'লে এত টাকা লইবার প্রয়োজন কি ?"

"কিন্তু ছয় মাস আমি পঞ্চাশ টাকার বেশী পাইব না। এই ছয় মাস আমায় শিক্ষানবীশী করিতে হইবে। এই ছয়-মাসে জলপানিস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে ত তা বুঝিবে না। তাহারা আমাকে হাকিম বলিয়াই জানিবে। হাকিমের মর্য্যাদায় থাকিতে হইলে এই ছয়মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ হইবে। পাঁচশো টাকা ঘর হইতে লইব, পাঁচশো টাকা মাহিনা থেকে খরচ করিব।"

"অত টাকা ত আমি দিতে পারিব না। আমার নিজের বলিবার কুড়ি গণ্ডা টাকা আছে, তাই তোমাকে দিতে পারি।"

"সে কি! এত টাকা পিতা উপার্জ্জন করিলেন, আমি উপার্জ্জন করিলাম—তোমার হাতে টাকা নাই! এ তুমি কি বলছ মা ?"

"তা'মা কি বলিবে ? টাকা উপার্জ্জন করিয়া তুমি কি মায়ের হাতে দিয়াছ—না কর্ত্তাই তাঁর উপার্জ্জনের টাকা আমাকে কখন দিয়াছেন ? তোমাদের উপার্জ্জনের কথা আমি শুনিয়াছি মাত্র। চোখে কখনও দেখি নাই।"

"মৃত্যুকালেও কি টাকার কথা তিনি ব'লে যান নি ?"

"কিছু না। হৃদ্‌রোগে মৃত্যু। কথা বলিবার সময় পান নাই।"

কিছুক্ষণের জন্ত আবার উভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। বাবা কি করিতেছেন, দেখিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলাম। উঁকি দিয়া দেখি, পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। আর পিতামহী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উর্দ্ধনেত্রে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন। আমি প্রায়ই তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখি বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আহ্নিকের সময় কেবল তিনি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। আহ্নিকান্তে যখন তিনি জপে বসিতেন, তখন তিনি প্রয়োজন হইলে লোকের সঙ্গে কথাও কহিতেন।

অনেকক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া পিতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"মা, এরূপ করিয়া সন্তানের মাথায় বজ্র হানিয়ো না। টাকা তোমার কাছে আছে নিশ্চয় জানিয়া, আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।"

পিতামহী আবার নীরব রহিলেন। এখন বুঝিতেছি, এ কঠোর বাক্যের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পিতা উত্তরের প্রতীক্ষায় পিতামহীর মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার বলিলেন—"কি বল ?"

পিতামহী। কি বলিব! এই ত বলিলাম, কুড়ি গণ্ডা টাকা লইতে চাও, দিতে পারি। ইহার অধিক চাহিলে কেমন করিয়া দিব ?

পিতা। তোমার হাতে আর কিছু নাই ?

পিতামহী। কিছু নাই, এ মালা হাতে করিয়া কেমন করিয়া বলিব। আরও দুই চারি টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা একত্র করিলেও তোমার পাঁচশো হইবে না।

পিতা। তা হ'লে তুমি আমাকে বুঝিতে বল, পিতা এই এতকাল কেবল চিনির বলদের মত বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন, এক পয়সাও উপার্জ্জন করেন নাই ?

পিতামহী। উপার্জ্জন করেন নাই ত, এত বিষয় আশয় কোথা থেকে হইল ? তোমাদের কি ছিল ? তবে কি তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমিও কখন জানিতে চাহি নাই, তিনিও আমাকে বলেন নাই। জানিবার মধ্যে এক জন কেবল তাঁহার নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিত। টাকাকড়ি কিছু আছে কি না, তুমি গোবিন্দ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার। যদি কিছু থাকে, তাহার কাছেই আছে। না থাকে নাই।

পিতা। আমার বাবার উপার্জ্জন। কি আছে না আছে, আমি তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গোবিন্দ খুড়োকে জিজ্ঞাসা করিব ? মা, তোমার এমনি মতিচ্ছন্ন হইয়াছে!

পিতামহী। ও কি বলিতেছ অঘোরনাথ!

পিতা। আর না বলিয়া কি বলিব। আমি দেবতার দুষ্প্রাপ্য চাকরী শুধু তোমার জন্ত পাইয়াও পাইলাম না। তোমার হাতে টাকা থাকিতেও তুমি বউএর উপর ঈর্ষ্যায় আমাকে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছ।

পিতামহী। ঈর্ষ্যা করিবার লোক না পাইলে, এ ছাড়া আর কি করিব অঘোরনাথ ? তুমি একমাত্র পুত্র। তাঁহার কাছে দুই এক পয়সা চাহিলে তিনি তোমার দোহাই দিয়া আমাকে নিরস্ত করিতেন। বলিতেন— "ইহার পরে অঘোরনাথ তোমাকে কি খেতে দিবে না বলিয়া, আগে হইতে বৈধব্যের সম্বল করিতেছ ? ভয় নাই। রত্ন গর্ভে ধরিয়াছ। যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহারই কাছে পাইবে। কখনও সে তোমাকে অভাবে রাখিবে না।" তিনি দুই দিন মাত্র স্বর্গে গিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তোমার কাছে যা পাইলাম! ইহার পরে আরও না জানি কি পাইব, ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

পিতা। তা আমি কি মূর্খ যে, তোমার এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিব? বুঝিব, তোমার হাতে কিছু নাই? যদি কিছুই নাই, শ্রাদ্ধের টাকা কেমন করিয়া দিলে?

পিতামহী। শ্রাদ্ধের টাকা কি আমি তোমার হাতে দিয়াছি?

পিতা। গোবিন্দ খুড়ো আমার হাতে দিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, তিনি তোমার নিকট হইতে সে টাকা লইয়া আমাকে দিয়াছেন।

পিতামহী। না, ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে লয় নাই।

পিতা এই কথায় যেন কতকটা সত্যের আভাস পাই-লেন। তিনি একটি গভীর হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তার পর বলিলেন—"ভাল, বিষয়-আশয়ের দলিলপত্র কোথায়? তা-ও কি তোমার কাছে নাই?"

পিতামহী। আমার কাছে কিছু নাই।

পিতা। তা-ও কি গোবিন্দ খুড়োর কাছে?

পিতামহী। তোমার কাছে ত তাঁহার বাক্স আছে।

পিতা। তাহাতে ত শুধু একটি সিঁদুর-মাখানো টাকা ছিল। আর কতকগুলা বাজে কবিতাভরা কাগজ।

পিতামহী। ছিল বলিতেছ যে! সে টাকা কি বাহির করিয়া লইয়াছ?

পিতা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া আমার মাকে ডাকিলেন। "ওগো! একবার এদিকে এস ত।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই মা আসিলেন বুঝিতে পারি-লাম। কেন না, পিতা বলিতে লাগিলেন—"কি ঘটিয়াছে, বুঝিয়াছ কি?"

পিতামহী আবার বলিলেন—"সে লক্ষ্মীর টাকা কি নষ্ট করিয়াছ?"

পিতার পরিবর্ত্তে মাতা উত্তর করিলেন—"না—সে আমার বাক্সে রাখিয়াছি।"

পিতামহী। সেটি আমাকে দিও। তোমরা তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে না।

মাতা সে 'অমূল্যনিধি' পিতামহীকে ফিরাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তার পর পিতাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"কি ঘটিয়াছে?"

পিতা। সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এ দিকে হাকিমী পাইয়াছি; ওদিকে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।

মাতা। সে কি?

পিতা। পিতারই মূর্খতায় হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে।

মাতা। বল কি গো!

পিতা। আর বলিব কি, এখন বুঝিতেছি, আমার কিছু নাই।

মাতা। কি হইল?

পিতা। সমস্ত সম্পত্তি—টাকা-কড়ি, জমী-জিরেত সমস্তই গোবিন্দ খুড়োর হাতে।

মাতা। তা এ শুভসংবাদ আমাকে দিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? এরূপ ঘটিবে, এ কথা ত আগে থাকতে কতবার তোমাকে বলিয়াছি। তোমার অগাধ বিশ্বাস। ও কথা তুলিতেই আমাকে মারিতে আসিতে। আমি "ছোটলোকে"র মেয়ে, তোমাকে দিবারাত্রি কেবল কুমন্ত্রণাই দিয়া আসিতেছি। ছোটলোকের মেয়েকে এ সব কথা শুনাইবার দরকার কি?

পিতা। এখন ক্রোধ রাখিয়া কি কর্ত্তব্য, তাই বল। আমার মাথা ঘুরিতেছে। একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পিতা ঘরে রাখেন নাই। কি যে ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাই ত! বাবা এত নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছেন, তাহা ত এক দিনের জন্যও বুঝিতে পারি নাই।

মাতা। ঠাকুর নির্ব্বোধ হইতে যাইবেন কেন! নির্ব্বোধ তুমি। তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একটা মূর্খ বামুনের হাতে দিয়ে গেছেন, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?

পিতামহী। অর্থাৎ তোমার শ্বশুরের মৃত্যুর পরে আমিই টাকাকড়ি, কাগজপত্র, সব গোপনে ঠাকুরপোর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি?

মাতা। কি করেছ না করেছ, তুমি জান, আর ভগ-বান্ জানেন। তা আমাকে শুনাইয়া বলিতেছ কেন? আমি কি তোমার সম্পত্তির জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছি? বলিতে হয়, তোমার ছেলে সম্মুখে আছে, তাহাকে বল।

পিতামহী। ছেলে কোথায় তা বলিব। তুমিই ত ছেলের স্থান অধিকার করিয়াছ।

মাতা আবার এই কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, পিতা ঈষৎ উষ্মাসূচক বাক্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং পিতামহীর পদধারণ করিয়া ঈষৎ ক্রন্দনের ভাবে বলিলেন—"দোহাই মা, আমার এই গৌরবের দিবসে আমাকে পাগল করিও না। কাগজপত্র, টাকাকড়ি সম্বন্ধে যদি কিছু করিয়া থাক ত বল।"

"মালা-হাতে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, অঘোরনাথ!

বাস্তবিক আমি কিছুই জানি না। তিনি আমাকে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। আমিও কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

পিতা আবার মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। মাতা বলিলেন—"তামা-তুলসীর দিব্য শুনিলে, আর কেন—উঠিয়া এস। মাথায় হাত দিয়া বসিলে কি সম্পত্তি ফিরিয়া আসিবে? সে সমস্ত গিয়াছে।"

পিতা। বল কি! সব গেল?

মাতা। না যাইবে কেন? এখনি তোমার খুড়ো সমস্ত সম্পত্তি মাথায় বহিয়া দিয়া যাইবে। তোমাকে কোম্পানী কেমন করিয়া হাকিম করিল, বুঝিতে পারিতেছি না। হিসাব নাই, কি আছে কি না আছে, জানা নাই, সে কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে, তুমি তাহার কাছে টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ?

ঠিক এমনি সময়ে বহির্ব্বাটীতে শব্দ উঠিল—"অঘোরনাথ, ঘরে আছ?"

মুহূর্ত্তে সমস্ত কথা একটা ঘন নিস্তব্ধতার চাপে চাপা পড়িয়া যেন নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

"অঘোরনাথ!" দ্বিতীয়বারে উচ্চতর স্বরে ডাক পড়িল।

এবার ব্যস্তসমস্তভাবে পিতা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে একটা আসন আনিতে আদেশ দিয়াই বলিয়া উঠিলেন – "আসুন, খুড়োমহাশয় আসুন।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই – স্বহস্তে একটি লণ্ঠন লইয়া গোবিন্দ ঠাকুরদা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। পিতামহীর ঘরের দাওয়াতেই তাঁহার বসিবার আসন প্রদত্ত হইল।

পিতামহী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবিন্দ ঠাকুরদা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবার পূর্ব্বে পিতামহীকে তিনি একবার প্রণাম করিয়া লইলেন। বলিলেন, "বউ! আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখি নাই।"

পিতামহীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া পিতাও ঠাকুরদাকে প্রণাম করিলেন। মাতাঠাকুরাণীর প্রণাম আমি দেখিতে পাই নাই। ঠাকুরদার আশীর্ব্বাদে বুঝিলাম, তাঁহাকেও প্রণাম করিতে হইয়াছে।

পিতামহী বলিলেন, "ভাই, আজ আর আমি যাইবার অবসর পাই নাই।"

"পাও নাই, তা বুঝিয়াছি। অঘোরনাথ শুনিলাম ফৌজদারী হাকিম হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া গ্রামান্তর হইতে অঘোরনাথকে দেখিতে লোক আসিয়াছে। বুঝিলাম, তুমি সেইজন্যই অবকাশ পাও নাই।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "নাতীটে এক আধবার আমাদের বাড়ীতে যায়, আজ সে-ও পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিসীমানায় পা বাড়ায় নাই।"

এই কথা শুনিয়াই, পাছে ঠাকুরদা ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, এই ভয়ে আমি আবার পা টিপিয়া টিপিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

শুইতে শুইতে পিতার কথা আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি ঠাকুরদার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করা তাঁর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা পারেন নাই। পিতা বলিলেন, "সারাদিন এমন ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছিলাম যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অবকাশ পাইলাম না।"

এ কৈফিয়ৎ ঠাকুরদা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"তাই কি অঘোরনাথ! না মূর্খ কাকার সঙ্গে দেখা করায় মানহানি হইবে বলিয়া পারিলে না।"

পিতা। ক্ষমা করুন কাকা, ওরকম অসৎবুদ্ধি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হয় নাই। আর আশীর্ব্বাদ করুন, কখন যেন না হয়।

ঠাকুরদা। আমিও তাই বিশ্বাস করি। তুমি যে লোকের পুত্র, তোমার অসদ্‌বুদ্ধি হওয়া ত সম্ভব নয়। তথাপি আমার মনে অভিমান জাগিয়াছিল। ফৌজদারী হাকিম হওয়া এত অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়! বাঙ্গালীতে এরূপ চাকুরী পায়, আগে আমার এ ধারণাই ছিল না। যখনই আমি এই খবর পাইয়াছি, তখনই দাদার শোকে অভিভূত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। আক্ষেপ, পুত্রের এ সৌভাগ্য তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পিতা। আপনার ত দুঃখ হইবারই কথা। আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু।

ঠাকুরদা। শুধু বন্ধু বলিলেও ঠিক সম্বন্ধ বলা হয় না। তিনি আমার সহোদর—গুরু। আমাদের এ ভালবাসা কাহাকেও বলিবার নয়। কেন না, বলিলেও সে বুঝিবে না। অধিক আর কি বলিব, তুমি পুত্র, তুমিও তা বুঝিতে পার নাই। পারিলে, তুমি সব কাজ ফেলিয়া আগে এ শুভসংবাদ আমাকে জানাইতে।

পিতা। অপরাধ হইয়াছে কাকা, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার এরূপ অভিমান জাগিবে জানিলে, আমি সর্ব্বাগ্রে আপনার চরণ দর্শন করিয়া আসিতাম।

ঠাকুরদা। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তুমি এই আস—এই আস ভাবিয়া আমি পথ পানে চাহিয়াছিলাম। তুমি যখন একান্তই গেলে না, তখন তোমাকে দেখিবার জন্য আমার

বড়ই ব্যাকুলতা আসিল। কিন্তু কি করি, বড় লজ্জাবোধ হইল বলিয়া দিনমানে এখানে আসিতে পারিলাম না।

মাতা অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার কাছে যাইবার জন্ত আমি উঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছি। বলিয়াছি, "কাকা মশা'য়ের সঙ্গে দেখা না করিলে, তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইবে। উনি কোনমতেই যাইতে পারিলেন না। আপনার পুত্রকন্তার প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের ক্ষমা করুন।"

"আপনাকে অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছীল্য করিয়া যাই নাই, কাকা মশা'য়, এ কথা আপনি মনের কোণেও স্থান দিবেন না। আপনার কাছে যাইবার একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও যাইতে পারি নাই; এইটে শুনিলেই আপনি আমার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া পিতা ঠাকুরদার কাছে টাকার কথা পাড়িলেন। পিতামহীকে ইতঃপূর্ব্বে যে সব কারণ দেখাইয়াছিলেন, গোবিন্দ ঠাকুরদাকেও সেই সমস্ত কারণ দেখাইয়া পিতা সর্ব্বশেষে বলিলেন,— "কাকা মশায়, কাল আপনাকে যেমন করিয়াই হউক, পাঁচশত টাকা ঋণ দিতে হইবে।"

এতক্ষণ পরে ঠাকুরদা যেন পিতার নির্দ্দোষতায় বিশ্বাস করিলেন। টাকার প্রয়োজন সত্ত্বেও যখন বাবা তাঁহার কাছে যান নাই, তখন তিনি যে একান্ত অশক্ত হইয়াছিলেন, এটা ঠাকুরদার যেন বোধ হইল। তিনি বলিলেন —"টাকার যখন প্রয়োজন, তখন তুমি যাইতে না পারিলেও বৌমাকেও অন্ততঃ একবার আমার কাছে পাঠাইতে পারিতে। আর ঋণই বা তোমাকে করিতে হইবে কেন? তোমার পিতার সমস্ত টাকাই যে আমার কাছে রহিয়াছে।"

পিতা। তাহা আমি জানিতাম না।

ঠাকুরদা। সে—কি! দাদা—কি তোমাকে টাকার কথা কিছু বলেন নি?

পিতা। না। আর বলিবারও তাঁর প্রয়োজন হয় নাই। তিনি জানিতেন, টাকা যেন তাঁর ঘরেই তোলা আছে। আমাদের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন পাইব।

ঠাকুরদা। তা হ'ক। তথাপি তোমাকে টাকার কথা বলা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। যদি আমিও ইহার মধ্যে মরিয়া যাইতাম, তা হ'লে আমার কি সর্ব্বনাশ হইত বল দেখি! আজকালকার ছেলে কি উপযাচক হইয়া তোমার টাকা শোধ করিত? ভগবান্ আমাকে বড়ই রক্ষা করিয়াছেন। তা হ'লে শুন, অঘোরনাথ! তোমাকে যে কথা বলিতে এত রাত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শুন। তোমার পিতার ন্তস্ত যে সকল টাকা-কড়ি কাগজ-পত্র আমার কাছে আছে, কাল আমি সে সমস্তই তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

পিতা। অবশ্য আপনি যখন দিবেন বলিতেছেন, তখন আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। তবে আপনার কাছে টাকা থাকায় আমি যত নিশ্চিন্ত, ঘরে সে টাকা রাখিলে আমার ততটা নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, বুদ্ধিমান আপনাকে এ কথা বুঝাইতে হইবে না। আমি এখন হইতে প্রায় বিদেশে বিদেশেই ঘুরিব। টাকা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফেরাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর মায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পিতার এ উত্তরে মাতা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু যেন ভীত হইলেন। তাঁহার কথার ভাব স্মরণ করিয়া এখন আমি তাহা অনুমান করিতেছি। মাতা বলিলেন, "তা কাকা মহাশয় যখন আর টাকাকড়ি রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তখন উঁহার কাছে রাখিয়া উঁহার ঝঞ্ঝাট বাড়াইবার প্রয়োজন কি?"

ঠাকুরদা। না মা, টাকা আর রাখিতে ইচ্ছা নাই।

মাতা। পরের টাকা—হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখা কি কম ঝঞ্ঝাট।

ঠাকুরদা। এই মা, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। ঝঞ্ঝাট কি সহজ! নিজেরই হ'ক বা পরেরই হ'ক এ বয়সে আর আমি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে পারিব না। দাদার হঠাৎ মৃত্যুতে আমারও বড় ভয় হইয়াছে। অঘোরনাথ, তুমি কালই সমস্ত কাগজ-পত্র বুঝিয়া লইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতামহীর একটিও কথা শুনিতে পাই নাই। পিতা মাতা অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যা কহিতেছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কথা শুনিবার পর এ সকল কথা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি ঠাকুরমার কথা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম।

পিতামহীর কথা শুনিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। গোবিন্দ ঠাকুরদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বউ ঠাকরুণ, তুমি যে কোনও কথা কহিতেছ না? অঘোরনাথকে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি বুঝাইয়া দিই, তুমি অনুমতি দাও।"

পিতামহী উত্তর করিলেন,—"বুঝাইয়া দিবে কি? অঘোরনাথ উপযুক্ত হইয়াছে, তোমারও এ ধারের বোঝা বহিতে ইচ্ছা নাই। তখন উহাদের সম্পত্তি উহাদের ফেলিয়া দাও। তার আর বুঝাইয়া দিবে কি?"

ঠাকুরদা। তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বলিলে। দাদা এতকাল কি উপার্জ্জন করিল, কখনও কোন দিন সং.

করিয়াও জানিতে চাহিলে না। তোমার বুদ্ধির যোগ্য কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু বিনা হিসাবে দিয়া আমি সন্তুষ্ট হইব কেন?"

পিতামহী। তবে তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়—কর।

ঠাকুরদা। দাদার কাছে কতবার হিসাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। দাদা খাতা দেখিলেই ক্রোধ করিতেন, মুখ ফিরাইতেন। তোমার কাছে ত টাকার কথা তুলিতেই পারিতাম না। বউ! দাদার বিশ বৎসরের ন্যস্ত ধন। তিনি নিজে পর্য্যন্ত জানিতেন না, আমার কাছে তাঁহার কি ছিল। এই জন্ত সত্য বলিতে কি, এই বিশ বৎসর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি নাই। কি জানি, কোন মুহূর্ত্তে সহসা যদি আমার জীবন যায়, দাদা যদি সে সময় ঘরে না থাকেন, স্ত্রী-পুত্রে—করিবে না খুব বিশ্বাস—তবু কালবশে—যদি সে সম্পত্তি অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাকে অনন্তকাল অমুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। এই ভয়ে আমি সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতাম। অথচ পাছে দাদার ক্রোধ হয়, এই ভয়ে তাঁহার কাছে ইদানীং টাকার কথা উত্থাপন করিতে পারিতাম না। কি করি বউ! সে অগাধ বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন—নিরুপায়ে আমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব রাখিয়াছি। কাল অঘোরনাথকে বুঝাইয়া দিব। নখদর্পণের হিসাব বুদ্ধিমান অঘোরনাথ দেখামাত্র বুঝিতে পারিবে।

পিতা। হিসাব আবার কি দেখিব? যাঁহার সম্পত্তি, তিনি কখনও দেখেন নাই। আমি কি এতই হীন হইয়াছি কাকা ম'শায়?

ঠাকুরদা। বেশ, হিসাব না দেখিতে চাও, কাগজপত্রগুলা ত তোমার কাছে রাখিতে হইবে।

পিতা। সে দিতে হয় মায়ের হাতে দিবেন।

পিতামহী। না বাবা, আমি ও সব সামগ্রী আর হাতে করিব না। আমি এখন তোমাদের রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। কাগজপত্র টাকা কড়ি সমস্ত তুমি বউমার হাতে দিও।

পিতা। সে যাহা করিবার, পরে করা যাইবে। কাগজপত্রের জন্ত আমি বিশেষ ব্যস্ত নই। যে জন্তে আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা আপনাকে আমি বলিয়াছি। আমার টাকার একান্ত প্রয়োজন। হাজার টাকা হইলেই ভাল হয়, একান্ত না হয়, পাঁচশো টাকা আপনাকে যেমন করিয়া হউক দিতে হইবে।

ঠাকুরদা। হাজার টাকা হইলেই যদি ভাল হয়, হাজারই দিব।

মাতা। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

ঠাকুরদা। বল।

মাতা। আগে বলুন, কিছু মনে করিবেন না?

ঠাকুরদা। কত টাকা আছে, জিজ্ঞাসা করিবে ত?

মাতা। আমার শ্বশুর বহুকাল হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুরদা। হাঁ বউ, তোমার কি জানিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার স্বামীর উপার্জ্জন, একদিনও কি তোমার মনে জানিবার খেয়াল হইল না!

পিতামহী। বেশ ত বলই না ঠাকুরপো, আজ একবার শুনিয়া লই।

ঠাকুরদা। তুমি কি কিছু আন্দাজ করিতে পার, অঘোরনাথ?

পিতামহী। ও বালক, ও কি আন্দাজ করিবে?

পিতা। গত তিন বৎসরের একটা আন্দাজ করিতে পারি। কেন না, এই কয় বৎসর মাসে তাঁহার কি আয় ছিল, আমার অনেকটা জানা আছে। এই কয় বৎসর আমিও তাঁহাকে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা দিয়াছি। তাঁহার আয় ছাড়িয়া দিলে, এই তিন বৎসরে আমার অন্ততঃ দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আমি জানি না।

ঠাকুরদা। তিনি তোমার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। সব আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

পিতা। তা হ'লে এই দুই হাজার—

ঠাকুরদা। দুই হাজারের বেশী। প্রায় চব্বিশ শো হইবে।

পিতা। তা হ'লে এই চব্বিশ শো, আর পিতার হাজার চারেক। তাহার মধ্যে বাসা ও যাতায়াত খরচ বাবদে হাজার খানেক টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা।

ঠাকুরদা। তা হ'লে তুমি বলিতে চাও, গত তিন বৎসরে তোমাদের হাজার পাঁচেক টাকা সঞ্চয় হইয়াছে?

পিতা। এই আমার অনুমান। তারপর ইহার পূর্ব্বেও আরও হাজার পাঁচেক, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আর কিই বা অবশিষ্ট আছে, আপনি জানেন।

এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুরদা উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। পিতা যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উত্তরেই সেইটিই যেন আমার অনুমান হইল। পিতা বলিলেন—"হাসিলেন যে কাকা ম'শায়? তবে কি

বুঝিব, পিতা আমার সারাজীবনে দশ হার টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই ?"

ঠাকুরদা পিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ! তাহ'লে আজ আর টাকার কথা তোমাকে বলিব না। কাল অঘোরনাথকে সমস্ত কাগজ দেখাইব।"

মাতা ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন—"কাগজপত্রও আপনার, হিসাবও আপনার। উনি আর দেখিয়া কি বুঝিবেন।"

ঠাকুরদা মায়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকেই পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ, তাহ'লে যা বলিবার কালই বলিব, আজ আমি চলিলাম। পার ত তুমিও কাল সকালে একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো।"

"না ভাই, ওইটি আমায় অনুরোধ করিও না। টাকার কথায় আমি থাকিব না। উহাদের টাকা উহাদের ফেলিয়া দাও—আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

"বেশ, কাল তাই করিব। রাত্রি অধিক হইতেছে, আজ আমি চলিলাম।"

ইহার পর কিছুক্ষণের জন্য কাহারও কোন কথা আমি শুনিতে পাইলাম না, তাহাতেই অনুমান করিলাম, ঠাকুরদা চলিয়া গিয়াছেন।

কিছুক্ষণের নীরবতায় আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। তাহার পর কে কি কহিল, আমি আর শুনিতে পাইলাম না।

১০

পরবর্ত্তী তিন চারি দিবসের ঘটনা আমার স্মৃতি হইতে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে।

অনুমানে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া তাহা বলিতে আমি নিরস্ত হইলাম। গোবিন্দঠাকুরদার কাছে পিতার যে কি প্রাপ্তি হইল, আমার পিতামহের সম্পত্তি কি ছিল, এ সব আমি সময়ান্তরে জানিয়াছি। অনেক দিন পরে সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া যথাসময়ে আপনাদের জানাইব। গুরুজন লইয়া কথা, অনর্থক তাহার অবতারণা করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

পিতার প্রথম চাকরীস্থান হুগলী। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসের শেষে পিতা হুগলী যাত্রা করিলেন। আমার ও মায়ের, সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হইল না। পিতা পূরা বেতন পাইবেন না। এই জন্য তিনি আমাদিগকে সে দূরদেশে লইয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। সঙ্গে যাইবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও মাতা কর্ত্তৃপক্ষের কার্পণ্যের উপর দোষারোপ করিয়া পিতার সঙ্গে যাইতে নিরস্ত হইলেন।

আমি বুঝিলাম, আপাততঃ ছয় মাসের জন্য আমাকে আর গ্রাম ছাড়িতে হইবে না। পিতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলাম, এই কয়মাস আমাকে বাড়ীতে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের শাসনাধীন থাকিতে হইবে।

এ কয়দিনের মধ্যে একটি দিনের জন্যও আমি সেই কমনীয়-কান্তি ব্রাহ্মণকে দেখি নাই। তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কি না, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পিতার উচ্চপদপ্রাপ্তির উল্লাসে আমি বোধ হয়, সে সময় বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

গ্রাম হইতে পোয়াটাক পথ তফাতেই একটি খাল। সেই খালে কলিকাতা যাইবার ডোঙ্গা থাকিত। গ্রামের বহুলোক, স্ত্রী ও পুরুষ পিতাকে শুভকার্য্যে শুভযাত্রা করাইতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই খালের ধার পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আমরাও গিয়াছিলাম।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণকে পিতার সমীপে উপস্থিত হইতে দেখিলাম।

অমনি সেই সময় পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া মাকে বলিতে শুনিলাম—"মা! বাবুকে পিছু ডাকিতে বামুনকে নিষেধ কর।"

পিতামহী বলিলেন—"ভয় নাই, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ। যাতে তোমার স্বামীর অনিষ্ট হয়, এমন কাজ তিনি কখনও করিবেন না।"

পিতামহীর অনুমান মিথ্যা হইল, তাঁহার আশ্বাস-বাণী মিথ্যা হইল। পিতা ডোঙ্গায় উঠিবার জন্য সবেমাত্র পা'টি বাড়াইয়াছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ খালের তীর-ভূমি অবতরণ করিয়াই পিতাকে বলিলেন,—"অঘোরনাথ! একটু অপেক্ষা কর।"

মাতা অমনি নয়ন ঈষৎ বক্র করিয়া পিতামহীর মুখের পানে চাহিলেন, পিতামহীও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ কি বলেন, শুনিবার জন্য আমি যথা সম্ভব তাঁহার সমীপস্থ হইলাম।

পিতাও যেন ব্রাহ্মণের আচরণে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি উত্থিত চরণ নামাইয়া বলিলেন—"সমস্তই ত বলিয়াছি। আবার আপনার বলিবার কি আছে ?"

"না, আমার নিজের আর বলিবার কিছু নাই। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে তোমার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমারি মুখে শুনিয়াছিলাম, তোমার কর্ম্মস্থানে যাইতে অন্ততঃ সপ্তাহ বিলম্ব হইবে। তুমি এত শীঘ্র

যাইবে, তাহা আমি শুনি নাই। তুমি আজ যাত্রা করিতেছ শুনিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি।"

"কি প্রয়োজন বলুন?"

"প্রয়োজন আমার নয়, তোমার। অবশ্য তোমার হইলেই আমার। কেন না, তোমার মঙ্গলের উপর আমার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।"

"কি বলিতে চান বলুন।"

"কোন্ মূর্খ তোমাকে এ সময় যাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছে?"

"তাতে কি হইয়াছে? এ সময় যাত্রা করিতে দোষ কি?"

"দোষ কি! যদিও তুমি বৈবাহিক, তথাপি তুমি স্নেহাস্পদ। কি দোষ, তা আর তোমাকে কি বলিব? সূর্য্যাস্তের আর একদণ্ড সময় আছে, এই সময় অপেক্ষা করিয়া যাত্রা কর। আর যখন শুভকর্ম্মের জন্য যাত্রা করিতেছ, তখন এই সামগ্রীটা সঙ্গে লইয়া যাও।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শুষ্ক ফুলের মত কি একটা সামগ্রী পিতার হাতে দিলেন। তারপর তীরভূমি হইতে উঠিয়া পিতামহীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সকলেই ব্যাপারটা কি, বুঝিবার জন্ত উৎসুক হইল। যখন সকলে সে সময় যাত্রার ফল শুনিল, তখন বুঝিল, অশুভক্ষণে যাত্রা করিলে পিতার মৃত্যু অথবা মৃত্যুতুল্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে; তখন সেই অজ্ঞাত অজ্ঞ পঞ্জিকা-দর্শকের উপরে সকলেই একবাক্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় দেখি, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মাথা গুঁজিয়া মাতার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিতা ব্রাহ্মণের এই কুসংস্কার-প্রণোদিত কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিলেন না। কেন না, ব্রাহ্মণ পিছন ফিরিতেই তদ্দণ্ডে শুষ্ক পুষ্পটি তিনি খালের জলে নিক্ষেপ করিলেন। পুষ্প স্রোতের জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাঁহার অবজ্ঞায় ক্ষুণ্ণ হইয়াই যেন তীব্রবেগে স্থানান্তরিত হইয়া তীরস্থ একটা বেতসকুঞ্জে আত্মগোপন করিল। কিন্তু একদণ্ড বিলম্বে কোনও ক্ষতি হইবে না বুঝিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিনি শালতীতে পদার্পণ করিলেন না। তীরের উপরে উঠিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সে দিন শুক্লপক্ষীয়া একাদশী। পিতামহীর সে দিন নিরম্বু উপবাস। মাস অগ্রহায়ণ। খালের দুই পাশের শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্র সন্ধ্যার বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গসঙ্কুল হরিৎসাগরে পরিণত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তগত হইল এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পীত কিরণ-তরঙ্গ যেন ঈর্ষ্যায় প্রান্তর-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমার এখনও সে দৃশ্য বেশ মনে পড়ে। এখনও যেন দেখিতেছি, বায়ুবলে উত্থিত ধান্যশীর্ষগুলা আকাশের কৌমুদীকে পাইয়া আহ্লাদে তরঙ্গশিরে ভাসিয়া, অবিরাম রজত-ফেনোচ্ছ্বাস ফুৎকার করিতেছে।

পিতা সেই সন্ধ্যায় আত্মীয়-বন্ধুগণের আশীর্ব্বাদ-প্রেরিত হইয়া শালতীতে আরোহণ করিলেন। সেই পীতশ্যাম সাগর দেখিতে দেখিতে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া শালতীকে চোখের অন্তরাল করিয়া দিল।

পিতার এই কর্ম্ম-প্রাপ্তিতে গ্রামের সকল লোকেই সুখী হইয়াছিল, মায়ের মুখ আনন্দে, গর্ব্বে ভরিয়াছিল। আমি সুখী কি দুঃখী হইয়াছিলাম, মনে নাই। কিন্তু পিতামহীর একটা কথায় আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। গৃহে ফিরিয়াই পিতামহী আমাকে বলিলেন,—"যা হ'ক ভাই, আরও ছয়মাস বোধ হয় আমি তোমাকে দেখিতে পাইব। 'সাভ্যোম' চাকরী স্বীকার করে নাই বলিয়া আমি আগে তাকে মূর্খ মনে করিয়াছিলাম। এখন গুরুজন হইয়াও তাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বাস্তবিকই পিতামহী করযোড়ে 'সাভ্যোম' মহাশয়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদুটির প্রান্ত হইতে আমি দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

১১

যাক্, এতকাল আমার ক'নের কথা বলিবার অবসর পাই নাই। চাকরী, বাম্‌নাই আর বিষয়ের হাঙ্গামে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল কতকগুলা বাজে কথায় আপনাদের কর্ণকণ্ডুতি উৎপাদন করিয়াছি। সকল উপন্যাসের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সেই পরমাবলম্বন, সমাজচক্ষে এখনও দুষ্প্রাপ্য হইলেও কল্পনার দৃষ্টিতে চিরাবস্থিতা, সেই ষোড়শী নায়িকাই যদি আমার এই গল্পে না রহিল, তাহা হইলে এ শুষ্ক সমাজ-কথার ঝঙ্কার তুলিয়া লাভ কি? সুতরাং এইবারে মনের কথা—ক'নের কথা কহিব।

যে গ্রামে ক'নের বাড়ী, তাহা আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে। উভয় গ্রামের মধ্যে একটা মাঠ। এখন তাহাকে মাঠই বলি, কিন্তু বাস্তবিক একসময়ে তাহা গঙ্গার গর্ভ ছিল। গঙ্গা স্রোতের মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। তার পূর্ব্বের প্রবাহ-পথ এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে আজিও পর্য্যন্ত এই দুইখানি গ্রাম—প্রান্তস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট নানাজাতীয় তরু, শির অবনমিত করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে আপনাদিগের লুপ্ত ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আর একটি গণ্ডগ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল ছিল। আমি প্রতিদিন সেখানে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে যাইতাম। বৈকালে ঘরে প্রত্যাগমনমুখে লুপ্ত গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত তরুগুলির মত, আমিও পরপারের সেই গ্রামখানির ভিতরে আমার সেই পাঁচ বছরের ক'নেটির আজিও না-দেখা মুখখানির অনুসন্ধান করিতাম।

আমার মনে হইত, সেই 'কি জানি কে' যেন আমার গ্রামস্থ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা আপনার। কিন্তু শৈশবের লুকোচুরী খেলায় সে আমার নিকট হইতে এমন করিয়া লুকাইয়া আছে, যেন বহু অনুসন্ধানে চারিদিক্ আতিপাতি করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। তাহাকে ছুঁইতে না পারায় আজিও পর্য্যন্ত যেন আমি চোর হইয়া ঘুরিতেছি। একদিন তাহার চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, গ্রাম হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য মাঠে অবতরণ করিয়াছিলাম। গ্রামবুড়ী যদি তাহার দন্তহীন মুখ ব্যাদান করিয়া আমায় ভয় না দেখাইত, তাহা হইলে হয় ত সেদিন আমি ক'নেদের দেশে উপস্থিত হইতাম।

তাহার প্রতি এতটা মমতা যে কেন আসিয়াছিল, এত অল্প বয়সে সে যে আমার আপনার হইতেও আপনার, এ বোধ কেন হইয়াছিল, তাহা এখন অনুমানে কতকটা যেন বুঝিয়াছি।

আমাদের দেশে অন্য শ্রেণীর বিবাহ-সম্বন্ধ ও আমাদের বিবাহ-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে। অন্যশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বর-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ছাদনাতলাতে ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন কন্যার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কন্যাকে আবার অপর পাত্রে অর্পণ করা চলে; আমাদের সম্প্রদায়ের বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ সেরূপ নয়। সম্বন্ধই একরূপ বিবাহ। সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে কতকগুলা মাঙ্গল্য কর্ম্ম করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণে উভয় পক্ষের আদানপ্রদানের প্রতিশ্রুতি হয়। দেবদ্বিজের অর্চ্চনায় উভয় পক্ষের যথাসম্ভব অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে কন্যার নাম 'অন্যপূর্ব্বা'। পূর্ব্বে কোন কুলীনের গৃহে তাহার বিবাহ হইত না। শুনিয়াছি, কোন কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ এরূপ কন্যার আর বিবাহ দেন নাই; বাগ্-দত্তা কুমারীকে অপর বরে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন নাই। তাহাকে বিধবা জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিতেন।

দশমবর্ষীয় বালকের শুদ্ধমনে বাগ্দানের মন্ত্রগুলা বুঝি থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইত, বুঝি তাহার প্রিয়তমার ঘুমঘোরে উচ্চারিত আত্মনিবেদিত প্রিয় বচনের আকর্ষণে বালক স্বামীর অন্তরাত্মা মিলনাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

১২

একদিন শুভ সুযোগে ক'নের সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল। চারিটা বাজিলে যেমন স্কুলের ছুটী হইত, অমনি আমি আমার সহপাঠীর সঙ্গে বাড়ীতে চলিয়া আসিতাম। আমার পিতার হাকিম হওয়া অবধি পণ্ডিত মশায় আমাকে সমধিক যত্ন করিতেন। পাছে পথে কোথাও খেলা করিয়া আমি বাড়ী পৌঁছিতে বিলম্ব করি, এই জন্য তিনি আমাদের গ্রামের দুই একটি বড় ছেলের উপর আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায়ই তাহারা যথাসময়ে আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইত। তবে মাঝে মাঝে পথের মধ্যে খেলার জন্য দুই একদিন বাড়ীতে পৌঁছিতে বিলম্ব যে না ঘটিত, এমন নয়; কিন্তু গৃহে পৌঁছিতে কখনও কোন কালে আমি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করি নাই।

গ্রামের এক প্রান্তে একটি চৌরাস্তার মোড়ের উপর আমাদের স্কুল। তাহার একটি ধরিয়া কিছু দূর গেলেই গ্রামের জমীদারের একটি বাগান। সেই বাগান পার হইলেই পঞ্চবটীর বন। সেখানে কালুরায় দক্ষিণরায় ঠাকুরের 'আস্তানা।' আমরা এক কথায় ঠাকুরকে 'দক্ষিণরায়' বলিতাম। যে ভীষণ অরণ্য নিম্নবঙ্গের সমস্ত উপকূলভাগ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই নরখাদক, 'রাজকীয় বাঙ্গালা-বাঘে'র আবাসভূমি সুন্দরবন পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের অতি নিকটেই ছিল। বন কাটিয়া আবাদ হওয়ায় এখন তাহা গ্রাম হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

পিতামহের বাল্যাবস্থায় গ্রামে প্রায়ই বাঘের উপদ্রব হইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় গ্রামের মধ্যে কোনও উপদ্রব না থাকিলেও গ্রামের দুই এক ক্রোশের মধ্যে বাঘ আসিয়াছে শুনিয়াছি। গ্রামে বাঘ আসার কথা না শুনিলেও গ্রামের লোকে, বিশেষতঃ বালক-বালিকারা তখন সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইত না।

দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। তাঁহাকে পূজা-উপচারে

তুষ্ট করিলে বাঘের ভয় দূর হয়, এই বিশ্বাসে গ্রামের লোকে শনিমঙ্গলবারে তাঁহার অর্চনা করিত। শরীররক্ষী দেশরক্ষী সিপাইগণের মধ্যে আমরা যেমন কাহাকে পাহারাদার, কাহাকেও বা জমাদার, রেসেলদার বলিয়া থাকি, এই ঠাকুর দক্ষিণদিক্ রক্ষা করিতেন বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহাকে দক্ষিণরায় বলা হইত। দক্ষিণরায়ের আস্তানা পার হইলেই গুপ্তগঙ্গার তীরস্থ পথ। সেই পথ ধরিয়া পোয়াখানেক পথ আসিলেই আমাদের গ্রাম।

দক্ষিণরায়ের আস্তানার কাছে যে পঞ্চবটী, তাহারই একটি আমলকীবৃক্ষের তলদেশে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চার পাঁচ খানি গ্রাম হইতে গ্রাম্য রমণীরা প্রতি চৈত্রমাসে বনভোজন করিতে আসিত। কেহ কেহ বা সেই সঙ্গে দক্ষিণরায়ের পূজাও সারিয়া যাইত।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন অনেক রমণী পূর্ব্বোক্ত আমলকীবৃক্ষের তলে সমবেত হইয়াছিল।

সে দিন শনিবার। দেড়টার সময়েই আমাদের ছুটী হইয়াছে। সকাল সকাল বাড়ীতে পৌঁছিব বুঝিয়া, আমার সহচর রক্ষী সে দিন আমাকে সত্বর বাড়ী ফিরিতে অর্থাৎ পথের কোন স্থানে বিলম্ব না করিতে উপদেশ দিয়া, কোনও কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সঙ্গে আরও যে দুই চারি জন বালক ছিল, তাহারা কিয়দ্দূর আমার সহিত চলিয়া নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল। পঞ্চবটীর সন্নিকটে যখন আমি উপস্থিত হইলাম, তখন আমি সঙ্গিহীন। কিন্তু আমি তখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি। সুতরাং একাকী পথ চলিতে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

সেদিনকার নির্জ্জনতা আমার কেমন মিষ্ট লাগিল। আমি যেন একটা অভিনব উল্লাসে এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে দেখি, অনেকগুলি স্ত্রীলোক আমলকীগাছের তলে বসিয়া আহার করিতেছে।

তখন বনভোজন কা'কে বলে, জানিতাম না। আমলকীর তলে বনভোজন প্রশস্ত বলিয়া মহিলামণ্ডলী গাছটিকে একরূপ ঘেরিয়া অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আহারে বসিয়াছিল। মেয়েদের এরূপ ভাবে ভোজনে বসিতে আমি আর কখন দেখি নাই। সকলেরই আহার্য্য প্রায় একরূপ ছিল। চিঁড়ে, চালভাজা, দৈ, কলা, গুড়—কেহ কেহ বা গুড়ের পরিবর্ত্তে বাতাসা লইয়াছিল।

বাঙ্গালীর ভোজন-পুরুষেরই হউক, অথবা স্ত্রীলোকেরই হউক—বড় একটা নীরবে নিষ্পন্ন হয় না। ক্ষুধার প্রাবল্যে, ভোজনারম্ভে কতকটা নীরবতা থাকে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে না হইতে আবার যে কোলাহল, সেই কোলাহল। মহিলাদের মধ্যে কতকগুলি নীরবে আহার করিতেছিলেন, কতকগুলির মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল বালক-বালিকা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্ব স্ব গুরুজনের প্রসাদ পাইতেছিল, কতকগুলি পূর্ব্বাহ্নেই "ফলার" খাইয়া দূরে ক্রীড়াকৌতুকে রত ছিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রলোভনীয় আহারের প্রবল আকর্ষণে আমার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। আমার ইচ্ছা হইল, আমিও উহাদের মধ্যে বসিয়া পেট ভরিয়া 'ফলার' খাইয়া লই। কিন্তু আমার ত মা অথবা ঠাকুরমা আসে নাই, আমি কাহার কাছে খাবার চাহিব?

ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ-মনে আসি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটু দূরেই দক্ষিণরায়ের স্থান। পঞ্চবটীকে বামে রাখিয়া আমি যেমন ঠাকুরের কুটীর-প্রাঙ্গণে পা দিয়াছি, অমনি একটি বৃদ্ধা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আমার হাত ধরিয়া বলিল—"কি বাবা! চলিয়া যাইতেছ কেন? একটু মিষ্টমুখ করিয়া যাও।"

আমার বগলে বই ও শ্লেট ছিল। হাত ধরাতে বগল আল্‌গা হইয়া বইগুলি পতনোন্মুখ হইল। বৃদ্ধা ক্ষিপ্রতার সহিত সেগুলা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল—"এস আমার সঙ্গে। আমি দেখিতেছি, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, মুখখানি মলিন হইয়াছে।"

আমি তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—"আমার বই ফিরাইয়া দাও, আমি খাইব না।"

বৃদ্ধা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তা-ও কি হয়? তুমি এই তৃতীয় প্রহর বেলায় প্রসূতিদের নিকট হইতে শুষ্কমুখে চলিয়া যাইলে, তাহারা কেমন করিয়া মুখে আহার তুলিবে? তোমাকে কিছু মুখে দিয়া যাইতে হইবে।"

এই বলিয়াই বৃদ্ধা আমার পশ্চাতে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"খুকী, এই বইগুলা ধর ত দিদি, আমি বাছাকে কোলে করিয়া লইয়া যাই।"

বৃদ্ধার কথা শেষ হইতে না হইতে একটি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত হইতে বই-শ্লেট গ্রহণ করিল। বালিকার পরণে একখানি লালপেড়ে শাড়ী। পাছে তাহা খুলিয়া যায়, এই জন্য আঁচলটা তাহার কোমরে বাঁধা ছিল। বেণী-সংবদ্ধ কেশগুলি ঝুঁটীর আকারে মাথার উপর বিন্যস্ত ছিল। কপালে একটি কাঁচপোকার টীপ, গলদেশে

গুটিকয়েক মাদুলী, হাতে কালো কাচের চুড়ী, বাম হস্তের চুড়ীর নিম্নভাগে একগাছি 'নোয়া'। এই সামান্য অলঙ্কারে নিরলঙ্কারা বালিকা শুদ্ধ মাত্র তাহার দেহের বর্ণে দক্ষিণরায়ের আশিস-পুষ্পের মত আমার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিল। দশমবর্ষীয় বালকের চোখে সৌন্দর্য্যদর্শনের যতটুকু শক্তি, এখন স্মরণে আনিয়া অনুভবে বলিতে পারি, তাহাই আমি বলিতেছি। পরবর্ত্তী বক্ষ্যমাণ ঘটনায় এই রূপের সঙ্গে আমার হৃদয়ের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, বালিকার সেই শ্রী আমি আজিও স্মরণ রাখিতে পারিতাম কি না, সে কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না। কিন্তু আজিও আমি তাহা স্মরণে রাখিয়াছি। যৌবনে পদার্পণ করা অবধি এ বয়স পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরীর রূপ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু নির্জ্জনে বসিয়া কোনও সময়ে সেই সকল রূপের চিন্তা করিতে গেলে, সকলকে অতিক্রম করিয়া, সেই বালিকার রূপটিই আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। যে কামগন্ধহীন রূপ সকল রূপের মধ্য দিয়া মানুষের মনকে অনন্তের দিকে টানিয়া লয়, এখন আমার মনে হয়, এ রূপ বুঝি সে রূপেরই প্রতিবিম্ব।

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। তবে কোলে উঠিলাম না, বৃদ্ধার অনুসরণ করিলাম। শ্লেট-বই বগলে লইয়া বালিকা আমার পশ্চাতে চলিল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধা পরিচয় জানিতে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। লজ্জায় আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর পাই নাই। উত্তর দিতে না দিতে আমি মহিলা-মণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলাম। আর উপস্থিত হইতে না হইতে সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমাদের গ্রাম হইতেও দু'চারিটি স্ত্রীলোক সেখানে বনভোজনে আসিয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"ওগো মা, তুমি কাকে ধরিয়া আনিতেছ?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন মহিলা সাক্ষাৎ ভগবতীর মত পার্শ্ববর্ত্তিনী অপর একটি মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও খুকীর মা! এ যে তোমারই জামাই গো!"

'জামাই' এই কথা শুনিবামাত্র এই দশমবর্ষীয় বালককে দেখিয়া তিনি আহার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কতই যেন সঙ্কোচের সহিত অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন দান করিলেন।

যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে উল্লাসে এমন কতকগুলি রহস্যের বাক্য প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া লজ্জায় আমি যেন গুটাইয়া গেলাম। এই অবস্থায় লুকাইয়া লুকাইয়া আমি একবার বালিকার পানে চাহিলাম। সে এ সকল রহস্যের একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ছিল।

বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"ও দাখী! এখন থেকে এত ক'রে দেখিস্‌নি, পার্শ্বে তোর সতীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখ আর বড় বেশী দিন থাকিবে না। তাহাকে একটু দেখিবার ভাগ দে!"

অতি মধুর কণ্ঠে বালিকা বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল—"দিদিমা! এ কে?"

"চিন্‌তে পার্‌লিনি! তোর বর!"

তড়িতাকৃষ্টবৎ আমার দৃষ্টি আর একবার বালিকার মুখের উপর পড়িল! বালিকাও পূর্ণবিস্ফারিত-নেত্রে আমার পানে চাহিল। তাহার বগল হইতে বই-শ্লেট পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে রমণীমণ্ডলীর হাস্যপরিহাস পঞ্চবটীর পত্রান্তরাল-নিঃসৃত চৈত্র-বায়ুর "হো হো" হাস্যের সহিত মিশিয়া একটা হাসির ফলার রচিয়া আকাশে উপহার প্রদান করিল। আমি চক্ষু মুদিলাম।

তার পর? তার পর আমি কি বলিব? বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে যাহা আর কোনও বঙ্গ-বর-বধূর ভাগ্যে ঘটিবে না, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। আজকালিকার বয়স্থ নায়ক ও বয়স্থা নায়িকার অনেকের মধ্যে বহু পত্র-ব্যবহারে, বহুবার নির্জ্জন সাক্ষাতে—পরস্পরের কাছে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন ঘটিতে পারে, কিন্তু বরবধূর একত্র বসিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হাতের 'ফলার' খাওয়া আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে না।

বালিকার মাতা অতি যত্নে 'ফলার' মাখিয়া, নিজ হস্তে আমার মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। 'দিদি মা' এখন বসনাঞ্চলে বালিকার দেহ ও মস্তকের কিয়দংশ ঢাকিয়া দিয়াছিল। সে তদবস্থায় আমার নিকটে বসিয়া বসিয়া 'ফলার' খাইতেছিল এবং এই অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুটির প্রতি তাহার মায়ের আদর নিরীক্ষণ করিতেছিল। রমণীদের মধ্যে যাহারা আহারকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিল, তাহারা আমাদের তিনজনকে ঘেরিয়া—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া, তুলনায় আমাদের রূপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেক আহার করিয়াছি, এমন সময়ে এক বজ্রের মত চপেটাঘাত আমার পৃষ্ঠের উপর পড়িল। বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, রমণীগণ স্তম্ভিত হইল, বালিকার মাতা কম্পিতকলেবরে মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে পতনোন্মুখী হইলেন। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আনন্দ-কলকল যেন বিষাদ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল—পঞ্চবটীর সমীরণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

আমি মাথা তুলিয়া দেখি, আমার মা। তাঁহার রোষ-কষায়িত চক্ষু দেখিয়া আমি প্রহার-যাতনা ভুলিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

কাহারও কোন কথা কহিবার অবসর রহিল না। আমি মাতৃকর্তৃক কেশাকৃষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে নীত হইলাম।

১৩

আমার বাড়ী ফিরিতে অযথা বিলম্ব দেখিয়া মাতা ও পিতামহী উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বাড়ীতে তখনও পর্য্যন্ত চাকর নিযুক্ত হয় নাই। গো-সেবা, বাসন-মাজা ও বাড়ীর উঠান ঝাঁট দিবার জন্য এক জন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। সদানন্দ অধিকাংশ সময় চাষের কাজেই নিযুক্ত থাকিত। বাড়ীর কাজে তাহাকে বড় একটা পাওয়া যাইত না। পরিবারবর্গ অধিক ছিল না। গৃহের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পিতামহী ও মাতার দ্বারাই সম্পন্ন হইত। ঝি কাজ সারিয়া তাহার গৃহে বোধ হয় চলিয়া গিয়াছিল। সদানন্দও বোধ হয়, তখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। বেলা যায় দেখিয়া উদ্বেগে আত্মহারা জননী গঙ্গার তীর ধরিয়া একটু একটু অগ্রসর হইতে হইতে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতামহী একে বৃদ্ধা, তাহার উপর স্বামিশোকে তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঘর ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পথের মাঝে দাঁড়াইয়া উৎ-কণ্ঠার সহিত তিনিও আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিবামাত্র আমার অবস্থা বুঝিতে পিতা-মহীর বাকী রহিল না। তিনি বুঝিলেন, আমার অকা-র্য্যের জন্য আগে হইতেই মায়ের হাতে যথেষ্ট শাস্তি পাই-য়াছি। এই জন্য তৎসম্বন্ধে আমাকে কিংবা মাকে তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, নীরবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্যে আমি পিতামহ ও পিতামহীর কাছেই একরূপ পালিত হইয়াছিলাম। আমার পালনে ও শাসনে আমার মাতা কিংবা পিতার কোনও অধিকার ছিল না। এমন কি, কোনও সময়ে তাঁহারা আমাকে শাসন করিলে, উভয়েই পিতামহী কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। পিতামহ পিতমহীকে নিষেধ না করিয়া, তাঁহার কার্য্যের পোষকতা করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি সংসারে একরূপ নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ কয়টা মাস তৎকর্তৃক আমি একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিলাম।

কিন্তু আজ মায়ের শাসনে আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ ভাই! কখন কোন দিন ত তোমাকে পথে বিলম্ব করিতে দেখি নাই, তবে আজ এমন অন্যায় কাজ করিলে কেন?"

তখনও প্রহারের জ্বালা আমার পৃষ্ঠদেশে প্রবলভাবেই সংলগ্ন ছিল। পিতামহীর প্রশ্নে সেই জ্বালার সঙ্গে প্রবল বেগে অভিমান জাগিয়া উঠিল। ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। পিতামহী সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে হাত দিলেন—দেখিলেন, মায়ের পাঁচটা আঙ্গুলের চিহ্ন এখনও আমার পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া রহিয়াছে।

এ অবস্থা দেখিয়া পিতামহীর চোখে জল আসিল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছ?"

মাতা রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"অপরাধ! অপরাধ কার? তোমাদের। তোমাদের অপরাধে বালক আজ শাস্তি পাইল।"

"তোমাদের"—এই বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, আমার পিতামহী বুঝিতে পারিলেন, পুত্রবধূ তাঁহার পরলোকগত স্বামীকেও লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছেন।

ইদানীং মায়ের ভাবপরিবর্তন হইয়াছে বটে, তথাপি পিতামহী আমার মাতার নিকট হইতে এরূপ ভাবের উত্তর কখনও শুনেন নাই, শুনিবার প্রত্যাশাও করেন নাই।

উত্তর শুনিয়া তিনি স্তম্ভিতার ন্যায় নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মা মুখ অবনত করিয়া ভূমিতে লক্ষ্য করিয়াই যেন অস্ফুটস্বরে আর কতকগুলা কি কথা বলিলেন—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না; পিতামহী বোধ হয়, পারিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—"তা আমাদেরই যদি অপরাধ বুঝিয়া থাক,—আমাদের অবশিষ্ট আমি আছি—আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? আমাদের অপরাধে বালক শাস্তি পাইল কেন?"

মাতা একটু অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কথার কু ধর কেন?"

পিতামহী। যেমন স্বভাব, সেইরূপ করিব ত। তুমি যে হাকিমের গৃহিণী হইয়াছ, তাহা ত বুঝি নাই।

মাতা। তুমি আমার ভাগ্যে ঈর্ষা করিতেছ নাকি?

পিতামহী। করিতে হয় বই কি। হাকিমের বউ না হইলে ত এরূপ মেজাজ হয় না।

মাতা। মেজাজ কি দেখিলে?

পিতামহী। আর দেখাইতে বাকি কি রাখিতেছ? তবু এখনও তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের এক তণ্ডুলকণাও মুখে তুলি নাই। আজিও পর্য্যন্ত সেই 'মূর্খের' অন্নে জীবন রক্ষা করিতেছি।

মাতা। তা ব'লে দুগ্ধপোষ্য শিশুর যিনি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে পারেন, তিনি বেদবেদান্ত গুলিয়া খাইলেও তাঁহাকে আমি পণ্ডিত বলিতে পারিব না।

ইহার পর মাতা ও মাতামহীর মধ্যে যে সমস্ত কথা-বার্ত্তা হইল, বাঙ্গালীর এই যৌন-বিবাহ-সমর্থন-যুগে, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমি অপ্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সেই সকল কথা শুনিয়া যে তথ্য-টুকু আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহার যে অংশটুকু প্রকাশ-যোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই আমি আপনাদিগকে শুনাইব।

বংশানুক্রমিক আমাদিগের মধ্যে এইরূপ বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্বন্ধ অতি শৈশবে হইলেও বরের উপনয়ন-সংস্কারের পরে বিবাহ হইত। বিবাহের অব্য-বহিত পরেই বালক গুরুগৃহে প্রেরিত হইত। অন্ততঃ বারো বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে সে গৃহে ফিরিবার অনুমতি পাইত না। সেখানে শাস্ত্রশিক্ষা ও গুরুসেবা তাহার কার্য্য ছিল। যাহার একাধিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা-লাভে অভি-লাষ হইত, তাহাকে এক গুরুর নিকটে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আবার অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী—এমন কি, দ্রাবিড় পর্য্যন্ত কেহ কেহ শাস্ত্রশিক্ষার্থে গমন করিতেন। একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে, দ্বাদশ বৎসরেও কুলাইত না। পিতামহী শুনিয়াছেন, ক'নের বাপের ঘরে ফিরিতে কুড়ি বৎসরকাল লাগিয়াছিল। আমার পিতামহ বারো বৎসর পরেই ফিরিয়াছিলেন।

পাছে শাস্ত্রজ্ঞানের ফলস্বরূপ বৈরাগ্যোদয়ে যুবক সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়, ঘরে আর না ফিরিয়া আসে, এই জন্ত বর-কন্তা উভয়েরই একরূপ অজ্ঞাতসারে উভয়কে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। পুরুষ যে সময়ে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু—বিশেষতঃ সে সময়ের হিন্দু—কন্তার ত আর কন্তাকাল উত্তীর্ণ হইতে দিতে পারিতেন না, কাজেই ওই অতি অল্পবয়সেই বিবাহের ব্যবস্থাটা তাঁহাদের কাছে সমীচীন বোধ হইয়াছিল।

স্বামীর অনুপস্থিতিকালে বধূ শ্বশুরগৃহে আনিত হই-তেন। বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে দ্বিতীয়বার আসাতেও একটা হাঙ্গামা ছিল। এরূপ আসাকে দ্বিরাগমন বলিত। বলিতই বলিতেছি; কেন না, পাঁজিতে এ কথাটার অস্তিত্ব থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এ প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র বধূকে ধরে আনিবার যে প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, আজিকালিকার কোন বিবাহিত হিন্দুসন্তানের অবিদিত নাই। কিন্তু পূর্ব্বে রীতি-মত শুভদিন দেখিয়া, বধূকে দ্বিতীয়বার বাড়ীতে আনিতে হইত। এ দ্বিরাগমনের দিন এতই অল্প যে, কাহারও কাহারও ভাগ্যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্বশুর-গৃহে আগমন ঘটিয়া উঠিত না।

শ্বশুর-গৃহে আসিলে, কুমারী ব্রহ্মচারিণীর মত তিনি শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবাতৎপরা—গৃহের সৌভাগ্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেন। আমার পিতামহীও বহুকাল সেইরূপ ভাবে আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর সমাবর্ত্তিত পিতামহকে যে দিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, সে দিন নবোঢ়া বধূর সমস্ত লজ্জা নব ভাবে তাঁহাকে আবৃত করিয়াছিল।

মাতা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডায় আমি পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলাম। পিতামহী বাল্যবিবাহের সমর্থনে তাহাকেই প্রকৃত যৌন-বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; মাতা সে প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন; এবং সেই সঙ্গে গুরুজনের বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন।

এরূপ ভাবে শাশুড়ীর সঙ্গে মায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা এই প্রথম। অন্ততঃ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আমি এরূপ বিতণ্ডা দেখি নাই।

মাতার এই অভাবনীয় আচরণে ক্ষুণ্ণ পিতামহীর মুখের ভাব এখনও আমার মনে পড়ে। সে মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, পিতামহী বুঝি আমার উপর অধি-কার পরিত্যাগ করিলেন। প্রস্থান কালে তিনি আমার পানেও আর ফিরিয়া চাহেন নাই।

১৪

পরবর্ত্তী সোমবারে ডাকঘরে দিবার জন্ত মা আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। ইহার সপ্তাহ পরেই পিতা কর্ম্ম-স্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পিতার শিক্ষানবীশীর ছয়মাস পূর্ণ হইয়াছে। তিনি হুগলী সহরেই ডেপুটীর পদে পাকা হইয়াছেন এবং আমা-দের সকলকেই তিনি সেখানে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

সঙ্গে যাইবার জন্ত তিনি প্রথমেই পিতামহীকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"আমি গেলে ঘরে সন্ধ্যা দিবার লোক থাকিবে না। গরুর ও নারায়ণের সেবা হইবে না।"

কাজেই পিতামহীর হুগলী সহর দেখা ভাগ্যে ঘটিল না। আমি, মা, ঠানদিদির পুত্র গণেশ খুড়া এবং নবনিযুক্ত এক জন ভৃত্য পিতার সঙ্গে চলিলাম।

আমাদের বিদেশ যাইবার কথা কাহার মুখে শুনিয়া ক'নের বাপ আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, শুনি নাই। কেন না, পিতা আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে দেন নাই। তবে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, পিতামহী পিতাকে যে সব কথা কহিয়াছিলেন, ঘটনাবশে, তাঁহাদের কথোপকথন-সময় তাহার কিয়দংশ আমি শুনিয়াছিলাম।

পিতামহী বলিলেন—"তোমার ব্যবহারে ও কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি হরিহরের বিবাহ দিবে না।"

"বিবাহ দিব না, তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

"বিবাহ দিবে না কেন—আমি বলিতেছি, সান্যালের কন্যার সহিত—"

"এখন দিব না। তবে ও ব্রাহ্মণ যদি বিবাহের কথা লইয়া আমাকে বারংবার বিরক্ত করে, তা হ'লে দিব না।"

"এ কি পাগলের মতন কথা বলিতেছ?"

"পাগল আমি, না তোমরা? এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছ!"

"সম্বন্ধ করিয়াছ ত তুমি।"

"আমি করিয়াছি?"

"আদানপ্রদানের প্রতিজ্ঞা কি আমরা করিয়াছি?"

"করিয়াছি একান্ত অনিচ্ছায়—কেবল তোমাদের অত্যাচারে।"

"তুমি সে সময় কর্ত্তাকে মনের কথা বল নাই কেন?"

"সেইটিই আমার বোকামী হইয়াছে।"

"তা হ'লে ব্রাহ্মণের কি হইবে, অঘোরনাথ?"

"ব্রাহ্মণের কি হইয়াছে, তা হইবে?"

"সে যে সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছে।"

"তা হ'লে কি আমি কচিছেলের বিবাহ দিয়া, তার ইহকাল-পরকাল সব নষ্ট করিব?"

"ইহকাল পরকাল যাইবে কেন?"

"বালকের এই পঠদ্দশা—এ সময় বিবাহ হইলে এ জন্মের মত তার পড়াশুনা শেষ হইয়া যাইবে।"

"কেন, তোমার পিতার কি পড়াশুনা শেষ হইয়াছিল?"

"সেকালে হইতে পারিত। এখন আর সে বর্ব্বরতার যুগ নাই। আমার বাল্যে বিবাহ হইলে, আমাকে আর তিনটা পাশ দিতে হইত না। আমাদের বংশে বিচারক জন্মিবে, কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল কি? আমার অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা তুমি এখানে আমাকে দেখিয়া কি বুঝিবে? আমার সঙ্গে হুগলী চল, তা হ'লে কতকটা বুঝিতে পারিবে। ছেলেবেলায় বিয়ে হইলে কি এ সব হইত?"

পিতামহী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন মনে করিয়া, পিতা বলিতে লাগিলেন, "এই আমার নূতন চাকরী—একটা পুতুলখেলার ব্যাপার লইয়া কি চাকরীটি খোয়াইব—আখের নষ্ট করিব?"

"হুঁ! তা হ'লে সপিণ্ডকরণের কি করিবে?"

"তুমি কি সত্যসত্যই পাগল হইয়াছ? এ কাজ—আর তোমার নাতির বিবাহ—এ দুই কি এক সমান? সপিণ্ডকরণের সময় সব কাজ ফেলিয়াও আমাকে আসিতে হইবে। তখন ছুটি চাইলে ছুটি পাইব। আর এ কার্য্যে ছুটি পাওয়া দূরে থাক্, শিশুপুত্রের বিবাহ দিয়াছি, এ কথা যদি মেজেষ্টার সাহেবের কানে ওঠে, তখনি আমার চাকরী যাইবে।"

চাকরী যাইবার কথা শুনিয়াই পিতামহী নিরুত্তর রহিলেন। তথাপি পিতা বলিলেন—"ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইলে, তাঁহাকে নিরাশ হইতে নিষেধ করিও। তাঁহাকে বলিয়ো, যদিও আমার একান্ত অনিচ্ছা, তথাপি যখন কথা দিয়াছি, তখন তাঁহার কন্যার সহিত হরিহরের বিবাহ আমাকে দিতে হইবে। কিন্তু এখন নয় কিছু দিন পরে। পুত্র দুইটা পাশ না হইলে, তাহার কাছে বিবাহের কথা তুলিতেই দিব না।"

"সে কত দিন পরে?"

"সেখানে হরিহরকে যদি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেও, অন্ততঃ ছয় বৎসর। তাহার কমে ত হইতেই পারে না।"

"তত দিন ব্রাহ্মণ মেয়েকে রাখিতে পারিবে কেন?"

"তা কি করিব!—তা ব'লে আমি শিশু-পুত্রের বিবাহ কিছুতেই দিতে পারিব না।"

"বিবাহ?—কার বিবাহ?"—বলিয়া আমার মা রণচণ্ডিকার আবির্ভাবের মত পিতা ও পিতামহীর কথোপকথনস্থলে উপস্থিত হইলেন।

পিতা বোধ হয়, তাঁহার আকস্মিক উপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তিনি মাতাকে বলিলেন,—"তুমি এখানে আসিলে কেন?"

মাতা পিতার কথায় উত্তর না দিয়া, পিতামহীকে বলিতে লাগিলেন,—"পুত্রকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে ফুসলাইয়া আমার কচিছেলের মাথা খাইবার চেষ্টায় আছ। ও কেমন করিয়া আমার ছেলের বিবাহ দেয়—দিক্ দেখি।"

পিতা। ছেলের বিবাহ দিতেছি, তোমাকে কে বলিল? ভবিষ্যতে দিবার কথা হইতেছে।

মাতা। কার সঙ্গে? ওই মড়ুইপোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে? আজই হ'ক, কালই হ'ক, যে দিন তা দিবে, সেই দিনই আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব।

এই বলিয়া মাতা পিতামহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি কি মনে করিয়াছ, বামুন সে দিন প্রাতঃকালে আসিয়া তোমাকে যা বলিয়া গিয়াছে, আমি শুনি নাই? আমি হাড়ী-মুচি-ঘরের মেয়ে—কেমন?"

পিতামহী বিস্মিতার মত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাড়ী-মুচির ঘরের মেয়ে, এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"কে বলিল জান না? এখন ন্যাকা সাজিতেছ!"

পিতা, মাতাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মাতা নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সে বামুন, সে দিন ভোরে আসিয়া বলে নাই, আমি 'অঘরের মেয়ে'। আমি আমার পুত্রকে শাসন করিব, তাহাতে সে বামুনের এত মায়া উথলিয়া উঠিল কেন? সে আমাকে অকথ্য কথা শুনাইবার কে? আমি কে, সে জানে না? তার মত কত বামুন আমার বাপের ঘরে রসুয়ের বৃত্তি করিতেছে।"

পিতামহী বলিলেন—"তা করিতে পারে। কিন্তু মা ব্রাহ্মণ ত মিথ্যা কথা ক'ন নাই। তুমি আমাদের ঘর নও।"

"তবে ভালঘরের বধূ আনিয়া আগে ছেলের বিবাহ দাও, তার পর নাতির বিয়ের ব্যবস্থা কর"।—বলিয়াই ক্রোধান্ধ জননী পিতার ঘাড়ের উপর দিয়াই যেন এক রকম চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে দেয়াল না থাকিলে পিতা বোধ হয়, ভূপতিত হইতেন।

পিতা দেওয়ালের সাহায্যে পতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াই "কর কি—কর কি, লোকে জানিবে, আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে"—বলিতে বলিতে মাতার অনুসরণ করিলেন।

এই কথোপকথন হইতে আমি বুঝিলাম, আমার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, সমবেদনা জানাইতে, ব্রাহ্মণ কোন এক দিন পিতামহীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। মা অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। আর বুঝিলাম, ক'নের সঙ্গে আমার দেখা এ জন্মের মত বুঝি আর হইবে না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা ফিরিলেন। পিতামহী, মাতা ও পিতা উভয়েরই আচরণে স্তম্ভিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিতা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে বলিলেন,—"মা তুমি সেই ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার জন্য অন্য কোনও স্থানে পাত্র দেখিতে বলিয়ো। আমার পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পারিব না।"

"বলিতে হয়, তুমিই বলিয়ো।"

"বেশ—আমিই বলিব।"—বলিয়াই পিতা আমাকে ডাকিলেন। আমি বই পড়িবার ব্যপদেশে পিতামহীর ঘরের তক্তাপোষে বসিয়া, একটি ক্ষুদ্র জানালার ফাঁক দিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। পিতার ঘরের দাওয়ায় এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

আমি পিতার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি আমার বই-শ্লেট সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিলেন। আমাদের সেই দিনেই বৈকালে রওনা হইতে হইবে। পিতামহী বলিলেন,—"মিস্ত্রী আসিলে তাহাকে আমি কি বলিব?"

"এখন থাক্। আমি ফিরিয়া আসিলে ঘর করিবার ব্যবস্থা করিব।"

আমাদের মেটে বাড়ী। তবে ঘরগুলা যথাসম্ভব বড় ও সুদৃশ্য ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে কোঠা করিবার অভিলাষে পিতামহ একলক্ষ ইট পোড়াইয়াছিলেন। তাহা দিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি একটি ঠাকুরঘর ও একটি বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পিতার বি-এ পাশের পর হইতে দেশের দুই চারিজন ভদ্রলোক প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। সুতরাং একটি বৈঠকখানার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট ঘরগুলিও তাঁহার কোঠা করিবার ইচ্ছা ছিল। এখন পিতা হাকিম। তাঁহার চালাঘরে বাস ত' কোনও ক্রমেই চলিতে পারে না, এইজন্য পিতামহী ঘরগুলাকে কোঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

মিস্ত্রীও আসিয়াছিল। কথা ছিল, কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে পিতা বাড়ী করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। সে ব্যবস্থা আর করা হইল না। আমার এক কুক্ষণে খাওয়া-কলার সকল কাজের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

সেই দিন অপরাহ্নে পিতা আমাদের লইয়া হুগলী যাত্রা করিলেন।

১৫

রাত্রির শেষভাগে আমরা কালক্লিষ্টা ভাগীরথীর বিশীর্ণ দেহে ভর করিলাম। আজ ভাগীরথীর এই দুর্দ্দশা; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি পূর্ণাঙ্গী, নিত্যবেগবতী তরঙ্গমালিনী ছিলেন। অসংখ্য পোত তৎকালীন বণিক্গণের আশার ভাণ্ডার বুকে করিয়া, এক সময় এই গঙ্গার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর অন্তর্দ্ধানে

সঙ্গে এক দিন সপ্তগ্রামের—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী বন্দরের—যে অবস্থা হইয়াছিল, জাহ্নবী স্রোতের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী আমাদের দেশে গ্রামসমূহেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।

অনুমান ভিন্ন এখন আর অন্য কোন উপায়ে এ দেশে জাহ্নবীর অস্তিত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। এখনও গ্রামপ্রান্তে অনেক ভগ্নদেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকাপ্রোথিত অনেক দেবমূর্ত্তি জলাশয়-খননকারীর খনিত্র আশ্রয় করিয়া সূর্য্যামুখদর্শনের জন্য উপরে উঠে। সময়ে সময়ে দুই একটা নৌকার ভগ্নাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন ইহার একটি ক্ষুদ্র শালতী-সঞ্চালনেরও শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এক সময় ইহার উপর দিয়া শ্রীমন্ত সদাগর সাত ডিঙ্গা পণ্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া সিংহল গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পার্ষদ সঙ্গে লইয়া এই গঙ্গারই উপর দিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন।

এখন ইহাকে গঙ্গা বলিতে লজ্জা বোধ করে। মধ্যে একটি সামান্য শীর্ণ খাল। আর খালের উভয় পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র। স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। তথাপি দেশবাসী ইহাকে গঙ্গা বলিতে ছাড়ে না। জাহ্নবীর আকৃতি গিয়াছে, প্রকৃতি গিয়াছে; তথাপি উহার উপর দেশের লোকের ভক্তি যায় নাই। এই ক্ষুদ্র শীর্ণদেহ খালের জল এখনও গঙ্গাজলের ন্যায়ই তাহাদের চক্ষে পবিত্র। লোকে ইহার বক্ষে স্থানে স্থানে সরোবর খনন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জলজ-গুল্ম-বহুল। সেই সকল গুল্মাচ্ছাদিত পানাভরা পঙ্কিল জলে এখনও হিন্দু নরনারী, "সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সুখদা-মোক্ষদা" জ্ঞানে, অসঙ্কোচে ডুব দিয়া থাকে।

আমরা এই গঙ্গায় শালতী ভাসাইয়া চলিয়াছি। ভাসাইয়া বলি কেন, গঙ্গাকে প্রহার করিতে করিতে শালতীকে বংশদণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর করিতেছি। পিতা যখন প্রথমবার হুগলীতে যান, তখন বর্ষার শেষ। শস্যক্ষেত্র জলপূর্ণ, খালেও যথেষ্ট স্রোত ছিল। এখন জৈষ্ঠ্যের শেষ। সবেমাত্র বর্ষার সূচনা হইয়াছে। সেই জন্য খালটা শালতীর পক্ষে কতকটা সুগম হইয়াছে।

এই খাল ধরিয়া আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মগরায় উপস্থিত হইব। সেখানে আহারাদি সমাপন করিয়া আবার যাত্রা করিব। সকাল সকাল পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে আমরা রাত্রিশেষেই যাত্রা করিয়াছি। স্থলপথে মা'কে ও বালক আমাকে লইয়া বার বার উঠানামা করিতে হইবে বলিয়া, পিতা বরাবর জলপথেই আমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। যাইতে কিছু বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম।

আমরা যে শালতীতে উঠিয়াছি, তাহা সেই জাতীয় যানের পক্ষে যতটা বড় হওয়া সম্ভব, তত বড়। পিতা বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ শালতী ভাড়া লইয়াছেন। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ চারি জন আরোহী, তাহার উপর আবার মায়ের সেই সেকালের মন্দিরাকৃতি পেঁটরা, কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, ও বালিস-বিছানার মোট। ছোট শালতীতে সকলের স্থান হইত না।

শালতীর টাপরের মধ্যে পেঁটরা ও সিন্দুকটি রাখিয়া মা তাহার নিকটে বসিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে এবং আমার পার্শ্বে পিতা ঝাঁপি ও কাপড়ের মোট লইয়া। গণেশ খুড়া টাপরের বাহিরে বসিল।

টাপরের আচ্ছাদনে এতটুকু ফাঁক নাই যে, উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিব। রাত্রি তখন তিনটা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। দুই পার্শ্বে কেবল মাঠ। মাঠের প্রান্তে দূরে গাঢ় অন্ধকার কোলে করিয়া গ্রামপ্রান্তস্থ আম, কাঁটাল, অশ্বত্থ, বটের গাছ। দেখিবার এমন বিশেষ কিছু ছিল না যে, তাহা দেখিতে আগ্রহ হইবে। তথাপি আমি টাপরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগিলাম। তাহাতে টাপরে আমার মাথা দুই তিন বার আহত হইল। প্রথম দুই এক বার চাঞ্চল্যের জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলাম। মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ঘুম ত তাঁহার আদেশ অনুযায়ী আমার চোখে আশ্রয় লইবে না। আমি কিয়ৎক্ষণ মায়ের কোলে মাথা দিয়া চোখ টিপিয়া পড়িয়া রহিলাম। ঘুম আসিল না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল। গ্রাম পার হইয়াছি।"

মা বলিলেন,— "আপদ্ চুকিল।"

আমি তাঁহাদের কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে অক্ষম হইলেও, গ্রামপারের কথা শুনিয়া, সহসা মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম। কেন যে উঠিলাম, তাহা বুঝি নাই। বুঝি, জন্মভূমির জন্য চিরান্তঃস্থিত মমতা সহসা আহত হইয়া মস্তিষ্কপথে ছুটিল। আমি বসিয়াই দাঁড়াইতে গেলাম। অমনি মাথাটা বিষমবেগে টাপরে লাগিয়া গেল। আমি মায়ের বক্ষের উপর সবেগে পতিত হইলাম।

মায়ের বক্ষে আঘাত লাগিল। তিনি মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া আমার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিলেন। মায়ের অঙ্গে আঘাত লাগায়, আমি নিজের আঘাত-যন্ত্রণা মনেই রাখিয়া, আবার তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম।

পিতা এইবারে আমার প্রতি সদয় হইলেন।

বলিলেন,—"মাঠ দেখিতে কি তোর বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে? তা হ'লে আমার সুমুখে আসিয়া বোস্।"

মা বলিলেন,—"তোমারই কাছে রাখ। আর বোঝ, অসৎশিক্ষায় ছেলে কতটা বেসহবৎ হইয়াছে।"

আমি পিতার সম্মুখে বসিলাম।—পিতা বলিলেন,—"সাবধান, এখানে যেন উঠিবার চেষ্টা কয়ো না। তা হ'লেই জলে পড়িয়া যাইবে।"

যেখানে বসিলাম, সেখান হইতে মুখ বাহির করিলেই খালের উভয় তীরই দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মুখ বাহির করিয়াই দেখিলাম। যে স্থানের উপর দিয়া শালতী চলিয়াছে, গঙ্গার একটি তীর তাহার অতি নিকটে। অপরটি প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে।

নিকটের তীরে যে গ্রাম, আমরা যেন তার গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম। ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি পিতাকে বলিলাম,—"কৈ বাবা, এ ত আমাদের গ্রাম নয়।"

পিতা কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কথাটা যেন তিনি শুনিতে পাইলেন না। তিনি গণেশ খুড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে গণেশ, ঘুমাইতেছ না কি?"

সত্যই তখন গণেশ খুড়া ঘুমাইতেছিল। পিতার কথা শুনিবামাত্র সুপ্তোত্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, —"এঁ—"

পিতা বলিলেন—"বেশ গণেশ, বেশ! এই অবস্থায় তুমি যে ঘুমাইতে পারিয়াছ, ইহাতে তোমার বাহাদুরী আছে।"

বাহাদুরীই বটে! তাহার পার্শ্ব দিয়া মাঝির 'বোটে' অবিরাম যাতায়াত করিতেছে; খুড়ার তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। লেপ-বালিসের নীচে মাথা গুঁজিয়া খুড়া বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লইল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ ঠাকুরপো, ইহারই মধ্যে কখন তোমার ঘুম আসিল?"

পিতা বলিলেন,—"ডোঙ্গায় উঠিবামাত্র। ইহা আর বুঝিতে পারিলে না! জাগিয়া থাকিলে গণেশ কি অন্ততঃ একটা কথাও কহিতে ছাড়িত! কেমন গণেশ, না?"

খুড়া বলিল,—"হাঁ দাদা, তাই বোধ হয়।"

পিতা। গণেশ! দেখিতেছি তুমিই যথার্থ সুখী।

গণেশ। হাঁ দাদা, আমি কিছু সুখী। যাত্রার উদ্যোগ করিতে এবং মা ও বউকে বুঝাইতে ভুলাইতে সারা রাত্রিটাই চলিয়া গেল। একটি বারের জন্য চোখের পলক ফেলতে পাই নাই। রাত্রিটা আমি আদতেই জাগিতে পারি না। এই জন্য চোখ দু'টা কখন্ আপনি বুজিয়া গিয়াছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে কি বলিয়া ভুলাইলে?"

খুড়া। বউ কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম,—"কাঁদিসনে ক্ষেপী, আমি তোর জন্য গেঁজে পূরিয়া টাকা আনিতে চলিয়াছি।" মা বলিল,—"বাবা! কোম্পানীর চাকরী করিতে চলিয়াছ। খুব হুসিয়ার হইয়া কাজ করিবে। কোনও রকমে কোম্পানীকে চটাইয়ো না।" আমি বলিলাম,—"আমার কাজ দেখিয়া কোম্পানীর বাপ পর্য্যন্ত খুসী হইয়া যাইবে। কোম্পানী ত ছেলেমানুষ।" এই রকম কথার উপর কথা—রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। তার পর তোমাদের তল্পীতল্পা বাঁধিতে, গোছ করিতে, ডোঙ্গায় উঠাইতে দুইটা। ঘুমাইবার আর এক দণ্ডও সময় পাইলাম না।

পিতা। এমন কি কাজ করিতে জান যে, কোম্পানী দেখিয়া তুষ্ট হইবে?

খুড়া। এমন কি কাজ আছে যে আমি করিতে জানি না? ঘর-ঝাঁট হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত বাড়ীর সমস্ত কাজ ত আমিই করি। মা দিনরাত এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। বউ নিজের শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কাজ করিবে কখন্?

পিতা। রান্নার কাজও কি করিতে হয়?

খুড়া। দুইবেলা। করিতে হয় বলিয়া করিতে হয়!

পিতা। বেশ ভাই, বেশ! তা হ'লে তোমার চাকরীর ভাবনা কি?

মাতা। চাকরী করিতে হইলে যে কিছু বিদ্যা থাকা চাই ঠাকুরপো!

খুড়া। কেন! বিদ্যের অভাব কি? গোপাল গুরুম'শার পাঠশাল। অঘোর দা'র যেখান থেকে বিদ্যে, আমারও বিদ্যে সেইখান থেকে। কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্যে; কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিজ্যে। গোবিন্দ খুড়ার বাগানের কলাগাছ শেষ করিয়াছি। বাঁশ ঝাড়ের কঞ্চি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। আমার বিদ্যে নাই! তবে বিদ্যা দাদার মতন হয় নাই, এই যা বলিতে পার। তবে দাদার বিদ্যা দাদার মতন, ছোট ভাইয়ের বিদ্যা ছোট ভাইয়ের মতন।

পিতা। শুধু বিদ্যা হ'লে ত হবে না। কোম্পানী বড় পেটুক। তাহাকে ভাল ভাল তরকারী না খাওয়াইলে সে খুসী হইবে না।

খুড়া এই কথা শুনিয়াই হো হো করিয়া হাসি

উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"অঘোর দা, তবে ত কোম্পানীকে হাতের মুঠোর ভিতরে পুরিয়াছি।"

মা বলিলেন,—"কই ভাই, তোমার বিদ্যা ত আমি জানিতে পারিলাম না।"

"বেশ, আগে মগরায় চল। আজই তোমাকে বিদ্যার পরিচয় দিব।"

এই কথোপকথনেই গণেশ খুড়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় হইল।

আমি কিন্তু গ্রামের পানেই চাহিয়া ছিলাম। আমাদের গ্রাম কি না, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই অবস্থায় গণেশ খুড়ার কথা যতটা শুনিবার শুনিয়াছিলাম। আমি বিশেষ দৃষ্টিতে যখন দেখিলাম, সেটা আমাদের গ্রাম নয়, তখন সে সম্বন্ধে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কই বাবা, এ ত আমাদের গ্রাম নয়।"

আমার এই কথা শুনিয়াই গণেশ খুড়া বলিয়া উঠিল, "ও হরি। আমাদের গাঁ, সে কোথায়। কখন্ তাকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তোমার ওই শ্বশুরের গাঁ'ও ফেলিয়া আসিয়াছি।"

পিতা কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্ থাক্।"

গণেশ খুড়া পিতার আদেশ মানিল না। আবেগের সহিতই বলিয়া উঠিল,—"ওই ওই! ওই দেখ বাবাজী, সাভ্যোম ম'শায়ের বাগানের অশথ গাছ নী নী করিতেছে।"

"চুপ কর না গণেশ!" পিতা ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন।

কিন্তু নিষেধ মানে কে? গণেশ খুড়ার তখন প্রাণের কবাট খুলিয়া গিয়াছে। সে আবার বলিল,—"সত্যি অঘোর দা! হয় না হয়, তুমি দেখ। ওই অশথ-গাছ আঙুল নাড়িয়া যেন হরিহরকে যাইতে ইসারা করিতেছে।"

আমি অশথ-গাছটার আঙল নাড়া দেখিবার জন্য টাপর হইতে সাগ্রহে গলা বাড়াইতে গেলাম। পিতা আমার ঘাড়টা ধরিয়া যথাস্থানে বসাইলেন।

মাতাও ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কর কি গণেশ! বাবু বার বার তোমাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, আর তুমি পাগলের মত কি ছাই পাঁশ বকিয়া যাইতেছ?"

মায়ের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে গণেশ খুড়া এই প্রথম শুনিল। সে আর গ্রাম সম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া বলিল,—"বউ ঠাকরুণ! যখন তোমার মুখ থেকে আমার নামটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন বুঝলুম, তোমার সত্যি সত্যি রাগ হয়েছে। আর ও গাঁয়ের কথা বলিব না।"

পিতা বলিলেন,—"তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও।"

"বেশ দাদা।"—বলিয়াই গণেশ খুড়া আবার মোটের উপর মস্তক রক্ষা করিল।

শালতী-চালক বলিল,—"ওইটাই সাভ্যোম ম'শায়ের বাস্ত বটে। খুড়াঠাকুর ভুল করে নাই।"

পিতা বলিলেন,—"বেশ। তুমি এখন একটু জোরে চালাইয়া চল।"

গণেশ খুড়া মোটের উপর মাথা দিতে না দিতেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পিতা সেটা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাতাকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"মুখ'টা ঘুমটাকে দেখিতেছি খুব সাধিয়াছে।"

মা বলিলেন,—"ওর আর সাধিবার কি আছে! কাজের মধ্যে দুই। খাই আর শুই।"

এই বলিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন,—"কেন মিছে বসিয়া আছিস্ হরিহর? এখনও অনেক রাত আছে। আমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমা। এ পোড়া দেশে কি দেখিবার আছে, তা দেখ্‌বি। যে দেশে বাবু আমাদের লইয়া যাইতেছেন, সেই দেশে চল্। কত কি দেখিতে পারিস, বুঝিব।"

পিতা বলিলেন,—"তোকে কাল কলকেতা দেখাইব। তার পর হুগলীতে গিয়া ইমামবাড়ী দেখিবি; সে দেখিলে আর তোর এ দেশের নামপর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হইবে না।"

নূতন দেশ দেখিবার আশ্বাসে আশ্বাসিত আমি আবার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলাম।

তখন ঘুম আসে নাই। সবেমাত্র আসে-আসে হইয়াছে। পিতা মনে করিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছি। সেই মনে করিয়াই বোধ হয়, তিনি মাকে বলিলেন,—"এখন বুঝিতেছি, মা ছেলেটার মাথা খাইতে বসিয়াছিলেন।"

মাতা। দেখ—বুঝে দেখ। শ্বশুরবাড়ী দেখিবার জন্য বালকের আগ্রহটা দেখিলে। তবু ত এই কয় মাস ওকে শাসনে শাসনে রাখিয়াছি।

পিতা। এখন বছর পাঁচ ছয় ত ওকে এদিকে পাঠাইবার নাম করিব না।

মাতা। তুমি যে পুরুষ, তুমি কি তা পারিবে? মা চিঠিতে একটু কাঁদাকাটার কথা লিখিলেই তুমি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া আসিবে।

পিতা। কিছুতেই না। এখন বুঝিতেছি, ছয় মাস আগেই তোমাদের লইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

মাতা। আমার কথাকে ত মূল্যজ্ঞান কর না আমি কে ত কে। তোমাদের শত্রু বই ত নয়। অথচ ছেলেকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়াছি।

পিতা। এত রাত্রিতে বাহির হইলাম কেন জান? পাছে বামুন খবর পাইয়া পথ আগুলিয়া বিরক্ত করে। যতক্ষণ না বামুনের গ্রাম পার হইয়াছি, ততক্ষণ মনে বড়ই উদ্বেগ ছিল।

মাতা। উদ্বেগ কি গিয়াছে মনে করিয়াছ? বামুন সেই হুগলী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবে।

পিতা। সেখানে গেলে তাহাকে বুঝিয়া লইব।

মাতা। পারিবে?

পিতা। দেখিয়ো।

মাতা। তবে তোমাকে মনের কথা বলি। ছেলের আমার বিবাহ না হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি মড়ুই-পোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিব না। সে আমাকে অঘরের মেয়ে বলিয়াছে।

পিতা। বামুন অতি নির্ব্বোধ।

মাতা। নির্ব্বোধ নয় হারামজাদা। সে কি আমাদের ঘর কি, জানে না? আমার বাপের মত কুলীন তোমাদের দেশে আর কেউ আছে?

পিতা। সে কথা ছাড়িয়া দাও না। আর কি কুলীন-মৌলিকের ইতর-বিশেষ থাকিবে?

মাতা। ও বামুন ত মড়ুইপোড়া। তোমরা বোকা, তাই উহার বেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছ। আমার বাবা হইলে উহাদের ঘরের ছায়া মাড়াইত না।

পিতা। যাক্, বিবাহ ত আর হইতেছে না। তখন ঘরের কথা তুলিবার আর প্রয়োজন কি? তা যা হ'ক, একি করিলে? এক আপদ্ হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছি, আবার এ আপদ্ সঙ্গে লইলে কেন? এ গণ্ডমূর্খটাকে সেখানে লইয়া কি করিব?

মাতা। ওর মা আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছে। আর আমার হাত দুটি ধরিয়া প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে। কাছারীতে যে কোন একটি কাজ উহাকে করিয়া দিয়ো।

পিতা। কাজের মধ্যে এক কাজ রাঁধুনি-বৃত্তি। অন্য কোন কাজ ও মূর্খের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।

মাতা। ভাল, এখন চলুক। কোনও কাজ করিতে না পারে, আমাদের রসুই করিবে।

ইহার পরেই পিতামাতা নিস্তব্ধ হইলেন এবং এই নিস্তব্ধতার অবসরে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৬

প্রভাতে মগরায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে চটিতে আহার-কার্য্য সমাধা করিলাম। গণেশ খুড়াই রাঁধিল। তাহার হাতের রান্নার অপূর্ব্ব আস্বাদন আজও পর্য্যন্ত আমার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পর অনেক স্থানে ভাল ভাল রসুয়ের রান্না খাইয়াছি, কিন্তু সে দিন যেমন তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলাম, এরূপ আহারে তৃপ্তি আর কখনও লাভ করি নাই। আমি যে শুধু একাই তৃপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে। পিতা ও মাতা উভয়েই পরম তৃপ্তির কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মাতা বলিলেন,—"তাই ত ঠাকুরপো, রান্নায় তোমার এমন মিষ্ট হাত, তা তো আগে জানিতাম না। আগে জানিলে যে, উপযাচক হইয়া তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতাম।"

পিতা বলিলেন,—"তোমার যখন হাতের এত গুণ, তখন তোমার চাকরীর ভাবনা কি গণেশ!"

গণেশ খুড়া বলিল,—"কেমন অঘোরদা, কোম্পানী খুসী হইবে না?"

পিতা ও মাতা উভয়েই তখন গণেশ খুড়াকে চাকরী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার আশ্বাস দিলেন। আমি বুঝিলাম, গণেশ খুড়ার কি চাকরী হইবে। কিন্তু গণেশ খুড়া বুঝিল না।

আহারান্তে আবার আমরা শালতীতে উঠিলাম। এবারে প্রখর রৌদ্র; সুতরাং গণেশ খুড়ার আর টাপরের বাহিরে থাকা চলিবে না। পিতা তাহাকে টাপরের ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খুড়া ভিতরে আসিল না। গামছাখানা জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া বাহিরে বসিল। বলিল,—'না দাদা, আমি বাহিরেই থাকিব। রোদ-জল আমার সওয়া আছে। আর বামুনের ছেলে হয়ে যখন চাকরী করিতেই হইবে, তখন রোদ-জলকে ভয় করিলে চলিবে কেন?"

পিতা। চাকরী করাটা কি খারাপ কাজ?

খুড়া। খারাপ বই কি দাদা! যে কাজ বাপ-ঠাকুরদা করেন নাই, সে কাজ ভাল কেমন করিয়া বলিব! তাহারা ত কেহ মূর্খ ছিল না। বংশের মধ্যে মূর্খ কেবল আমি। ওই ত আমাদের সবার বড় পণ্ডিত সাভ্যোম মশাই। কোম্পানী তাকে কত টাকা দিতে চাইলে, তবু বামুন চাকরী নিলে না।

মাতা। সে যে সবার বড় পণ্ডিত, এ কথা তোমারে কে বলিল?

খুড়া। সকলে বলে, তাই শুনি। আমি মূর্খ, আমি কি জানিব?

পিতা। বটে! তা হ'লে তুমি বুঝি অনিচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যাইতেছ?

খুড়া। ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝি না। মা তোমাদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছে—চলিয়াছি। আবার আসিতে বলে—আসিব। না বলে, আসিব না।

মাতা। এ কথা আগে বলিলে ত আমরা তোমাকে সঙ্গে আনিতাম না।

খুড়া এ কথার কোন উত্তর করিল না। চাকরীর লঘুত্ব চিন্তায় বুঝি ব্যাকুল হইয়া আপনার মনে গান ধরিল—

"তারা কোন্ অপরাধে সুদীর্ঘ মিয়াদে
সংসার-গারদে থাটি বল।"

এই সময়ে পিতা ও মাতা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। মাতা বলিলেন,—"তবে আর কেন? পার ত এই স্থান হইতেই বিদায় দাও।"

পিতা ডাকিলেন "গণেশ!"

খুড়া। কি অঘোরদা'!

পিতা। তুমি এইখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিতেছি।

খুড়া। কেন, আমি কি চাকরী করিতে পারিব না?

পিতা। না। তুমি লেখাপড়া জান না। তুমি সেখানে কি চাকরী করিবে? তোমার মায়ের একান্ত অনুরোধে তোমাকে লইয়া চলিয়াছি; কিন্তু তোমাকে যে কি কাজে লাগাইব, এখন পর্য্যন্ত আমরা স্বামি-স্ত্রীতে তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

মাতা। আমাদের বাসায় রসুই করা ভিন্ন সেখানে তোমার অন্য কোন কাজ করিবার নাই।

খুড়া। বেশ, তাই করিব। বউ ঠাকরুণ! তোমাদের সেবা ত আমার চাকরী নয়!

পিতা। তা যদি করতে ইচ্ছা কর, চল। যতদূর যত্নে তোমাকে রাখা সম্ভব, ততদূর যত্নে তোমাকে রাখিব। হুগলী সহরে অন্যান্য ব্রাহ্মণে যাহা পায়, তোমাকে তাহার দ্বিগুণ দিব।

খুড়া। সে কি অঘোরদা'! তোমার ঘরে রাঁধিব, তাহাতে মাহিনা লইব। মূর্খ বলিয়া কি আমি এতই হীন হইয়াছি।

পিতা। তা লইতেই হইবে। তুমি একা হইলে কথা স্বতন্ত্র ছিল। তা' নয়, তুমি সংসারী। তোমার মা আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। সংসার স্বচ্ছলে চলে না বলিয়া তোমার মা আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। আমরাই কি এত হীন যে, তোমাকে শুধু শুধু খাটাইব?

খুড়া। বেশ, তবে যা ইচ্ছা হয় দিয়ো।

মাতা। তোমার না লইতে ইচ্ছা থাকে, আমরা তোমার মা'র নামে তোমার বেতন মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব।

খুড়া। হাঁ, তাই দিয়ো; আমি আর চাকরীর টাকা হাতে করিব না।

পিতা। আর এক কথা। তুমি সেখানে ইঁহাকে বউ ঠাকরুণ বলিয়া ডাকিতে পারিবে না।

খুড়া। তবে কি বলিব?

পিতা। 'মা' বলিবে।

খুড়া। তা উনি ত মা! 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা, জ্যেষ্ঠভার্য্যা সম মাতা'। বড় ভাই যখন বাপের তুল্য, তখন বড় ভাজ মা নয় ত কি?

সংস্কৃত শ্লোক গণেশখুড়ার মুখ হইতে নির্গত হইতে শুনিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন,—হাঁ ভাই, এইবার ঠিক বলিয়াছ।"

মা বলিলেন—"আর ইঁহারও নাম ধরিতে পাইবে না।"

"বেশ, শুধু দাদা বলিব।"

"না—তাও বলিতে পাইবে না।"

"তবে কি বাবা বলিব?"

"তা কেন? হয় হুজুর, আর তা বলিতে যদি না পার, শুধু 'বাবু' বলিবে।

"বাবু, হুজুর, কি দাদার চেয়ে বেশী মানের কথা হইল?"

"হোক, না হোক, তোমাকে বলিতে হইবে।"

"আর হরিহরকে?"

"খোকাবাবু বলিবে। নাম তুমি কাহারও ধরিতে পাইবে না।"

"কেন, ওরা কি সব আমার ভাসুর যে, নাম ধরিতে পাইব না।"

"তামাসা রাখ। যা বলিলাম, করিতে পারিবে?"

"চাকরী করিতে গেলেই কি এইরূপ করিতে হয়।"

"স্থানবিশেষে করিতে হয়। উনি ত আর যে সে লোক ন'ন। উনি হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। উঁহার সঙ্গে তোমার যে কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথাও কেহ জানিবে না। জানিলে মানে খাট হইতে হইবে।"

গণেশখুড়া এই স্থানে কথা বন্ধ করিয়া শুধু সানুনাসিক স্বরে গান ভাঁজ করিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন—"ঠাকুরপো, পারিবে ত?"

"আর ঠাকুরপো কেন মা-লক্ষ্মী! সম্পর্কটা এইখান থেকে শেষ করিলেই ভাল হয়।"

"পারিবে না?"

"কস্মিন্ কালেও না।"

এই বলিয়াই খুড়া তাহার তলপীটি মাথায় লইয়া ঝপ ত করিয়া জলে পড়িল। সেখানে জল তাহার এক বুক হইবে। গণেশ হাঁটিয়া খালের পাড়ের উপর উঠিল। পিতা বলিলেন "গণেশ! পাঁচটা টাকা সঙ্গে লইয়া যাও।"

খুড়া উত্তর করিল না—মুখও ফিরাইল না। "তারা কোন অপরাধে" গাহিতে গাহিতে খালের ধার ধরিয়া চলিয়া গেল।

১৭

এইবারে হুগলীতে আসিয়াছি। এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা সহর অতিক্রম করিয়াছি। বিপুলপ্রবাহিণী ভাগীরথীর বক্ষে প্রায় একটা পূরাদিন অবস্থিতি করিয়াছি। বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তনশীল গ্রামের বালক একেবারে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে। কূপ-মণ্ডুক ঘুম হইতে উঠিয়া একেবারে সাগরে পড়িয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহার নাসিকারন্ধ্র আক্রমণ করিয়াছে, তথাপি সে সাগরের বিশালতার মধুরতা ভুলিতে পারিতেছে না।

হুগলী কলিকাতার মত সহর নয়, তথাপি সে আমাদের গ্রামের তুলনায় বড় সহর। তাহার উপর কলিকাতারই মত ভাগীরথী তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমি এত বড় নদী পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। যেখানে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে স্থানটা হাকিমদিগেরই বাসপল্লী। তাহার কিছু দূরে বড় বড় উকীলেরা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। হাকিমপাড়া ও উকীলপাড়া একরূপ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। সুতরাং সে স্থানটা একরূপ পাকা সহরেরই মত দেখাইত। অদূরে কাছারী, কাছারীর সন্নিকটেই ভাগীরথী। মধ্যে একটি সুসংস্কৃত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে ঝাউগাছের সারি। আমি বহুকালান্তর হইতে কথা কহিতেছি। সুতরাং স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু বিভ্রম হইতে পারে। সহৃদয় পাঠক বর্ণনার ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

আমার মত বন্ধ পল্লীবাসী বালকের পক্ষে এইরূপ সহরই যথেষ্ট। আমি নূতন মানুষ হইতে নূতন দেশে আসিলাম। পর্ণকুটীরবাসী ব্রাহ্মণপুত্র প্রথমে সভয়ে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন ভয় ঘুচিল, তখন পৈতৃক খড়ের ঘরখানি অল্পে অল্পে মমতাবিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

সে দিন মনে পড়ে। মনে করিতে গেলে কতকগুলা অশ্রুবিন্দু আমার চক্ষুকে আবৃত করিয়া ফেলে। তথাপি গৈরিকাঞ্চলে মুছিয়া আমি তাহাকে যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিয়াছি। কেন রাখিয়াছি? সে দৃশ্য পুনর্দ্দর্শনের সময় আসিয়াছে। মহাভারতের শুধু বাসুদেবচরিত্র পড়িলে চলিবে না। ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরাদিকে শুধু দেখিলে দেখা সম্পূর্ণ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধনকে দেখিতে হইবে, শকুনি-দুঃশাসনাদির সহিত পরিচয় করিতে হইবে। নতুবা মহাভারত পাঠ সম্পূর্ণ হইবে না। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের মর্ম্ম বুঝিবে না। আর বুঝিবে না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট সদ্রৌপদী যাজ্ঞক পঞ্চভ্রাতার মহাপ্রস্থান।

হুগলীতে আসিবার দুই চারি দিন পরেই পিতা আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। স্কুলে পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমার নূতন সঙ্গী জুটিল! তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উকীলের ছেলে। দেশী হাকিমের পুত্রও যে ছিল না, এরূপ নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। সকলেই এক ক্লাসে পড়িতাম না। দুই এক জন উঁচু নীচু ক্লাসের ছাত্র লইয়া আমরা এক দল হইলাম। তাহাদের ভাবাভাব আমার গ্রাম্য সঙ্গীগুলির ভাষা ও ভাব হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম প্রথম আমি সসঙ্কোচভাবে তাহাদের সহিত মিশিতাম। ক্রমে দিনের পর দিন যখন আমার সঙ্কোচভাব দূর হইয়া আসিল এবং আমি নগরবাসে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইলাম, তখন আমার সহচরগুলির মধ্যে আমিই প্রকৃত নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

মাতারও দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। আমার পিতামহীর শাসনে আমাদের পল্লীগৃহে মা যেরূপ ভাবে দিন যাপন করিতেন, হুগলীতে আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি সে ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিতার সপরিবারে আসিবার সংবাদ পাইয়া, আমাদের আসিবার দুই দিন পরেই হাকিম ও উকীল-মহিলারা মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। প্রথম দিন ব্রীড়ানম্র অবগুণ্ঠনবতী সঙ্কোচশীলা কুলবধূর সহিত তাঁহাদের প্রগল্‌ভ সম্ভাষণের সুবিধা হইল না।

মাসেক সময়ের মধ্যে মায়ের এই সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। একমাস পরে একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি, মা হাস্য-পরিহাসে ও প্রগল্‌ভতায় অপর মহিলাদের সমকক্ষ হইয়াছেন। আরও দুই চারি দিন পরে, আমি যেমন বালকবৃন্দের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছি, রমণীমণ্ডলী মধ্যে তাঁহারও সেই রূপ লাভ হইল। মা স্বভাবতঃ অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। অল্পদিবসের মধ্যেই তিনি সহরের আদবকায়দায় সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন।

যাক্, এসব পরিবর্ত্তনের কথা আর কহিব না। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, পরদিবসের অবস্থার তুলনায় পূর্ব্বদিবস বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বলিয়া লাভ নাই; বক্তারও নাই—শ্রোতারও নাই। যুবকবৃন্দ এ ইতিহাস শুনিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবে। আর সেই পরিবর্ত্তন-যুগের পরিবর্ত্তিত বৃদ্ধ

কপোলকণ্ডুয়নে মৃদুহাস্যে পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালীজীবনের স্বপ্নকথা গাঢ়তর নিদ্রায় ঢাকিয়া দিবে।

বলিয়া ফল কি? নবীন শ্রোতা বুঝিবে না। অধিকন্তু গোঁড়া বামুনের বামনাই বলিয়া রহস্য করিবে। প্রবীণ বন্ধু বুঝিলেও, যদি ফিরিতে ইচ্ছা করে, ফিরিতে পারিবে না। খাঁটি দুগ্ধ অম্লস্পর্শে দধিতে পারণত হইয়াছে। দুগ্ধ দধি হয়। দধি আর দুগ্ধ হয় না।

হুগলীতে এক বৎসর কাটিল। দৈনন্দিন পরিবর্তনে এই এক বৎসরেই আমরা নূতন জীবে পরিণত হইয়াছি। এই এক বৎসরে পিতামহীর সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধই এক রূপ বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

পিতামাতা দেশে যে আর ফিরিবেন না, এটা স্থির হইয়া গিয়াছে। আমারও ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। নিম্নবঙ্গের, বিশেষতঃ আমাদের 'দক্ষিণ' দেশের পথগুলা বর্ষাকালে বড়ই দুর্গম হইয়া থাকে। কখনও কোনদিন গ্রামে ফিরিবার ইচ্ছা হইলে, আমার সে দুর্গম পথের কথা মনে পড়িত। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও যেন কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইত।

১৮

পিতার চাকরী হইবার পূর্ব্বে ঠানদিদির সঙ্গে কিছুদিন মাতার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পিতামহী জানিবার পূর্ব্বেই মাতা এই চাকরীর সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। পিতা এ গুহ্য কথা মাতা ব্যতীত আর কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি হাকিমের গৃহিণী হইবার উপযোগিনী হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

মা আবার "অন্য-পূর্ব্বা" কন্যা। পূর্ব্ব-কথিত সম্বন্ধের পর যদি বালকের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কন্যাকে 'অন্য-পূর্ব্বা' বলে। তাহার বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ না হইলেও, কখন প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এরূপ কন্যার প্রায়শঃ 'মৌলিকে'র ঘরে বিবাহ হয়। পিতামহ কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির আশায় পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতার অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। আমার মাতামহ মুঙ্গেরে জেলার হাকিমের পেস্কারী করিতেন। দেশ হইতে অনেক দূরে থাকিতেন বলিয়া তিনি কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দিতে পারেন নাই। মাতার যে বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সে সময়ে তত অধিক বয়সে বিবাহ লোকের চক্ষে একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

জন্মাবধি কাছারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেন বলিয়া, হাকিমী সম্বন্ধে মাতার একটু আধটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার ফলে, তিনি হয় ত কোন একটি হাকিমপত্নীকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছিলেন।

স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া বাবু অভিধানে সম্বোধন, কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত লোকসহ আলাপন এবং রন্ধনাদি হিন্দুললনার অত্যাবশ্যক কার্য্যে পরনির্ভরতা, এইরূপ কতকগুলি সদ্‌গুণ অবলম্বনে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। সেই জন্য গোপনে তিনি ঠানদিদির সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠানদিদি আসিয়া মায়ের কবরীবন্ধনের সাহায্য ক'রতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা মায়ের রন্ধন-কার্য্যটিও নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। মায়ের এইরূপ কার্য্যে ঠানদিদির যে বিশেষ অর্থসাহায্য হইত, তাহা নহে। তবে তাঁহার ভবিষ্যতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল। সে কথা শুনিয়া ঠানদিদির আশা হইয়াছিল, এই সময়ে মাকে সাহায্য করিলে, তাঁহার পুত্র গণেশ ভবিষ্যতে একটা চাকরী পাইবেই। মাও বোধ হয় তাহার চাকরীর একটা আভাস দিয়াছিলেন।

পিতা ও মাতার কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম, গণেশ খুড়াকে আনিতে পিতার ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাহাকে বুদ্ধিহীন গণ্ডমূর্খ বলিয়াই জানিতেন। সে এখানে আসিয়া কি চাকরী করিবে? অথবা আমাদেরই কি উপকারে আসিবে? বিশেষতঃ তাহাকে আনিলে আমাদের অনেকটা সম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দেশে সে আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট আত্মীয়। আমার অতি দরিদ্র প্রপিতামহ শুদ্ধমাত্র কৌলীন্য সম্বল লইয়া পূর্ব্বে ইঁহাদিগেরই এক আত্মীয়-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং বিবাহসূত্রে গণেশ খুড়ারই এক বৃদ্ধপ্রপিতামহের ভূমিসম্পত্তিতে অধিকার পাইয়াছিলেন। খুড়া আমার পিতামহের মাতুলবংশীয়। সুতরাং তাঁহার সম্পর্ক আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

এইজন্য পিতা তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে আনিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মাতাও পিতা এবং আমি ছাড়া, শ্বশুরকুলের আর কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা নয়, আমাদের গ্রামের কুটুম্বদের মধ্যে কেহ তাঁহার এই নব-স্বাধীনতা-সুখলাভের অন্তরায় হয়।

পিতামহীর অস্তিত্বে মা দেশে গৃহিণীপণা করিতে পারেন নাই। পিতার উপার্জ্জনের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া ইচ্ছামত সে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে সমর্থ হন নাই। পিতামহী কখন পিতামহের উপার্জ্জনের টাকা হাতে পান নাই বটে, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে যে সমস্ত ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন, পিতামহ সেগুলি সুসম্পন্ন করিয়া দিতেন। সে সমস্ত কার্য্যে প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও, তিনি তাহাতে

কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। গোবিন্দ ঠাকুরদা' পিতামহীকে এই সকল কার্য্যে প্ররোচিত করিতেন।

দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী—নানা জাতীয় সংক্রান্তি—এমন ব্রত নাই, যাহা পিতামহী গ্রহণ করেন নাই। এ সকল ব্রতের কতকগুলা আমি দেখিয়াছি, কতকগুলার কথা শুনিয়াছি। তবে পিতামহীর মহাসমারোহের জগদ্ধাত্রী পূজাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মূর্খজনোচিত অর্থের অসদ্ব্যয় মাতা অত্যন্ত মানসিক ক্লেশের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। জগদ্ধাত্রী-পূজার উদ্‌যাপনের বৎসরে সহস্রাধিক কাঙ্গালীকে অন্নদান করা হইয়াছিল। তাই দেখিয়া মায়ের এরূপ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি মুখ ফুটিয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন—"বুড়ী আর আমাদের খাইবার জন্য কিছু রাখিবে না দেখিতেছি।" পিতা বলিয়াছিলেন—"উপায় নাই। বুড়ী আর গোবিন্দখুড়া যতদিন না মরে, তত দিন অর্থের বিষম অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিব না।"

বুড়ী মরিল না, উদ্‌যাপনের পর বৎসর বুড়া মরিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর সকল ব্রতেরই একেবারে উদ্‌যাপন হইল।

সেই সমস্ত উৎসব-ব্যাপারে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকগুলাই সাগ্রহে যোগদান করিত। এইজন্য মা আমাদের গ্রামের নামটার উপর পর্য্যন্ত চটিয়াছিলেন। অনেকবার নামের উদ্দেশে মৌখিক শতমুখী প্রহার করিয়াছিলেন। এমন কি, হুগলীর 'খোলঘাটে' নৌকা হইতে নামিবার সময়ে, মায়ের চরণতলে যেখানে এক বিন্দু গ্রামের মাটী লুক্কায়িত ছিল অথবা ভক্তিবশে চরণে জড়াইয়াছিল, মা সে সমস্ত মৃত্তিকা জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা এক, বিধাতার ইচ্ছা আর। আমাদের গ্রামের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলে কি হইবে? বিধাতার ইচ্ছা নয়, গ্রাম আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তা হইলে ত আমি এই অপ্রীতিকর কাহিনীর বর্ণনার দায় হইতে রক্ষা পাইতাম। মা'ই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার প্রধান বাধা। কর্ম্মবিপাকে সেই মাকেই আবার বাধ্য হইয়া দেশের সঙ্গে হুগলীর সম্বন্ধের ঘটকালী করিতে হইল।

আমরা হুগলীতে আসিবার পূর্ব্বেই পিতা তাঁহার পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া এই বাসাই মনোনীত করিয়াছিলেন। বাসাটি আজিকালিকার 'বাংলা'র ধরণে প্রায় বিঘে তিনেক জমীর মধ্যস্থলে একেবারে পরস্পর-সংলগ্ন কতকগুলা ঘর। বাংলার আকৃতি সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, প্রায় সেইরূপ। ইহাকে নূতন করিয়া বর্ণনা করিবার কিছু নাই। দেখিতে সুদৃশ্য বটে। প্লোরের উপর বাড়ী। একতলা হইলেও দোতলার কার্য্য করিয়া থাকে। কেন না, প্লোরটা এত উঁচু যে, তাহার তলে ভৃত্যাদি সুশৃঙ্খলে বাস করিতে পারে।

সুদৃশ্য হইলেও বাড়ীটি কিন্তু তখনকার হিন্দু-গৃহস্থের বাসের পক্ষে সেরূপ সুবিধার ছিল না। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফুলের বাগান। পশ্চাতে কিছু দূরে রান্নাঘর। রান্নাঘর কেন—বাবুর্চিখানা।

পূর্ব্বে কোন সাহেব ইঞ্জিনীয়র বাংলাখানা নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমস্ত জমীটা ঈষদুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ফুলবাগানের পশ্চাৎ হইতে প্রাচীর-গাত্র পর্য্যন্ত কতকগুলা আমকাঁঠালের গাছ। গাছগুলা ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে।

ইঞ্জিনীয়র সাহেব এরূপভাবে গাছগুলি রোপণ করেন নাই। তিনি যখন কর্ম্মাবসরে পেন্‌সন লইয়া বিলাত চলিয়া যান, তখন বাংলাটি জনৈক উকীলকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উকীল মহাশয় জিনিসের অপব্যয় দেখাটা বড় পছন্দ করিতেন না। বাড়ীর মধ্যে এতটা মৃত্তিকা অকর্ম্মণ্য থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহাতে আম কাঁঠাল লীচুর চারা যেখানে যেরূপ সুবিধা বুঝিয়াছিলেন, রোপণ করিয়াছিলেন। গাছগুলা শৈশবাবস্থায় পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। এখন বড় হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন—আলিঙ্গন বলি কেন—আক্রমণ করিয়াছে। তাহাতে গাছগুলার ক্ষতি হউক না হউক, স্থানটা জঙ্গলের ভাব ধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ যেখানে রান্নাঘর, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগটা একেবারে অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল।

এইজন্য এখানে বাসের সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধুনী-বিভ্রাট ঘটিল। ব্রাহ্মণ আসে আর চলিয়া যায়। কেহ, সাহেবের বাড়ী ছিল বলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই চাহে না। কেহ বা দুইদিন কাজ করিয়াই ঘরের নির্জ্জনতায় ভীত হইয়া প্রস্থান করে। শেষে লোক খুঁজিতে খুঁজিতে পিতার আরদালীর প্রাণ যায় যায় হইল।

এ স্থলে বলিয়া রাখি, পিতার আসিবার পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুই জন ফিরিঙ্গী ডেপুটী ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া সপরিবারে এখানে বাস করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থানচিহ্ন বাড়ীর ভিতরের সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই। যে স্থানটায় তাহাদের মুরগী-পেরুগুলা থাকিত, সে স্থানগুলা আমাদের আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত ছিল। তখনও পর্য্যন্ত বামুনগুলা একেবারে বামনাই ছাড়িতে পারে নাই। অথবা অন্য জাতি গলায়-পৈতা-বামুন সাজিয়া রাঁধুনীবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।

এই সকল কারণে এখানে বাসের কিছুদিন পরে পিতা বাসস্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ীখানা মায়ের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। তাহার উপর যে সকল মহিলা মাঝে মাঝে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে বাড়ীখানির প্রশংসা করিতেন। যে ভাড়ায় ইহা পাওয়া গিয়াছিল, অন্যত্র সেরূপ ভাড়ায় সেরূপ বাটী মিলা দুর্ঘট। এই সকল কারণে আমাদের আর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা হইল না।

তথাপি মা গণেশখুড়াকে আনিবার ইচ্ছা করিলেন না। তিনি আমার মাতামহকে পত্র লিখিলেন। মাতামহ উত্তর লিখিলেন, তিনি দেশে আসিয়া নিজেই রাঁধুনীর অভাবে বিপদে পড়িয়াছেন। দেশে আসিবার পর হইতেই আমার মাতামহীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। নিত্যই তাঁহার মাথা ঘুরে। পশ্চিমা অথবা উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবারও উপায় নাই। তাহা হইলে জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই তাঁহার গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। অথচ ঈর্ষান্বিত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ এক দিনও আসিয়া তাঁহার রুগ্ন পরিবারকে দুই মুঠা অন্ন রাঁধিয়া দিবে না। অনেক দিন মাতামহকে নিজে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইয়াছে। মাতামহী একটু সুস্থ হইলেই মুঙ্গেরেই ফিরিবার তিনি ব্যবস্থা করিবেন।

অগত্যা গণেশখুড়ার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর রহিল না। গণেশখুড়াকে পাঠাইবার জন্য পিতা পিতামহীকে পত্র লিখিলেন। হুগলীতে আসার পরেই পিতা তাঁহাকে পৌঁছান সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি নিজ হাতে লিখেন নাই। আমাকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। শেষে নিজের নামটা দস্তখত করিয়াছিলেন এইমাত্র। এবারে স্বহস্তে তিনি পত্র লিখিয়াছেন।

পিতা কি লিখিয়াছেন জানি না, তবে আমরা সকলেই সপ্তাহ যাবৎ পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আরদালী যে বামুনটাকে আনিয়া দিয়াছিল, সেটা সাহসী ও নিরভিমান হইলেও তাহার রান্না আমাদের কাহারও পছন্দ হইল না। বিশেষতঃ মায়ের। তিনি ত তাহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন মুখেই তুলিতে পারিলেন না। মাতা একদিন রন্ধন সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনিবার পর তাহার রন্ধন-মাধুর্য্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়া পড়িল। সেই 'অতি'র উল্লাসে আত্মহারা হইয়া মা বড় একটা রুই মাছের মুড়াযুক্ত ঝোলের বাটি পুরস্কার-স্বরূপ বামুনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বামুন পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া পলাইল।

ইহার পর নিরুপায়ে মাকে দুই দিন রাঁধিতে হইয়াছে। রাঁধিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়াছে! বাবার চিঠি লিখিবার সপ্তম দিবস সন্ধ্যার পর আমরা দোকান হইতে খাবার আনাইয়া ভক্ষণ করিতেছি, এমন সময় বাহিরে ফটকের কাছে কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমাদের পরিচারকবর্গের মধ্যে এক চাকর, এক ঝি এবং কোম্পানীদত্ত এক আরদালী। বাড়ীখানার উদ্‌বাস্তু বড় বলিয়া আরও দুই চারিজন লোক বেশী থাকা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু পিতার তখনও পর্য্যন্ত দুই শত টাকার অধিক বেতন ছিল না বলিয়া অধিক লোক রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি দুইটা বিলাতী কুকুর পুষিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেগুলা রাত্রিকালে প্রহরীর কার্য্য করিত।

সে দিন সে সময়ে ভৃত্য ও আরদালী কেহই বাড়ীতে ছিল না। তাহারা রাঁধুনীর অন্বেষণে সহরের মধ্যে গিয়াছিল।

কুকুর দুইটা আকারে ছোট ছিল। কিন্তু তাহাদের চীৎকার-শক্তি তাহাদের আকৃতির অসংখ্যগুণ অধিক ছিল। তাহাদের চীৎকারে অনেক দিন আমি মধ্যরাত্রিতে ঘুম হইতে শিহরিয়া উঠিয়াছি। আজ তাহারা ফটকের কাছে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অবকাশে উকীল-মোক্তার প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রায়ই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কুকুরগুলা ভদ্রলোক চিনিত। তাঁহারা ফটক পার হইয়া আসিলে চীৎকার করিত না।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষ। হয় দ্বিতীয়া—না হয় তৃতীয়া। কিছু ক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিবে বলিয়া আমরা ফটকে আলোক দিই নাই। কুকুরের অস্বাভাবিক চীৎকার শুনিয়া এবং নীচে কেহ নাই জানিয়া, আমরা মনে করিলাম, বুঝি বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে।

মা পিতাকে বলিলেন—"কুকুরগুলা এত চেঁচায় কেন দেখিয়া আইস।"

"বুঝি চোর বাড়ীতে ঢুকিয়াছে।"

"সে কিগো! তুমি হাকিম—তোমার বাড়ীতে চোর!"

"চোর ঢুকিবার কারণ হইয়াছে। আমি আজ কয়দিন ধরিয়া চোরগুলার কঠিন কঠিন শাস্তি দিতেছি। বিশেষতঃ আজ একটা দাগী ছিঁচকে চোরকে পাকা ছয়টি মাস জেল দিয়াছি। আমার শাস্তি দিবার ধুম দেখিয়া সাহেব এই ছয়মাসের মধ্যেই আমাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়াছেন। সেইজন্য চোর বেটাদের আমার উপর আক্রোশ হইয়াছে।"

মাতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো! তবে কি হবে?"

মাতার ভয় দেখিয়া আমিও ভয়কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।

পিতা বিশেষ রকমের একটা আশ্বাস দিতে পারিলেন না। বলিলেন—"তাই ত। চাকর-আরদালী কেহই যে বাড়ীতে নাই।"

এমন সময় ঝি ভিতরের বারাণ্ডা হইতে "বাবু! বাবু" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা মধ্যের হলঘরে বসিয়া ছিলাম। ব্যাপারটা কি জানিতে তখন পিতা অথবা মাতা কাহারও সাহস হইল না। তাঁহারা আমাকে ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একেবারে পার্শ্বের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝিও আমাদের অনুসরণ করিল।

পিতা তাহাকে ব্যস্তভাবে হলঘরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

সে বলিল—"বন্ধ করিতে হয় তোমরা কর। ঝি বলিয়া কি আমার প্রাণ প্রাণ নয়? কতকগুলা লোক হুড় হুড় করিয়া বাহির হইতে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র মাতা ভয়ে পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দারুণ ভীতিবশে পিতারও বসন অর্দ্ধস্রস্ত হইয়া গেল। এমন সময় বাহিরে শব্দ উঠিল, "চোর—চোর।" পিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল আরদালীকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ঘরে চোর-দস্যুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অস্ত্র একটি পিস্তল ছিল। কিন্তু ভীতিবিহ্বল পিতা তাহা আর হাতে করিবার সময় পাইলেন না। "চোর চোর" শব্দ শুনিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি ঝিটা যদি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

সত্যসত্যই যদি সে দিন প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন দস্যু আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহারা অক্লেশে গলাটিপিয়া আমাদিগকে মারিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশে সে দিন আমাদের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে নাই। ঝি দরজা বন্ধ করিতে না করিতে বাহির হইতে আরদালী ডাকিল—"হজুর!"

পিতা ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"চোরের কি হইল?"

আরদালী বলিল—"তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

তখন পিতা কাপড়খানা গুছাইয়া পরিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঝি দরজা খুলিল। মাতা চোর অথবা আরদালী কাহাকেও না দেখিয়াই, চোর ধরিবার বিলম্বের জন্য আরদালীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

পিতা ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমে চোরের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া আমার কিন্তু যথেষ্ট সাহস হইয়াছে। আমি একেবারে একলম্ফে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আরদালী, চাকর ও দুই তিনজন বাহিরের লোক চোরকে ধরিয়াছিল। পিতা চোরটা সুচারুরূপে ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা চোরকে ভিতর দিক হইতে আনিয়াছিল। ভিতরের বারান্দায় আলোর বেশী জোর ছিল না। এই জন্য ঘর হইতে চোরের মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। আমিও পিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি।

চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, ঝিও পার্শ্বের কামরা হইতে হলঘরে আসিয়াছে। মা কিন্তু এখনও বাহির হন নাই। দ্বারের পার্শ্বেই হলঘরের কোণে বাবার ছড়ি থাকিত। চোরকে প্রহার করিবার সঙ্কল্পে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই ছড়ি হাতে করিলেন।

চোরকে একটু মিষ্ট আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া যেমন তিনি ছড়িগাছটি উঠাইয়াছেন, অমনি চোর "অঘোর দা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সমস্ত রহস্য তখন প্রকাশিত হইল। চোর এই বারে উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, "দোহাই দাদা, আমাকে মেরো না। আমি গণেশের মা'র গণেশ।"

১৯

গণেশ খুড়া যে এরূপভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, ইহা আমাদের মধ্যে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যাই হ'ক, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলাম।

পিতা হাতের ছড়িটা পশ্চাৎ দিকে মেজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মাতাও মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য ও আরদালী তাহার উভয় হস্ত ধরিয়াছিল। চোর ধরিবার সহায়তা করিতে বাহিরের দুই জন লোক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়াই তাহারা লজ্জায় খুড়াকে পরিত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে পলাইল। যাইবার সময় চোর ধরার

পুরস্কার-স্বরূপ তাহারা ঝির কাছে গোটাকতক তীব্র তিরস্কার উপহার প্রাপ্ত হইল।

পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁহার এই লাঞ্ছনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মনে কিছু ক্ষোভ না রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন মাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি খুড়ার হাত ধরিয়া তাঁহাকে হলঘরে লইয়া আসিলাম।

ঘরের মেজেটা মাদুর দিয়া বাঁধান ছিল। মধ্যস্থলে কতকগুলা চেয়ার-বেষ্টিত একটি গোল টেবিল। আমি সেই টেবিলে পুস্তকাদি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম।

আমি খুড়াকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম। খুড়া বসিল না। বলিল—"আমার কাপড় চোপড় সব নষ্ট হইয়াছে। আমি স্নান না করিয়া আর বসিতেছি না।"

পিতা ও মাতা উভয়েই প্রকৃত শুচিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট উপদেশ দিলেন। কোনও ফল হইল না। কিসে যে সে অপবিত্র হইয়াছে, তাহা গণেশ-খুড়া বলিল না। ক্ষণ-পূর্ব্বের লাঞ্ছনার একটিও কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না।

পিতা বুঝিলেন, খুড়ার ভয় এখনও দূরীভূত হয় নাই। তিনি তাহাকে নানা অভয় বাক্য শুনাইলেন। মা শুনাইলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও শুনাইলাম। তবু খুড়া স্নানের জেদ ছাড়িল না। অধিকন্তু তাহাকে স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া, আমাকেও সে স্নান করিতে অনুরোধ করিল।

অগত্যা পিতাকে খুড়ার স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইল। যে আরদালী তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল, পিতা তাহাকেই খুড়ার সঙ্গে গঙ্গায় পাঠাইলেন। মা-গঙ্গার তীরে আসিয়া খুড়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চাহিল না।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া আমরা আহারে বসিয়াছিলাম। ভুক্তাবশিষ্টগুলা টেবিলের উপরেই পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বে দেশে মাকে কখন পিতার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে দেখি নাই। বরং তাঁহার আহারের সময় ঘটনাক্রমে পিতা যদি কোনও দিন উপস্থিত হইতেন, অমনি জননী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইতেন। এখানে তাঁহার আর কাহাকেও সরম দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না, লোক-লজ্জারও ভয় ছিল না। নির্জ্জন-বাসের ফলে এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনোপযোগী মনের বলে আমরা গ্রাম্য কুসংস্কারগুলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।

অন্যদিন আহারের সময়ে কুকুর দুইটা উপস্থিত থাকিত এবং আহার-শেষে যখন আমরা আসন পরিত্যাগ করিতাম, তখন সেই দুইটা পাত্রে মুখ দিয়া যাহা কিছু তাহাদের খাদ্যযোগ্য অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই তুলিয়া লইত। বাড়ীতে রক্ষক কেহ ছিল না বলিয়া সে দুটাকে আজ বাহিরে রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ আজ আহারের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য দিন ভিতরের দিকের বারাণ্ডায় আমাদের আসন হইত; আজ আমরা ঘরের ভিতরে টেবিলে আহার করিয়াছি। আমাদের আসনগুলা উন্নতির সমানুপাতে মাটী ছাড়িয়া চেয়ারে উঠিয়াছে। কুকুর দুইটা অগ্রে এ স্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। গণেশ-খুড়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা হল-ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্রেই তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি-বলে আহার্য্যের সন্ধান পাইল। অমনি দুইটাতেই লাফাইয়া টেবিলের উপর উঠিল।

পিতা এতক্ষণে গণেশ-খুড়ার গৃহত্যাগের কারণ বুঝিলেন। তিনি মাকে বলিলেন,—"এ টেবিলটা পরিষ্কার না করিয়া, গণেশকে এখানে আনা অন্যায় হইয়াছে।" মাও বোধ হয়, কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি পিতার কথায় কোন উত্তর না দিয়া টেবিল পরিষ্কার করিবার জন্য ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। তথাপি ঝি উত্তর দিল না।

দুই বারের আহ্বানে ঝির উত্তর মিলিল না দেখিয়া পিতা বলিলেন—"সে বোধ হয় নিকটে নাই। তাহার ফিরিবার অপেক্ষা না করিয়া, তুমি টেবিলটা পরিষ্কার করিয়া ফেল; ফিরিয়া গণেশ এগুলা দেখিতে না পায়।"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, মূর্খটা এগুলা দেখিয়াই আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়াছে?"

"তাহাতে আর সন্দেহ আছে? সে ফিরিলেই বুঝিতে পারিবে।"

মা আর একবার ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকেই টেবিল পরিষ্কার করিতে হইল।

পিতা এইবারে ভৃত্যটাকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ভৃত্য পাঁচু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল পিতা তাহাকে ভিজা গামছা দিয়া টেবিলটা মুছিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। আর বলিলেন—"টেবিল সাফ করিয়াই কুকুর দু'টাকে শিকলে বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া যা। দেখিস—কোন রকমে এ দুইটা যেন আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে।"

মাতা বলিলেন—"তুমি মিছামিছি এমন ভয় পাইতেছ কেন?"

পিতা এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করিতে পাঁচুকে আদেশ করিলেন। টেবিল পরিষ্কার করিয়া, কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া পাঁচু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মা পিতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নাই। গণেশ আসিলেই আমি তাহাকে জলের মত সমস্ত বুঝাইয়া দিব।"

"পারিলেই ভাল"—এই বলিয়াই পিতা বিশ্রামার্থ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমার পরিধানে একটা ঢিলা পায়জামা ছিল। মায়ের ছিল সেমিজ। অতি অল্পদিন মাত্র হিন্দুর গৃহে সেগুলার প্রচলন হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু-পরিবারই সেগুলার ব্যবহারে সাহসী হইয়াছে। তাহাদেরও মধ্যে অনেকেই নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা পরিধান করিত না। মাও প্রথম প্রথম সসঙ্কোচে সেমিজের ব্যবহার করিতেন। ইদানীং শিক্ষার জন্য এক জন মেম ও এক জন খৃষ্টান দেশীয় মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে মাতা সর্ব্বদা সেমিজ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে, মা আমাকে বলিলেন—"হরিহর! পায়জামাটা ছাড়িয়া কাপড় পরবি আয়।"

মাতার আদেশানুযায়ী আমি তাঁহার সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিলাম। মাতাও বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। তদন্তে উভয়েই গণেশ-খুড়ার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

আমি রহিলাম কেন? খুড়াকে দেখিয়াই আমার জন্মভূমির প্রীতি আকুল আবেগে জাগিয়া উঠিয়াছে। পিতামহীর সংবাদ লইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মা যে কেন রহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শয্যায় তাঁহাকে স্থিরভাবে শয়ান দেখিয়া অনুমান করিলাম, তিনি ঘুমাইয়াছেন।

২০

আমাদের বাসা হইতে রশী দুই অন্তরেই গঙ্গার ঘাট। স্নানের জন্য অধিক সময় নষ্ট না করিলে, সেখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসা যায়। নির্দ্দিষ্ট ঘাটে স্নান না করিয়া, যদি কেহ সোজাসুজি পথ ধরিয়া, আমাদের বাসা হইতে গঙ্গাতীরে যাইতে চায়, তাহা হইলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত চলে। আমাদের বাসা ও গঙ্গাতীরের মধ্যে সে সময় এক ওলন্দাজ ফিরিঙ্গীর বাগানবাড়ী ছিল। সদর রাস্তার উপরে সেই বাগানের ফটক। সেই ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটি সরল পথ। এই পথ-অবলম্বনে গঙ্গার তীরে আরও অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যাইত। তবে সে পথটায় যে সে চলিতে অধিকার পাইত না। হাকিমের পুত্র বলিয়া আমি অথবা আমাদের সম্পর্কীয় যে কোন লোকের সে পথে চলিবার নিষেধ ছিল না। যদি বাগানের ফটক বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে গণেশ খুড়াকে সেই পথ অবলম্বনে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পিতা আরদালীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। গণেশ খুড়াকেও শীঘ্র শীঘ্র স্নান সারিয়া ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। গণেশ-খুড়া ফিরিল না। আর আরদালীও ফিরিল না। ঝি যে কোথায় গেল, তাহারও সন্ধান নাই!

অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া মায়ের চোখে তন্দ্রা আসিল। মা নিজের অবস্থা আমাতে আরোপ করিয়া বলিলেন,—"আর কেন হরিহর? কতক্ষণ তার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবি—ঘুমা।"

এই বলিয়াই মাতা হাতের উপর মাথার ভর দিয়া, একটা বালিসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি শয়ন করিলাম কি না, তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর রহিল না। দেখিতে দেখিতে তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আমার কিন্তু ঘুম আসিল না। ঘুমাইবার দুই একবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল।

এক ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা—দেখিতে দেখিতে ঘড়ীতে দশটা বাজিল। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। অথচ সমস্ত দ্বারই খোলা রহিয়াছে।

চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া থাকায় ক্রমে কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

পিতার সারাদিবসের পরিশ্রম। তিনি শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়াছেন। এখন তাঁহার নাসিকাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

অবকাশ পাইয়া আমি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলাম এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হলঘরে উপস্থিত হইলাম।

তখনও ঘরে বাহিরে আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রিও অধিক হয় নাই। গ্রীষ্মকাল—জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রি। সবেমাত্র দশটা বাজিয়াছে।

হলঘরে প্রবিষ্ট হইয়া আমি বাহির বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, সমস্ত দ্বারই মুক্ত। অথচ বাড়ীটা যেন জনশূন্য।

টেবিল পরিষ্কার করিয়া, কুকুর দু'টাকে সঙ্গে লইয়া চাকর পাঁচুও যে সেই বাহিরের দিকে গিয়াছে, সেও আর ফিরিয়া আসে নাই।

ঘর ছাড়িয়া এবার আমি বাহিরের বারান্দায় আসিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি, বারান্দার এক কোণে মেঝের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়া, পাঁচু অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

সকলকেই ঘুমাইতে দেখিয়া, আমার মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হইল। নিঃশঙ্কচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম। এখন বাহির হইতে ভিতরে ফিরিতে গাটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। আমার পাঁচুকে জাগাইবার প্রয়োজন হইল। পাছে পিতা ও মাতার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কোন সাড়াশব্দ না করিয়া, শুধু করস্পর্শে তাহাকে উঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

নিকটে গিয়া তাহার গায়ে হাতটি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে এবং অস্ফুটকণ্ঠে কে আমাকে ডাকিল—"খোকাবাবু!"

পিছন ফিরিয়া দেখি—ঝি। সে আমাকে আর কোন কথা কহিবার অবকাশ দিল না। আমাকে ফিরিতে দেখিয়াই বলিল—"মা ও বাবা কি করিতেছেন?"

"ঘুমাইতেছেন।"

"বেশ হইয়াছে। বিধাতা কৃপা করিয়াছেন। ও বোকাটাকে জাগাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"এখানে বলিব না। এখনি জানিতে পারিবে। দেরী করিলে কাজের ক্ষতি হইবে।"

"যদি বাবা কিংবা মা ইহার মধ্যে জাগিয়া উঠেন?"

"উঠেন, আমি তার ব্যবস্থা করিব। তোমার কোন ভয় নাই।"

কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি ঝির অনুসরণ করিলাম।

বারান্দা হইতে নামিয়া উঠানে পা দিতেই ঝি আমার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল—"খোকাবাবু! এইবারে তোমাকে আমার কোলে উঠিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"কেন?"

"আমি তোমাকে একবার ফটকের বাহিরে লইয়া যাইব। দেশ থেকে তোমাদের এক আত্মীয় আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে একবার দেখিবেন।"

কে আত্মীয় না বুঝিলেও, আত্মীয়ের নাম শুনিবামাত্র আমি ঝির কোলে উঠিলাম।

ফটক পার হইয়া ঝি সদর রাস্তায় পড়িল। তারপর কিছু দূর পূর্ব্বমুখে চলিল। যেখানে সেই প্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর একটু সরু পথের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঝি সেইখানে উপস্থিত হইয়াই কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আনিয়াছি।"

এই বলিয়াই ঝি কোল হইতে আমাকে নামাইয়া সেই চৌমাথার পথে দাঁড় করাইল।

সেখানে একটি আলোক-স্তম্ভ ছিল। ভূমিতে পা দিয়াই দেখিলাম, আলোক-স্তম্ভে ভর দিয়া কে এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি ঝিয়ের কথা শুনিবামাত্র আমার দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে আসিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম। তিনি অন্য কেহ নহেন—সার্ব্বভৌম ম'শায়।

আমাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। পথের লণ্ঠন হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিতে আমি তাহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি যেন স্পন্দহীনের মত দাঁড়াইয়াছি! আমার মুখ হইতে একটিও বাক্য নির্গত হইতেছে না। নির্নিমেষনেত্রে আমি কেবল তাঁর মুখের পানে চাহিয়া আছি। সে অবস্থা আজিও পর্য্যন্ত আমার মনে সুস্পষ্ট জাগিয়া আছে। ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়া প্রথমে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। আমারই মত কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"মা! কি বলিয়া যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঝি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া আমাকে বলিল—"কার কাছে তোমায় আনিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ খোকা বাবু? নাও, ঠাকুরকে প্রণাম কর।"

ঝির আদেশমত আমি ব্রাহ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম। ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। বলিলেন "বাবা, একটু অপেক্ষা কর।"

তাঁহার হাতে একটা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু ছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই, তিনি কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল আমার মস্তকে নিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতের পথপার্শ্বস্থ একটা বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন "ব্রাহ্মণি, কন্যাকে লইয়া আইস।"

আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ—হাঁ করিয়া, বকুলবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে স্থানটায় বেশ অন্ধকার। বিশেষতঃ আমরা আলোকের কাছে অবস্থিত ছিলাম বলিয়া অন্ধকার গাঢ়তর বোধ হইতেছিল। প্রথমে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণও বোধ হয় দেখিতে পাইলেন না। তিনি একটু ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কি করিতেছ? বিলম্বে কি আমার সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিবে!"

অমনি দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, ক্রোড়স্থা একটি বালিকাকে লইয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে এক রমণী আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বালিকা পট্টবস্ত্র-পরিধায়িনী। তাঁহারও মুখে অবগুণ্ঠন।

তাহারা কে এবং কি জন্য এখানে এরূপভাবে উপস্থিত হইল, তখনকার বালকের বুদ্ধিমত্তায় আমি সে সময় কিছু বুঝিতে পারি নাই

আমি হতভম্বের ন্যায় তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম। ঝিও কিছু বুঝিতে পারে নাই। সেও আমারই মত হতভম্ব। আমি কি জানি কেন, তাহার পানে ফিরিয়া দেখি, সেও আমারই মত হাঁ করিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে।

তাঁহাদের পানে ফিরিয়া দেখি, রমণী বালিকাকে কোল হইতে নামাইয়াছেন। এ দিকে ব্রাহ্মণ গলার পুঁটলী হইতে কি একটা দ্রব্য বাহির করিতেছেন।

দ্রব্যটি বাহির হইবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম, সেটি একটি শালগ্রাম শিলা। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া অতি শৈশবেই শালগ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারের পর আমি দুই এক দিন তাঁহার পূজা করিয়াছি। মোটামুটি পূজার পদ্ধতিও শিখিয়াছি। সুতরাং সেই গোল প্রস্তর খণ্ডটি দেখিবামাত্র তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না।

এক হস্তে শালগ্রাম, অন্যহস্তে কমণ্ডলু লইয়া ব্রাহ্মণ যেন বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। বলিলেন—"তাইত! এ সময় গণেশ নিকটে থাকিলে বড়ই ভাল হইত।"

এই কথায় অবগুণ্ঠনবতী রমণী বলিলেন—"তাহার আসিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে একটা লোক রহিয়াছে।"

"বেশ—মা দাক্ষায়ণি! তুমিই কমণ্ডলুটা হাতে কর।" —এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ পট্টবস্ত্রাবৃতা বালিকার হস্তে কমণ্ডলু প্রদান করিলেন।

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কেবল তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তরীয়াঞ্চল হইতে কতকগুলা পুষ্প বাহির করিলেন। বাহির করিয়াই কমণ্ডলু হইতে আবার কিছু জল লইয়া বালিকার মস্তকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বাম হস্তে আমার জানু স্পর্শ করিয়াই আমার মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন।

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এই সকল ও আনুসঙ্গিক আরও অনেকগুলা কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণ হস্তে শালগ্রাম রক্ষা করিলেন। এতক্ষণের কার্য্য সকল নীরবেই নিষ্পন্ন হইতেছিল। সকলের নিশ্বাসগুলাও বুঝি নীরবতা-ভঙ্গের ভয়ে যে যার অধিকারীর হৃদয়মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। এইবারে ব্রাহ্মণ কথা কহিলেন। বলিলেন, "হরিহর! একবার প্রণব উচ্চারণ কর।"

প্রণব কিরূপভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাহার উপদেশানুযায়ী আমি প্রণব উচ্চারণ করিলাম। হৃদয়ের আবেগেই হউক, অথবা অন্য যে প্রকারেই হউক, তাহা এমন ভাবে আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল যে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে স্পন্দন আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

উচ্চারিত বাণী শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণি! নিরাশ হইও না। কন্যাকে ভাগ্যহীনা ও তাহাকে গর্ভে ধরিয়া নিজেকেও ভাগ্যহীনা মনে করিও না। আমি যে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া, এই বালককে কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে অপাত্রে কন্যাদানে প্ররোচিত করেন নাই।"

এই সময়ে রমণীর কণ্ঠ হইতে অতি মৃদু রোদন-শব্দ আমি যেন শুনিতে পাইলাম। ব্রাহ্মণ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাকে বলিলেন—"নাও বাপ, এইবারে একবার সপ্রণব নারায়ণ-মন্ত্র উচ্চারণ কর।" আমি সে মন্ত্র জানিতাম। তিনি আদেশ করিতে না করিতে আমি বলিয়া উঠিলাম—ওঁ নমো নারায়ণায়।

ব্রাহ্মণ আমার উচ্চারণ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি উল্লাস আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিলাখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তিনি আমার কুক্ষিদেশ বাহুনিবদ্ধ করিলেন এবং তিনি কি করিতেছেন—আমি বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—"ব্রাহ্মণি! কন্যাকে কোলে কর।"

আমাকে বলিলেন—"হরিহর! এইবারে তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর। তুমি জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ঋষি গৌতমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম—"বলুন।"

"তুমি মনে কর, তোমার হৃদয় মধ্যে নারায়ণ বাস করিতেছেন।"

আমি প্রথমে এ কথার কোনও উত্তর দিলাম না। চোখ বুজিয়া হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত নারায়ণকে খুঁজিতে লাগিলাম

আজ বহুকালের কথা। তারপর কত বৎসর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কতবার কতপ্রকারে হৃদয় মধ্যে নারায়ণের অনুসন্ধান করিয়াছি; আজও পর্য্যন্ত করিতেছি। কিন্তু সে রাত্রি সাধু ব্রাহ্মণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নারায়ণ খুঁজিতে আমার যে অবর্ণনীয় আনন্দের অবস্থা হইয়াছিল, সত্য বলিতে কি, সে অবস্থার কণাও যদি এখন আমার লাভ হইত, তাহা হইলেও আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিতাম।

সে অবস্থার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র আমার মনে জাগিয়া আছে। কেহ বুঝিতে চাহিলে, তাহাও বুঝাইতে আমার সাধ্য নাই।

সে অবস্থার একমাত্র অবশিষ্ট সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি, আমাকে নারায়ণ খুঁজিতে আদেশ করিয়া আবার ব্রাহ্মণ যখন সম্বোধন করেন, তখন তিনি উত্তর পান নাই। আমাকে কোলে রাখিয়া, বহুক্ষণ স্থিরভাবে তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কথায় ষোলআনা-বিশ্বাসে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, ভাগ্যবান বালক বুঝি সেদিন নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিল। সংসার-ভোগপুষ্ট দুর্ব্বল বৃদ্ধের সে অবস্থা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, সংজ্ঞার পুনরাবর্ত্তনে আমি তিনবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"হরিহর! তুমি ধন্য। তোমাকে কোলে করিয়া আমি ধন্য। তোমাকে যে আজ আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, সেই বালিকাও ধন্য। তারপর শুন। যিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, মনে কর, সেই নারায়ণই পূর্ণ চৈতন্যে এই শিলা-মূর্ত্তির ভিতরে অবস্থিত রহিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি শালগ্রামটি আমার দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিলেন।

আমি সেই ছিদ্রবিশিষ্ট শিলাখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সে শিলাখণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার বোধ হইল, যেন এক অপূর্ব্ব সরোবর মধ্যে অপূর্ব্ব কমলাসনসন্নিবিষ্ট, কেয়ূরবান্, কনককুণ্ডলবান্ এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বালক—যেন কতকালের পরিচিত সঙ্গী—ঈষৎ হাস্যমুখে আমাকে বলিতেছে, "কি ভাই হরিহর! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

আমি উত্তর করিলাম—"তুমি নারায়ণ!"

ইহার কতক্ষণ পরে জানি না, সেই রাত্রির অন্ধকারে শালগ্রাম-নিবদ্ধ আমার হস্তে সেই পট্টবস্ত্র-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী বালিকার কোমল হস্ত রক্ষিত হইল।

রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-গদগদ-কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"দাক্ষায়ণি! মা আমার! এই তোমার স্বামী। স্বামী নারায়ণ। এই হরিহর নামধারী নারায়ণের করে আমি আজ তোমাকে নিবেদন করিলাম।"

এই বলিয়াই তিনি বালিকার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল।

উল্লাসে আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উল্লাসে স্খলন-ভয়ে বালিকা স্পন্দিত হস্তে সবলে আমার নারায়ণযুক্ত হস্ত চাপিয়া ধরিল। অবগুণ্ঠনবতী রমণীর অতি মৃদু উলুধ্বনিতে হুগলী সহরের একটি নির্জ্জন পথে আমাদের বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর দাক্ষায়ণী এই তিন জন সাক্ষী। বাহিরের সাক্ষী এক শূদ্রাণী। সে চিত্রপুত্তলিকার মত আমাদের বিবাহ-ব্যাপার দেখিতেছিল। আর কেহ জানিল না। এ অপূর্ব্ব সংযোগ-কথা আজিও পর্য্যন্ত আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সংগোপনে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দানান্তে ব্রাহ্মণ আমাকে কোল হইতে নামাইলেন। তারপর হস্ত হইতে শিলাটি গ্রহণ করিলেন। লইয়া বালিকার অঞ্চলে বাঁধিলেন। স্ত্রীলোকের শালগ্রাম-স্পর্শ নিষিদ্ধ, সেই বালককাল হইতেই আমি জানিতাম। কিন্তু সার্ব্বভৌম কি তাহা জানিতেন না?

শিলা-বন্ধন শেষ হইলে ব্রাহ্মণের আদেশে বালিকার হাত ধরিয়া আমি সপ্তপদ গমন করিলাম। এইখানে ব্রাহ্মণী আমাদের উভয়কে ধান্য ও দূর্ব্বা-দানে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই সময়ে দূরে জনসমাগম অনুমিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন নিজেও কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রতার সহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ঝিকে বলিলেন—"মা! ইহজন্মে তোমার উপকার বিস্মৃত হইব না।"

এই কথা শুনিয়াই ঝি দণ্ডবৎ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পতিত হইল। বলিল—"দেবতা! অমন কথা মুখেও আনিবেন না।"

"যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, স্মরণ রাখিব। তুমি মা, আমার জাতিকুল রক্ষা করিয়াছ।"

"আমি শূদ্রের মেয়ে! তবে জন্মজন্মান্তরে বুঝি কিছু পুণ্য করিয়াছিলাম। নইলে আমি এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে পাইলাম কেন?"

ব্রাহ্মণ তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে কাঁদিয়া ফেলিল—পুরস্কার গ্রহণ করিল না। বলিল—"ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে।"

ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর বলিলেন—"আর নয় মা, বালককে গৃহে লইয়া যাও।

নিষ্ঠুরা মাতা জানিতে পারিলে, বালকের ও তোমার লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা।"

"কিছু ভয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে সব গুছাইয়া লইব।"

এই বলিয়া ঝি আমাকে কোলে উঠাইয়া লইল।

কর্ম্মবশে এ অপূর্ব্ব সুখসঙ্গ আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ কন্যা ও পত্নীকে লইয়া পথের একদিকে চলিয়া গেলেন। ঝি আমাকে কোলে করিয়া বিপরীত দিকে লইয়া চলিল।

গৃহে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীখানায় যেন এক বিরাট সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়াছে। নিদ্রিত কুকুর দুইটার পার্শ্ব দিয়া, সুষুপ্ত ভৃত্য পাঁচুর মস্তকে পাদস্পর্শ করাইয়া, সুনিদ্রিত পিতার নাসিকাধ্বনি শুনাইয়া, মোহাচ্ছন্ন জননীর পার্শ্বে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হইয়া, ঝি সন্তর্পণে আমাকে শয্যায় শয়ন করাইল।

অতি প্রত্যূষে একটা বিচিত্র স্বপ্ন-দর্শন-শেষে সহসা কার যেন আহ্বানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। "হরিহর! বাবাজী! খোকা বাবু!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, সম্বোধন-কর্ত্তা অপর কেহ নহে—গণেশের মা'র গণেশ।

২৯

প্রাতঃকালে খুড়া-রহস্য প্রকাশিত হইল। খুড়ার আহ্বানে আমিই সর্ব্বপ্রথম ঘর হইতে বাহিরে আসি। আসিয়া দেখি, খুড়া অর্দ্ধসিক্ত বস্ত্রে বাহির-বারাণ্ডার মেজের উপর বসিয়া আছে। জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া, পা দুইটি ভূমি হইতে ঈষৎ উপরে তুলিয়া, চেয়ারে ঠেস দিবার মত বসিয়া আছে। তার দেহ অনাবৃত—একখানি গামোছা পর্য্যন্ত কাঁধে ছিল না। বসিয়া বসিয়া আমাদের বাসার অনতিদূরস্থ একটা বকুল বৃক্ষের পানে চাহিয়া আপনার মনে শিষ দিতেছিল। আর আরদালী কার্ত্তিক, বারান্দার সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানে পা দিয়া, খুড়াকে যেন পাহারা দিতেছিল।

আমি বারান্দায় পা দিবামাত্র কার্ত্তিক ঈষৎ অবনত হইয়া আমাকে সেলাম করিল। খুড়া তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে জানু হইতে হাত ছাড়িয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইল এবং কার্ত্তিকেরই মত সম্ভ্রম দেখাইয়া আমাকে সেলাম করিল। তাহার সেলাম দেখিয়া আমি অপ্রতিভের মত দাঁড়াইলাম। বহুকালের পর গুরুজন-দর্শন, সমাজের রীতি-অনুসারে তাহাকে প্রণাম করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিলাম না। দুই কারণে পারিলাম না। খুড়া কি করিতে আসিয়াছে, আমার জানা ছিল। আরদালীর সুমুখে রাঁধুনী বামুনের কাছে মাথা হেঁট করিতে মনটা কেমন 'কিন্তু' করিতে লাগিল। দ্বিতীয় কারণ—খুড়াকে প্রণাম করিলে, মাতার কাছে তিরস্কৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমি প্রণাম করিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম। খুড়া শুনিতে পাইল না, কি শুনিয়াও শুনিল না, বুঝিতে পারিলাম না। সে আবার মুখ ফিরাইয়া বকুল-বৃক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমিও তার দেখাদেখি বকুলের পানে চাহিলাম। চাহিবামাত্র একটা স্পন্দন, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারাভেদ করিয়া, হৃদয়দেশে একটা প্রবল ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। কাল আমি এই বকুলেরই তলসমীপে আমার ক'নের হাত ধরিয়া এক বিচিত্র লীলা করিয়া আসিয়াছি! মনে হইতেই আমি বকুলের পানে আর একবার সাগ্রহ-দৃষ্টিতে চাহিলাম। বকুলের শুধু মাথা সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দেখিয়া আমার বোধ হইল, বকুল যেন মস্তক অবনত করিয়া স্নিগ্ধঘন-মধুর নীরবতায় তলদেশের আমাদের পূর্ব্বরাত্রির লীলার ধ্যান করিতেছে।

বোধ মাত্রেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মাথাঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপাধি-বোধেরও বিপর্য্যয় ঘটিল। আমি যে ডেপুটীর পুত্র, তাহা ভুলিয়া গেলাম। সম্মুখের বকুল আসঙ্গলিপ্সায় আমাদের গ্রামস্থ তাহার অগণ্য বকুল সহচরকে আনিয়া, বারাণ্ডার সম্মুখস্থ আকাশ পাতায় পাতায় ঢাকিয়া দিল। আমার মনে হইল, সেই অপূর্ব্ব শান্তিময় ছায়াতলে আনন্দময় খুড়া, ঘটক চূড়ামণির মূর্ত্তিতে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমাকে কোথাও যেন দেখিতে না পাইয়া আকাশপানে চাহিয়া আছে।

আমি ধীরে ধীরে খুড়ার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। চরণে করস্পর্শে খুড়ার যেন চৈতন্য হইল। চোক নামাইয়া খুড়া আমার মুখের পানে চাহিল। চাহিয়াই ঈষৎ হাসির সহিত আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"হরিহর! কি আর বলিব! জগদম্বার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও।" কথা বলিতে বলিতে গণেশ-খুড়ার চোখে জল আসিল।

আমি বলিলাম—"কাকা! রাত্রিতে তোমার বড়ই লাঞ্ছনা হইয়াছে।"

"কিছু হইয়াছে।—মিছা কথা কহিব কেন, হরিহর!

তবে তোমার মুখ দেখিয়া সে সমস্ত ভুলিলাম। আমি তোমার গণ্ডমূর্খ কাকা! অধিক কথা তোমাকে আর বলিতে পারিলাম না।"

"ইহার জন্ম বাবা, মা—উভয়েই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন।"

এ কথায় খুড়া আর কোনও উত্তর করিল না। আমার মনে হইল, তাহার বিশ্বাস হইল না। আমিও এক প্রকার মিথ্যা কথা কহিয়াছি। পিতামাতার মর্ম্মকথা কিছুই না জানিয়া, শুদ্ধমাত্র অনুমান অবলম্বনে, এইরূপ বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই খুড়ার ওইরূপ অবস্থায় দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, সে অপ্রিয় আলোচনায় নিরস্ত হইয়া, আমি খুড়াকে ঘরে আসিবার জন্ম অনুরোধ করিলাম।

খুড়া ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিল না। বলিল—"না। আমি এখানে বেশ বসিয়াছি। তুমি এক কাজ কর। তোমার বাপের নামে একখানা পত্র আনিয়াছি। তাঁহাকে দিয়া আইস।"

এই বলিয়া সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া খুড়া আমাকে দিল। অগত্যা আমি পিতাকে দিবার জন্ম পত্রখানা হাতে লইলাম।

খুড়ার নিকট হইতে অধিক দূর যাইতে হইল না। দুই চারিপদ চলিয়া আসিতেই পিতার কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতি-গোচর হইল। বুঝিলাম, তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। মায়েরও কথা শুনিলাম। বোধ হইল, পিতামাতায় একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র এই বুঝি-লাম, কথাটা খুড়ার সম্বন্ধেই হইতেছে। পিতা খুড়াকে হুগলীতে আনিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; শুধু মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে আনাইতে চিঠি লিখিয়াছিলেন।

মায়ের শেষ কথাটামাত্র আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছিলেন—"যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমার যাইতে দায় পড়িয়াছে। তোমার দেশের লোক। খোসা-মোদ করিতে হয়, তুমিই কর। আমি করিতে যাইব কেন? আমি তোমাদেরই জন্ম চিঠি লিখতে বলিয়াছি।"

ইহার পরেই পিতা তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে হলঘরে আসিলেন। মাতা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। প্রতিদিন বেলা পর্য্যন্ত ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল। আমার অনুমান হইল, পিতাকে বিদায় করিয়া তিনি আবার শয়ন করিয়াছেন।

পিতা বারান্দার দিকেই আসিতেছিলেন দেখিয়া আমি আর অগ্রসর হইলাম না। চিঠিখানা হাতে করিয়া কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যেখানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে পিতার আগমন দেখা যায় না।

আমাকে নিকটে পাইয়া কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ খোকাবাবু, ও ঠাকুরটি আপনাদের কে?"

আমি কোনও উত্তর দিতে না দিতে পিতা বারান্দায় পদক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিক অমনি মস্তক ভূমিলগ্নপ্রায় করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

গণেশ খুড়াও পিতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং কার্ত্তিকের দেখাদেখি তাহারই অনুকরণে পিতাকে সেলাম করিল।

পিতার মুখে তখনও নিদ্রাভারচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খুড়ার আচরণে তাহা আরও যেন ভারী হইয়া উঠিল। তিনি খুড়াকে প্রথমে কিছু না বলিয়া, আরদালীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি রে! তোর এমন অবস্থা কে করিল?"

কার্ত্তিক করযোড়ে উত্তর করিল—"হুজুর! গোলামকে এখন সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলে উত্তর দিতে পারিব না; বাপ-মায়ের বড় পুণ্য ছিল, তাই হুজুরের হুকুম তামিল করতে পেরেছি।"

পিতা। বলিস কি!

কার্ত্তিক। ইহার পরে বলিব। আপাততঃ ঠাকুরকে একখানা বস্ত্র দিন। ঠাকুরের কাপড়-চোপড় সব জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

পিতা আমাকে একখানা বস্ত্র আনিতে আদেশ করি-লেন। আদেশ শুনিবামাত্র গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"না হুজুর, প্রয়োজন নাই। খোকাবাবুর হাতে আপনার নামের এক পত্র দিয়াছি। সেইখানা লইয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। একটা উত্তর পাইলে আরও কৃতার্থ হই।"

গণেশ-খুড়ার এ কথাতেও পিতা কোন উত্তর করিলেন না, অথবা তাহার পানে চাহিলেন না। তিনি কার্ত্তিককে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল যে রাঁধুনীর সন্ধানে তোরা দু'জন চলিয়া গেলি, তার কি করিয়া আসিলি?"

কার্ত্তিক বলিল—"খুব ভাল একজন রাঁধুনী পাইয়াছি। খাজাঞ্চীবাবু তাহাকে যোগাড় করিয়াছেন। সে আগে একজন হাকিমেরই ঘরে চাকরী করিত। সব রকমের রসুই তাহার জানা আছে। মাহিনা কিছু বেশী চায়।"

"তাহাতে কোন আটক হইবে না। তুই কাপড় ছাড়িয়া এখনি তাহাকে লইয়া আয়।"

কার্ত্তিক সিঁড়িতে দ্রুত নামিতে লাগিল। উঠানে পা দিতে না দিতে, পিতা আবার তাহাকে ডাকিলেন। কার্ত্তিক আবার ফিরিল। পিতা তাহাকে গোপনে কি বলিতে অভিলাষ করিলেন। আমি থাকিলে তাঁহার বলার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, বোধ হয়, পিতা আমাকে খুড়ার জন্য আবার কাপড় আনিতে আদেশ করিলেন।

কাপড় আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, মা আবার ঘুমাইয়াছেন।

যেখানে কাঠের আনালায় পিতার কাপড় থাকিত, আমি নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেইখানে গেলাম এবং পিতার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে একখানি উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে কাঁচি ধুতি গ্রহণ করিলাম। ধুতি চুনট করা কোঁচান। কার্ত্তিক কাপড় কোঁচাইতে পারদর্শী ছিল বলিয়া, পিতা তাহাকেই সমস্ত কাপড় কোঁচাইতে দিতেন।

কাপড় লইয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময়ে মায়ের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হরিহর ?"

"কাপড়!" "কার জন্য।" আমি আসল কথাটা গোপন করিয়া বলিলাম—"বাবা চাহিয়াছেন।" "তা, তুমি লইয়া যাইতেছ কেন?" "আমাকেই লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" "কি কাপড় দেখি।"

আমি দেখাইলাম। মা কাপড়খানা দেখিয়াই বলিলেন—"বাবু কি বাহিরে যাইবেন ?"

"না।" "তবে ?" "একখানা কাপড় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি এইখানাই লইয়াছি।" "সে পাগলটা কোথায় আছে ?"

আমি যেন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ পাগল !"

"গণেশের মা'র গণেশ। বেটাকে রসুইয়ের জন্য আনাইয়াছি।"

মা আমার দুষ্টামী বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি কিন্তু আমাকে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিলেন না। শুধু গণেশ বলিলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, কোন্ গণেশ। ইতিপূর্ব্বে গণেশ নামে আর এক 'বামুন' আমাদের বাড়ী মাসখানেক চাকরী করিয়াছিল। তাহারও একটু পাগলামীর ছিট ছিল। আমাদের গ্রামেও গণেশ নামে চারিজন পাঁচজন লোক ছিল, তাহাদের এক একটি নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট গুণানুসারে এক একটা বিশেষ বিশেষ বিশেষণ ছিল। যথা—পোড়া গণেশ, বাঘা গণেশ, গোবর গণেশ ইত্যাদি। কি জন্য যে তাহারা এইরূপ বিশেষণ লাভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও বড় একটা জানা ছিল না। পোড়া গণেশ পোড়া ছিল না, বরং সুপুরুষই ছিল। তবে বিশেষণটি যোগ দিলেই কে যে কোথাকার, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিত না। সেইরূপ গণেশের মা'র গণেশ এই কথা বলিলেই আমাদের গ্রামমধ্যে খুড়ার সম্যক্ পরিচয় হইত।

"গণেশের মা'র গণেশ" এই কথা শুনিবামাত্র আমাকে বলিতে হইল,—"বারান্দায় আছে।" "বাবু?" "তিনিও সেইখানে আছেন।" "আর কে আছে?" "আর ছিল আরদালী।" "এখন নাই?" "বাবা তাকে কাপড় ছাড়িবার জন্য চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন।" "কাপড় আমার হাতে দিয়া তাঁকে ডাকিয়া আন।"

কি করি, মায়ের হাতে কাপড়খানা রাখিয়া, পিতাকে ডাকিতে চলিলাম।

আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, পিতা ঘরে ফিরিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই কাপড়ের কথা তুলিলেন। আমি যাহা বলিবার বলিতে না বলিতে মা ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"কি বলিতেছ ?"

"গণেশের জন্য একখানা কাপড় চাহিতেছি।"

"কেন, গণেশ কি উলঙ্গ আসিয়াছে ?"

"তাহার কাপড়ের পুঁটুলি গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। সে নিজেও ভাসিয়া যাইত; কার্ত্তিক গঙ্গায় নামিয়া অতি কষ্টে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে।"

"মরিলেই ভাল হইত। হতভাগাটা কিছুতেই ত আমাদের কথা শুনিল না। যাক্, তুমি কি সেই জন্য ছেলেকে কাপড় আনিতে হুকুম করিয়াছ ?"

পিতা যেন অপ্রতিভ হইলেন। এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতা বলিতে লাগিলেন—"এই বুদ্ধিতে তুমি হাকিমী কর? রাঁধুনী বামুনের পরিচর্য্যা করিতে ছেলেকে হুকুম কর! কেহ ছিল না বলিতেছ। কার্ত্তিক ছিল না?"

"কার্ত্তিক থাকিলে কি হইবে। তাহাকে ত আর গণেশের কাপড় ছুঁইতে দিতে পারি না!"

"কেন গো! সে বাগ্‌দী বলিয়া? এ দেশের বাগ্‌দীর আচার-ব্যবহার তোমাদের দেশের বামুনগুলার চেয়েও শতগুণে ভাল। আমি কার্ত্তিকের জল নিঃসঙ্কোচে খাইতে পারি। কিন্তু তোমাদের দেশের বামুনের হাতে জল খাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

পিতা মায়ের এই কথায় ভ্রূ আকৃষ্ট করিয়া, অর্দ্ধবদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কর কি! আস্তে কথা কও। সে এই বারান্দায় বসিয়া আছে।"

ঠিক এমনি সময়ে খুড়া গাহিয়া উঠিল—

"দোষ কারো নয় গো মা!
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

মাতা চমৎকৃতের মত দাঁড়াইলেন পিতাও যেন একটু বিচলিত হইলেন। গান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল না। গোটাকতক হাঁচি আসিয়া এই এক কলিতেই খুড়ার গান বন্ধ করিয়া দিল।

পিতা বলিলেন—"গণেশ শুনিতে পাইল না কি!"

"পেলেই বা। আমি ত আর কাহাকেও ভয় করিয়া বলিতেছি না। যা সত্য—তাই বলিতেছি।"

এই বলিয়া মা কাপড়খানা হাতে তুলিয়া পিতাকে দেখাইলেন। বলিলেন,—"এই কাপড় কি গণেশকে পরিতে দিতে হইবে? এই সাত টাকার ধুতি পরিয়া সে রাঁধিবে?"

পিতা কাপড় দেখিয়াই শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"ওকে কাপড় আনিতেই বলিয়াছি। বোকাটা যে ঐ কাপড় আনিবে, তা কেমন করিয়া বুঝিব!"

"বোকা ও হইতে যাইবে কেন—বোকা তুমি। বালক—ও কি জানে?"

"বেশ, তুমি যা জান তাই কর। গণেশকে একখানা কাপড় দাও। দেখ, একদিনের জন্য সে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা গোল বাধাইও না।"

"একদিনের জন্য কেন? সে কি চাকরী করিবে না?"

"একদিনই কেন, এক দণ্ড বলিলেও চলে। ও-পারে নৈহাটীতে তার কুটুম্ব আছে। সে সেইখানেই যাইবে।"

মায়ের দম্ভে যেন আঘাত লাগিল। গণেশ-খুড়া চাকরী করিবে না, ও আমাদিগকে 'বাবু' 'হুজুর' বলিতে পারিবে না বলিয়া, ডোঙ্গা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল; সেই গণেশ ফিরিয়া চাকরী করিতে আসিয়াছে। চাকরী করিলেই বোধ হয়, মায়ের অভিমান বজায় থাকিত। তাহা হইবে না, খুড়া থাকিবে না শুনিয়া মা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। অন্ততঃ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এইটাই আমার বোধ হইল।

মা বলিলেন,—"সে কি তোমাকে বলিয়াছে, চাকরী করিবে না?"

"স্পষ্টতঃ বলে নাই। কথার ভাবে বুঝিয়াছি। আর সে চাকরী করিতে চাহিলেও আমি করিতে দিব না।"

"কেন? স্বদেশবাসীর উপর সহসা এত রাগ হইল কেন?"

"আমি ভাল রাঁধুনী-বামুন পাইয়াছি।"

"দিনকতক তাহাকে দিয়া রাঁধাইলেই আমার মনের আক্ষেপ মিটিত।"

"আক্ষেপ মিটাইতে পারিতে, যদি দেশে আর আমাদের না ফিরিতে হইত। সে থাকিলে তোমার আরদালী যখন তখন যে, সে ঘরে ঢুকিতে পারিবে না, রান্নাঘরের ত্রিসীমা মাড়াইতে পাইবে না। বাজার হইতে খাবার আসিবে না। মেম সাহেবকে কিছু দিনের জন্য সেলাম ঠুকিতে হইবে।"

"তবে সে আসিয়াছে কেন?"

"কেন আসিয়াছে বুঝিতেছি!"

এই বলিয়া পিতা ভিতর-বারান্দার দিকে চলিয়া গেলেন।

২২

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ঝি-চাকর—উভয়েই ঘুমাইতেছিল। আমরা রোজ-রোজ বেলায় ঘুম হইতে উঠি বলিয়া, চাকরটাও বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইত। কিন্তু ঝি প্রতিদিন প্রত্যূষেই উঠিত। মায়ের শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বে সে ঘরের অনেক কাজ সারিয়া রাখিত।

আজ প্রথম, মায়ের ডাকে ঝির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে একটু সশঙ্কভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।

সে কাছে আসিতেই মা তাহাকে একটু মৃদু তিরস্কারের ভাবে বলিলেন—"এমনি করিয়া ঘুমাইয়া কি তুই মনিবের চাকরী করিবি?"

"আজ একটু উঠিতে বেলা হইয়াছে। আর আপনি যে আজ এমন সময় উঠিবেন, তা জানিতাম না।" "তাহা হইলে জেগে ঘুমাইতেছিলি বল্?" "না মা, ঘুমাইতেছিলাম।" "মিথ্যা কথা বলিতেছিস্ কেন?" "মিথ্যা কেমন করিয়া জানিলে?"

"তোর চোখ দেখিয়া বুঝিতেছি। তোদের কাজ দেখিবার জন্যই আমি আজ সকাল সকাল উঠিয়াছি।"

দেশে আমি সময়ে অসময়ে মায়ের কথায় কথা কহিতাম। মায়ের যে কাজটা আমার অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, আমি প্রতিবাদ করিতাম। সেখানে পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয় ছিল। এখানে একমাত্র মায়ের আশ্রয়। মা'র কথা অনর্থক অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না।

ঝি কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। কি জানি, কি বুঝিয়া, সে বলিতে নিরস্ত হইল। তখনও ঝি-চাকরের আজিকালিকার মত গুমর বাড়ে নাই। এক রাঁধুনী-বামুন ছাড়া আর সকলই সুপ্রাপ্য ছিল। তাহাদের বেতনও এখনকার মত অধিক ছিল না। আমার বোধ হয়, নিজের

দরিদ্র অবস্থা স্মরণ করিয়া, সে মায়ের এই অযথা কঠোর বাক্যপ্রয়োগে ক্রোধ দেখাইতে সাহস করিল না। কেন না, আমি বুঝিয়াছি, সে মিথ্যা কহে নাই। সে মস্তক অবনত করিয়া নীরবে মা'র সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঝি আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া মা বলিলেন, —"যা,—এবার মাপ করিলাম। মিছা কথায় মনিবের কথার উত্তর দিবার বেয়াদবী দ্বিতীয় বার যেন দেখিতে না পাই।"

ঝি প্রস্থানোদ্যতা হইল। মা বলিলেন—"দাঁড়া। আমার কাজ আছে। তোর একখানা থান কাপড় লইয়া আয়।"

"পরিয়া আসিব?" "না; হাতে করিয়া আন্।"

"আপনার সঙ্গে কোথাও কি যাইতে হইবে?"

"না। আগে লইয়া আয়। কি জন্য, তার পরে বলিতেছি।"

ঝি কাপড় আনিতে গেল। ইত্যবসরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গণেশের সঙ্গে তোর কি কোনও কথা হইয়াছিল?"

"কথা হইতে না হইতে বাবা আসিয়া পড়িলেন। তাঁর আদেশে আমি খুড়ার জন্য——।" "খুড়া" বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতে মা হস্ত দ্বারা আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কাপড় আনিবার কথা আর মুখ হইতে বাহির হইল না। "খুড়া" কে মূর্খ!—হুসিয়ার! আমি যা শুনিলাম, চাকর-দাসীদের মধ্যে আর কেহ যেন এ কথা শুনিতে না পায়। শুনিলে আমাদের মাথা হেঁট হইবে। হুগলীতে আর আমরা থাকিতে পারিব না।"

এই সকল বিপদ-বিভীষিকার কথা শুনিয়া, আমি মনে করিলাম, না জানি কি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি। আমাদের হুগলী-বাস উৎখাত করিতে কোথা হইতে খুড়ারূপে এক প্রকাণ্ড কোদাল আসিয়াছে! আমি একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়া চুপ করিলাম। ঝি অচিরে কাপড় লইয়া আসিল।

বস্ত্র ঝির পরিধেয়; অর্দ্ধ মলিন। ঝি বিধবা বলিয়া তাহাতে পাড় ছিল না। মা সেই বস্ত্র খুড়াকে দিবার জন্য ঝিকে আদেশ করিলেন। ঝি মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, সে আদেশের অর্থ বুঝিতে পারিল না। মা বলিলেন—"হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলি কেন? বামুনকে দিয়ে আয়।"

ঝি বলিল—"কেন?" "কাপড় আবার কি জন্য দিয়া আসে?"

"তা তো জানি;—কিন্তু পরিবে কে?"

"ওই বামুনই পরিবে—আবার কে! বোকা বামুন গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়া পুঁটুলি হারাইয়া আসিয়াছে। ভিজে কাপড়ে বসিয়া আছে বলিয়া, বাবু তাহাকে একখানা কাপড় দিতে বলিয়াছেন।"

"আমার কাপড় বামুনকে পরিতে দিবে কিগো!"

"কেন, দোষ কি? তোতে আর তাতে বেশী তফাৎ কি? তুই দেড় টাকা মাহিনা পাস্, সে বড়-জোর না হয় তিন টাকা পাইবে।"

ঝি স্থিরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণের জন্য কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছে। ঝি উত্তর করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কথা যেন বাহির হইতেছে না।

মা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ করিয়া ডাইনের মত মুখের পানে কি দেখিতেছিস? আমাকে গিলিয়া খাইবি না কি?"

তথাপি ঝি কথা কহিল না; মায়ের মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি যেন মাকে বলিবে, কিন্তু বলিবার সাহস আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, মাও যেন কিছু শঙ্কিত হইলেন। অনেক সময়ে নির্ব্বাক্-লাঞ্ছনা উচ্চ চীৎকারের কলহকে পরাস্ত করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল; ঝিয়ের অবজ্ঞার দৃষ্টির কাছে মা পরাভব স্বীকার করিলেন; বলিলেন—"বেশ, তুই দিতে না পারিস্, কাপড় আমাকে দে।"

এইবারে ঝি কথা কহিল। অতি মৃদুতার সহিত সে মাকে বলিল—"হাঁ মা! তুমি কি?"

মা বোধ হয়, ঝির প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম। ঝিয়ের পরবর্ত্তী প্রশ্নে, আমি যে বুঝিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

মা বলিলেন—"কি মানে কি?"

"বাবু ত শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র মা'র চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তদণ্ডেই ঝিকে একটা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ঝি কিন্তু তাহাতে চিত্তের বিন্দুমাত্রও বিচলন প্রদর্শন করিল না। সে বলিল—"ক্রোধ কর, কটু বল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি তাঁতীর মেয়ে। এক সময় আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ আমাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অবস্থাপন্ন আমার অনেক কুটুম্ব আছে। আমার এক বোন-ঝি-জামাই তোমারই স্বামীর মত হাকিম।"

মা চমকিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, ঝি তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিতে লাগিল—"আমি, আমার

মর্য্যাদা ও অভিমান বজায় রাখিতে, তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। গতর খাটাইয়া খাইব, তবু জ্ঞাতি-কুটুম্বের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিব না বলিয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়াছি। জানি—থাকিলে আমার নিন্দা হইবে না। কিন্তু তোমাদের ভাবগতি দেখিয়া, এখানে কয়দিন হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছে ;—সন্দেহ কেন, ভয় হইয়াছে। ভাবিতেছি, ব্রাহ্মণ ভাবিয়া কার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে আসিলাম।"

মা বলিলেন—"তোর কি মনে হয় ?"

ঠিক এই সময়ে গণেশখুড়া গাহিয়া উঠিল—

"ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।"

গায়িতে গায়িতে হলঘরের দ্বারের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই খুড়া পিতাকে লক্ষ্য করিয়া, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই হুজুর ?—চিঠি দাও। আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

মাতা তাহার সম্বোধনের কর্কশতা অনুভব করিয়া বলিলেন—"মূর্খ! এ তোমার বন্য বর্ব্বরের দেশ নয়। একটু আস্তে কথা কহিতে জান না ?"

মায়ের কথা শুনিয়াই গণেশ ঘরের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং মাকে দেখিবামাত্রই, আমাদের বেলায় যেরূপ করিয়াছিল, সেলাম করিল।

মা তাহার এইরূপ রহস্যাভিনয়ে ক্রোধ-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অধর কম্পিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তিনি মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে না করিতে গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"ক্রোধ করিতেছ কেন মা লক্ষ্মী ? তোমার বাগ্‌দী আরদালীই আমাকে এই সব শিখাইয়া দিয়াছে। কাল আমি তোমাদের এখানে খানা খাইতে দেখিয়াছিলাম ; দেখিয়া বাহির হইতেই চুপিচুপি পলাইবার চেষ্টায় ছিলাম। ফটকের মুখে কুকুর দুইটা আমাকে আক্রমণ করে। তাহাদের হাতে রক্ষার উপায় না পাইয়া তোমাদের মুরগীর ঘরে ঢুকিয়াছিলাম। তার পর কয় বেটাতে পড়িয়া আমাকে ধরিয়া চোরের মার মারিয়াছে।"

মাতা মস্তক অবনত করিলেন। খুড়া বলিতে লাগিল—"এখনও কি মা লক্ষ্মী, তোমার রাগ মিটিল না ?"

"'মূর্খস্ত লাঠ্যৌষধি'—যেমন কাজ করিয়াছ, তাহার ফল পাইয়াছ।"

"তা যা বলিয়াছ। আমার কা'ল বড়ই মূর্খামী হইয়াছে। দাদার আশ্রয়ে আসিতেছি বুঝিয়া বাড়ীতে লাঠি গাছটি ফেলিয়া আসিয়াছি।"

"লাঠি আনিয়া আমাদের মাথা ভাঙিয়া দিতে নাকি ?"

"আগে তোমার ঐ কুকুর দু'টার মাথার ঘি বাহির করিতাম।"

"কুকুরের গায়ে লাঠি ঠেকাইলে, তখনই শ্রীঘরে যাইতে হইত। কুকুর দুইটির দাম দুইশো টাকা। তোমার ভিটা মাটী বিক্রী করিলেও ওর দাম উঠিত না।"

"বটে!"

"তোমার ভাগ্য যে, কুকুরের গায়ে হাত দাও নাই। দিলে আর বাবুর কাছে তোমার দয়া পাইবার কোন প্রত্যাশা থকিত না।"

"আর তোমার কাছে ?"

মা উত্তর করিলেন না। খুড়া কিন্তু উত্তর শুনিবার জেদ ধরিল। একবার—দুইবার তিনবার। আমরা—ঝি ও আমি, হতভম্বের মত দেখিতেছি। তৃতীয় বারের পরেও যখন খুড়া উত্তর শুনিবার জেদ ছাড়িল না, তখন মা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আরদালী!"

আরদালী আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে ভিতর দিক্ হইতে আমার পিতৃদেব ছুটিয়া আসিলেন।

মা ও খুড়ার কথাবার্ত্তা বোধ হয়, তিনি ভিতর-বারান্দা হইতে শুনিয়াছিলেন। তাই, আরদালীর নাম শ্রুতিগোচর হইবামাত্র ব্যাপার কিছু কঠিন হইতেছে বুঝিয়া, শৌচাদিকার্য্য সমাক্ শেষ না করিয়াই, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। একখানা তোয়ালে ও সাবান হাতে পাঁচুও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে।

পিতা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"মেম সাহেব! তোমার ওই আরদালী হুজুর আসিয়াছেন। উঁহাকে কি হুকুম করিবে কর। আমি উঁহারই সম্মুখে জোর করিয়া আবার বলিতেছি—আগে তোমার ওই কুকুর দুইটার মাথার ঘি বাহির করিতাম ; তারপর যে যে—"

এই বলিয়া, খুড়া, কার্ত্তিক-পাঁচু প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রে তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, সকলেরই বাপগুলার মুখে ঘৃণিত পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদেরও মুণ্ডপাতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা বুঝাইয়া দিল।

সত্বর পত্রের উত্তর দিবার আভাস দিয়া, পিতা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতার সহিত খুড়াকে দ্বারদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

আমাদের এখানে অবস্থানে খুড়ার নাসিকারন্ধ্র যে বিশেষ উৎপীড়িত হইতেছে, ইহা বুঝাইয়া খুড়া পত্রের প্রতীক্ষায় নিজস্থানে ফিরিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম পিতা প্রথমে পাঁচুকে তিরস্কার করিলেন ; তার পর ঝিকে ও তাহাকে স্থানত্যাগের আদেশ করিলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে, পিতা মাকে বলিলেন—"তুমি কি আমাকে দেশে ফিরিতে দিবে না ?"

মায়ের তখনও ক্রোধের উপশম হয় নাই। পিতার কথা শুনিবামাত্র তিনি উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখনি যাও। আমি কি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি ?"

"আমার উপর ক্রোধ করিতেছ কেন ? এ আপদ্ কি আমি জুটাইয়াছি ?"

"তাই ত চুপ করিয়া আছি। তা না-হ'লে কাণ ধরাইয়া মূর্খটাকে বাটীর বাহির করিয়া দিতাম। হতভাগার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার কুকুরের মাথার ঘি বাহির করিবে বলে ? হতভাগা জানে না, ওর চেয়ে আমার কুকুরের দর বেশী।"

"বামুনের ছেলে হয়ে গণ্ডমূর্খ। ওর কথায় তুমি কাণ দাও ! তোমাকে আর কি বলিব। বর্ত্তমান সভ্যতা যে কি, তাহা ওদের বংশে কখন শোনে নাই। তুমি এবং তোমার কুকুর যে কি বস্তু, তা ও কেমন করিয়া বুঝিবে ?"

গণেশ খুড়া এই সময় আবার দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত। মা কি তাহাকে বলিতে যাইতেছিলেন। পিতা খুড়ার দিকে মুখ ফিরাইয়া পিছন হইতে হস্তের ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন ; এবং বলিলেন—"গণেশ ! চিঠির জবাব দেশে পাঠাইয়া দিব।"

গণেশ বলিল—"তবে সেলাম ! জেঠাই মাকে কি বলিব ?"

"কিছু বলিতে হইবে না।"

"না দাদা ! একটা বলিব। বলিব—জেঠাই মা ! আমি বাঁদর বটি ; কিন্তু তুমি যাকে গর্ভে ধরিয়াছ, তার মত আজও আমি মগ্‌ডালে উঠিতে পারি নাই।"

"কি বল্‌লি উল্লুক ?"

উল্লুক উত্তর করিল না।—"দোষ কারো নয় গো মা !" গান গাহিতে গাহিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

পিতা বোধ হয়, খুড়াকে শাস্তি দিবার অভিলাষী ছিলেন। মা এবারে তাঁর হাত ধরিলেন। বলিলেন—"গণ্ডমূর্খকে যাইতে দাও।"

"না, একটু আমার শক্তির পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে আমার দেশে যাওয়া সম্ভব হইবে না।" "তবে একটু দেখাইয়া দাও।"

ঠিক এমনি সময়ে উঠানে একটা কুকুর প্রথমে চীৎকার ও পরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কার্ত্তিক দ্রুতপদে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"হজুর ! বামুন কুকুরকে পদাঘাতে বিষম আহত করিয়াছে।"

পিতা গণেশকে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আরদালী ছুটিল। আমি, পিতা ও মা, তিনজনেই বাহির বারান্দায় ছুটিয়া আসিলাম।

দেখিলাম, আহত কুকুরের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে—অপরটা পলাইয়াছে।

গণেশ-খুড়া ফটকে পা দিবামাত্র কার্ত্তিক তাহাকে ধরিল ! যেমন ধরা, অমনি খুড়া হতভাগ্যের গালে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সেই আঘাতে তাহাকে মাথায় হাত দিয়া ভূমিতে বসিতে হইল।

পিতার ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই নীচে নামিয়া খুড়ার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। খুড়া তখন ফটক পার হইয়া পথে পা দিয়াছে।

পিতা বলিলেন—"যাবি কোথা মূর্খ ? তোকে আমি জেলে দিব।"

"এস দাদা, এস। চিরদিনের জন্ম যাতে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয়, তার ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া গণেশ পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

আমি ও মা, উভয়েই বারান্দায়। সেখান হইতে পিতাকে ফটক পার হইতে দেখিলাম। গণেশ তখন সগর্ব্বে বলিতেছে—"এস দাদা, এস। আমি দু'টি হাত বাড়াইয়া আছি।"

ফটক পার হইয়াই—সেই বকুল, সেই বকুল ! গণেশ পিতাকে বকুলের দিক্ দেখাইয়া দিল।

পিতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। আমরা শুনিতে পাইলাম "অঘোরনাথ ! নিরপরাধকে পরিত্যাগ কর। সকল অপরাধের অপরাধী আমি। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে দাও।"

সে মধুর পরিচিত স্বর আজ এক বৎসর পরে শুনিতেছি। সেই স্বরাকর্ষণে সমস্ত বৎসরটা যেন গুটাইয়া দণ্ডে পরিণত হইয়াছে—সুন্দর হুগলী সহর তাহার ভিতর কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে।

আমি ছুটিলাম। কে মা—কোথায় মা ভুলিয়া গেলাম। উন্মত্তের মত সিঁড়ি হইতে নামিয়া, তখনও অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কার্ত্তিককে পায়ে ঠেলিয়া, পিতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া,—সেই বকুল—সেই বকুল—উন্মত্তের মত আমি বকুলতলে ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

২৩

বহুদিনের কথা। যথাযথ স্মরণ করিতে মস্তিষ্ক নিষ্পীড়নে অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্নেরও সর্ব্বশরীর

অবসাদ আসে। তবু সেদিনের ঘটনা আমি সম্পূর্ণ স্মরণ রাখিয়াছি। এখনও যেন তাহা পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তাহার পর আজ! মধ্যে যেন দিনের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়াছে! প্রভাতে জাগরণ মুখে এক একটা ক্ষুদ্র স্বল্পপলের স্বপ্ন যেমন যুগব্যাপী জীবনকে কুক্ষিগত করে, আমার মনে হয়, গত রাত্রিতে আমিও সেইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনে হইতেছে, কাল সন্ধ্যায় আমি একাদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম। আজ সূর্য্যোদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি, রাত্রির সেই বিপুল শক্তিধর স্বপ্ন অগণ্য তরঙ্গে আমাকে উত্থিত নিপতিত করিয়া, আমার জীবনের সমস্ত রস নিজের অঙ্গে বিলীন করিয়া লইয়াছে—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বৃদ্ধ দেহে আর কৈশোর-যৌবনের লীলাভার বহনের শক্তি নাই। তাহা আমাকে স্পর্শমাত্রেই দুই চপল শিশুর মত নখপ্রহারে আমার শুষ্ক দেহকে জর্জ্জরিত করে; অথচ পরিত্যাগ করা দুরূহ! শিশুকে কোল হইতে ভূমিতে নামাইতে মন যায় না। সেই জন্য সেদিনের কথা আমি বলিব। একদিকে পিতা ও মাতা, অন্য-দিকে পিতামহী; আমি মধ্যে পড়িয়া, উভয়ের সম্মিলন-পথ অবরোধ করিয়াছি। পুত্রমুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী মাতার দৃষ্টিপথ রোধ করিতে বল্মীক স্তূপ বিশাল শৈলের আকার ধারণ করিয়াছে। কেমন করিয়া করিয়াছে বলিব।

আমি পিতামহীকে জড়াইয়া ধরিলাম, কিন্তু তাঁহাকে পাইলাম না। পিতার সক্রোধ সম্বোধনে তাঁহাকে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিতে হইল।

পিতা পিতামহীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। এবং তখনও পর্য্যন্ত পিতামহীর সঙ্গে সংলগ্ন আমার কর্ণ ধরিয়া আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

অপমানে ও কর্ণের যাতনায় আমি মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলাম। কি জানি কেন, চক্ষু হইতে আমার জল নির্গত হইল না।

পিতামহীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। "তুমি কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক পর্য্যন্ত রাখিতে চাও না, অঘোরনাথ?"

"সম্পর্ক তুমি রাখিতে দিলে কই?"

"আমি রাখিতে দিলাম না!"

"তোমার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার আমার অবসর নাই। যদি এখানে আসিবার জন্যই তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা হইলে একটু ভাল পরিচ্ছদ পরিয়া আসিলে না কেন?"

"বিধবার আবার কিরূপ বেশ পরিচ্ছদ হয়?"

পিতা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আবার আমার কাণ ধরিলেন। তবে এবার সবলে ধরিলেন না—অতি সন্তর্পণে ধরিয়া বলিলেন—"মূর্খ! কাল তোমার পরীক্ষা! তুমি এমনি করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ!"

এই কথার পরেই তিনি একবার পিতামহীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—"বেলা হইতেছে। এখনি এ পথে লোক চলাচল করিবে। যদি আসিতে হয় বাসায় চল। এখানে এরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে, আর লোকে পরিচয় জানিলে আমার মাথা হেঁট হইবে। এটা আমার দেশ নয়—চাকুরীস্থল।"

"ভয় নাই অঘোরনাথ, পরিচয় দিয়া এখানে—শুধু এখানে কেন—আর কোনও স্থানে তোমার মাথা হেঁট করিব না। এখন হইতে আমি মনে করিব, তোমার মত পুত্রকে আমি গর্ভে ধারণ করি নাই।" কথা শেষ না করিয়াই যেন পিতামহী খুড়াকে ডাকিলেন—"গণেশ।"

খুড়া অনেকটা দূরে গঙ্গাতীরে যাইবার পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, পিতামহীর আহ্বানে সে দ্রুতগতি নিকটে আসিল।

গণেশকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া পিতা বলিয়া উঠিলেন—"সকালবেলায় পথের মাঝে একটা মিছা হাঙ্গাম বাধাইয়া কেন মা আমাকে অপদস্থ করিবে। বাসায় চল। আমাকে আগে হইতে না জানাইয়া এরূপ ভাবে তোমার আসা কি উচিত হইয়াছে? কি জন্য এবং কাহার প্ররো-চনায় আসিয়াছ, আমি কি বুঝি নাই? নাও, ক্রমে এ পথে লোকের সমাগম হইতেছে, এখানে এরূপ ভাবে আর দাঁড়াইয়ো না। তিরস্কার করিবার কিছু থাকে, ঘরে আসিয়া কর।" ইত্যবসরে খুড়া আমাদের সমীপস্থ হইল। পিতামহী পিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়া আবার বলিলেন "গণেশ!"

খুড়া আসিয়াই পিতামহীর মুখ দেখিয়া কি একটা বুঝিয়া লইল। বলিল—"কি হইল জেঠাইমা?"

অবস্থানুযায়ী নিজের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে, পিতার সেখানে আর অধিকক্ষণ অবস্থান দুরূহ হইয়া পড়িল। বাস্তবিকই সে পথে লোক উপস্থিত হইতেছিল। একে সে কালের হাকিম, তাহার উপর তখনকার গ্রামবাসী নিরক্ষর লোক। হাকিম পথে বেড়াইতেছে জানিলে, অমনি অমনি দেখিবার জন্য লোক জড় হইয়া যায়। এ কি না হাকিম সাহেব একটা দীনবেশা বৃদ্ধার সঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে! এ কথা একজনেরও কর্ণ-গোচর হইলে, তখনি সেখানে রথ দোলের মত লোক জড় হইত। পিতার সেখানে আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তবে তোমার যা

অভিরুচি তাই কর। আমি আর থাকিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন।

গণেশ বলিল—"দাদা!" পিতা উত্তর দিলেন না। পিতামহী বলিলেন—"কাকে দাদা বলিতেছিস্ গণেশ? ফিরিয়া চল্। ও কুলাঙ্গারের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নাই।" তথাপি খুড়া বলিল—"একটা কথা শুনিয়া যাও।" পিতা এবারেও উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমি একবার সন্তর্পণে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, পিতা বাড়ীর দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছেন। আমিও তাঁহার দৃষ্টির অনুসরণে সে দিকে চাহিয়া দেখি, মা ফটক হইতে মুখ বাড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মনে করিলাম, মা'কে দেখিয়াই বুঝি পিতা অন্যমনস্ক হইয়াছেন। তাই খুড়ার কথা শুনিতে পান নাই তাই তাঁহাকে বলিলাম—"খুড়া আপনাকে ডাকিতেছে।"

পিতা বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি। তোমার ও কথায় কাণ দিবার প্রয়োজন নাই। এক জন বাবু—বোধ হয় উকীল এ দিকে আসিতেছেন এখানে তিনি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তোমার গর্ভধারিণীকে সাবধান করিয়া আইস।" এই বলিয়াই তিনি আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন। দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই গণেশ খুড়ার ঈষদুচ্চ উচ্চারিত কথা আমার কর্ণগোচর হইল—"একটা কথা একটা কথা আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না।"

পিতাও ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"যা বলিবার, বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বল্।"

"আমি ও ম্লেচ্ছের ঘরে আর প্রবেশ করিবনা।"

"তবে ওইখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে চলে যা। বাম্নাই বুজরুকি ঘরে গিয়ে দেখা। ও সব এ চাকরীস্থানে চলিবে না। কি বলবি, আমি তা আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছি।"

"না হাকিম দাদা, পার নাই। তুমি মনে করেছ, আমি সার্ভ্যোম-ম'শায়ের কন্যার জন্য তোমাকে অনুরোধ করতে এসেছি। ভয় নাই, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

পিতা খুড়ার দিকে তড়িচ্চালিতের মত মুখ ফিরাইলেন। আমি শিহরিলাম। খুড়া যেন দ্বিগুণ উত্তেজনার সঙ্গে বলিয়া উঠিল "অতি সৎপাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। সার্ভোম-ম'শায়ের কন্যা যেরূপ লক্ষ্মী, তাহার সেইরূপ নারায়ণ স্বামীই ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" খুড়া প্রস্থান করিল। সে যে কি বলিতে চাহিয়াছিল, আর তাহার বলা হইল না। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরমাও কখন যে অন্তর্হিতা হইয়াছেন, আমরা কেহই তাহা জানিতে পারি নাই।

পিতার সঙ্গেই বাসায় ফিরিলাম। মা ইতিমধ্যে ফটক ছাড়িয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন। আমরা উপরে উঠিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?" পিতা বরাবর মাথা হেঁট করিয়াই আসিতেছিলেন। পিতামহীর শেষ কথায় এবং অলক্ষিত প্রস্থানে বোধ হয় তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে। তিনি মায়ের কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন,—"যা হরিহর, তোর ঠাকুমাকে লইয়া আয়।" আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন আমি অতি উল্লাসে বারান্দা পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছি, অমনি মা আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? নিজেই ঘটকালি করিয়া, লক্ষ্মীছাড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবে না কি?"

পিতা। সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। তার কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

মাতা। কে বলিল?

পিতা। গণেশ।

মাতা। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তুমি সেই মিথ্যাবাদী মূর্খ টার কথায় বিশ্বাস করিলে!

পিতা। বিবাহ হয় নাই?

মাতা। তোমার মা কেন আসিয়াছে, তা কি বুঝিয়াছ?

পিতা। তুমি কি কিছু বুঝিয়াছ?

মাতা। তাই ত বলিলাম, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তোমার মা একা আসে নাই, সেই বুড়া ও তাহার স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পিতা। বল কি!

মাতা। গণেশ ছেলে চুরি করিতেই কাল চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আমার বড় গুরুবল, তাই পারে নাই।

পিতা। কে তোমাকে বলিল?

মাতা। কার্ত্তিক সমস্ত জানিয়া আসিয়াছে।

পিতা এইবারে ঠাকুরমা'র ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিলেন। বুঝিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন বলিলেন—"যাক—যে মা সন্তানের মাথা খাইতে কুণ্ঠিত নয়, সে মা পথে পড়িয়া মরিলেও আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

উপর্যুপরি কতকগুলা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আমার শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পিতা মাতার কথা শোনার

অপেক্ষা না করিয়া আমি ঘরে গিয়া পিতার শয্যায় শুইয়া পড়িলাম।

সে দিন শনিবার। পরের পরই সোমবার দিন স্কুলে আমাদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলে, পিতার মনস্তুষ্টি হইবে না। এই জন্য, বাড়ীতে আমাকে পড়াইবার জন্য, পিতা আমাদের শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয়কেই শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য অন্য সময়ে, তিনি সন্ধ্যা-কালেই আমাকে পড়াইতেন। পরীক্ষা অতি সন্নিকট বলিয়া তিনি দুই একদিন প্রাতঃকালেও পড়াইয়া যান। আমার শয়নের অল্পক্ষণ পরেই, তিনি বাহির হইতে আমাকে ডাকিলেন—'হরিহর'। মাতা ও পিতা উভয়েই সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিবামাত্র, পিতা বলিলেন—"কি রে! পড়া না করিয়া, এখানে আসিয়া শুইয়া রহিয়াছিস্ যে?"

আমি বলিলাম—"শরীরটে আমার কেমন করিতেছে।"

"কি করিতেছে?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

তিনি তৎক্ষণাৎ, শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন।

পরীক্ষা করিবার কারণ, তখন হুগলীতে সবেমাত্র ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে! সহরে তখনও তাহার প্রকোপ সম্যক্ না হইলেও, সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে সে বৎসর সে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। সহরেও দুই চারিজন মরিয়াছে। বিশ পঞ্চাশজনের প্লীহাজনিত উদরস্ফীতিও ঘটিয়াছে। তবে শীতের সঙ্গে, রোগের প্রথম আক্রমণের কাল গিয়াছে। তথাপি, আমার শরীরের অসুস্থতার কথা শুনিয়াই, পিতা আমার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে আসিলেন।

মাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্বর নয় ত?"

পিতা বলিলেন—"না।"

"যাক্—বাঁচিলাম। যে ডাইন ডাইনীর নজর পড়িয়াছে, তাহাতে ছেলেটা আমার বাঁচিলে বাঁচি।"

এই বলিয়াই, মা আমাকে শুইয়া থাকিতেই আদেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন—"যাক্, ওর এখন আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। তুমি মাষ্টারকে বলিয়া আইস। একজামিন হইবার পর, ইস্কুলের ছুটিটা হইয়া গেলে, আমি দিন কয়েকের জন্য ওকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব।"

আহারাদির যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতে মাকে আদেশ দিয়া, পিতা বাহিরে গেলেন। মা, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, পিতার মত হস্ত দ্বারা গাত্রস্পর্শ করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, আমার জ্বর নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ করিতেছে?"

"বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পাধাটা তোকে কিছু কি বলিয়াছিল?" "কিছু না।"

"ডাইনীবুড়ী" আমাকে কিছু বলিয়াছে, কি না, মা তাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম না। বাস্তবিক আমার ভিতরটা কেমন করিতেছে।

কি করিতেছে বুঝিতে না পারিলেও, এটা যেন আমার মনে হইতেছে, যেন কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য রোগ আমাকে আশ্রয় করিতেছে। মা পরীক্ষায় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আমিও বুঝাইতে পারিলাম না। মা গাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া বলিলেন—"অসুখ বোধ করে, শুইয়া থাক্। আজ আর স্কুলে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

তিনি গৃহত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে ঝি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। মা ও তাহার কথোপকথনে বুঝিলাম, মা গোপনে সন্ধান লইবার জন্য, এবং আমাদের সম্বন্ধে কি কি কথা হয় শুনিবার জন্য, তাহাকে পিতা-মহীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কথায় বুঝিলাম, পিতামহী নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন। এক গণেশ-খুড়া ছাড়া, তাঁহার সঙ্গে আর যে কেহ ছিল, তাহা ঝি বলিল না। পিতামহীর হুগলী-ত্যাগের কথা বিদিত হইয়া, মা যেন আপনাকে বিপন্মুক্ত বোধ করিলেন।

মাতা গৃহত্যাগ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ঝি পৈতা সূতায় বাঁধা একটা তামার মাদুলী মায়ের হাতে দিয়া বলিল—"মা! এইটা দাদাবাবুর হাতে পরাইয়া দিন।"

মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন—"কি এ?"

"দেখিতেই ত পাইতেছ মা!"

"এ মাদুলী কে দিল?"

"এক ব্রাহ্মণ।"

"কেন?"

"তা জানি না! ব্রাহ্মণ এই মাদুলী দাদাবাবুর হাতে পরাইতে বলিয়া দিল। বাঁধিয়া দিবে তুমি। অন্যে বাঁধিলে ফল হইবে না। দাদাবাবুর যদি কোনও গ্রহের আপদ থাকে, আমার বোধ হয়, এই মাদুলী পরিলে আর তা আসিতে পারিবে না।"

"কে সে ব্রাহ্মণ, তুই জানিস্?"

"আপনারা ব্রাহ্মণ। মিথ্যা কথা কহিব কেন মা,—তিনি দাদাবাবুর শ্বশুর।"

"শ্বশুর" কথা শুনিবামাত্র, মাতা সহসা-প্রজ্বলিত দারুণ

ক্রোধে ঝিকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন। দ্বিতীয়বার এ কথা মুখে উচ্চারিত হইলে, তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিবার ভয় দেখাইলেন; এবং মাদুলীটা ঘরের জানালা দিয়া বাগানের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

ঝি বলিল—"দূর করিতে হবে কেন মা,—আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি।"

"এখন কোথায় যাইবি? আর একটা ঝি না পাইলে তোকে ছাড়িবে কে?"

"বেশ মা, আর একটা ঝিয়ের সন্ধান দেখ। তবে আমি বলিয়া রাখি, এ গৃহে আর আমি চাকরী করিব না!"

"কোন্ চুলায় এমন সুখের চাকরী পাইবি?"

"চুলা আমার মিলিয়াছে। জীবনের শেষে একমাত্র চুলাই যখন সকলের আশ্রয়, তখন আমি একটু আগেই তাকে অবলম্বন করিব।"

ঝিয়ের এ হেঁয়ালী কথা, আমরা কেহই বুঝিলাম না। মা, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, চলিয়া গেলেন। ঝিও নীরবে মায়ের অনুসরণ করিল। আমার সঙ্গেও একটা কথা কহিল না।

সেই দিনের সন্ধ্যায়—কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ আমার জ্বর আসিল।

৪২

প্রাতঃকালের ঘটনায় সমস্ত দিনটাই আমাদের এক-রূপ গোলমালে কাটিয়াছিল। গণেশ-খুড়ার প্রহারে কার্ত্তিকও কিছু হতভম্ব হইয়াছিল। সেইজন্য যে রাঁধুনী বামুনকে তাহার আনিবার কথা ছিল, তাহাকে সে আনিতে পারে নাই। অগত্যা মাকে নিজেই আজ পিতার জন্য অন্নপ্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

কাজের ব্যস্ততায় দিবসে মা আমার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। অপরাহ্ণে আমার চক্ষু ছলছল করিতেছে দেখিয়া তিনি আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন। বুঝিলেন, আমার জ্বর হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। মাতৃ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনিও আমার নাড়ী-পরীক্ষা করিলেন। তিনিও বুঝিলেন, জ্বর। তবে জ্বর অতি সামান্য। গাত্র ঈষদুষ্ণ। নাড়ী সামান্য চঞ্চল। আমার আর পড়া হইল না। পরীক্ষার মুখে পাঠের ব্যাঘাত হইল বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আশ্বাস দিলেন, সামান্য সাবধানতার পর দিবসেই আমি সুস্থ হইব।

সন্ধ্যার সময় পিতা কাছারী হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই আমার জ্বরের সংবাদ পাইলেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদি করিয়া তিনিও একবার জ্বরের পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য—শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ হইতে এক ডিগ্রী বেশী। মাকে বুঝাইলেন—উত্তেজনাই ইহার কারণ। রাত্রিতে উপবাস দিলে, এবং একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিলেই পরদিন আর ইহা থাকিবে না

মা এ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি পিতাকে বলিলেন—"ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাও।"

মায়ের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতা ডাক্তারবাবুকে পত্র পাঠাইলেন। পত্রে তাঁহার আসিবার অনুরোধ না থাকিলেও ডাক্তার বাবু আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি হাঁসপাতালের ডাক্তার। সহরে তাঁহার বহুদর্শিতার ও চিকিৎসার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। তিনিও পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য। পিতার মুখে প্রাতঃকালের ঘটনা তিনি কতকটা অবগত হইলেন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, একমাত্র উত্তেজনাই আমার অসুখের কারণ স্থির করিয়া, তিনি ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন না।

এক, দুই, তিন দিন—সেই সামান্য জ্বরের বিচ্ছেদ হইল না। পিতা চিন্তিত হইলেন। মাতা ব্যাকুল হইলেন। ডাক্তার বাবু এ দুই দিনও আসিয়াছেন; বিরাম না হইলেও জ্বর কিছু নয় বলিয়া তিনি জনক ও জননীকে আশ্বাস দিয়াছেন। জনক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কি না মনে নাই। জননী আশ্বস্তা হইলেন না। আমার পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

এ তিন দিনের মধ্যে বাড়ীর অপরাপর অবস্থা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে। রাঁধুনী আসিয়াছে। সে ব্যক্তি দুই দিনেই কার্য্যতৎপরতা ও রন্ধনকুশলতা দেখাইয়া মাকে তুষ্ট করিয়াছে। পাঁচু ও কার্ত্তিক যেমন কাজ করে, তেমনই করিতেছে। কেবল ঝি নাই। আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্য বেতনাদির অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, রবিবার প্রাতঃকালেই সে চলিয়া গিয়াছে। বিকালে ঝিয়ের পরিবর্ত্তে অপর এক ঝি আসিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিয়া তুষ্ট হই নাই।

ঝি আমাকে ভালবাসিত। চাকরীর জন্য প্রভু-পুত্রকে ভালবাসিতে হয় বলিয়া বাসিত না। কি জানি কেন, আমার প্রতি তাহার আন্তরিক একটা টান ছিল। আমাদের হুগলীতে আসার পূর্ব্বেই পিতৃ-কর্ত্তৃক সে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই অবধি সে আমাদের কাছে ছিল। আমার জননীর তৎপ্রতি সময়ে সময়ে প্রযুক্ত অতি কঠোর

বাক্য সহিয়াও সে আমারই জন্য গৃহত্যাগ করে নাই। সেই ঝি চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিল না।

এই তিন দিবস জ্বরের জন্য যে একটা বিশেষ কষ্ট, তা আমি অনুভব করি নাই। কষ্টের মধ্যে এক কষ্ট—উপবাস। ডাক্তারবাবুর আদেশমত দুই দিন আমি ভাত খাইতে পাই নাই। দ্বিতীয় কষ্ট—ঝির অদর্শন। সে রাত্রিতে আমার ঘরে শয়ন করিত তাহার কাজ সারিয়া আমার গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে যদি না আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে সে আমাকে কত গল্প শুনাইত। ভূতের গল্প, পরীর গল্প, বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর গল্প নানা সামাজিক কথা—কত ইতিহাস এই সংবৎসরের মধ্যে সে আমাকে শুনাইয়া গিয়াছে। তন্তুবায়দিগের পূর্ব্বসৌভাগ্যের অবস্থা, দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ, পরে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্যদিগের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে অকালমৃত্যু এবং কালে তাহাদের ইন্দ্রভবনতুল্য অট্টালিকাদির ধ্বংস—এই সকল শোকোদ্দীপক ইতিহাসও সে আমাকে শুনাইতে বিরত হয় নাই। সেই ইতি-কথা হইতে বুঝিয়াছিলাম, একটি ধনাঢ্য বণিকের পৌত্রবধূ সর্ব্বস্বহারা ও অকালে স্বামিহারা হইয়া, অবশেষে একটি বন্য পল্লীর কুটীর হইতে একমাত্র শিশুপুত্রকে শৃগালের মুখে সমর্পণ করিয়া, পেটের দায়ে আমাদের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছে। এই এক বৎসরের সাহচর্য্যে আমি ঝিয়ের পরম প্রিয় হইয়াছিলাম। ঝিয়ের সঙ্গও আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ঝিয়ের অভাবটা আমি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

যাক্ সে কথা। ডাক্তারবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, চতুর্থ দিবসে জ্বরের বিরাম হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তারপর পঞ্চম—ষষ্ঠ—সপ্তম—জ্বর গেল না। এইবারে ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইলেন। জ্বর কিন্তু সেই সামান্য নিরেনব্বুই হইতে একশোর মধ্যে। তিনি বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, উদর সমস্তই সযত্নে পরীক্ষা করিলেন। ফুসফুস-যকৃতাদি কোনও যন্ত্রের তিনি দোষ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং এই একজ্বরের কারণ-নির্ণয়ে তিনি অক্ষম হইলেন। তখন স্থির হইল, পর দিন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

ডাক্তারবাবু আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন নিষেধ সত্ত্বেও ঘরে কেহ না থাকিলে, আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের ইতস্ততঃ বিচরণ করি। সপ্তম দিবসের অপরাহ্ণে বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখি, মা বাগানের ভিতর কি যেন একটা সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণে মা তন্ময়—কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এ গাছের তলা হইতে ও গাছের তলা—কখন উদ্যানপার্শ্বস্থ পথে, কখন পরস্পরনিবদ্ধ গুল্মকুঞ্জে কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন বা অর্দ্ধাবনমিত দেহে তীব্রদৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠ যেন বিদীর্ণ করিয়া, মা কোন হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রথমে মায়ের এ অন্বেষণের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণের পরেই সেই স্থানে মায়ের মাদুলী নিক্ষেপের কথাটা আমার মনে হইল। স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল এই সাত দিনের মধ্যে প্রথমতঃ আমি স্পষ্টতঃ দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পাছে মেজের উপর পড়িয়া যাই, এই জন্য তাড়াতাড়ি ফিরিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল যেন একটা মোহ—বেশ মিষ্ট মোহ—আবেশকর! চক্ষু মেলিতে ইচ্ছা হইতেছে না! অথচ নিদ্রাতন্দ্রা কিছু নয়। মুদ্রিত পলকের ভিতরে আমি চাহিয়া আছি। আমার চোখের উপর দিয়া লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট এক মনোহর চন্দ্রাতপ যেন আকাশপথে ভাসিয়া যাইতেছে! সে চন্দ্রাতপের যেন অন্ত নাই! তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্যেরও ইয়ত্তা নাই।

পিতার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বেই আমার ঘর। মধ্যে একটি বড় দরজা। পিতার ঘরের দিক্ হইতেই তাহাকে খোলা ও বন্ধ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগে রাত্রিতে ঝি এই ঘরে আমাকে আগুলিয়া থাকিত। এই দুই দিন মা অবস্থান করিতেছেন।

আমার শয়নের বহুক্ষণ পরে মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষু মেলিতে পারিলাম না। আমাকে ডাকিলেন—আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। চক্ষু মুদিয়া মায়ের ক্রিয়াকলাপ আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। মা শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। আমার বক্ষ ও মস্তকে করস্পর্শ করিলেন। তার পর পার্শ্বের গৃহে চলিয়া গেলেন। আমি ঘুমাইতেছি মনে করিয়া আমাকে আর ডাকিলেন না।

ইহার পরেই পিতা কাছারী হইতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছারীর কাগজপত্রাদিপূর্ণ-বাক্স-মাথায় কার্ত্তিক আসিল। পিতা প্রথমে তাঁহারই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মাতাকে আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

মাতা উত্তর করিলেন—"পোষাক ছাড়িয়া আগে একটু

বিশ্রাম লও। তার পর নিজে দেখ। আমার মনে হইতেছে, হরিহরের আজ জ্বরের বিরাম হইতেছে। তাহার বুকে কপালে ঘাম; সে সুস্থ হইয়া ঘুমাইতেছে। তবে তুমি একবার না দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

পিতা আর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা করিলেন না। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই মায়েরই মত আমার বুকে ও কপালে হাত দিলেন। আমাকে একবার ডাকিলেন। আমি চোখ বুজিয়াই উত্তর দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি। ভাল আছি শুনিয়াই তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন—"এখনি ডাক্তার বাবুকে খবর দে। ব'লে আয়, এখনি তাঁহাকে আসিতে হইবে।" কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি বাক্স রাখিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে ছুটিল। মাতা সন্ত্রস্তার মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে ?"

"খোকার জ্বর বিচ্ছেদ হইতেছে।"

"বাচলুম। তুমি যে ভাবে কার্ত্তিককে হুকুম করিলে, শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে।"

"জ্বরের বিরাম অবস্থা বুঝিলে ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন।"

"তা হ'লে তোমাকে বলি"—

এই বলিয়া মাতা মাদুলী সম্বন্ধে সমস্ত কথা পিতাকে শুনাইলেন। আমি সেইরূপই চোখ বুজিয়া শুইয়া আছি। আমি শুনিতেছি ও দেখিতেছি। আমার চোখের উপর দিয়া ছবির পর ছবি ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সে দৃশ্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

মায়ের কথা শুনিয়া পিতা একটু মৃদুহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—"তুমি বেশ করিয়াছ। তুমি যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার সৎসাহস দেখাইয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বাড়ী হইতে আসিবার সময় শালতীতে উঠিবার মুখে বামুন আমার হাতে কতকগুলা ফুল দিয়াছিল। আমি তখনই সেগুলো জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।"

মা বলিলেন—"সে বামুন দেখিয়াছিল ?"

পিতা বলিলেন—"না, মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া আমি তাহাকে দেখাইয়া নিক্ষেপ করি নাই। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, করা উচিত ছিল। বামুন-পণ্ডিতগুলার দেখিতেছি কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, মর্য্যাদা-বোধও নাই। এ সমস্ত তাহারই কাণ্ড। গণ্ডমূর্খ গণেশ ও সেই বোকা বুড়ীকে ঐ বামুনই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আনিয়া গণেশ আর বুড়ীকে সম্মুখে রাখিয়া, শিখণ্ডীর মত অন্তরাল হইতে সে আমাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে।"

"মায়ের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! ছেলে একটা হাকিম! রাজা জমীদার পর্য্যন্ত যাঁর কাছে মাথা নোয়ায়, সাহেব দেখিলে সেলাম করে, তার মা হ'য়ে বাগ্দিনীর মত হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া এখানে কেমন করিয়া আসিল ?"

"তার কথা আর তুলিও না। অমন মায়ের বাঁচিবার আর প্রয়োজন নাই। হুগলী সহরে অনেকেই সে দিনের দুর্ঘটনার কথা জানিয়াছে। হাকিমের দেউড়ী বলিয়া জনরব আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। নহিলে লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া আজই আমাকে সহর ত্যাগ করিতে হইত।"

"হরিহর সারিয়া উঠুক। পূজার ছুটী পড়িলেই আমি কিছুদিনের জন্য উহাকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব। গত নষ্টের মূল সেই বামুন। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন। আবার হয় ত আসিয়া কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিবে।"

"হরিহরকে আর লইয়া যাইতে হইবে না। আমি আর একটা গ্রেডে উঠিলাম। এবার আমি মহকুমার মেজেষ্টারী করিতে পাইব। কোথায় যাইব, এখনও ঠিক নাই। যেখানেই হ'ক, গ্রামের কাউকে আর সে খবর দিব না।"

ইহার পরেই বুঝিলাম, পিতা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে একবার মাত্র অতি সন্তর্পণে করস্পর্শ করিয়াই মাতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ঘর নিশীথের জনশূন্য প্রান্তরবৎ নিস্তব্ধ। আমি সে মধুর নিস্তব্ধতা এখন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছি। আমার চক্ষুর উপর দিয়া পূর্ব্ববৎ সেই বিচিত্র বর্ণমালা ভাসিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, যেন অসংখ্য বর্ণাভিমানী দেবশিশু আমার অপাঙ্গপার্শ্বে আমার দৃষ্টিসীমান্তে অবস্থিত এক নীলবর্ণ নদী-স্রোতে অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে।

আমিও যেন তাহাদের এক জন সঙ্গী। আমিও যেন সেই নদী-স্রোতে গা ভাসাইবার জন্য তাহাদিগেরই মত ব্যাকুলভাবে, তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছি।

কিন্তু পা আমার চলিতেছে না। দেবশিশুগণ প্রতি পদক্ষেপে যেন দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে আমি সঙ্গিহীন হইয়া পড়িলাম। সেই সুবিস্তীর্ণ নীল প্রান্তরপথ দেখিতে দেখিতে জীবশূন্য হইল। আমার উল্লাস ভয়ে পরিণত হইল। আমি সঙ্গী খুঁজিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম।

সেই অবস্থাতে আমার যেন অন্তশ্চক্ষুও মুদ্রিত হইয়া আসিল। আমি প্রাণপণে চোখ মেলিবার চেষ্টা করিলাম। পলক মুক্ত হইল না। তাহার উপরে কে যেন একটা

বিশ মণ ওজনের পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। আমার সম্মুখে আর কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরিবর্ত্তে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম, নীল প্রান্তরের নিস্তরঙ্গ বায়ুসাগরপারে কে যেন করুণ কণ্ঠে রোদন করিতেছে।

আমি উৎকর্ণ হইয়া রোদনের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিতে পারিলাম না। স্বর পিতামহীর। আমার শ্রবণের আকুল আগ্রহে কর্ণরন্ধ্র লক্ষ্যে ছুটিয়া আসিতে ভাগীরথীর কুলকুল ধ্বনির ন্যায় এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধারায় বাধা পাইয়া আবার সে সাগরপারে ফিরিয়া চলিল। কেবল তিনটি মাত্র কথা—ভাগীরথীর উজান-বাহী বানমুখে চরে প্রতিহত তরঙ্গের ন্যায় তিনটি মাত্র উচ্ছ্বাস—আমার হৃদয়তটে আঘাত করিল।

"হরিহর, হরিহর, হরিহর।"

কে যেন আমাকে বুঝাইয়া দিল—"তোমার ক'নে গুরুপদিষ্টা হইয়া তোমার নাম জপ করিতেছে।"

আবেগে বোধ হয়, চক্ষুর পলকবদ্ধ অবস্থাতেই আমি শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম। উঠিতে পড়িয়া গিয়াছি! তারপর মৃদু-কর-স্পর্শস্মৃতি। শুনিয়াছি, মাতা পতনশব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া-ছিলেন। আমার আর কিছু মনে নাই।

ক্রমাগত সাতদিন আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম। শুনিয়াছি, এই সাতদিন ডাক্তার সাহেব ও ডাক্তার বাবু উভয়ে প্রাণপণে আমার সংজ্ঞা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহাদের মতে আমি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছি।

সপ্তম দিবসের রাত্রিশেষে আমার সংজ্ঞা ফিরিল। চোখ মেলিয়া দেখি আমার মুখের উপরে চোক রাখিয়া মাথার শিয়রে মা বসিয়া আছেন। উষ্ণ অশ্রুতে আমার কপোল সিক্ত হইতেছে।

তখন নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের ছবি মাথা হইতে একেবারে দূর হইয়া যায় নাই। চোখ মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল, আমি যেন কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেশে চলিয়া আসিয়াছি।

আমি ডাকিলাম "মা!"

আমার সংজ্ঞার পুনরাবর্ত্তন মা লক্ষ্য করেন নাই। আমি 'মা' বলিতেই তিনি ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"গোপাল! গোপাল! আমার নীল-মণি!"

তাঁহার ব্যাকুলতায় উচ্চারিত কথা বুঝি পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাতা তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। চাবির তোড়া অঞ্চল-মুক্ত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন—"শীঘ্র 'ষোল আনা' হরিহরের মাথায় ঠেকাইয়া দক্ষিণরায়ের নামে তুলিয়া রাখ।"

এই সময় কি জানি কেন, দক্ষিণ বাহুতে আমার হাত পড়িল আমি বুঝিলাম, বাহুমূলে একটি মাদুলী বাঁধা রহিয়াছে।

মাদুলী-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি মা?"

মা উত্তর করিলেন—"মাদুলী।"

আমি সেই বিষম দুর্ব্বল অবস্থাতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম,—"কেন মা, তোমরা আমাকে বাঁচাইলে?"

মাতা কোনও উত্তর দিলেন না। পিতা বলিয়া উঠিলেন—"হরিহর! তোমার ঠাকুরমার কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আর—আর—"

এইবারে মা বলিলেন—"তোমার ক'নের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।"

২৫

আমি হয় ত অমনি অমনিই আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু মাঝখানে একটা মাদুলী পড়িয়া গণ্ডগোল বাধাইল। সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুই স্থির বুঝিয়া ডাক্তারেরা পিতা মাতাকে একরূপ প্রবোধ দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কয়দিবস উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া আমি জীবিত ছিলাম। শেষ দিবসে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গলাধঃকৃত হয় নাই। রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তারেরা চলিয়া যাইবার পর হতাশ হইয়া পিতা শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু দেখিতে তাঁহার হৃদয়-বলে কুলায় নাই। মা কিন্তু ধৈর্য্য হারাণ নাই! এইখানেই মায়ের মাতৃত্ব। স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মা যদি একবার নিজ-মূর্ত্তি ধরেন তখন সন্তানের কল্যাণে মঙ্গলময়ী সম্মুখস্থ বিশাল শৈলবাধাকেও উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি সারারাত্রি লণ্ঠন-হাতে সেই আম কাঁঠালের জঙ্গলে মাদুলীর অন্বেষণ করিয়াছেন। অন্বেষণকালে দক্ষিণরায়ের সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্ব ধৃষ্টতার আচরণ স্মরণে আসিয়াছে। তিনি কাতরকণ্ঠে "ষোল আনা" পূজা মানত করিয়া সেই বন্য ঠাকুরের কাছে মাদুলী ভিক্ষা করিয়াছেন। রাত্রির শেষযামে দক্ষিণরায় কৃপা করিয়াছেন—মায়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে। মাদুলী-প্রাপ্তিমাত্র তিনি আমার দক্ষিণ বাহু মূলে বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাঁধিবার অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তেই আমি চোখ মেলিয়াছি।

এই এক কাকতালীয় ন্যায়ের ফাঁকিতে পিতামাতার দম্ভ চূর্ণ হইয়া গেল। আমার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নানাবিধ কারণ নির্ণয়ের অধিকার থাকিলেও তাঁহারা আমার হাত হইতে আর মাদুলী খুলিতে সাহসী হইলেন না শুধু তাই নয়, উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেই তাঁহারা আমাকে দেশে লইয়া যাইবেন, ঠাকুরমার কাছে ক্ষমা চাহিবেন ও সার্ব্বভৌম-কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন।

শুধু যে আমার অসুখই পিতামাতার মতি পরিবর্ত্তনের কারণ—ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমার মনে হয় গোবিন্দ-ঠাকুরদার মহত্ত্বও এ পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

গণেশ খুড়া পিতাকে দিবার জন্য যে চিঠি আনিয়াছিল, রোগমুক্তির তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিবসে ভাগ্যক্রমে সেই চিঠি আমার চোখে পড়িয়াছিল। চিঠি ঠাকুরদা লিখিয়াছেন—অথবা লিখাইয়াছেন। তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ :—পিতা আমার পণ্ডিত বটে কিন্তু হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে একেবারেই মূর্খ। ঠাকুরদার কাছে আমার পিতামহের গচ্ছিত এখনও অনেক টাকা আছে। পিতা ও মাতা তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং আমার ঠাকুরমার সে দিবসের কথায় তাঁহার নিজের মনে একটা বিশেষ রকমের সন্দেহ জাগিয়াছিল বলিয়া তিনি পিতার ন্যায্য প্রাপ্য সমস্ত টাকা পিতাকে দেন নাই। কিছু টাকা আমার পিতামহীর ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলেন। সে টাকা পিতামহী স্পর্শ করেন নাই, পিতাকে দিতেই অনুরোধ করিয়াছেন। পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় ঠাকুরদা পিতার দেশে প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতেছে। পিতার মত শিক্ষিতের মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছে। যে কাল আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা যে, আমার পিতাকে ডাকিয়া টাকা অথবা দলীল পত্রাদি দিবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। সেইজন্য তিনি পিতাকে সত্বর দেশে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পিতা এ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরিবার পর কয়দিন পিতা ও মাতার মনোভাবের একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন আমি যেন লক্ষ্য করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে যেন একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যাক্, ইতিমধ্যে পিতা ও মাতা উভয়েই দেশে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন।

সপ্তাহ পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পিতাও ছুটীর আবেদন করিয়াছেন। ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। তৃতীয় দিবসের রবিবারে আমরা হুগলী পরিত্যাগ করিব।

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা সবে মাত্র কাছারী হইতে আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার একখানি পত্র আসিল। ভাগ্যক্রমে তাহারও মর্ম্ম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। সে পত্র লিখিয়াছেন বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়। এ পত্রের মর্ম্ম বড়ই বিচিত্র। তিনি লিখিয়াছেন, কন্যার কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, আর পিতা বালো কিছুতেই আমার বিবাহ দিবেন না বুঝিয়া পাগল বামুন এক শালগ্রাম শিলার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছে। শুধু তাই নয়, দেশের লোকও এমনি পাগল, সেই বিবাহোৎসবে যোগ দিয়াছে। পণ্ডিতমহাশয়ও কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই পাগলামী দেখিতে গিয়াছিলেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোককে নারায়ণ-শিলা স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া দুই একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাদের বুঝাইয়াছেন, তাঁহার কন্যা নারায়ণ-বরা—হইবে চিরব্রহ্মচর্য্যা-ব্রতধারিণী। তাঁহার শালগ্রাম স্পর্শে দোষ নাই। কন্যার কুশণ্ডিকা হইবার পরই দশমবর্ষীয়া বালিকাকে সব পাগলগুলা লক্ষ্মীজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয় প্রণাম করিয়াছিলেন কি না লেখেন নাই। তবে আরও এইরূপ পাগলামীর কথা তিনি লিখিয়াছেন। বালিকার কুশণ্ডিকা কার্য্য শেষ হইবার পর আমার মাতামহী তাহাকে আমাদের গৃহে আনাইয়াছিলেন এবং আমার পিতামহের সত্য অনুসারে তাহাকে আমাদের কুলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও একটা বিরাট সমারোহ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। দেশের জমীদার হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত সে বিরাটভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সেই সমারোহের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ ঠাকুরদা। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ বালিকার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছেন।

পত্রের মর্ম্ম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু পত্রের ক্রিয়া তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনুভব করিয়াছিলাম। এইদিনে সর্ব্বপ্রথম পিতা ঈষৎ কঠোর ভাষায় মাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া পিতা ও মাতার তর্ক চলিতেছিল। আমি পার্শ্বের ঘর হইতে শুনিতেছিলাম। শুনিতেছিলাম কেন, শুনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে বাহিরে কুকুর দুইটা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। পিতা হুগলী ছাড়িবেন, এইজন্য কাছারীর উকীল-আমলারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার সম্ভাবনা।

আর একদিন ঠিক এমনি সময়ে কুকুরের চীৎকার হইতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া, পিতা সন্ত্রস্তভাবে নিজেই বাহিরে ছুটিয়া গেলেন। আমি পিতার

অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; মাতা এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়া যাইতে দিলেন না—হাতে ধরিয়া বসাইলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁরে, আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?"

আমি এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কোথায় যাইবে ?" দেখিলাম তাঁহার চোখ ছল ছল করিতেছে।

"কোথায় কোন্ চুলায় যাইব, তা কেমন করিয়া বলিব ? তোদের ঘরে আর আমার স্থান হইবে না।"

"বাবা কি তোমায় কিছু বলিয়াছেন ?"

"পাকে প্রকারে বলিয়াছেন বই কি। আমিই তোদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। আমার জন্য বাবুর, দেশে-শুধু দেশে কেন লোকসমাজে, মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিবেন। শুধু তাই নয়, বিবাগী হইবেন। আমার অপরাধে তিনি বিবাগী হইবেন কেন! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?"

"কেন তোমাকে ছাড়িব ?"

"ছাড়িতেই হইবে। আমি থাকিতে তোদের ঘরে আর মঙ্গল হইবে না।"

"কোন্ পাষণ্ড এ কথা বলে ?"—আমরা চমকিতের মত দ্বারের দিকে চাহিলাম। দেখি, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে প্রবেশ করিতেছেন। সঙ্গে গণেশ-খুড়া, তাহার পশ্চাতে পিতা। পিতার পশ্চাতে আমাদের পুরাতন ভৃত্য সদানন্দ। তাহার এক হাতে একটি ক্যাম্বিশের বড় ব্যাগ। বোধ হয়, তাহার ভিতরে ঠাকুরদা'র বস্ত্রাদি, অন্য হস্তে হুঁকা, তাহার পশ্চাতে পাঁচু। কার্ত্তিক বোধ হয়, ইহাদের অনুসরণে ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

মাতা তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। আমিও প্রণাম করিলাম।

বৃদ্ধের সেই সহাস্যবদন। বিশেষতঃ আমাদিগকে দেখিয়া, তাঁহার আনন্দ আজ যেন বার্দ্ধক্যের নিগড় ভাঙ্গিয়া, দন্তহীন মুখের ওষ্ঠাধরে শৈশবের মাধুর্য্য ঢালিয়া দিতে বসিয়াছে।

ঠাকুরদা—মা ও আমার মস্তকে করস্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মাকে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ পাষণ্ড বলে তুমি থাকিতে দাদার ঘরে মঙ্গল হইবে না ? তুমি লক্ষ্মীরূপে দাদার গৃহে আসিয়াছিলে। মা! আমি সাক্ষী—গ্রাম সাক্ষী। তবে আমি প্রধান সাক্ষী। দাদা কবে কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমস্তই আমার খাতায় জমা আছে। অবশ্য বৌ-ঠাকুরাণীও লক্ষ্মী। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দাদার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাঁর চারগুণ লক্ষ্মী। তোমার আগমনের পর হইতে দাদা ঘরে ভারে ভারে টাকা আনিয়াছে। সব লেখা আছে। সে টাকায় জমি কিনিয়া, ধার দিয়া, যা করিয়াছি, সব লেখা আছে। দেশে চল মা, সমস্তই তোমাদের বুঝাইয়া দিব। আমার কাছে তোমাদের দশহাজারের বেশী টাকা আছে, এ কথা বলিতে ভরসা কর নাই। আমি শুনিয়া হাসিয়াছিলাম। তার চেয়ে ঢের বেশী, মা, ঢের বেশী। সব লেখা আছে।"

মা আর পূর্ব্বের মত বৃথা লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন—"টাকা আর চাই না। আপনার যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, তাই যথেষ্ট। মা আমার উপর রাগ করিয়া হুগলীতে আসিয়াও এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই।"

"সেটা মা, তাঁর বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়াছে।"

"কাকা-ম'শায়, আপনি আমার কলঙ্ক মোচন করুন। নহিলে বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ঠাকুরদার চরণযুগল ধারণ করিলেন।

গোবিন্দ-ঠাকুরদা মাকে আশ্বাস দিলেন। শুধু মাকে কেন, মাতৃদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আমাদের সকলকেই আশ্বাস দিলেন। আর আমরা সাহেব হইয়াছি বলিয়া, গণেশ-খুড়া তাঁহার কাছে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, তাহার জন্য মূর্খত্বের নানাজাতীয় বিশেষণে তাহার শ্রবণমূল চরিতার্থ করিয়া দিলেন।

গণেশ-খুড়া কোনও উত্তর না করিয়া, মেজের উপরে বসিয়া, ঠাকুরদার জন্য তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল। পাঁচু পিতার আদেশে সদানন্দকে নিজের বসিবার স্থানে লইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি, গোবিন্দ-ঠাকুরদার আগমনে বহুকাল পরে আমাদের হুগলীর বাসায় সেই পূর্ব্বযুগের আনন্দ ফিরিয়া আসিয়াছে।

এমন মহদাশয় ব্রাহ্মণ,—আমাদের ঘরে সাহেবিয়ানার নানা চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতেও তিনি যেন সে সমস্ত দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

একবার কেবল কথায় কথায় গণেশ-খুড়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "শিরোমণির ছেলে কি ম্লেচ্ছ হ'তে পারে রে! ও যে হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাই ওকে সাহেবের পোষাক পরিয়া থাকতে হয়। ওর ঐ পোষাক তুলিয়া দেখ—দেখবি উহার ভিতরে গৌতমের সুবর্ণকান্তি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।"

সে রাত্রিতে ঠাকুরদা-কর্ত্তৃক মাতাই রন্ধনাদির ভার প্রাপ্ত হইলেন। বহুকাল পরে "মাতা অন্নপূর্ণা"র কল্যাণে গোবিন্দ-ঠাকুরদার আমাদের সম্মুখে তৃপ্তিভোজন হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা হুগলী হইতে রওনা হইলাম। সে দিন শুক্লানবমী। মাস—জ্যৈষ্ঠ। সন্ধ্যা হইতেই একটা হু হু বাতাস ভাগীরথীর রজতধারাকে কোলে তুলিতে আসিয়াছিল। সেইজন্য ভাগীরথীবক্ষ বড়ই আন্দোলিত হইতেছিল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওনা হইতে পারি নাই। তা করিলে আমরা রাত্রি থাকিতে থাকিতে কালীঘাটে পৌঁছিতে পারিতাম।

পৌঁছিতে পারিলে আমাদের সুখের সংসার দীর্ঘযুগ-ব্যাপী নিরানন্দের ভাবে নিষ্পেষিত হইত না।

কালীঘাটে যখন পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। সেখানে আদিগঙ্গার ঘাটে এক আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, পিতামহী ও তাঁহার "পৌত্রবধূ" ও আর একটি স্ত্রীলোক সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে স্নান সারিয়া দেবী-মন্দিরে গমন করিয়াছেন।

বলিতে হইবে না আমরা সকলেই তাঁহাদের দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম।

এইস্থানেই সর্ব্বপ্রথমে মাতা ও পিতা সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার সম্বন্ধ জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ও গণেশ-খুড়ার কাছে। আমাকে বাধ্য হইয়া সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইল। বকুল বৃক্ষের তলদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেরূপ ঘটিয়াছিল, ঠাকুরদাদার সাহস ও পিতা-মাতার স্নেহের আশ্বাস পাইয়া আমি সব স্বীকার করিলাম।

তাহা শুনিয়া কি জানি কি এক সহসোদিত মমতায় মাতা ও পিতা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাদের খুঁজিতে দেবীমন্দিরের দিকে চলিলেন।

কিন্তু কোথায় তাঁহারা? দেবীমন্দিরে তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। কালীঘাটের যেখানে যে চটি-দোকান, সব তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ হইল। তাঁহাদের দেখা মিলিল না।

* * * *

দেশে ফিরিয়া ঘর খুঁজিলাম—ঠাকুরমা ঘরে ফিরেন নাই। সার্ব্বভৌমের কাছে সন্ধান লওয়া হইল ব্রাহ্মণ বলিতে পারিল না।

তাঁ[হা]র সঙ্গে পিতার অনেক কথা হইয়াছিল। সে সব কথা কহিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। পিতা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও দীনবেশী সার্ব্বভৌমকে এত কাল চিনিতে পারেন নাই। এত দিন পরে পিতৃকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব অনুভূত হইয়াছে। সত্যরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ 'কন্যা' আখ্যাধারিণী" কুমারীকে "হরিহর" নামধারী নারায়ণকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কন্যার উপর মমতার অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর সত্যপালনার্থ সে অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পিতামহী।

এক দুই, তিন—দেখিতে দেখিতে সাতদিন চলিয়া গেল, ঠাকুরমা ঘরে ফিরিলেন না। গোবিন্দ-ঠাকুরদা ব্যাকুল হইলেন, গ্রামশুদ্ধ লোক ব্যাকুল হইল। যে পিতামহী সকলের প্রাণ-স্বরূপিণী ছিলেন, এ সাত দিনে তাঁহার কোনও সন্ধান মিলিল না। এইবারে পিতা বুঝিলেন, তাঁহার মা চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি বুঝিলেন, শুধু তাঁহার কিংবা পুত্রবধূর উপর ক্রোধ করিয়া, তাঁহার জননী গৃহত্যাগ করেন নাই। কাম-লালসার নিঃশ্বাস-স্পর্শে পাছে এক অনাঘ্রাত দেব-নির্ম্মাল্য কলুষিত হয়, তাই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি কোনও আত্মীয়কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানান নাই। এমন কি, সাধু সার্ব্বভৌমকেও এ সম্বন্ধে কোনও কিছু আভাষ দেন নাই। এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লন নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, যেখানের যে সামগ্রীটি, সেইখানেই পড়িয়া আছে। কেবল যাঁর উপর আমাদের গৃহদেবতার পূজার ভার আছে, তাহার হস্তে তিনি ঘরের চাবী দিয়া গিয়াছেন।

পিতা সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিলেন, মাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। খুঁজিয়া পাইলেও তাঁহাকে গৃহে ফিরানো অসম্ভব। বুঝিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন। শৈশব হইতে সেই অল্পভাষিণী অল্পাশিনী জননীর স্থিরমূর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িল। ফিরাইতে পারিবেন না বুঝিয়াও তিনি পিতামহীর অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

২৬

দেশে পদার্পণ করিয়াই শুনিলাম, সত্যপালনের জন্য ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম তাঁহার শিশু কন্যাটিকে বালক আমার হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পিতামহীও আমার বিবাহ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—পত্রে পত্রে পিতাকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-শূদ্র, এমন কি, দেশের কৃতবিদ্য জমীদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই

জেনের পোষকতা করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও প্রেরিত অনেক অনুরোধ-পত্র পিতার নিকটে আসিয়াছিল।

কিন্তু পিতা কিছুতেই তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি দেশে ফিরিলেন না। এই বিবাহের ভয়েই পিতামহের 'সপিণ্ড'করণের কার্য্য পর্য্যন্ত অনিষ্পন্ন রহিয়াছে। পাছে, লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, আমার বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। পিতা সমস্ত লোক-নিন্দার ভার চিরজীবনের জন্য বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ বিবাহ না দিলে তাঁহাকে একঘ'রে হইতে হইবে, আমারও ভবিষ্যতে বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে—এরূপ অনেক বিভীষিকার পত্রও তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। এ সকল ভয়-প্রদর্শনে পিতা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প, কিছুতেই এই বর্ব্বরোচিত সামাজিক প্রথার সম্মুখে তিনি পুত্রবলি দিবেন না।

পত্রে পিতামহীকে তিনি বহুবার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতামহী তথাপি পিতাকে উত্যক্ত করিতে নিরস্ত হন নাই। শেষে তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে হুগলীতে পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়াছে। সেখানে পিতার কাছে তাঁহার কেবল তিরস্কার—দারুণ তিরস্কার লাভ হইয়াছে।

ইহাও শুনিলাম, সার্ব্বভৌম পিতাকে স্বহস্তে এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পিতাকে তাঁহার সত্য রক্ষার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সামান্য মাত্রও আড়ম্বর না করিয়া হরিহরের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দাও। কেবলমাত্র আমার সত্যরক্ষা—আমার ধর্ম্মরক্ষা কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিবাহের পর কন্যাকে তোমার গৃহে পাঠাইব না। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার পুত্রের সঙ্গে অন্য কন্যার বিবাহ দিও। আমি আপত্তি করিব না। কেহ ভবিষ্যতে উৎপীড়ন না করে, তাহারও ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইব। তুমি শুধু আমার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

পিতা এ পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। অতি অর্ব্বাচীনের মত লেখা বলিয়া বোধ হয়, পত্রের উত্তর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। অগত্যা ব্রাহ্মণকে আমার সম্বন্ধে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু—সত্য কি? ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার কথা লইয়া দেশমধ্যে কিছুদিন ধরিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কিছুদিন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জল্পনা চলিয়াছিল এ সত্য কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবাহ করিয়া বহুকালের মত দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। বালিকা পত্নীকে গৃহে রাখিয়া, শাস্ত্রশিক্ষার জন্য ভারতের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদ শিখিতে দ্রাবিড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া যখন তিনি দেশে ফিরিয়াছেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিজ্ঞা—স্বামীর স্মরণমাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্যে পূর্ণাভ্যস্তা। এ ত্রিশ বৎসর একেবারে তিনি নিরুদ্দিষ্টের মত কালযাপন করেন নাই। এক এক চতুষ্পাঠী হইতে এক এক প্রকারের দর্শন শেষ করিয়া, তিনি এক একবার গৃহে ফিরিতেন। দিন কয়েকের জন্য গৃহে অবস্থান করিয়াই, আবার অন্য শাস্ত্রশিক্ষার জন্য অন্য দেশে যাইতেন।

কিন্তু তিনি আসিতেন ব্রহ্মচারীর বেশে। পিতামাতার চরণ দর্শন করিতে, ব্রহ্মচারিণী পত্নীর পতিদর্শন-লালসা চরিতার্থ করিতে, তিনি মাঝে মাঝে এক একবার তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে, একান্ত সত্যনিষ্ঠ না হইলে, বেদবেদান্তে কাহারও পূর্ণ অধিকার জন্মে না। সেই ব্রাহ্মণ সত্যরক্ষার জন্য কাতরভাবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এ সত্য কি? রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেট তাঁহার বিচারমন্দিরে আনীত বদ্ধহস্ত যিশুখৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সত্য কি?" কিন্তু তিনি ইহার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষের শ্রীমুখ-বিনির্গত বাণী শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মনে হয়, সত্য শুনিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই।

পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গিয়াছিলেন। এ কথা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুর একজনেরও বোধ হয় অবিদিত নাই। অথচ এখনকার জ্ঞানের হিসাবে তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিলে, তাহাকে গণ্ডমূর্খ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যে দিন রামচন্দ্র—ঋষি অষ্টাবক্রের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যদি প্রাণসমা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না";—ঠিক সেই দিনেই দুর্ম্মুখ প্রজার নিকট হইতে জানকী সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আনিয়া উপস্থিত হইল। ফলে জানকী নির্ব্বাসিতা হইলেন। সতীশিরোমণি একটা রজকের অসংযত জিহ্বায় উচ্চারিত তুচ্ছ কথার জন্যের মত পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিতা হইলেন। পুরুষের এরূপ নিষ্ঠুরতা ত আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। অথচ সমগ্র হিন্দুর চক্ষে সেই রাম শান্ত, শাশ্বত, অপ্রমেয়, অনঘ!

দস্যুর আক্রমণ হইতে এক নিরীহকে রক্ষা করিতে

অস্ত্র আনিবার জন্য অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সহিত অবস্থিতা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ফলে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তাঁহার নির্ব্বাসন!

এ তাঁহার স্বেচ্ছাগৃহীত শাস্তি। পরোপকার-প্রবৃত্তির দোহাই দিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য! —সত্যভঙ্গভয়ে তৃতীয় পাণ্ডব গৃহত্যাগ করিলেন। কাহারও অনুরোধ রহিল না।

কেহ কি বলিতে পার, এ সত্য কি? বড় বড় কথা আমরা অনেক কহিয়াছি। এখনও অনেক বড় বড় কথা কহিতেছি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "সত্যমেব জয়তে," "নাস্তি সত্যাৎ পরোধর্ম্ম," "সত্যং বলং কেবলং"—এইরূপ মহাবাক্য আমরা মুখে কতবারই না উচ্চারণ করিয়াছি। কিন্তু যদি আমরা কোন সাধুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, হৃদয়ে হস্ত দিয়া, মুখের পানে চাহিয়া—প্রশ্ন করি, সত্য কি, আমার এখনও বিশ্বাস, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকেরই হস্ত হৃদয়-প্রদেশ হইতে নামিয়া পড়ে। প্রশ্নের উত্তর শুনিতে সাহস থাকে না পাইলটের মত সাধুর মুখ হইতে উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমাদের স্থানত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। যে শুনিবার জন্য দাঁড়াইতে পারে, তুমি বুঝিবে, তাহারও কতকটা সত্যের উপলব্ধি হইয়াছে।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এই বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন এখানে একটি লোককেও মিথ্যাবাদী দেখিতে পান নাই। এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠ জাতিকে তিনি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হাজার বৎসর পরে 'মিথ্যাবাদীর কীর্ত্তিস্তম্ভ' বলিয়া সেই বাঙ্গালীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাছে গালি খাইতে হইয়াছে। এ কথা শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। অথচ যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সত্য কি, এই প্রশ্ন করিলে প্রাচ্যের উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইতে সাহস করেন না।

বর্ত্তমান সভ্যতার অনুভূতির সীমান্তে অবস্থিত সেই সত্য এক সময় বাঙ্গালীর অবলম্বন ছিল। তাহার স্বরূপ কি, এখন আমাদের বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে কার্য্য এখন আমাদের পুরুষকারের সাধ্যায়ত্ত নহে, এখন আমরা কেবল তাহার দোষানুসন্ধানেরই চেষ্টা করি এবং তৎপরিবর্ত্তে একটা মিথ্যার প্রতিষ্ঠায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের উপর দোষারোপ করি।

সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অনুপস্থিতির অবকাশে বাঙ্গালার প্রকৃতি কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর পূর্ব্ব চরিত্রের উপর দিয়া কি প্রবল ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এই বাগ্‌দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন অবস্থানের পর এ পরিবর্ত্তন তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণগৃহ হইতে ব্রহ্মচর্য্য ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এখন যে ভাবে তাহাদের শিক্ষা, তাহাতে ব্রাহ্মণবালকের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থারক্ষা বড়ই দুরূহ।

কিন্তু তখন আর উপায় নাই। কার্য্য আগে হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহদেবতার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি আমাকে কন্যাদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন যেমন করিয়া হউক, সে সঙ্কল্প তাঁহার রক্ষা করিতেই হইবে।

সে সময়েও গ্রামবাসী তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। প্রতিজ্ঞারক্ষায় পিতার অনাস্থা দেখিয়া তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল মাত্র। এমন কি, গোবিন্দ-ঠাকুরদাও বুঝিতে পারেন নাই, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইবার দুই একমাস পরে কন্যার বিবাহ হইলে সার্ব্বভৌমের ধর্ম্মসম্বন্ধে কি অনিষ্ট হইবে! তিনি আমার সঙ্গে তৎকন্যার বিবাহের আশ্বাস তাঁহাকে দিয়াছিলেন। "অঘোরনাথকে বাধ্য করিবার উপায় আমার কাছে আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার কন্যার বিবাহের জন্য আমি দায়ী রহিলাম। দুই দিনের বিলম্বে আপনি ভীত হইবেন না।"

ব্রাহ্মণ এ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হন নাই। আশ্বাস বাক্য কাণেও তুলেন নাই। তিনি ধর্ম্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আমার পিতা যদি আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে, কি উপায়ে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হয়, সেই উপায় তিনি গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক জন কেবলমাত্র তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতামহী।

পিতামহী বুঝিয়াছিলেন, পিতা সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। যদিও দেন, তাহা এমন সময়ে দিবেন যাহাতে ব্রাহ্মণের বাগ্‌দানের কোনও ফল হইবে না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। তিনিই কেবল ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিতে পারেন নাই। কোন্ মুখে তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবেন! ব্রাহ্মণের বিপদে, স্বামীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার যে দুঃখ, তিনি সে দুঃখ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন।

তিনি ব্রাহ্মণকে দেখিলে, কেবলই কাঁদিতেন। তাঁহার কাছে আশ্বস্ত হইতে আসিয়া, ব্রাহ্মণের তাঁহাকেই আশ্বাস দিতে হইত।

প্রতীকারের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া পিতামহী ব্রাহ্মণের সমক্ষে কাঁদিতেন এবং তাঁহার অন্তরালে কুলদেবতার কাছে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রার্থনা করিতেন। অনেক দিনের প্রার্থনায়ও যখন কিছু ফল হইল না, বৃদ্ধা যখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আর কিছুতেই রক্ষা হয় না, তখন মনের আবেগে কুলদেবতার সম্মুখে তিনি এক সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। করযোড়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন "ঠাকুর! বালিকার দশবৎসর উত্তীর্ণ না হইতে যেমন করিয়া হউক, হরিহরকে আনিয়া দাও। আমি চক্ষুর উপর ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশ দেখিতে পারিব না। যদি না আন, তোমার সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এই গৃহ পরিত্যাগ করিব।"

তাঁহার প্রতিজ্ঞার পর দিবসেই প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ পাগলের মত পিতামহীর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে এক শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন। শিলা স্থাপন করিয়া বাষ্পগদগদস্বরে বলিলেন—"মা! আমি হরিহর পাইয়াছি। আমার ধর্ম্মরক্ষা হইবার উপায় হইয়াছে! এই মাসেই বিবাহের এক প্রশস্ত দিনে তোমার এই পৌত্রের হাতে আমার দাক্ষায়ণীকে সমর্পণ করিব।" পিতামহী দেখিলেন শিলা—শিলা অপূর্ব্ব! তাহার একাংশ তুষার শুভ্র। অপরাংশ ঘনকৃষ্ণ। একদিকে হরির—অপর দিকে হরের অঙ্গকান্তি।

অন্যে এই সকল কথা শুনিলে, তাঁহাকে পাগল মনে করিত। পিতামহী কিন্তু তাহা করিলেন না। সার্ব্বভৌমের জ্ঞানের উপর তাঁহার অণুমাত্রও সংশয় ছিল না। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজে শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইলেও এটা জানিতেন, সার্ব্বভৌমের তুল্য পণ্ডিত ও সাধু, সে দেশে—সে দেশে কেন—সমস্ত বঙ্গদেশে তখন একজনও ছিল না। পিতামহী পিতামহের কাছে এ কথা শুনিয়াছিলেন। স্বামি-বাক্যে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

সুতরাং সার্ব্বভৌমকে তিনি পাগল মনে করেন নাই। বুঝিয়াছিলেন, হরিহরের অভাবে এই শালগ্রাম-শিলাতেই তাঁহার পৌত্রত্বের আরোপ করিয়া, ইহাকেই ব্রাহ্মণ কন্যাদান করিবেন।

দেবতার উপর অগাধ ভক্তি থাকিলেও—এক শিলাকে লক্ষ্য করিয়া, ব্রাহ্মণের কন্যাদানের চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র পিতামহীর প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের আবেগে তিনি নয়নযুগলকে অশ্রুশূন্য করিতে পারিলেন না।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ত আনন্দের কথা! নারায়ণ পৌত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া তোমার কোলে আসিতেছে! তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন মা?" পিতামহী উত্তর করিলেন—"আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। তবে কি জানেন ঠাকুর, আপনার মত আমার দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই। আপনি ইঁহাকে যেরূপ দেখিতেছেন, এ মমতান্ধের সেরূপ দেখিতে সামর্থ্য নাই। আমার অনুরোধ, এই দেবতাকে কন্যাদানের পূর্ব্বে আপনি একবার আমার সঙ্গে হুগলী যান।"

"বেশ যাইব!"

ঠিক এমনি সময়ে গণেশ-খুড়াকে হুগলী পাঠাইবার জন্য পিতামহীর কাছে পিতার পত্র আসিল। পিতামহীরও হুগলী-যাত্রার সুযোগ ঘটিল। যাত্রার ফল সমস্তই পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

২৭

এখন শুধু পিতামহীকে ও তৎসঙ্গে অভাগিনী সার্ব্বভৌম-কন্যাকে ঘরে ফিরাইবার কথা। "অভাগিনী—তাহার ভাগ্য ভাল কি মন্দ, এ কথা বিচার করিবার কাহারও সে সময় অবসর ছিল না। তাহার বিবাহের তত্ত্ব বুঝিতেও অতি অল্প লোকেরই সে সময় সামর্থ্য ছিল। সার্ব্বভৌমের কন্যাদান-মহোৎসবের প্রকৃতি দেখিয়া, সে দেশের প্রায় সমস্ত লোকেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল। আত্মীয়স্বজন ব্রাহ্মণের মন রাখিতে এই বিবাহ-ব্যাপারে যোগ দিলেও, অনেকেই অন্তরালে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। দক্ষিণ রায়ের আস্তানার সম্মুখ হইতে যে প্রৌঢ়া রমণী আমাকে বনভোজন করাইতে আমলকীতলে রমণীমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত করাইয়াছিল—শুনিয়াছি, বিবাহের দিন হইতেই "দাখীর" শোকে অন্নজল ত্যাগ করিয়া সে একরূপ মরিতে বসিয়াছে।

আর দাক্ষায়ণীর মা? এতকাল আমি কেবল আমাদের দিক্ হইতেই এ ইতিহাসের কথা বলিয়া যাইতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, সে বালিকার সঙ্গে আজিও পর্য্যন্ত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আমাদের সে সম্পর্ক লইয়া, এতটা বাগাড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। যাহা কিছু বলিবার, তাহা সেই মহীয়সী রমণী সম্বন্ধে বলিলেই সমীচীন ও শোভন হইত। যাহা কিছু ক্ষতি হইবার তা তাঁহারই হইয়াছে! তাঁহার "বত্রিশনাড়ী" ছেঁড়া ধন আজ পথে পরিত্যক্ত হইয়াছে! সংসার পথে অগণ্য পথিক—সকলেই কি পথ দেখিয়া চলে? ধূলিধূসরিত এই অমূল্য রত্ন কত রূঢ় চরণতলে পড়িয়া যে পিষ্ট হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

পুত্র বলিতে—কন্যা বলিতে—বংশধর—এমন কি

ব্রাহ্মণদম্পতির সাধনার ফল বলিতে ওই একমাত্র কন্যা দাক্ষায়ণী; তাহার পরে অথবা পূর্ব্বে তাঁহাদের পুত্র কিংবা কন্যা কিছুই হয় নাই। এমন অমূল্যনিধি তাঁহাদের -বুঝি জন্মের মত- চোখের অন্তরাল হইয়াছে। এ বিয়োগ বালিকার মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়,—না মৃত্যু হইতেও ভীষণ? মৃত্যুতে একটা সান্ত্বনা আছে। অন্য অন্য পুত্রকন্যা-হীনের অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার একটা তুলনা আছে। পৃথিবীর দুঃখ বিয়োগের জ্বালা যন্ত্রণা বৈতরিণী পার হইয়া স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না বুঝিয়া, সময়ে সময়ে মনের একটা নিশ্চিন্ততা আছে। এমন কি, শোকের তীব্রতা কালবশে অপসারিত হইলে, হারানিধির স্মরণে নৈরাশ্যের মধুময় নিশ্বাসস্পর্শের একটা অবসাদ আছে। সেই মমতাময়ী প্রিয়-স্মৃতি আকাশ-প্রান্তগামিনী অবিরাম হাস্যময়ী কাদম্বিনীর দূরাগত ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কত আশ্বাস-কথা বায়ুসাগরে মিলাইয়া মিলাইয়া, "মধু'তোঽপি চ মধুরং" করিয়া নীরবতার মাদকতা মাখাইয়া, বিয়োগীর অন্তঃশ্রবণে ঢালিয়া দেয়!

কিন্তু এ বিয়োগ ত তাহা নয়! আমার প্রিয় জীবিত আছে—এ বিশাল ধরণীর কোন্ অন্তরালে, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে লুকাইয়া আছে! আমি দেখিবার জন্য ব্যাকুল অথচ তাহাকে দেখিতে পাইব না। এ কথা মনে করিতে গেলেই বিশাল ধরণী দেহসঙ্কোচে সমস্ত ভার কেন্দ্রস্থ করিয়া, যেন হৃদয়ের জীবন-স্পন্দনটাকে চাপিয়া ধরে! জীবন তখন একটা প্রচণ্ড যাতনার কারণ হইয়া উঠে। অথচ ম'রতে সাহস নাই কি জানি, মরণের পরমুহূর্ত্তেই যদি প্রিয়তম কাছে আসিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বসে!

এইরূপ দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতে যিনি এক-মাত্র বালিকা কন্যাকে গৃহ হইতে কোন অজ্ঞাত দেশে বিদায় দিয়াছেন, সেই সাধ্বী জননীর কথা একটিও কি কহিতে পাইব না?

কেমন করিয়া কহিব! তখন আমি বালক—পিতা-মাতার মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ—বন্দী। গৃহের দ্বার হইতে বাহিরের পথে একটি পদও অগ্রসর হইবার আমার ক্ষমতা নাই। কাহারও নিকট হইতে তাহার অবস্থা জানিবারও আমার উপায় নাই। কেমন করিয়া বুঝিব, আপনাদেরই বা কেমন করিয়া বুঝাইব, কি ভাবে তাঁহার দিন যাইতেছে!

তথাপি কালস্রোতে প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলিদানের মত পরস্পরের অসম্বদ্ধ যে দুই একটা কথার গুচ্ছ সেই সময় ভাসিয়া আমার কাণে লাগিয়াছিল, তাহাই আমি বলিব এবং এই বর্ণনা হইতেই সার্ব্বভৌমপত্নীর মহত্ত্বের পরিচয় দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অনেক কথা গণেশ-খুড়ার মুখেই শুনিয়াছি। আমা-দের গ্রামত্যাগের পর হইতে খুড়াই একাকিনী পিতামহীর অনুচরের কার্য্য করিয়াছে। ভৃত্য সদানন্দ ও খুড়া—উভয়ে মিলিয়া ঠাকুরমার যখন যা অভাব হইত, পূরণ করিত। ঠাকুরমার আদেশে তাহাকে মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইতে হইত। সেখানে সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে অনেক কথা হইত। দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের "বাগ্‌দান" প্রথা বিবাহেরই সঙ্গে একরূপ তুলনীয়। পুত্র অথবা কন্যা—এ উভয়ের মধ্যে এক জন মৃত্যুমুখে না পড়িলে, উভয়ের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বর বাঁচিয়া থাকিতে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হয় নাই, ইহা আমাদের দেশে কেহ শুনে নাই। এই জন্য সার্ব্ব-ভৌম-গৃহিণী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই যে, তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। বনভোজন দিবসে মহিলা-মণ্ডলী মধ্যে মায়ের আচরণ দেখিয়া তিনি কেবল একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন—"কোপন-স্বভাবা শাশুড়ীর হাতে পড়িয়া, তাঁহার প্রিয় নন্দিনীকে সময়ে সময়ে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। দাক্ষায়ণীর শ্বশ্রূ-সৌভাগ্য ঘটিবে না।"

এই জন্য আমাদের প্রথম মিলনের পর হইতেই তিনি কন্যাকে ভাবী শ্বশুর-গৃহবাসের জন্য প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। শাশুড়ীর মেজাজ বুঝিয়া কেমন করিয়া চলিতে হইবে, কিরূপ ভাবে চলিলে, স্বভাবকে কিরূপ ভাবে গঠিত করিলে কোপন স্বভাবারও প্রিয়পাত্রী হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয় লইয়া, তিনি কন্যাকে বধূর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছিলেন; এমন সময় তিনি শুনিলেন, আমার পিতা তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। অথবা যদি বিবাহ দেন, তাহা হইলে, আমার বি, এ-পাশ না করা পর্যান্ত তিনি কোন মতেই বিবাহ দিতে পারিবেন না। সে সময় আমার বয়স হইবে, আন্দাজ একুশ এবং দাক্ষায়ণীর আঠারো কিংবা উনিশ। যদি প্রথম পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারি, তাহা হইলে বয়স আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই দীর্ঘ সময় যদি সার্ব্বভৌম কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে পারেন, তবেই বিবাহ হইবে নতুবা তিনি কন্যাকে অন্যপাত্রস্থা করিতে পারেন।

পিতা পিতামহীকে উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং পত্রমর্ম্ম ব্রাহ্মণকে অবগত করাইতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। সেই কথা শুনাইবার ভার গণেশ-খুড়ার উপর পড়িয়াছিল। খুড়ার নিকট হইতেই এই সময়ের ইতিহাস আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

খুড়ার কথাতেই আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

"আমি মূর্খ গণ্ডমূর্খ। গণেশের মা'র পুত্র, এই গৌরবের উপাধি লইয়াই মত্ত। আমি নিজেকে লইয়া, আর নিজের সংসারের কাজ কর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম। অন্যের ঘরের ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বুঝিতাম না। সুতরাং অঘোর দা'র বাড়ীতে হরিহরের বিবাহ লইয়া কি যে গোলমাল চলিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। মূর্খ বলিয়া আমার কোম্পানীর চাকরী করা ঘটিবে না, আর চিরকালের দাদাকে হুজুর বলা চলিবে না বলিয়া, আমি মনে মনে ভবিষ্যতের চাকরীকে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি।

"এখন আমি মাকে বুঝাইয়া, স্ত্রীকে বুঝাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছি। প্রথম প্রথম শালতী হইতে পলাইয়া আসিবার দরুণ উভয়েরই অনেক মুখনাড়া খাইয়াছিলাম। জ্যেঠাইমা কৃপা করিয়া, দাদা হাকিম হইবার ফলে নিজের অবস্থা দেখাইয়া, উভয়কে বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্যেঠা মহাশয়ের সপিণ্ডকরণে দাদা দেশে ফিরিল না দেখিয়া, মায়ের চক্ষু ফুটিয়াছে। এখন সকলের ভয় হইয়াছে, হঠাৎ কোন রোগ হইলে, নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের মত লোকাভাবে বুঝি জ্যেঠাইমাকে ঘরে মরিতে হয়!

"তাই গোবিন্দ-খুড়া আমাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে খুড়া আমার সংসার-প্রতিপালনের ল্যাঠাটাও মিটাইয়া দিয়াছে।

"আমি জ্যেঠাইমা'র কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। অমন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, উপযুক্ত পুত্র, অমন সোনারচাঁদ নাতী, সব থাকিতে জ্যেঠাইমার যেন কেহ নাই। আমার পাঁচ বছরের ছেলে এখন তাঁর একমাত্র আদরের পাত্র হইয়াছে! আমার তিন বছরের মেয়ে তাঁর ঘাড়ে পিঠে চাপিয়া, তাঁর পূজার সামগ্রী ফেলিয়া, তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছে! দাদার বাড়ীটা অরণ্যের মত বোধ হইত বলিয়া ছেলেমেয়েটাকে তাঁর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াছি। আমার বউ এখন তাঁর পদসেবা করে। আপনার সামগ্রীগুলিকে যেন হারাইয়া দয়াময়ী এ দরিদ্র গণ্ডমূর্খের পরিবারগুলাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন।

"মনে মনে ভাবি, দাদার হাকিমীতে জ্যেঠাইমা'র কি লাভ হইল—দেশেরই বা কি উপকার হইল! লাভের মধ্যে তুচ্ছ দু'দশটা টাকার জন্য ঘরের ছেলে পর হইতে বসিয়াছে। বৈকুণ্ঠের লোভেও বৃদ্ধ মা-বাপকে ত্যাগ করিতে নাই। যাঁর করুণায় পৃথিবীতে আসিয়াছি, তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ মানের লোভে সেই গর্ভধারিণীকে পরিত্যাগ! আমি মায়ের উপর মাঝে মাঝে রাগ করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব, এ কথা একদিনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। দাদার সঙ্গে বিদেশে যাইবার সময় মায়ের মুখ মনে পড়াও আমার পথ হইতে পলাইয়া আসিবার আর একটা কারণ। আমি এক এক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া অঘোরদা'কে উদ্দেশে ধিক্কার দিতাম। আর বউঠাকুরাণীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতাম। আমার বোধ হইত, বউঠাকুরাণীই দাদাকে আমাদের পর করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীবশ হইয়া দাদার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তবে আমি গণ্ডমূর্খ। পণ্ডিতের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য আমার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"আমার সকল কথা তোমরা ধরিও না। আমি যেটা সত্য মনে করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। বাস্তবিকই বউ-ঠাকুরাণীর উপর মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। পুত্র পৌত্রের স্মরণে সদানন্দময়ী জ্যেঠাইমার মুখ এক একদিন বড়ই মলিন হইয়া যাইত। আমাদের মত অভাগ্যগুলাকে আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়া, এক এক দিন জ্যেঠাইমা সকলকে লুকাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া, 'হাপুষনয়নে' কাঁদিতেন। মাঝে মাঝে আমি তা দেখিতে পাইতাম। সে সময় তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হইত না। তবে দূরে দাঁড়াইয়া, মনে মনে দাদা ও বউ-ঠাকুরাণীকে গালি পাড়িতাম।

"আমি যেমন মূর্খ, তেমনি মূর্খেরই মত বুঝিলাম। স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, জ্যেঠাইমা কেবল হরিহরের বিবাহের চিন্তাতেই এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি নাই, তাঁহার যে নির্জ্জনে বসিয়া রোদন, সে পুত্র পৌত্রকে না দেখিবার জন্য নয়, সান্ন্যোমের কন্যার সঙ্গে হরিহরের বিবাহ দিতে দাদার ইচ্ছা নাই বলিয়া!

"যখন বুঝিলাম দাদা হরিহরের বিবাহ দিবে না, তখন কন্যার দশবৎসর পূর্ণ হইতে সবে মাত্র একটি মাস অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে আবার বিবাহের দুইটিমাত্র দিন। এই দুই দিনের যে কোন একদিনে বিবাহ হইল ত হইল, নহিলে দশমবৎসরে আর সান্ন্যোমের কন্যার বিবাহ হইল না।

"এ কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে! আমাদের সমাজে আজও পর্য্যন্ত কেহ যাহা করে নাই, করিবার কথা মনেও আনিতে পারে নাই, আমার পাঁচটা পাশ করা ধর্ম্মাবতার' দাদা কি তাই করিবে! নারায়ণ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে করা যে বাগ্‌দানের প্রতিজ্ঞা, তা ভঙ্গ করিবে।

"সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন অঘোরদা'কে দেখি নাই বলিয়া, তাঁহাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। একবৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বাড়ীতে না আসিলেও, মনে মনে বিশ্বাস ছিল, হরিহরের বিবাহ দিতে তাঁহাকে

স্ত্রীপুত্র লইয়া বাড়ীতে আসিতেই হইবে। সেই আশায় নির্ভর করিয়া একরূপ নিশ্চিন্তের মতই দাদার দেশে ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

"আমি যখন জ্যেঠাইমা'র কাছে প্রথম এ কথা শুনিলাম, তখন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতেই পারি নাই। কিন্তু শেষে বিশ্বাস করিতে হইল। বিবাহ সম্বন্ধে দাদা জ্যেঠাইমাকে অতি নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র সাভ্যোম-ম'শায়ের কাছে লইয়া যাইবার ভার আমারই উপর পড়িয়াছে। পত্রের মর্ম্মকথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথা টলিতে লাগিল। সেই অবস্থাতেও জ্যেঠাইমা'র আদেশে ব্রাহ্মণের কাছে আমাকে পত্র লইয়া যাইতে হইল।

"সাভ্যোম-মহাশয়ের বাড়ীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যা না হইলেও তার ছায়া আগে হইতেই যেন ব্রাহ্মণের সদর-বাড়ীর উঠান অধিকার করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যতবার যখনই আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, একটিবারও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপ আমি লোকশূন্য দেখি নাই। ছাত্র, প্রতিবেশী, প্রবাসী, সাধু সন্ন্যাসী, যখনই গিয়াছি, অন্ততঃ একজনকেও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে দেখিয়াছি।

"আশ্চর্য্যের বিষয়, সেদিন সেখানে একটি প্রাণীও ছিল না। কেবল কতকগুলা ছেলেমেয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীর সম্মুখে গ্রাম্যপথে ধুলা উড়াইয়া খেলা করিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে কেহ নাই দেখিয়া, আমি একটু যেন বিপদে পড়িলাম। সাভ্যোম-ম'শায় যদি বাড়ীর ভিতর থাকেন, তাহা হইলে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে, তিনি শুনিতে পাইবেন না। অথচ তাঁহাকে ডাকিতে আমার সাহস নাই।

"আমি কিছুক্ষণের জন্য উঠানটায় পায়চারী করিলাম। তবু সাভ্যোম-ম'শায়, অথবা অন্য কেহ সেখানে আসিল না। ছেলেগুলা থাকিয়া থাকিয়া, প্রকাণ্ড বটগাছে রাত্রি-বাসী পাখীগুলার মত এক একবার গণ্ডগোল করিয়া উঠিতেছিল। মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কন্যা এই বালক-বালিকাদিগের ভিতর থাকিতে পারে।

"এই মনে করিয়া একবার তাহাদের নিকটে গেলাম। সেখানে দাক্ষায়ণী অপেক্ষা বড়, ছোট, সমবয়সী, অনেক ছেলেমেয়ে দেখিলাম; কিন্তু দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তাহারা সে স্থানে আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনে খেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের মধ্যে যে কোন একজনকে—সাভ্যোম-ম'শায়কে আমার আসার খবর দিতে অনুরোধ করিলাম। কেহ আমার কথায় কাণ দিল না।

"আবার আমি ফিরিলাম। এবার আর উঠানে পায়চারী না করিয়া, যতক্ষণ হয়, সাভ্যোম-ম'শায়ের অপেক্ষা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলাম। দেয়ালে ঠেসানো মাদুর লইয়া বারান্দায় পাতিয়া বসিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপে বিছানো সপের একধারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে খোলা একখানা পুঁথি—পুঁথির লেখার উপর চোখ রাখিয়া, মাথাটি নামাইয়া, বালিকা আসনপিঁড়ি হইয়া যেন পূজার ভাব করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাব দেখিয়া, মাদুর-হাতে আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলাম। এই বয়সে দাক্ষায়ণী কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছে!

"অনেকক্ষণ আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে একটিবারের জন্যও সে মাথা তুলিল না। মাথাটি অল্প অল্প নড়িতেছিল। বুঝিলাম, তাঁহার দৃষ্টি পুঁথির এক দিক্ হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতেছে। পরণে একখানি সুন্দর চেলি। মাথাটি খোলা, এলো চুলগুলি পিঠ ঘেরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কতকগুলা মাদুর স্পর্শ করিয়াছে। চেলির আঁচলাও পুঁথির পাশে পড়িয়া লুটাইতেছে; হাতে জড়ান হাত কোলের উপর রাখা। যেন ধ্যানের মূর্ত্তি। গণ্ডমূর্খ আমি সে শোভার কথা কেমন করিয়া বলিব? সরস্বতীর সঙ্গে আমার চির-শত্রুতা। পাঠশালে তালপাতায় লেখা, কিল্লী আর্ক পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার মাপ। সেই দিন দাক্ষায়ণীকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রথম সরস্বতী ঠাকুরাণীর উপর আমার ভালবাসা জন্মিল। সাভ্যোমের সেই মেয়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল, মা যেন বালিকা দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি ধরিয়া, পুঁথির ভিতর হইতে তাঁরই ছড়ান বিদ্যা দৃষ্টিতে ধরিয়া, আঁচল পাতিয়া, কুড়াইয়া লইতেছেন।

"মা আমার মাথাও তুলে না, আমাকেও দেখিতে পায় না। ভাবিলাম, কি করি? মূর্খ আমি- বিদ্যার মর্ম্ম জানি না—তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলে কি পাপ হইবে কে জানে?

"আর কি বলিয়াই বা তাহাকে ডাকিব! ইহার পূর্ব্বে এখানে যত বার আসিয়াছি, তত বার মাকে 'বউমা' বলিয়া ডাকিয়াছি। যে খবর আজ আমি তাহার বাপকে দিতে আসিয়াছি, তাহাতে তাহাকে বউমা বলিয়া আবার আমি কেমন করিয়া ডাকিব? ও মধুর নামে তাহাকে ডাকিতে আমার মুখ রহিল না। দাক্ষায়ণীকে আমাদের ঘরের সামগ্রী বলিতে আ-র আর ভরসা কই?

"তাহাকে ডাকিতে গিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কে যেন একটা কঠিন হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"শুনিয়াছি, বেদও যা, সত্যও তা। সেই বেদ

আমাদের বংশের আদি। আমাদের জাতির জন্ম বেদে—সত্যে; তাই আমাদের উপাধি বৈদিক। সত্যেই আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠা। সেই বৈদিকের ঘরে সত্যের মর্য্যাদা থাকিবে না, 'বাগ্‌দানের' প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, আমাদের এমন দুর্দ্দিন আসিবে, তা কি আমি জানি! আমি তাহাকে বউমা বলিতে পারিলাম না, কাজেই কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। দুঃখে ক্ষোভে আমার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"কিন্তু আর কথা না কহিলে চলে না! সন্ধ্যা নিকট হইতেছে! চণ্ডীমণ্ডপে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের হস্তে চিঠি দিয়া এখনি আমাকে ফিরিতে হইবে। জ্যোঠাইমা উৎকণ্ঠার সহিত আমার ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছেন। চিঠি পড়িয়া ব্রাহ্মণ কি উত্তর দেয়, জ্যোঠাইমাকে বলিতেই হইবে।

"আমি বলিলাম—'আর কেন মা দাক্ষায়ণি'?—নাম করিবামাত্র বালিকা মাথা তুলিল। আমার পানে চাহিল। দেখিলাম, এখনও তার শূন্যদৃষ্টি। বুঝিলাম, পুঁথি হইতে তাহার চোখ উঠিয়াছে বটে, মন কিন্তু এখনও উঠে নাই।

"এ শূন্যদৃষ্টির কারণ নির্ণয় করিয়াছি মনে করিয়া আমি আবার বলিলাম—'মা! অন্ধকারে পড়িলে চোখের ক্ষতি হইবে।'

"ইহার পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী আমাকে যতবার দেখিয়াছে, ততবারই—বউ-মানুষ শ্বশুরকুলের গুরুজন দেখিলে যা' করে—সরম দেখাইতে গায়ে মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, যত সত্বর পারে চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

"আজ দুই দুইবার সে আমার কথা শুনিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত পলাইল না। প্রথমে সে আঁচলটি উঠাইয়া কাঁধে ফেলিল। তার পর পুঁথি-জড়ানো কাপড়ে পুঁথিখানিকে সযত্নে বাঁধিতে লাগিল। আমি তাহার ভাব দেখিয়া কিছু অপ্রতিভের মত হইলাম। তাহাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?' ঈষৎ হাসিয়া—ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া—দাক্ষায়ণী আমাকে বুঝাইল—'চিনি।'

"তার পর পুঁথিখানি কুলুঙ্গির উপরে রাখিয়া, একটি আসন লইয়া সে তাহা সেই সপের উপরই পাতিল, এবং আমাকে তার উপর বসিতে অনুরোধ করিল। বলিল—'বাবা স্নানে গিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ না ফিরেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।'

"এতকাল তাহাদের বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু একটি দিনের জন্যও তার মুখের কথা শুনি নাই। আজ শুনিলাম! সরস্বতীর কৃপা কখন পাই নাই—এ জন্মে আর পাওয়া ঘটিবে না জানিয়া, মূর্খের যতটুকু শক্তি, প্রতি বৎসরের শ্রীপঞ্চমীতে এক একবার বোবা সরস্বতীরই পূজা করিয়াছি। তাই বুঝি আজ মা আমার প্রতি কৃপা করিলেন! সরস্বতী কথা কহিলেন। কথা কি মধুর! ইহজন্মে এমন মিষ্ট কথা শুনি নাই। রূপ—আগে দেখিয়াও দেখি নাই এখন দেখিলাম! 'হা হতভাগা অঘোরদা'! এমন মেয়ের সঙ্গে তুমি ছেলের বিবাহ দিলে না! এমন সুশ্রী 'কনে' শুধু এ দেশে কেন, সারা বঙ্গের ভিতরে আর কি তুমি খুঁজিয়া পাইবে! পায়ে-পড়া এলো চুল, ময়ূরকণ্ঠী চেলিতে ঢাকা অঙ্গ, চাঁদমুখে চোক দুটা বসা'তে গিয়া বিধাতার হাতটা যেন কাঁপিয়া গিয়াছে! আজও পর্য্যন্ত যেন কম্প চক্ষুদুটিকে ছাড়িতে পারে নাই। আমি দেখিতে লাগিলাম। মুখ দেখিলাম—চোক দেখিলাম—শাখার বরণ হাতখানিতে শাঁখা দেখিলাম,—সবার শেষে দুইটি চরণ দেখিলাম। চরণ থেকে চোখ আর উঠিতে চাহিল না। ভিতর হইতে কেহ যদি কলসীখানেক জলের স্রোতে চোখ দু'টাতে আমার আঘাত না করিত যদি না হঠাৎ আমি অন্ধের মত হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে কতক্ষণ সে রাঙ্গা চরণ দেখিতাম, তার ঠিক কি?

"মাদুর রাখিবার ছলায়, মনের ভাব চাপিয়া, আবার আমি কথা কহিলাম। একবার শুনিয়া তৃপ্তি পাই নাই, আবার তাহার কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল। আর ত আমি তার কথা শুনিতে পাইব না! সে মর্ম্মভেদী খবর দিবার পর, আবার কোন্ মুখে আমি সার্ব্বভৌম-মহাশয়ের বাড়ীতে আসিব। দাদার আচরণে আমাদেরও পর্য্যন্ত মাথা হেঁট হইতে চলিয়াছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। যে কোন উপায়ে তার মুখের দু'একটা কথা শোনা চাই বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার বাবা কি দু'বেলা স্নান করেন?'

'ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার স্নান করেন।'

'তুমিও তাই কর নাকি? তোমার এলোচুল দেখিয়া আমার তাই বোধ হইয়াছে।' 'আমি দুইবার করি।' 'কতদিন হইতে করিতেছ?'

'প্রায় একমাস।' 'কোনও কি ব্রত লইয়াছ?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে সে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বুঝিলাম, সে এ কথার উত্তর দিবে না। আমি কিন্তু, সার্ব্বভৌম-ম'শায়ের না আসা পর্য্যন্ত সময়টা মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া দিব মনে করিয়াছি। সে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা! আমি তোমাকে পুঁথিতে চোখ দিয়া

বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তুমি কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছ ?'

বালিকা মৃদু হাসিল—উত্তর করিল না।

"আমি যেন একটু ক্ষোভের সহিত বলিলাম—'হাঁ মা, আমি মূর্খ জানিয়া কি তুমি আমার কথার উত্তর দিতেছ না ?'

প্রশ্ন করিতে না করিতে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সোনার কমলে কে যেন চোখের পালটে জবার বরণ ঢালিয়া দিল।

ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দিক্ হইতে কে তাহাকে ডাকিল—'দাক্ষায়ণি!' দেখিলাম, সার্ব্বভৌমের গৃহিণী পিছন হইতে একটি দীপ হাতে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন।"

২৮

সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর দর্শন-লাভের পর হইতে গণেশ-খুড়া যে সকল দৃষ্ট ঘটনার কথা আমাকে বলিয়াছে, আজিকালিকার বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত যুগে বর্ত্তমান ব্যবহারিক সত্যের সঙ্গে সেগুলার সামঞ্জস্য করা যায় না; এইজন্য সেগুলার বর্ণনা হইতে আমি যথাসম্ভব বিরত হইলাম।

তবে একটা কথা বলিবার প্রলোভন আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সেটি দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রতের কথা। কহিলে অনেক শিক্ষিত-শিক্ষিতার কাছে ইহা অবিশ্বাস্য বোধ হইতে পারে। এমন কি, হিন্দুর কুসংস্কার-দলনী বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যার সম্মুখে এরূপ একটা আজগুবি ব্রতের নামোল্লেখ তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইতে পারে। তথাপি বলিব, হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর—অন্তরের পূর্ব্বকথার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কথা কহিতে হইলে এরূপ ব্রতের কথাটা উত্থাপন করিবার লোভ সংবরণ করা যায় না।

এ দাক্ষায়ণী-সংবাদের শুধু যে শ্রোতাই আছেন, এমন ত নয়—অনেক শ্রোত্রীও গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বক্তার অলক্ষ্যে কান পাতিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতার ভাগ অপেক্ষা অর্দ্ধ-শিক্ষিতার ভাগই অধিক। অর্দ্ধশিক্ষিতাই বা বলি কেন, তাঁহাদের মধ্যে পোনেরো আনাই পাই-কড়া-ক্রান্তি-শিক্ষিতা।

যিনি পূর্ণশিক্ষিতা, তাঁহাকে এ ব্রতের কথা শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, তিনি নিজের চিত্তেই সম্যক্ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে শিখেন নাই। কোন্ সাহসে পরের কথায় তাঁহার আস্থা-স্থাপন করাইব ? এ কথা আমি বলিতেছি না। বলিয়াছেন যিনি, তিনি মহাকবি। তিনি সরলপ্রাণে স্বীকার করিয়াছেন—"বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"—শিক্ষিত সকলকে বুঝাইতে পারেন; পারেন না কেবল নিজেকে। তিনি বলেন—"আমি জানি।" ইহার অর্থ, তিনি সমস্তই জানেন; কেবল তিনি জানেন না, এইটি তিনি জানেন না।

এ কথাও আমি কহিতেছি না। ঋষিগুরু তাঁহার শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ-দানকালে বলিয়াছিলেন—"যিনি বলেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তুমি জানিবে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই।"

এই বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া শিষ্য কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। চিন্তাতে উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে মনে করিয়া যেই শিষ্য উত্তর করিল—"গুরুদেব! আমি বুঝিয়াছি," গুরু উত্তর করিলেন—"তাহা হইলেই তুমি বুঝ নাই।"

সুতরাং শিক্ষিতাকে এ ব্রতের কথা আমি বুঝাইবার ধৃষ্টতা করিতেছি না। আমি শুনাইতেছি তাহাদের, প্রতীচ্য শিক্ষার অভাবে যাহাদের একূল ওকূল—দুকূল গিয়াছে। প্রতীচ্যশিক্ষা নিজের গুণগুলি কম্বলে ঢাকিয়া, নিছাক দোষটুকু যাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা শুধু চিঠি লিখিবার মত লিখিতে জানে, আর উপন্যাস পড়িবার মত পড়িতে জানে। আর জানে—কর্ম্মস্থল হইতে দিনান্তে গৃহপ্রত্যাগত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, অনর্থতপ্ত স্বামীকে ভোগবিলাসিতার আবেদন লইয়া উত্ত্যক্ত ও অবসন্ন করিতে। আর জানে—থাক্—সে মর্ম্মভেদী কথা কহিব না। আগে হইতেই কিশলয়-কোমল দেহের পূতিগন্ধে বাঙ্গালার বায়ুমণ্ডল ভরিয়া গিয়াছে।

এই তথাকথিত শিক্ষিতা ও নিরক্ষরা লইয়াই বাঙ্গলার রমণী। তাহাদের তুলনায় সুশিক্ষিতার সংখ্যা এত অল্প যে, দশমিকে পরিণত করিলে, বিন্দুর পরের শূন্যগুলা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

পূর্ব্বে ইঁহাদেরই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী অভিধান ছিল। শান্তি নিত্য ইঁহাদের বসনাঞ্চলে বাঁধা থাকিত। সুখে ঔদাসীন্য, দুঃখে ভগবন্নির্ভরতা—সর্ব্বকালীন আনন্দের আভাবে ইঁহাদের অধিষ্ঠিত আশ্রম মর্ত্ত্যে দেবনিলয়ের প্রতিরূপ ছিল। এখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় ইঁহারা উভয়লোক হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই সুশিক্ষিতা—দশমিকের অগণ্যশূন্যের পরে এক—তিনিই কেবল অদ্ভুত ব্রতের কথা শুনিয়া,—"যব গোধূলি সময় বেলি," মন্দির হইতে

বিচিত্র যানারোহণে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া, কখন পতিপার্শ্বগতা, কখন বা একাকিনী, করধৃত অশ্ববল্গায় কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার সারথ্যকে পরাভূত করিয়া, আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন; তিনিই কেবল—"নবজলধর বিজরীরেখা দ্বন্দ্ব-পসারিয়া", বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মীর ব্রতের উপর রহস্য ইঙ্গিত করিয়া, চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সেই একের নিম্নের, কলিকাতা হইতে হিমালয়-পাদমূলপর্য্যন্ত প্রবাহিত অগণ্য "নয়"—সেই নবালোকগতা, কিন্তু বাস্তবিক ঘনতরতিমিরগ্রস্তা বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের জননী আমাদের মাতৃকুল? তাঁহারা বহুদিন হইতে এই প্রতীচ্যভাবসাগরের তীরে বসিয়া, কেবল লবণাক্ত তরঙ্গ-প্রহারেই পরিতৃপ্ত হইতেছেন; আজিও পর্য্যন্ত একটিও রত্ন তুলিতে পারেন নাই। লাভের মধ্যে তাঁহাদের সমাজ বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্রতপূজা ভুলিয়াছে—সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছে! মহাফলা নিবৃত্তির মন্ত্র আর তাঁহাদের মনে নাই। আজ একটু সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে এই ব্রতের কথা শুনাইব।

এই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত উচ্চশিক্ষা তাঁহারা শিখেন নাই—আর শিখিবেন না। তাহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—আর যে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। তখন তাঁহাদের যুগযুগান্ত হইতে বংশানুক্রমিক আগত সম্পত্তি হইতে তাঁহারা অকারণ অধিকারচ্যুত হন কেন?

দাক্ষায়ণী যে ব্রত লইয়াছিল, তাহার নাম—নারায়ণ-ব্রত। আমাদের দেশে এখনও হিন্দুমহিলাদের মধ্যে অনেক ব্রতের প্রচলন আছে। কিন্তু নারায়ণ-ব্রতের প্রচলন নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়েও ছিল না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় দ্রাবিড়ে বেদশিক্ষাকালে সে স্থানের কুমারীগণকে এই ব্রত করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যাদি-লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় এ ব্রতের অনুষ্ঠান নয়। শুধু সংযমে অভ্যস্ত হওয়াই এ ব্রতের একরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

তবে এ ব্রতের একটা বিশেষ লোভনীয় ফল ছিল। এ ব্রত-গ্রহণের ফলে কুমারীর নারায়ণতুল্য পতিলাভ হইত।

ব্রতের যে সমস্ত নিয়ম, তাহার সমস্ত এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহাকে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে এক পূর্ণিমা হইতে পর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল নিয়ম, সেইগুলি সযত্নে পালন করিতে হয়।

দাক্ষায়ণীও একমাস ধরিয়া সেই কঠোর নিয়ম পালন করিতেছিল। দাক্ষায়ণীকে সারাদিন উপবাসিনী থাকিতে হইত। দিবসে তিনবার, অন্ততঃ পক্ষে দুইবার স্নান করিতে হইত! সন্ধ্যার পর নিজহস্তে ভোগ রাঁধিয়া নারায়ণকে নিবেদনান্তে বালিকাকে প্রসাদ পাইতে হইত। যিনি এ ব্রতের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাকেও কুমারীর সঙ্গে উপবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নিয়ম বাক্-সংযম। একান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন সারাদিনের মধ্যে বালিকার বৃথা বাক্যালাপে অধিকার থাকিত না। হয় তাহাকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, নয়, মৌনী থাকিতে হইবে।

দ্রাবিড়দেশেও কদাচিৎ কোন পিতা কন্যাকে এই ব্রত ধারণ করাইতেন। সাহসী তেজস্বী বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম সেই ব্রত কন্যাকে গ্রহণ করাইয়াছেন। মৌনী হইয়া থাকা বালিকার পক্ষে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি তাহাকে শাস্ত্র পড়াইয়াছেন।

তবে অনেকগুলা শাস্ত্র পড়াইয়া কন্যার মনকে সন্দিগ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা তিনি দাক্ষায়ণীকে শিক্ষা দিয়াছেন। একমাস ধরিয়া এ কঠোর উপবাসাদি অন্যের সহ্য হইবে না বলিয়া, তিনি নিজেই কন্যার ব্রতের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯

চিঠি লইয়া যেদিন গণেশ-খুড়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সেদিন দাক্ষায়ণীর ব্রতের একমাস পূর্ণ হইয়াছে। পরদিবস তাহার ব্রত-উদ্‌যাপন!

খুড়া বলিয়াছিল—"সার্ব্বভৌম ম'শায়ের স্ত্রীকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যদি বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি উত্তর দিব? তাঁহার স্বামীকে পাইলেই আমি তাঁর হাতে চিঠি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতাম, চিঠি দিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পলাইয়া আসিতাম। তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, এটা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভাগ্যবশে তাঁহাদেরই সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হইল।

"কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়টা আমার কাটিয়াছে। ভয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেখার ফলে আমি একরাশ বেদনা বুকে পুরিয়াছি। এইবারে মা। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চোক মুদিয়া আমি নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিলাম, ঠাকুর, আমাকে আসন্ন সঙ্কট হইতে রক্ষা কর! ব্রাহ্মণ-কন্যার সম্মুখে আমি ত মিথ্যা কহিতে পারিব না! বিবাহ

সম্বন্ধে কিছু জানি কি না, প্রশ্ন করিলে, আমি ত জানি না বলিতে পারিব না !

"কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহ্মণকন্যা আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক্‌, চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিলেন না।

"সে দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। কথায় তাহা বুঝাইতে ত পারিবই না। লাভের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টায় বুঝি সেই কতকাল আগে-দেখা ছবিখানির হাড়গোড় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। সে কতদিনের কথা ! তার পর দেশের অবস্থা, দেশের মানুষের অবস্থা, কোথা হইতে কি হইয়াছে ! কিন্তু যতবারই সে দিনের কথা আমার মনে পড়ে, অমনি সে ছবি জল্ জল্ করিয়া আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ হইয়াও আমি মূর্খ। মা ও মেয়ের সে দিনের ক্রিয়ার মর্ম্ম আজিও পর্য্যন্ত বিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

"দেখিলাম, ব্রাহ্মণকন্যা দীপটি হস্তে লইয়া, বাড়ীর দিকের সিঁড়ি দিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। উঠিয়াই তিনি সবার উপরের সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন। দেয়ালে মাথা দিয়া মণ্ডপকে একবার প্রণাম করিলেন। তার পর চৌকাঠে পা না দিয়াই বাহির হইতেই কন্যাকে ডাকিলেন—'দাক্ষায়ণি!' দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'মা !'

"উত্তর করিয়াই দাক্ষায়ণী দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইল এবং ভূমিষ্ঠা হইয়া দীপধারিণী মাকে প্রণাম করিল। প্রণামানন্তর হাঁটুতে ভর দিয়া, হাত দুটি জোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাওয়ার মত মায়ের মুখের পানে চাহিল।

"বিচিত্র ব্যাপার ! মা সেই দীপ দিয়া কন্যার আরতি করিলেন। আরতির শেষে তিনি আর একবার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কন্যাও মা বলিয়া উত্তর দিল। মা এইবারে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গীতা'? কন্যা বলিল—'সুগীতা'—উত্তর পাইয়া মা মণ্ডপেই প্রবেশ করিলেন এবং হস্তস্থিত দীপ কন্যার হাতে প্রদান করিলেন।

"কন্যা সেই দীপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যে কুলুঙ্গিতে সে গীতার পুঁথি রাখিয়াছিল, সেইখানে যাইয়া দীপ ঘুরাইয়া পুঁথির আরতি করিল। আরতিশেষে স্তোত্র।

"সুর যেন কুলুঙ্গির ভিতরে পুঁথিখানিকে বেড়িয়া জমিয়াছিল। দাক্ষায়ণী হাতযোড় করিতেই যেন প্রেমানন্দে গলিয়া গেল—দাক্ষায়ণীর কণ্ঠে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল; আবার নাচিতে নাচিতে বালিকার কণ্ঠ হইতে পুঁথির গায়ে লাফাইয়া পড়িল।

"আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে। আমিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে করযোড়ে দাঁড়াইয়াছি। বৈশাখ মাস—বাহিরে গাছে গাছে ঝড়ের শব্দ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মণ্ডপের বায়ু নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ হইয়া আমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর মায়ের সঙ্গে—দীপের নিথর শিখার সঙ্গে বালিকার গীতাস্তোত্র শুনিতেছে। সুরটা উপরে নীচে ছুটাছুটি করিয়া পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠকে যেন কোলাকুলি করাইতেছে।

"স্তোত্র-পাঠ শেষ করিয়া, দাক্ষায়ণী পুঁথিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিল—'গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।'

"সমস্ত শ্লোক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্লোকের এই কয়টি কথামাত্র আমার মনে ছিল। শ্লোকপাঠান্তে যখন মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দাক্ষায়ণি ! তুমি ইহাদের ভিতর কি হইবে?' দাক্ষায়ণী উত্তর করিয়াছিল—'পতিব্রতা।' মাতা এইবারে অঞ্চল হইতে ফুল লইয়া কন্যার মস্তক স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'পতিব্রতা ভব।' কন্যা আবার মাতাকে প্রণাম করিয়াছিল; এবং মায়ের ইঙ্গিতে—অনাহূত ব্রাহ্মণ ভগবৎ-প্রেরিত জানে—বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকেও একটা প্রণাম করিয়াছিল।

"সর্ব্বশেষে সেই দীপ লইয়া দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপ হইতে উঠানে নামিল; এবং মাতৃদত্ত একটি ধুচুনির ভিতর দীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল !"

এই গল্প আমার কাছে করিতে করিতে গণেশ-খুড়ার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইতে আমি দেখিয়াছি। খুড়া বলে—"অপূর্ব্ব নারায়ণ-ব্রতের ফলে দাক্ষায়ণীতে আমি লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়াছিলাম। কড়ির শব্দ শুনিয়াছিলাম। পদ্মের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম। দাক্ষায়ণী চলিয়া গেলে যে সময় গ্রামের ঘরে ঘরে কুলদেবতার সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠিল, সেই সময়ে গোলমালের মধ্যে আমি লক্ষ্মীর জননী 'মা দুর্গাকে' সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলাম।"

কিন্তু আঘ্রাণ পাইয়া হইল কি? দাক্ষায়ণীর এ ব্রতধারণে কি লাভ হইল? বালিকা একমাস ধরিয়া দিবসের পর দিবস উপবাস-ক্লেশ ভোগ করিয়াছে—পিতাও কন্যার সঙ্গে সমানভাবে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কন্যা সারাদিন মুখে জলবিন্দুটি পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ জায়া তাই দেখিয়া কোন্ প্রাণে নিজের মুখে অন্ন দিবেন? তিনিও পতি-পুত্রীর সঙ্গে একমাস ধরিয়া সমভাবে নিয়ম পালন করিয়াছেন।

কিন্তু তিন তিন জনের অনুষ্ঠিত এই কঠোর ব্রতের

ফল কি হইল? ব্রত-উদ্‌যাপনের পূর্ব্ব দিবসেই চিঠিতে যে ফল পুরিয়া, গণেশ-খুড়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর হস্তে উপহার প্রদান করিয়াছে, ব্রাহ্মণ সে সুপক্ক ফলের আঘ্রাণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিতার মত হইয়াছিলেন। গণেশ-খুড়া ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়াই পলাইয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তাহাকে সে দিন ব্রাহ্মণের গৃহেই রাত্রি-যাপন করিতে হইল। দাক্ষায়ণীর ব্রতের নারায়ণ-প্রেরিত 'বামুন' হইয়া তাহার আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসা ঘটিল না।

দাক্ষায়ণী চিঠির কথা জানিতে পারে নাই। তাহার জননী যে প্রদীপহস্তে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সেই প্রদীপ লইয়া বাটীর বহির্ভাগস্থ এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে দিতে গিয়াছিল। নহিলে এ চিঠির মর্ম্ম সে বুদ্ধিমতী বালিকার অবিদিত থাকিত না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কেহই তাহাকে সে কথা শুনান নাই এবং দাক্ষায়ণীর মায়ের অনুরোধে সে রাত্রির মধ্যে চিঠি সম্বন্ধে আর কোন কথাও উত্থাপিত হয় নাই।

৩০

পরদিবসে সার্ব্বভৌমের গৃহে কতকগুলা দৈবঘটনা ঘটিল। তবে সেগুলা খুড়ার চোখের দৈবঘটনা। বিচারের পরিবীক্ষণ দিয়া আমাদের সেগুলাকে দেখিতে হইবে।

অত হাঙ্গাম করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া, আগে হইতেই সে সকলের উত্থাপন হইতে বিরত হইয়াছি। কেবল একটি কথা বলিব। সেইটির সঙ্গে আমার ও এই আখ্যায়িকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যূষে মায়ের সঙ্গে "কাশুপ" গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দাক্ষায়ণী একটি শিলা কুড়াইয়া পাইয়াছিল; এবং সেই দিবসেই এক জগন্নাথযাত্রী সন্ন্যাসী আসিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে অতিথি হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সেই শিলার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, নিজেই তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠান্তে সেটি দাক্ষায়ণীকেই দান করিয়াছিল। সেই কমঠ-কঠোর শিলাটাই দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলন-পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে গণেশ-খুড়ার বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে তাহার সহিত দাক্ষায়ণীর মায়ের যে কথা হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহার মহত্ত্ব আমরা যথেষ্ট বুঝিতে পারিব। আমি তাহা খুড়ার কথাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্রত-উদ্‌যাপনের উল্লাসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দারুণ মনোদুঃখ বুঝিয়া, খুড়া নিজের দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বিদায়গ্রহণের সময় খুড়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিল—"মা! আমার অপরাধ লইয়ো না।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ কেন গণেশ। তোমার আবার অপরাধ কি? বরং তুমি আগে হইতে এ সংবাদ দিয়া আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ।"

"জ্যেঠাইমার একান্ত অনুরোধে আমি আসিয়াছি।"

"তিনি সাধ্বী। তাঁহার গুণ আমি এক মুখে বলিতে পারি না। তাঁহার দয়া আমি ইহজন্মে ভুলিব না।"

'অঘোর দা'র কেন এমন মতিচ্ছন্ন হইল?"

"কিছু না। তাহারই বা মতিচ্ছন্ন হইবে কেন? সে যেমন শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপই কাজ করিয়াছে। মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল আমার। আমি আমার দেবতা স্বামীর নিষেধ না মানিয়া, এক অন্যপূর্ব্বার পুত্রকে কন্যাদানে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

আমাদের কুলীন সমাজে সে সময় অন্য-পূর্ব্বার গর্ভজাত সন্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। শুধু পিতামহের লোকপ্রিয়তায় এবং সার্ব্বভৌমের কন্যাদানের সাহসিকতায় সমাজে আমাদের অবস্থা হীন হয় নাই।

প্রথমে ব্রাহ্মণের আমাকে কন্যাদানে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পত্নীর একান্ত অনুরোধে তিনি আমাকে কন্যার বাগ্‌দান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন—"গণেশ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি। শুদ্ধমাত্র কন্যার প্রতি মমতাবশে আমার নারায়ণ-তুল্য স্বামীকে লোকবিগর্হিত কাজ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এ ফল ত আমার ন্যায্য প্রাপ্য। আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই এ কাজ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। মমতাতে অন্ধ হইয়া আমি কাহারও কথায় কান দিই নাই।"

"কন্যার জন্য আর কি ভাল পাত্র পাও নাই মা?"

"ঢের। সার্ব্বভৌমের কন্যা, তার কখন কি সুপাত্রের অভাব হইত।"

"সুপাত্র থাকিতে এরূপ ঘরে কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কাজ ভাল কর নাই।"

"বহুকালের শিবারাধনার ফলে আমার পরিব্রাজক স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। ওঁর যে মনের অবস্থা, তাহাতে উনি কখন্ ঘরে আছেন, কখন্ নাই। আমার ধারণা ছিল, কন্যার বিবাহের পর আর উনি গৃহে থাকিবেন না। তাইতে মনে করিয়াছিলাম, কি জান গণেশ, দাক্ষায়ণীকে এমন জায়গায় বিবাহ দিব, যাহাতে আমার বোধ হইবে, সে যেন আমার চোখের উপরেই রহিয়াছে। যখন মনে করিব, তখনি খবর লইতে পারিব। ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারিব। তাহার উপর

বুঝিয়াছিলাম, শিরোমণি যথেষ্ট পয়সা উপায় করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রও রত্ন, সেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিবে। পুত্রবধূর খাওয়া পরার দুঃখ থাকিবে না।"

"তার উপর তোমার ওই সবে একমাত্র কন্যা। আর দুটো একটা থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বিবাহ লইয়া গোল হইবার সম্ভাবনা থাকিত।"

"শিরোমণির পৌত্রকে দাক্ষায়ণী-দানের সেটাও একটা কারণ।"

"তা হ'লে তুমি ত কোনও দোষ কর নি মা।"

"দোষ করি নি, বল্‌ছ কি গণেশ—পাপ করেছি। পাপ—মহাপাপ! সুখদুঃখে সমজ্ঞান মহাপুরুষ আজ আমারই জন্য জীবনে প্রথম বিচলিত হইয়াছেন। যাহা কখন তাঁহাতে দেখি নাই, দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই—আজ তাঁহাতে তাই দেখিয়াছি! আজ নিদারুণ মনস্তাপে আমার ঠাকুরের চোখে জল পড়িয়াছে—ক্রোধে শরীর কাঁপিয়াছে!"

দুঃখ ও ক্রোধের মধ্য দিয়া নিত্যই আমাদের জীবন চলা ফেরা করিতেছে। জীবনের এইরূপ মরণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। চপল-চিত্তের সুখদুঃখ ঋষিগণের চক্ষে ক্লেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। সংযমীর চিত্তবিক্ষোভ যে কি বিষম বস্তু, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? গণেশ খুড়াও সে ক্রোধের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! ক্রোধটা একটা সামান্য মনের উচ্ছ্বাস বলিয়াই আমার জানা ছিল। আমি দিনের মধ্যে দশবার শাস্ত হইতাম। ক্রোধ হইলে মুখ হইতে দু'পাঁচটা অসঙ্গত কথাও যে বাহির না হইত, এমন নয়। ক্রোধের মুখে সময়ে সময়ে দু'একজনকে দুই চারিটা অভিশাপও দিয়াছি। কিন্তু যাহাকে বলিয়াছি—'তোর মৃত্যু সন্নিকট'—সে যেন চারিগুণ সুস্থ ও সবল হইয়া বাঁচিয়া আছে। যাহাকে নির্ব্বংশ হইবার শাপ দিয়াছি, তার বংশ চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।"

সার্ব্বভৌম-ম'শায়ের ক্রোধ এই রকম একটা কিছু হইবে মনে করিয়া, খুড়া সান্ত্বনার ছলে তাঁহার পত্নীকে কি দুই একটা কথা বলিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিয়াছেন—'মূর্খ! মনে করিতেছ কি? এ কি তোমার আমার ক্রোধ যে, তাহার যা কিছু শক্তি শুধু আমাদের দেহমনের উপর অনিষ্ট করিয়াই মিলাইয়া যাইবে!"

গণেশ-খুড়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তবে কি?"

"এ সংযমীর ক্রোধ! এ ক্রোধ অকারণ অথবা তুচ্ছ কারণে হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন যাহার জন্য এ ক্রোধের উৎপত্তি, তাহার অনিষ্ট না হইয়া যায় না। সে হতভাগ্য যদি পলাইয়া গড়ের ভিতরে আশ্রয় লয়, এ আগুন সেখানে গিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিবে! সাগরে ডুবিলে জলভেদ করিয়া তাহাকে ছাই করিয়া দিবে।"

"তবে ত অঘোর দা'র সর্ব্বনাশ হইল, দেখিতেছি!"

"হইতে দিই নাই। হইবার মুখে নারায়ণের কৃপায় আমি প্রতিবন্ধক হইয়াছি। গণেশ! তুমি গত রাত্রিতে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখ নাই। দেখিলে—আমার বিশ্বাস, মূর্চ্ছিত হইতে। নরাধম অসত্যবাদীর শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কথা বাহির হইবার সময়ে আমি মুখে হাত দিয়া তাহা রোধ করিয়াছি। তাঁহাকে স্নান করাইয়া আবার শাস্ত করিয়াছি।"

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহিণী গণেশ-খুড়াকে সত্য সম্বন্ধে কতকগুলা উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"কলিতে একমাত্র তপস্যা সত্য। ব্রাহ্মণ শৈশবাবধি সেই তপস্যাই করিয়াছেন। দ্বাদশ বৎসর যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য কহিয়াছে, সে-ই বাক্‌সিদ্ধ হয়। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও মিথ্যা কহেন নাই, তাঁহার মুখ হইতে অভিসম্পাতের কয়েকটি অক্ষর বাহির হইতে না হইতে হতভাগ্য অসত্যবাদী সবংশে দগ্ধ হইয়া যাইত।"

আমরা এ কথা বিশ্বাস করি আর নাই করি, মূর্খ গণেশ ব্রাহ্মণকন্যার এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। মূর্খ হইলেও কিন্তু খুড়ার বুদ্ধি ছিল। খুড়া বুঝিল, সার্ব্বভৌম ম'শায়ের মুখ হইতে অভিশাপ বাহির না হউক, তার ভিতরে ক্রোধ ত হইয়াছে! আর ক্রোধ যখন হইয়াছে, তখন আমাদের অনিষ্ট না হইবে কেন? খুড়া সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল। ক্রোধ যে হয় নাই, এ কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। আর এই ক্রোধ যদি আমাদেরই উপর প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কাহারও যে অনিষ্ট না হইবে, এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

গণেশ-খুড়া চিন্তিত হইল। বলিল—"তা হ'লে মা, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-পরিবারের রক্ষার উপায়?"

তিনি উত্তর করিলেন—"আমি ত স্বামীর মনের অবস্থা জানি না। তিনি চিরদিনই অতি ধীর। একটা কন্যার মোহে তিনি যে এক মুহূর্ত্তের ক্রোধে এতকালের অর্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট করিবেন, এটা আমার বোধ হয় না। তবে অসত্যের উপর যে ক্রোধের ভাব, তাহাতে সত্যাশ্রয়ীর তপস্যার হানি হয় না। যদি কোনও উপায়ে হতভাগ্যের পুত্রের হাতে দাক্ষায়ণীর হাতটা অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার উপায়

হইতে পারে। শিরোমণির বংশ ব্রহ্ম-কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।"

গণেশ খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ও জ্যেঠাইমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি, আমি তোমাকে চুরি করিয়া আনিব। আনিয়া তোমার হাতে দাক্ষায়ণীর হাত সমর্পণ করিব!"

তাই খুড়া চোরের মত আমাদের হুগলীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু খুড়া নিজে, সঙ্কল্প-সিদ্ধি করিতে পারে নাই। তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, আমাদের ঝি। খুড়া দৈবসুযোগে ঝির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকেই সঙ্গোপনে মনের কথা বলিয়াছিল এবং ঝিয়ের কৃপাতেই সে যাত্রা আমরা "ব্রহ্মকোপানল" হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। ঝিয়ের কৃপাতেই দাক্ষায়ণীর হাত আমার হাতের উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

সার্ব্বভৌম-পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া গণেশ-খুড়া সেই দিন অপরাহ্ণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

৩১

এত করিয়াও গণেশ-খুড়া পিতামহীর গৃহত্যাগ রক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের গ্রামের মধ্যে এক জনও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই, ঠাকুর মা আর আমাদের ঘরের অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। হুগলী হইতে চলিয়া আসিবার পর যে কয়দিন তিনি ঘরে ছিলেন, সেই কয়দিনই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিয়াছেন। সন্দেহ করিবার সমস্ত কারণ থাকিতেও সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ পিতামহীর এই আচরণ তাঁহার দেবরের প্রতি অহেতুকী প্রীতির একটা নিদর্শন অনুমান করিয়া, পরমানন্দই অনুভব করিতেছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রবধূগণ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়াইলেও তিনি তাহাতে সহধর্ম্মিণীর হস্তের মিষ্টতা অনুভব করিতেন না। সেই মত মিষ্ট হাত ছিল আমার পিতামহীর। সুতরাং ভ্রাতৃজায়ার তাঁহার গৃহে আহারে গোবিন্দ-ঠাকুরদা'র একটা স্বার্থ ছিল। সেই স্বার্থবশে পিতামহীর অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার অবকাশই ছিল না।

এই কয়দিন গণেশ-খুড়ার স্ত্রী আমাদের কুলদেবতার ভোগ রাঁধিত। কেবল পাকস্পর্শ উৎসবের পরদিনে দাক্ষায়ণীর উপর ভোগরন্ধনের ভার পড়িয়াছিল। পিতামহী সেই দিন বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। পৌত্রবধূর প্রস্তুত অন্ন দেবতাকে নিবেদন করাইয়া, নিজে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কেন, তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। বাড়ীর একজনও বধূর হাতের অন্ন না খাইলে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় বলিয়া, তিনি আহার করিয়াছিলেন, অথবা সম্পর্কত্যাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পরগৃহে ভিখারিণীর মত একদিনের জন্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজিও পর্য্যন্ত তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

অন্নগ্রহণের রাত্রিতেই তিনি পৌত্রবধূকে লইয়া গৃহত্যাগ করেন। সে দিন গণেশ-খুড়া, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া, ঠানদিদির কি একটা অসুখ উপলক্ষে বাড়ীতে গিয়াছিল। সুযোগ যেন বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া পিতামহীর গৃহত্যাগের সহায়তা করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুলবৃক্ষের তলদেশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমাদের গ্রামের মধ্যে কাহারও সে কথা শুনিতে বাকী ছিল না। যদিও পিতামহী অথবা গণেশ-খুড়া আমার বিবাহ দেখে নাই, তথাপি ঘটনায় কেহই অবিশ্বাস করে নাই। এক ঝিয়ের সাক্ষ্যতেই আমাকে সার্ব্বভৌমমহাশয়ের কন্যাসম্প্রদান—গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, দেশের জমীদার পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে দাক্ষায়ণীকে আমার বধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। তবে ঠাকুরমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কেন? হুগলীতে পিতৃ-কর্ত্তৃক পিতামহীর অপমান-কথা, গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহই শুনে নাই। সার্ব্বভৌম ত এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। গণেশ খুড়াও এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই। গ্রামের লোকে ঠাকুরমার জন্য দুঃখিত। অনেকেই—বিশেষতঃ গোবিন্দ-ঠাকুরদা মর্ম্মাহত। কিন্তু কেহই তাঁহার চলিয়া যাইবার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। পিতামহীর মত শান্ত-প্রকৃতি স্ত্রীলোক গ্রামের মধ্যে আর ছিল না। কেহ কখন তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। আমিও দেখি নাই। পিতামহের মৃত্যুর পর মা তাঁকে দিন কয়েক বড়ই উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। পিতামহী তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন মাত্র—ক্রুদ্ধ হন নাই। কারণ জানিতাম, পিতা ও আমি। কিন্তু সে কথা কাহাকেও কাহিয়া বলিবার উপায় ছিল না। কাজেই সকলের পক্ষে সেটা একটা রহস্যেরই বিষয় হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, ঠাকুরমা বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই, পৌত্রবধূর হাত ধরিয়া ও ঝিকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন এবং ব্রাহ্মণদম্পতীর কাছে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, দাক্ষায়ণীকে তাহাদের কাছে রাখিতে অনুরোধ করেন।

দাক্ষায়ণীর মা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন —"মা! অবোধ পুত্রের উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়ো না।"

তার পর যখন তিনি বুঝিলেন, শুদ্ধমাত্র অভিমানে নয়, তাঁহার নিজের ও পুত্রের—উভয়েরই মঙ্গলের জন্যও তিনি গৃহত্যাগ-সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তখন আর তিনি পিতামহীকে নিষেধ করেন নাই, কন্যাকেও গ্রহণ করেন নাই; সুখে দুঃখে পিতামহীর সহচরী থাকিতে উপদেশ দিয়া, তিনি দাক্ষায়ণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিতামহী কোথায় থাকিবেন, কত দিনের জন্য থাকিবেন, আর কন্যাকে দেখিতে পাইবেন কি না, এ কথা পর্য্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কিন্তু দশমবর্ষীয়া বালিকা—মায়ের অঞ্চলের নিধি,—বড়দর্শনজ্ঞ সার্ব্বভৌমের একমাত্র দর্শনীয় বস্তু, আত্মীয়-স্বজনের একান্ত প্রিয়পাত্রী—দাক্ষায়ণী অম্লানবদনে কেমন করিয়া এই নব আত্মীয়ার অনুসরণ করিল, তাহা মনে করিতে গেলেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

যাই হ'ক, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। সে চলার ভালমন্দ বিচার করিবার আমাদের সকলের অধিকার থাকিলেও বিচার করিয়া কোনও ফল নাই। দেশের লোকের মধ্যে অনেকেই নির্ম্মমভাবে আমার পিতামহী-চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন, পুত্র-বধূর উপর অভিমান করিয়া, এরূপ অনাথিনীর মত তাঁহার গৃহত্যাগ বিজ্ঞের কার্য্য হয় নাই। ইহাতে বংশের সম্ভ্রম-হানি হইয়াছে। বিশেষতঃ একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে তাহার মাতা ও পিতার মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞাতবাসে লইয়া যাইতে তাঁহার অধিকার কি? তাঁহার অভিমান তাঁহার সঙ্গে যাক্। একটা শিশুকে সে জন্য সঙ্গে লইয়া অনাচ্ছাদনে অপরিচিত স্থানে অনশনে মারিয়া ফেলা কেন?

কিন্তু সমালোচনায় কোন ফল হয় নাই। তাঁহাদের কথার যিনি উত্তর দিতে সমর্থ, কোথায় আমার সেই, আজি নির্ম্মম, কিন্তু পূর্ব্বের কেবল মমতাময়ী পিতামহী? গ্রামে আসিয়া একমাস আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। শুধু আমি কেন বাবা, এমন কি, মা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। গ্রামবাসীরাও বসিয়া আছে। কোথায় আমার ঠাকুরমা? গোবিন্দ-ঠাকুরদা প্রভাত হইলেই আমাদের গৃহে আসিয়া ঘুমন্ত পিতাকে ডাকেন—"অঘোরনাথ!" ডাকিয়া তুলিয়া কত কি কথা চুপি চুপি কহিয়া আবার তিনি চলিয়া যান। গণেশ-খুড়া একবার করিয়া অনুসন্ধানে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, দু'চার দিন বাহির বাহিরে ঘুরিয়া এ গ্রাম সে গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া, আবার ফিরিয়া আসে। আসিয়াই বাটীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে—"জ্যেঠাইমা! আসিয়াছ?" পিতামহীর গৃহত্যাগের পূর্ব্ব-ক্ষণে সেই যে তাহার স্ত্রী-পুত্রকন্যা চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আর আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের আনিতে খুড়াকে অনুরোধ করিয়াছি খুড়া অনুরোধ রাখে নাই। এক একবার তাহার মা আসেন। কিন্তু তিনিও পিতামহীর অন্তর্দ্ধানে কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। আগে মূর্খ পুত্রের কল্যাণ-লোভে তিনি মাতার পক্ষাবলম্বিনী হইয়া অন্তরালে পিতামহীর কত নিন্দা করিয়াছেন। এখন পুত্র-পৌত্রাদির অকল্যাণ ভয়ে কোনও কথা কহেন না।

একজন কেবল—কখন মা, কখন পিতার কাছে—মাঝে মাঝে অসংবদ্ধ প্রলাপ বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত। সে সেই বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত। তাহার মূর্খতা শেষে পিতার এমন অসহ্য হইয়া পড়িল যে, তিনি একদিন তাহাকে স্পষ্টতঃই বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি পণ্ডিত আসিত এবং মতামত প্রকাশ করা সুবিধা নয় বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিত এবং অনেক সময়ে পিতার ইতস্ততঃ গমনে সহচরের কার্য্য করিত। আমাকে পূর্ব্বে পড়াইত বলিয়া পিতা তাহাকে একটা মাসোহারা-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা অন্য উপকার না হউক, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত না থাকিলে, পিতাকে অনেক সময়ে সঙ্গিহীন থাকিতে হইত। সে বয়সে আমার যতটুকু বুঝিবার শক্তি ছিল, তাহাতেই অনুমান করিয়াছিলাম, অন্তর্যাতনার অতিপীড়নে তাঁহার গৃহ-প্রবাসের দিনগুলা তাঁহার জীবনকে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

মায়েরও সঙ্গিনীর অভাব হইয়াছে। আমার কাছেও বাল্যসঙ্গীরা বড় আসে না। আসিবার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে রামপদ। কিন্তু সেও পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে আর মাখামাখির মত মিশে না। এই একটা বৎসরের বিদেশ-বাস আমাদের ও প্রতিবেশীদিগের পরস্পর ভাববিনিময়ের মধ্যে যেন একটা বাঁধের মত প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

আমাদের গ্রাম আর ভাল লাগিতেছে না, বরং ভাল লাগিতেছে না। হুগলীতে এক বৎসর বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া অনাড়ম্বরময় গ্রাম্য জীবনও কেমন যেন আমাদের বিসদৃশ বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ

পিতামহীর অনাগমনে পিতা ও মাতা উভয়েই সর্ব্বদা অপরাধীর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া, বাড়ী যেন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে কারাগারের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে।

এক দুই তিন দেখিতে দেখিতে মাসের সব ক'টা দিন শেষ হইতে চলিল—পিতার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। গণেশ-খুড়া ইহার মধ্যে তিন চারিবার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিয়াছে—পিতামহীর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। অগত্যা আমাদের সঙ্গে লইয়া পিতাকে আবার চাকরীর জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইল, আমার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে পিতামহীর অন্বেষণ সম্বন্ধে পিতা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিয়াছিলাম। পিতা এই কার্য্যে গণেশ-খুড়াকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-ঠাকুরদা ও গ্রামের আরও দুই চারি জন বিজ্ঞের মতে গণেশ-খুড়াই এ অন্বেষণ কার্য্যে একমাত্র উপযোগী স্থির হইয়াছিল।

পিতার নিকট হইতে উপযুক্ত পাথেয় লইয়া, আমাদের গ্রামত্যাগের সপ্তাহ পূর্ব্বে খুড়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল। খুড়া যতদিন না ফিরিবে, স্থির হইল, ঠানদিদি—বধূ ও পৌত্রপৌত্রী লইয়া আমাদের গৃহেই অবস্থান করিবেন এবং গোবিন্দ-ঠাকুরদা নিজেই দুই বেলা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগের যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ সদানন্দ তাহাদের প্রহরিত্বের ভার লইয়া রহিল।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে আমার মাতা জীবনে সর্ব্বপ্রথম বৃদ্ধ পিতামহীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, দেশের সম্পত্তি বজায় রাখিতে হইলে ও বাড়ীঘরগুলিকে অকালধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, শাশুড়ীজাতীয়া একটা মিনিমাহিনার দাসী ঘরে রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন। চাকরীর জন্য স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাঁহাদের বিদেশে থাকিতে হয়, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা এরূপ পরিচারিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এখনও বাংলার ঘনবনাকীর্ণ অনেক পল্লীগৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, এইরূপ এক একটা বুড়ী চাকরীর জন্য বিদেশে অবস্থিত পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গলকামনায় সযত্নে বাস্তুদেবতাকে বুকে লইয়া, যুগযুগান্তর হইতে তপস্যারতার ন্যায় শুষ্কদেহে প্রিয়জনের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আজিও পর্য্যন্ত গ্রামশ্রী-নাশী ক্ষুধার্ত্ত মহামারী এরূপ গৃহের গোময়জলনিষিক্ত দ্বারের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই। গ্রাম উজাড় হইয়াছে কিন্তু তুলসীতলায় নিত্য সন্ধ্যা দিতে বুড়া এখনও বাঁচিয়া আছে। সেই জন্যই বুঝি আজ পিতামহীর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে সর্ব্বপ্রথম অশ্রু নিপতিত হইতে দেখিলাম। পিতার মুখেও আজ সর্ব্বপ্রথম আক্ষেপ-বাক্য বহির্গত হইতে শুনিলাম। গঙ্গাতীরে শালতীতে পা দিতে সেই আর একদিনের সন্ধ্যার কথা তাঁহার মনে হইল। সে দিন বিদায়দানে অনিচ্ছুক সহৃদয় গ্রাম্য নরনারীতে গঙ্গার ঘাট পূর্ণ ছিল। আজ একান্ত অনুগত দুই একজন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। পিতার যাত্রার বিঘ্ন উৎসারণ ফুল লইয়া ব্যাকুলতার সহিত আগত সে সার্ব্বভৌম নাই। মন্থরগামিনী-নদীকূলের সে কল্যাণময়ী নৃত্যশীলা শ্যামার আশিস্ সঙ্গীতের ইঙ্গিত নাই। সে ভাব যেন মরুপ্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকাস্তূপে সমাহিত হইয়াছে। প্রাণ-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া মরণের অধিক বিভীষিকা দেখাইতেছে।

কিন্তু সে সময় নিকটে থাকিয়াও যে সার্ব্বভৌম পিতার দৃষ্টি-সম্মুখে অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, আজ উপস্থিত না থাকিয়াও সে যেন দিব্য কান্তিতে তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইল। শালতীতে উঠিয়াই নদীর ক্ষীণ স্রোতে একবার করস্পর্শ করিয়া পিতা বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! সেবারে যথার্থই অতি অশুভক্ষণে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া পরমাত্মীয়ের প্রাণ লইয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলে। তোমার সেই অশুভ-নিরাকরণের নির্ম্মাল্য উজান-স্রোতে আর একবার আমার হাতে আনিয়া দাও। মর্ম্ম না বুঝিয়া দম্ভে আমি তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ফলে অশুভযাত্রার মুখেই আমি মাতৃরত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

ফুল আর উজান আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌমের উদ্যান-মধ্যস্থ অশ্বত্থের মাথা হইতে পেচকদম্পতি টিটকারীর অভিনন্দনে গমনপথে আমাদিগকে পুণ্য জন্মভূমি হইতে বিদায় দিল। বুঝি এই অশ্বত্থের তলেই দাক্ষায়ণী পাতিব্রত্যব্রত-পালনে একমাস ধরিয়া দীপদান করিয়াছিল।

৩২

একটা শালতী একজনে না লইলে শয়নের সুবিধা হয় না বলিয়া, পিতা দুইটি শালতী ভাড়া করিয়াছিলেন। তার একটাতে উঠিয়াছিলেন তিনি, অপরটাতে আমরা—মাতা ও পুত্র—আরোহণ করিয়াছিলাম। মাস জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ়ের প্রথম। কেন না, বেশ স্মরণ আছে, শালতীতে উঠিবার সময় ভৃত্য সদানন্দ কতকগুলা পাকা আম ঝুড়িতে

আনিয়া, বাবার শালতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। সেগুলার সদ্ব্যবহার আমার কাছেই হইবে বুঝিয়া, তিনি আবার সেগুলা আমাদের শালতীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বক্ষ্যমাণ জাগরণ-কথার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকা বিশেষ সম্ভব বলিয়াই সেগুলার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইতেছি।

বাল্যচাপলাপ্রযুক্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গ্রাম—ঘরবাড়ী, প্রতিবেশী, সহচর—এমন কি, ঠাকুরমা ও আমার 'কনে'কে ভুলিয়া, আমি খালের উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ক'নে বলিলাম কেন—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিচ্ছেদ-অদর্শন সত্ত্বেও দাক্ষায়ণী যে আমার নয়, এটা আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, এখন এ দূরাবস্থিত বার্দ্ধক্যের কেন্দ্রে বসিয়া, তাহা অনুমান করিবারও আমার শক্তি নাই।

শালতীতে উঠিয়াই মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ দিয়া নিজে শয়ন করিয়াছিলেন। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, তিনি ঘুমাইয়াছিলেন। নতুবা আমি বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সুপক্ক আম্রগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

ঘণ্টাখানেক সময় বোধ হয়,—উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আম্রভক্ষণে ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে খালের জলে হস্তস্পর্শ করিয়া আমি স্রোত কাটিয়া মুখে দিতেছিলাম। উদ্দেশ্য—মুখ ধুইয়া মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিব। এমন সময় দেখিলাম, খালের তীর ধরিয়া চলিষ্ণু ঘনান্ধকারের মত কি যেন শালতীর সমান্তরালে ঘন-পাদবিক্ষেপে চলিয়াছে!

দেখিবামাত্র আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারের পিণ্ডটা এক একবার নদীতীরস্থ এক একটা বাগানের ছায়ার সঙ্গে মিলাইতেছিল, আবার দুইটা বাগানের ব্যবধান-মধ্যস্থ অনাবৃত আকাশ-প্রণালীতে মসীকৃষ্ণ শুণ্ডকের মত ভাসিয়া উঠিতেছিল।

ভয়ে জড়সড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া, আমি মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিলাম। শালতী-চালককেও সে সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না।

মা ঘুমাইতেছিলেন। মাঝীরা আপনার মনে যে যার শালতী বাহিয়া চলিয়াছে। সহসা তীরভূমি হইতে বংশীরবের মত এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থাতেও আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ে মাকে জড়াইলাম। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিরক্তির সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অমন ছট্‌ফট্ করিতেছিস্ কেন? শুইবার জন্য ত তোকে যথেষ্ট স্থান দিয়াছি।"

আমি এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, সাহস করিয়া তাঁহারও কাছে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। মাতা আবার নিদ্রিতা হইলেন। অমন শব্দে পিতারও নিদ্রাভঙ্গের কোনও লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়বার সেইরূপ শব্দ হইল। কিন্তু শব্দটা এবারে সেরূপ জোরে হইল না। বিশেষতঃ এইবারে মাঝীরা কথা আরম্ভ করিল। আমারও ভয় ঘুচিল।

আমাদের এ পথে দস্যুর উপদ্রবের কথা কেহ কখন শুনে নাই। নদীর উভয় পার্শ্বেই গ্রাম। সেই সকল গ্রাম আবার জনবহুল। কেবল একস্থানে উভয় পার্শ্বের এক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় ছিল না। যদি ভয় করিবার কিছু থাকিত, তা সেই স্থানেই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বহুকাল হইতে সেখানেও কেহ কখন দস্যুর উৎপাতের কথা শুনে নাই। নানা গ্রাম হইতে নানা লোক এই খাল দিয়া শালতীতে চড়িয়া কলিকাতা যাতায়াত করিত। দস্যুর উপদ্রবের সুবিধা ছিল না।

ভয়ের কোনও কারণ ছিল না বলিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। এই জন্য মাঝীর সহিত তীরাবস্থিত কাহারও প্রথম আলাপ-কথা তিনি শুনিতে পান নাই।

পিতার শালতীর মাঝী প্রথমে কথা কহিল। ইঙ্গিতধ্বনিতে তাহার মনে বোধ হয়, কিছু সংশয় জন্মিয়াছিল। সে আমাদের শালতীর মাঝীকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে রেমো! বুঝ্‌ছিস্ কি?"

রেমোর উত্তরের ভাবে বোধ হইল, সেও সে শব্দটাকে লক্ষ্য করিয়াছে। সে বলিল- "ও কিছু না। দেখ্‌ছি না, সঙ্গে একখানা পাল্কী রহিয়াছে।"

"তবে কুক্ দিল কেন?"

"কোন একটা হিসেব করিয়া দেয় নাই। আর দিলেই বা ক্ষতি কি! একটা হাঁক দিলে চারিদিকের গাঁ হইতে এখনি হাজার মরদ জড় হবে।"

আমি তখন বুঝিলাম, কাহারা পাল্কী লইয়া তীরভূমি ধরিয়া, শালতীর সঙ্গে একমুখে চলিয়াছে। তাহারা দস্যু নয়। দস্যু হইলেও ভয় নাই। এখনি মাঝীর এক ডাকে গ্রাম হইতে হাজার লোক ছুটিয়া আসিবে।

বালকের চিত্ত—সহজে এক মুহূর্ত্তে যেমন ভীত হইয়াছিল, মাঝীর সরল আশ্বাসে তেমনি সহজে এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্ভয় হইল। আমি পাল্কী দেখিবার জন্য শালতীর 'ছই' হইতে আর একবার মুখ বাহির করিলাম।

দেখিলাম, বাস্তবিকই চারিজন লোক একটা পাল্কী কাঁধে শালতীর সঙ্গে ছুটিতেছে। তাহার পিছনে একটা লোক, তাহার হাতে একটা লম্বা লাঠী—সেও পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে।

উভয় মাঝীতেই কিছুক্ষণের জন্য শালতী দুটাকে একটু দ্রুত চালাইল। পাল্কীর বেয়ারাগুলাও সঙ্গে সঙ্গে

দ্রুত চলিল। মাঝীরা যেই একটু শালতীর বেগ কমাইল, তাহাদেরও বেগ অমনি কমিয়া আসিল। গতিক বুঝিতে না পারিয়া পিতার শালতীর মাঝী রামাকে বলিল, —"একটু দাঁড়া।"

আমরা আগে যাইতেছিলাম—পিতার শালতী পিছনে ছিল।

শালতী থামিল, পাল্‌কীও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। ইহার মধ্যে আমরা গ্রাম হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এবারে যেখান দিয়া যাইব, যদি ভয় থাকে, ত সেইখানেই একটু থাকিতে পারে। থালে সে দিন অন্য কোন শালতী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

পাল্‌কীর পিছনে যষ্টিধারী এইবারে কথা কহিল। আমাদের মাঝীর নিকট হইতে অগ্নি-প্রাপ্তির আশা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নিকটে তামাক আছে, কিন্তু আগুনের অভাবে তাহারা তার অস্তিত্বে শুধু যাতনার ধূমপান করিতেছে। তজ্জন্য তাহাদের উদর স্ফীত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

মাদকসেবনের সৌকর্য্যার্থে শ্রমজীবীদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ অগ্নি-আদান-প্রদানের উদারতা চিরকালই আছে। কিন্তু সে দিন আমাদের মাঝী সে রীতির ব্যতিক্রম করিল। বলিল,—"থাকিলেও দিবার উপায় নাই। আমরা শালতী ভিড়াইতে পারিব না।"

যষ্টিধারী এরূপ দুর্ব্বোধ্য নিষ্ঠুর আচরণের কৈফিয়ৎ চাহিল। মাঝী কৈফিয়ৎ দিতে শালতীতে হাকিমের অস্তিত্বের কথা শুনাইল। শুনাইয়া আবার যেই শালতী চালাইয়াছে, অমনি সে ব্যক্তি গুরুগম্ভীর স্বরে তাহাকে চালাইতে নিষেধ করিল।

স্বরে পিতা-মাতা উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন। সেই একটা গম্ভীরস্বরঝঙ্কার কোলাহলের আকারে সুষুপ্ত পিতার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। পিতা বলিয়া উঠিলেন— "কি রে, গোলমাল কিসের?"

মা আমাকে ছইএর বাহিরে বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি হরিহর?" মাঝী পিতার প্রশ্নে যা উত্তর দিল, তাহাতেই মায়েরও ব্যাপার বোঝা হইল। আমাকে আর উত্তর করিতে হইল না।

পিতা বুঝিলেন, মাঝীরা আগুন দিতে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া, যষ্টিধারী তাহাদের শালতী চালাইতে নিষেধ করিতেছে। তিনি বলিলেন—"তামাক খাবার জন্য আগুন চাচ্চে, তা দে না কেন।"

ভীত অথবা করুণাপরবশ হইয়া তিনি এ কথা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মা কিন্তু ভীতা হইয়াছেন। পিতার আদেশে রাম যেই আমাদের শালতী ভিড়াইতেছিল, অমনি তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, —"আমাদের শালতী কেন, যে হুকুম করিয়াছে, তাহার মাঝী দিয়া আসুক।"

আমাকে তিনি ভিতরে আসিতে আদেশ করিলেন। আমি ভিতরে না গিয়া, মাকে বলিলাম—"মা! কেমন একটি সুন্দর পাল্কী!"

সুন্দর পাল্কী দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাও বাহিরে আসিলেন। পিতাও তাঁহার শালতীর বাহিরে মুখ বহির্গত করিলেন। তাঁহার শালতী যেমন তীরভূমি স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, পাল্‌কীও অমনি ধীরে ধীরে তরী হইতে জল-সান্নিধ্যে অবতরণ করিতেছিল।

মা বলিলেন—"তাই ত হরিহর, এমন সুন্দর পাল্কী ত কখনও দেখি নাই।"

পিতা যষ্টিধারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এ পাল্কী কার রে?"

যষ্টিধারী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল—"হুজুর! পাল্কী আমার মনিবের। তাঁহার নাতনীর জন্য বর আনিতে চলিয়াছি।"

পিতা প্রশ্ন করিলেন—"কে তোদের মনিব?"

"মনিবের নাম বলিলে হুজুর ত চিনিতে পারিবেন না!"

'হুজুর' কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন, ভৃত্যটা সভ্য। সুতরাং তার মনিবও সভ্য। আমাদের দেশের লোকগুলা এখনও সভ্যতা শিখে নাই। তাহারা হাকিম কখন চক্ষে দেখে নাই। সেই জন্য দেশের চাষা-ভূষা, চাকর-বাকরগুলা পিতাকে কেহ ঠাকুরম'শায়, কেহ বা বাবা-ঠাকুর, কেহ দাদা-ঠাকুর বলিত—এক জনও হুজুর বলিত না।

এরূপ সভ্য মনিবের সভ্য চাকরের সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই বুঝিয়া, মা পিতার হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"নাম বল্ না। চিনিবার মত লোক হইলে বাবু তাঁকে অবশ্যই চিনিবেন।"

"তাঁহার বাড়ী এখান হইতে প্রায় একশো ক্রোশ তফাৎ হইবে।"

"একশো ক্রোশ! তোরা কি গাঁজা খাইয়াছিস্?"

"না হুজুরাইন, এখনও খাই নাই। বর লইয়া তার পর খাইব। এই জন্য হুজুরের শালতী থেকে একটু আগুন যোগাড় করিতেছি।"

হুজুর, হুজুরাইন! মা যেন কথাগুলা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন। আমার পিতাকে হুজুর বলা তিনি বহুলোকের মুখে বহুবার শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে হুজুরাইন সম্বোধন তিনি কোনও কালে কাহারও

মুখে শুনেন নাই। কি বুঝিয়া মা আর লোকটাকে নিজে প্রশ্ন না করিয়া আমাকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর্ ত হরিহর, উহারা কি?"

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। মা আমাকে এমন অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলিলেন যে, সে কথা আপনা আপনিই লোকটার কানে পৌঁছিল। সে বলিয়া উঠিল—"হজুরাইন! আমরা পাঠান।"

পিতার মুখে এতক্ষণ আর একটি কথাও শুনি নাই। এইবারে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"মনিব?"

"তিনি হিন্দু।"

"জাতি কি?"

"বলিতে নিষেধ আছে, হজুর! তবে তিনি বামুন ন'ন।"

"বর কোথাকার?"

"তার এখনও ঠিক নাই।"

"ঠিক নাই?"

"আজ্ঞে হজুর, বর খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

"শালতী এতক্ষণে তীরসংলগ্ন হইল। পাল্কী লইয়া বেহারাও শালতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। উত্তরগুলা যেন হেঁয়ালীর মত। পাল্কী লইয়া বেহারাগুলার আগমন যেন সন্দেহজনক। পিতা আর বর সম্বন্ধে কোনও কথা কহিলেন না। মাঝীকে তৎপরিবর্ত্তে আগুন দিতে আদেশ করিলেন।

মায়েরও কি জানি, কেন, ভয় হইয়াছে। তিনি আমাকে ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে নীরবে আকর্ষণ করিলেন।

আমি দেখিলাম, বেহারারাও যষ্টিধারীর মতই বলিষ্ঠকায়। তাহারাও মুসলমান। আমারও কেমন হঠাৎ বুকটা গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। মায়ের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আগুন করিবার জন্য দ্বিতীয় মাঝী চকমকি ঠুকিতে লাগিল। ইত্যবসরে যষ্টিধারী বলিল—"হজুর! মনিবের বেটীর বর খুঁজিয়া আমরা হায়রাণ হইয়াছি। এখন হজুর যদি গোলামের প্রতি দয়া করেন।"

"আমি কি দয়া করিব?

এই বলিয়াই পিতা মাঝীকে শালতী চালাইতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র রাম আমাদের শালতী চালাইল। পিতার শালতী আবদ্ধ হইয়াছে।

দুই তিন হাত শালতী চলিয়াছে কি না, অমনি যষ্টিধারী গুরুগম্ভীরস্বরে রেমোকে মধুর অন্তরঙ্গ আত্মীয় সম্বোধনে দাঁড়াইতে আদেশ করিল।

পিতা বলিলেন—"আর কেন ভাই, আমাদের যাইতে দাও।"

উভয় মাঝীও পিতার সঙ্গে তাঁহার শালতী মুক্ত করিতে দস্যুকে অনুরোধ করিল। দস্যুটা অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া পিতাকে বলিল,—"কি হজুর, দয়া হইবে না?"

পিতা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কিসের দয়া?"

"একটি বর।"

"বর আমি কোথায় পাইব? আমাকে কি ঘটক পেলি?"

"ঘটক হইবেন কেন—আপনি হাকিম। তাই হকুম চাহিতেছি। বর আপনার সঙ্গে চলিয়াছে।"

"কে? আমার ছেলে?"

"অমন সুন্দর বর এ গোলামের নজরে আর কখন পড়ে নাই। আপনার হকুম পাইলেই খুসি হইয়া যাই। নহিলে—"

"নহিলে কি জোর করিয়া লইয়া যাইবি?"

"কি করিব খোদাবন্দ, উপায় নাই।" "তোর মনিব শুনিলাম শূদ্র।" "আপনি কি?" "আমরা বামুন।"

"কই, আপনার গাঁয়ের লোকে ত এ কথা বলিল না। তারা বলে, আপনি বামুনের ছেলে বটে! কিন্তু আপনি জাতকে জাহান্নমে দিয়েছেন। আমাদের পয়গম্বরের মতন এক ঠাকুরের সঙ্গে আপনি বেইমানী করেছেন। বামুন হ'লে কখন কি আপনি অমন কাজ কর্‌তে পার্‌তেন? আপনার পুত্রই আমাদের মনিবের কন্যার উপযুক্ত বর।" এই বলিয়াই দস্যু শালতী তীরসংলগ্ন করিতে রামের উপর আদেশ করিল। পিতা উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কখন না। যা রাম, তুই শালতী বাহিয়া চলিয়া যা।" দস্যু রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"খবরদার।" তারপর পিতাকেও সে রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"খবরদার হজুর পিস্তলে হাত দিলেই জন্মের মত হাতখানি ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

এই সময়ে তীরের উচ্চভূমি হইতে ভদ্রবেশধারী এক ব্যক্তি উচ্চ হাস্যে বলিয়া উঠিল—"বাধা দিবেন না অঘোর বাবু! একবার উপরে চাহিয়া দেখুন। আপনার পুত্রকে আমরা লইয়া যাইব। বাধা দিলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

পিতা কাতরভাবে তাঁহার কাছে আমার ত্যাগ ভিক্ষা করিলেন।

আর ভিক্ষা! ঝুপ-ঝাপ করিয়া জলে মনুষ্য-পতনের শব্দ হইল। রাম বলিয়া উঠিল—"মা! বড় বিপদ! একবারে একশো ডাকাত তোমার ছেলে লুঠিতে আসিতেছে।"

এই বলিয়াই সে শালতী হইতে ঝাঁপ খাইল। মায়ের আর কথা কহিবার শক্তি নাই; আমিই দস্যুদের একবার

লক্ষ্য বস্তু বুঝিয়া বাহুযুগল দ্বারা দৃঢ়রূপে বক্ষোমধ্যে আমাকে আবদ্ধ করিলেন। মায়ের হৃদয়ের প্রচণ্ড স্পন্দন-প্রহারে আমার যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আমার অঙ্গে কঠোর করস্পর্শ, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ, মায়ের আর্ত্তস্বর ও গ্রামবাসী-দের উদ্দেশ্যে সাহায্য-প্রার্থনার ব্যাকুল চীৎকার।

*　　*　　*　　*

আমি পাল্‌কীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। বস্ত্রে মুখ আবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও মাতার আর্ত্তনাদ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। রাত্রির ভীম নীরবতায় পথের কোথায় আমি, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি!

৩৩

সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে বদ্ধ-পাল্‌কীর ভিতরে আমি চলিয়াছি। অবশ্য, মুখ আমার বহুক্ষণ আবদ্ধ ছিল না। যখন দস্যুরা বুঝিল, আমার পিতামাতা আর আমার চীৎকার শুনিতে পাইবে না, তখন তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। খুলিয়া অভয় দিল। দস্যু সর্দ্দার সেই পাঠান বলিল—"হুজুর! তোমার কোনও ভয় নাই। সুতরাং চীৎকার করিও না, অথবা কাঁদিও না। আমরা শীঘ্রই আবার তোমাকে তোমার বাপ-মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু চীৎকার করিলে পাঠাইব না। ইহজন্মে আর তা' হইলে বাপ-মায়ের মুখ দেখিতে পাইবে না।"

তাহার কথাতে আমি চীৎকার করি নাই। কিন্তু চোখের জল অথবা বক্ষের স্পন্দন কিছুতেই রহিত করিতে পারি নাই।

ভয়—কি যে ভয়, তা এখন কেমন করিয়া বলিব? পিপাসায় আমার তালু শুষ্ক হইয়াছে; তবু আমি তাহাদের কাছে জল চাহিতে পারি নাই। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পলক ফেলি নাই।

সমস্ত রাত্রি অবিরাম গতি। কাঁধ বদল করিতে বেহারারা পথে এক একবার মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়াছে; আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। রাত্রির শেষ যামে পাল্‌কীর গতির বিরাম হইল। বেহারারা এইবারে পাল্‌কী ভূমিতে নামাইল। সর্দ্দার তখন পাল্‌কীর দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিল—"হুজুর! এইবারে বাহিরে এস।"

আদেশ-মত বাহির হইয়া দেখি—হা ভগবান, এ আমি কোথায় আসিয়াছি? সম্মুখে চাহিয়া দেখি শূন্য। চোখ মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখি, যতদূর দৃষ্টি যায় যেন একটা জলের বিরাট পাত পড়িয়া আছে। পশ্চাতে দেখি, গাছ, গাছ—গাছের গায়ে, মাথায়—ঢলিয়া, বেড়িয়া, জড়াইয়া, কেবল গাছ—যেন আমার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে। তখনও ঊষার আলোক সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই। সেই আলোক-আঁধারের মাঝে পড়িয়া আমি সমস্ত জগৎটা শূন্যময় দেখিলাম। আমার দেহ পতনোন্মুখ হইল। সর্দ্দার তাহা বুঝিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং অগণ্য আশ্বাস দিয়া বলিল—"হুজুর! আমরা সকলেই তোমার নফর। তুমি আমাদের সকলের মনিব। আমরা তোমাকে ভয় করিব। তুমি আমাদের ভয় করিবে কেন?"

তাহাদের কথা আমাদের দেশের লোকের কথার মত নয়; উচ্চারণে অনেক প্রভেদ। সেইজন্য তাহাদের আশ্বাসবাক্য আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। তবে তাহার কথার সঙ্গে তাহার মুখচোখের ভাব-পরিবর্ত্তনে স্নেহ ও কারুণ্যের আভাষ দেখিয়া এবং তাহাদের বারংবার হুজুর সম্বোধনে তাহারা আমার অনিষ্টকারী নয় বুঝিয়া আমি অল্পে অল্পে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

এইবারে আমি কথা কহিলাম। বলিলাম—"তোমাদের কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না! তোমরা কে?"

সর্দ্দার এইবারে বুঝিল, তাহার আশ্বাসবাণী আমার বোধগম্য হয় নাই। তখন সে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব্বকথার পুনরুক্তি করিল। তাহাতে এই বুঝিলাম, তাহারা যেই হোক না কেন, তাহাদের দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তবে সর্দ্দারের স্নেহসূচক বাক্যে তাহাদের হইতে আমার ভয় ঘুচিল বটে, কিন্তু স্থানের ভয় যে কিছুতেই ঘুচিতেছে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আমাকে কোথায় আনিলে?"

"এখানে অধিকক্ষণ থাকিব না, হুজুর! আমরা আর একটু পরেই এখান হইতে রওনা হইব। বেহারারা এই রাত্রির মধ্যে প্রায় ষোল ক্রোশ পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহারা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছে।"

দেখিলাম, বেহারারা সকলেই একটা প্রকাণ্ড গাছের তল আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ডকে পিছন করিয়া, আধাআধি পা ছড়াইয়া, জানুতে হাতের ভর দিয়া, বৃক্ষমূলদেশ বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়াছে। কেহ তামাক খাইতেছে; কেহ একটা লাঠী লইয়া মাটী খুঁটিতেছে; কেহ বা পার্শ্বস্থ সঙ্গীর সঙ্গে কি এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁগা, এ কোন দেশ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে দিকে কেবল গাছ, সেই দিক্ হইতে একটা কি রকম গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। শব্দে

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সর্দ্দার আবার আমাকে ধরিল। আবার অভয় দিল। বলিল—"ও শালা তোমাকে হুজুর মানিয়া বনের ভিতর হইতে আদাব করিতেছে।"

"এই কি বন্?" "সুন্দরবনের নাম শুনিয়াছ, হুজুর?" "এই সেই—?" "এই সেই সুন্দর-বন।"

সবিস্ময়ে সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বনে অনেক বাঘ আছে?"

সর্দ্দার ঈষৎ হাসিমুখে বলিল—"আছেই ত। দেদার আছে। কিন্তু তাতে কি হুজুর, তুমি এ বনের রাজা—তারা প্রজা। তারা তোমাকে কাঁধে করিয়া নাচিবে।"

বাঘের কাঁধে চড়িয়া নাচিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না বুঝিয়া, আমি বলিলাম—"এই ত তোমার কথামত আমি চুপ করিয়া ছিলাম। এইবারে আমাকে বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

"এখনও শ্বশুরবাড়ী দেখা হইল না, আমাদের রাণীমায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হইল না, খানাপিনা কিছু করিলে না—এখনি যাইবার কথা কি হুজুর? আমি যখন বলেছি, তোমার বাপের কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিব, তখন তাহার অন্যথা হইবে না। তবে ব্যস্ত হইলে, আর বার বার পাঠাইবার কথা তুলিলে, পাঠাইতে দেরি করিব।"

আর আমি পাঠাইবার কথা তুলিতে সাহস করিলাম না। পিপাসা-নিবারণের জন্য তাহার কাছে আমি পানীয়ের প্রার্থনা করিলাম। সর্দ্দার আমাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিল। সে মুসলমান। সে ত আমাকে জল দিবে না। যে জল দিতে পারিবে, সে আসিতেছে। তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় তাহারা সেখানে পাল্‌কী রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম—"সম্মুখে অগাধ জল—শুধু জল, তার একগণ্ডূষও কি আমি মুখে দিতে পারি না?"

"না। তা হ'লে তোমাকে এখনি আমি জলের কাছে লইয়া যাইতাম। জল লোণা; মুখে দিতে পারিবে না।"

"তবে কে আমাকে জল আনিয়া দিবে? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, আর একবার দেখিলাম—কালো জল দুলিতে দুলিতে কালোবরণ একটা প্রাচীরের তলে যেন মিশিয়া যাইতেছে। পশ্চাতে সুন্দরবন—কালোবরণ মাথা তুলিয়া কালোবরণ আকাশ হইতে দুই একটা তারা ধরিবার জন্য যেন হাত নাড়িতেছে। ইহার ভিতরে কে কোথায় আছে? সে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিবে যে, আমাকে জল দিবে?"

আবার একবার বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন উঠিল। আমি পিপাসা ভুলিয়া সব ভুলিয়া সর্দ্দারকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে হাসিয়া, হাত দিয়া আমার দুই পার্শ্ব ধরিল, এবং কুকুটী যেমন চিলের ছোঁ হইতে শাবকগুলিকে রক্ষা করে, সেই মত আনত হইয়া, তাহার বিশাল বক্ষে আমাকে আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর্য্যাপ্ত-সঞ্জাত শ্মশ্রু আমার কপোলযুগল স্পর্শ করিল। সে বলিল—"গোলাম কাছে থাকিতে সেরকে ভয় কি হুজুর! আমি তাকে শিয়াল মনে করিয়া থাকি। আর সে বাঘ এখানে কোথায়? এখান হইতে সে চার পাঁচ ক্রোশ তফাতে খাড়ীর পারের জঙ্গলে ডাকিতেছে। কাছে থাকিলে সে চীৎকার করিত না—চোরের মত চুপি চুপি আসিত। আসিলে তোমার সুমুখে তখনই তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইতাম।"

মন আমার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফালাফি করিতেছিল। তাহার আশ্বাসবাক্যে আবার আমি মুখ তুলিলাম। সর্দ্দার এবারে আমাকে কাঁধে উঠাইল। কাঁধে উঠিয়াই আমি একেবারে নির্ভয় হইয়াছি। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে বেহারাদের মধ্যে কাহাকেও ভীতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। তাহারা যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া আছে। তাহাদের তামাকের কলিকা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফিরিতেছে।

সর্দ্দার তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এত দেরী হচ্ছে কেন রে?"

তাহারা কি উত্তর করিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহারা আমার শরীর-রক্ষীকে সর্দ্দার সম্বোধনে উত্তর দিল। তাই শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্দ্দার!—"

প্রশ্ন শেষ না হইতেই সর্দ্দার বলিল—"হুজুর!"

"উহারা কি বলিল?"

"বলিল, বজরা খাড়ীর ভিতরে নোঙ্গর করা আছে। জোয়ার হয় নাই বলিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না।"

বজরা আমি হুগলী যাইবার পথে কলিকাতার গঙ্গায় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খাড়ী কি আমি জানিতাম না। এই একটু আগে শুনিলাম, বাঘ খাড়ীর পারে গর্জ্জন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাড়ী কি?"

"এবারে আর তোমাকে তা দেখান হইল না। দেখাইতে হইলে এই গভীর জঙ্গল ভেদ করিতে হয়। কি জানি, ইহার ভিতরে অন্ধকারে কোথায় কোন্ সম্বন্ধী ওৎ করিয়া বসিয়া আছে! দেখিতে না পাইলে তোমাকে লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িতে হইবে।"

এই বলিয়া সর্দ্দার খাড়ী কি, আমাকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আমি বুঝিলাম, সাগর-সঙ্গমমুখে ভাগীরথী সাগরতুল্যই বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। খাড়ী তাহারই একটি অপরিসর শাখা। অরণ্যানী ভেদ করিয়া, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র আরণ্য দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া,

এইরূপ অসংখ্য প্রণালী জালরূপে এই অম্বুপদেশে বিস্তৃত হইয়া আছে। বড় গাঙে বজরা রাখিলে জোয়ার-মুখে বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, বজরা খাড়ীর ভিতরে নিরাপদ্ স্থানে নোঙ্গর করা আছে।

আমাকে বুঝানো শেষ হইতে না হইতে ভৈরব কল্লোলে জোয়ার আসিল। দেখিতে দেখিতে নিম্ন-তটভূমি প্লাবিত করিয়া, যে বৃক্ষতলে বসিয়া বেহারারা বিশ্রাম লইতেছিল, জলোচ্ছ্বাস সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া আসিল। অমনি সমস্বরে উচ্চ কোলাহলে আল্লার নামে দরিয়ার উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলিয়া, বেহারারা যে যার লাঠি হাতে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কারে কাননভূমি মুখরিত করিয়া অসংখ্য পাখীর কলধ্বনি।

সর্দ্দার বলিল—"হুজুর! এইবারে আবার আমাদের চলিতে হইবে। ফিরিবার সময় যদি আমরা এই পথ দিয়া ফিরি, তা হ'লে তোমাকে খাড়ী দেখাইব।"

সর্দ্দারের এই সরল প্রতিশ্রুতিতে আমার দেশে ফিরিবার আশা হইল। শুনিয়া আমার ভয় ঘুচিল। তাহার এতক্ষণের ব্যবহারে, তাহার স্নেহপূর্ণ কথায়, সর্ব্বোপরি তার বার্দ্ধক্যের যোগ্য বীরোচিত মূর্ত্তিতে অল্পে অল্পে তার প্রতি আমার প্রীতি জন্মিয়াছে।

আমি বলিলাম—"তবে চল।"

'চল' কথা শুনিবামাত্র সর্দ্দার হো হো হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি শুনিয়া আমি কিছু অপ্রতিভ হইলাম। হাসিবার কথা আমি এমন কি কহিয়াছি?

সর্দ্দার বলিল—"জল খাইতে চাহিয়াছিলে না হুজুর?"

তাই ত! আমার সে দারুণ পিপাসা? কই, এখন ত তার অর্দ্ধেকও নাই! এ পিপাসা আপনা আপনি কেমন করিয়া মিটিল! তবে কি সত্য সত্যই আমি পিপাসিত হই নাই!

আমার উত্তরদানে বিলম্ব দেখিয়া সর্দ্দার বলিল—"যদি পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে পাল্কীতে উঠ। বজরা খাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। আমরা আর একটুও বিলম্ব করিব না।" আসল কথা, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না লইয়া জলপান করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বলিয়া, সর্দ্দার নানা কথায় কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেছিল। ইত্যবসরে ঊষার শীতল জলীয়বাষ্পের বারংবার শ্বাসগ্রহণে আমার কণ্ঠতালু আবার সরস হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও অনেক উপশম হইয়াছে।

তথাপি আমি সর্দ্দারের কথায় উত্তর করিলাম। বলিলাম—"কই, তুমি জল ত আমায় দিলে না!"

"তোমাকে আর কেমন করিয়া দিব হুজুর! তোমার বাবা হইলে দিতাম।"

"আমার বাবাকে দিতে তবে আমাকে দিবে না কেন?"

"তোমার বাবা যে আমাদের কুটুম্ব। তাঁহাকে শুধু জল কেন, আমার ঘরের সুরুয়া পর্য্যন্ত দিতে পারি। তুমি জামাই—তোমাকে দিতে পারি না।"

আমি পাঠান সর্দ্দারের জামাই হইতে চলিয়াছি, শুনিয়া ভয়ে আবার আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি হতভম্বের মত সর্দ্দারের মুখপানে চাহিলাম।

সর্দ্দার আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দীর্ঘ যষ্টিতে দুই হাতের ভর দিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়াইল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"মুখপানে দেখিতেছ কি হুজুর? তোমাকে ধরিয়া লইয়া আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব।"

আমার পূর্ব্বের পিপাসা ফিরিয়া আসিল। সর্দ্দার বলিল—"এইবারে জল খাও।"

সাদীর কথা শুনিয়াই আমার মেজাজ চটিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বালকসুলভ আত্মবিস্মৃতির বশে আমি স্থানা-স্থান অবস্থা সব ভুলিয়াছি। আমি ঈষৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলাম—"তোমরা জল দিলে আমি খাইব না।"

"আমি দিলেও খাইবে না ভাই?"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রমণী! যুবকের চক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই। সুতরাং যুবকের দৃষ্টিতে লাবণ্যময়ী পরিণতযৌবনার রূপের যে বিশ্লেষণ, তাহা ক্ষুদ্র দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে হইবার সম্ভাবনা নাই। বালক—বিশেষতঃ ভয়বিস্ময়ে ব্যাকুল বালক—এক অপূর্ব্ব মধুময় কথার ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া, প্রথমেই তাঁহাকে যে রূপে আবির্ভূতা দেখিয়াছিল, তাহাই আমি বলিতেছি। ইহার পরেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিকৃতি-স্বরূপ অনেকবার তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। আবার বলিব? ইহার পূর্ব্বেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। কিন্তু সে দৃষ্টিহীনের চক্ষে দেখা। অভিমান-বিড়ম্বিতের গৃহে জন্মিয়াছিলাম। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে অলক্ষ্যে মিশ্রিত অভি-মানেই পুষ্ট হইয়াছিলাম। অভিমানিনী আঁখির তারকা-বরণী ভেদ করিয়া সেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আজি পিপাসাব্যাকুলিতের নেত্রে প্রথম তাঁহাকে দেখিলাম। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় রসপূর্ণ হইল! পিপাসা মিটিল! হৃদয় অতিরিক্ত রস ফুৎকারে লোচন-পথে নিক্ষেপ করিল। দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই, আমায় চিনিতে পারিলে না?"

আমি উত্তর করিলাম না। সর্দ্দারের কাছ হইতে উন্মত্তের মত তাহার দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম।

"থামো থামো। আমার এক হাতে গরম দুধ, অন্য হাতে জল।"

আর দুধ আর জল! আমি বাহুদ্বয়ের দৃঢ়বেষ্টনে তাহার কটিদেশ আবদ্ধ করিয়াছি উষ্ণদুগ্ধ আমার দেহে পড়িবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্তা অবনমিতদেহার পয়োধর যুগলতলে মুখ লুকাইয়াছি।

আপনাদের বোধ হয় বলিতে হইবে না, এ রমণী কে? আমাদের হুগলীতে অবস্থানকালে ইনি এক বৎসর আমাদের বাসায় ঝিয়ের মূর্ত্তিতে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক এখন আর আমি বলিব না। অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে আজ সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছি। ধন-গৌরবের সঙ্গেই আমরা আজিকালি সম্ভাষণের অনুপাত করি! পূর্ব্বেও এ ভাবটা আমাদের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। তখন অন্তর্গৌরবের দিকে আমাদের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। সদ্গুণসম্পন্ন দরিদ্রকে আমরা শ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

এখন হইতে আর তাঁকে ঝি বলিব না। তাঁর নাম দয়াময়ী। এ নাম আমাদের হুগলীর বাসায় এক বৎসরের মধ্যেও কাহারও জানিবার অবকাশ ঘটে নাই। পিতামাতার ত নয়ই, আমারও না। ঝি ত ঝি—তার কি আবার নাম থাকে! যদিই থাকে, সে নাম কি মধুরভাবে মুখে আনিবার যোগ্য! সেইজন্য এমন মধুময় নাম আমরা কেহ কাণের কিনারায় আসিতে দিই নাই! যে সময়ের কথা বলিয়াছি, সে সময়েও কি জানিয়াছি? জানিয়াছি পরে। অন্তর্গৌরবই যাঁর কাছে একমাত্র গৌরব বলিয়া গ্রাহ্য, তাঁহার মুখে শুনিয়া জানিয়াছি। তবে এখন হইতে তাঁহাকে দয়া-দিদি বলিয়াই আপনাদের কাছে পরিচিত করিব। সম্রান্তবংশের কুলবধূ—পরনির্ভরতা হেয় জ্ঞানে আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যিনি গতর খাটাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-জাতিরই সম্মাননার যোগ্য।

কোনও ক্রমে জল ও দুধের পাত্র ভূমিতে রাখিয়া, দয়াদিদি আমাকে বাহুপাশে দৃঢ় বাঁধিয়া বক্ষের উপর তুলিয়া ধরিল এবং আমার মুখ অজস্র চুম্বিত করিল। বামুনের মুখ বলিয়া আর সে মানিল না। তার পর কোল হইতে একবার আমাকে ভূমিতে নামাইল। ঘটী হইতে জল লইয়া আমার মুখচোখ প্রক্ষালিত করিল। শেষে অঞ্চল দিয়া আমার মুখচক্ষু মুছাইয়া আমাকে দুগ্ধপান করাইল।

সর্দ্দার বলিল—"মাসীজি, আর নয়। 'গণ' বহিয়া যাইতেছে।"

দয়াদিদি বলিল—"চল।"

বেহারারা আবার আমাকে পাল্কীতে উঠাইল। রশি-খানেক তীরস্থ বনপথ ভেদ করিয়া যাইতে না যাইতেই সুন্দর এক বজরা দৃষ্টিগোচর হইল। বজরাকে ঘেরিয়া অনেকগুলা ক্ষুদ্রাকার নৌকা।

পল্কীশুদ্ধ আমাকে সকলে বজরার উপর উঠাইল। দয়াদিদিও আমার সঙ্গে বজরায় আরোহণ করিল। সরদার ও তাহার সঙ্গিগণ নৌকায় উঠিল। আবার একবার গগনভেদী সমবেত কণ্ঠে আল্লাধ্বনি। ধ্বনির দিগন্তগত ঝঙ্কার নিস্তব্ধতায় বিলীন হইলে দেখি, তীরস্থ বনভূমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীতমুখে ছুটিয়াছে।

৩৪

বজরায় উঠিয়া দেখি, আরও দুইটি স্ত্রীলোক তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একটি অর্দ্ধবয়সী, অপরটি যুবতী। উভয়েই শ্যামাঙ্গী। তাহাদিগের আকারে উভয়কেই পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। আমার দুইদিকে, দুই-খানি ঝালরযুক্ত সুন্দর পাখা লইয়া তাহারা আমাকে ব্যজন করিতে বসিল। বজরায় যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই একটিও কথা কয় নাই। অবস্থার গুরুত্বে তখন সকলেই নীরব। নদীর ঢেউ দুইধারে ঢালিয়া গমনশীল বজরার তলদেশে কেবল থাকিয়া থাকিয়া কল্লোলধ্বনি উঠিতেছিল। আর সর্ব্বত্র নীরবতা। বায়ুর প্রহারে বজরার পাল পূর্ণ বিস্ফারিত হইয়াছে। দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে, আমার অপহারক সঙ্গিগণের নৌকা বজরার ব্যূহের আকারে চলিয়াছে। তাহারাও নীরব। সমস্ত প্রকৃতিতেই যেন নিস্তব্ধতা। দূরে তীরভূমি এখনও শয্যাশায়িনী দিগঙ্গনার লম্বমানা বেণীর মত দৃষ্ট হইতেছিল।

ধীরে ধীরে অরুণালোক দূরস্থ অরণ্যপ্রাচীরশীর্ষে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেখি, সূর্য্যদেব সাগরজলে স্বর্ণকুম্ভের মত ভাসিয়া উঠিতেছে। সাগরে সূর্য্যোদয় কখনও দেখি নাই। সাগরে কেন, দেশেও কখন সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এই প্রথম দেখিলাম। অরুণের অভ্যুত্থান আমার দৃষ্টিতে কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি প্রথমে তাহা সূর্য্য বলিয়াই বুঝিতে পারি নাই। বস্তুটা কি, জানিবার জন্য দয়াদিদিকে ডাকিবার আমার প্রয়োজন হইল। বজরার কামরার খড়খড়ি দিয়া আমি সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। মুখ না

ফিরাইয়াই দয়াদিদিকে ডাকিলাম। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জানি না। দিদি বলিয়া ডাকিতে তখনও অভ্যস্ত হই নাই।

আমি ডাকিলাম—"ঝি !"

পার্শ্বস্থা যুবতী-পরিচারিকা উত্তর করিল। আমি অমনি মুখ ফিরাইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সে বলিল—"কি বল জামাই বাবু !"

"তোকে নয় ললিতা ! তোর জামাই-বাবু আমাকে ডাকিতেছে।"

আমি তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া দয়াদিদির পানে চাহিলাম। বজরার ভিতরে দুইটি কামরা। দয়াদিদি দেখি, ভিতরের ছোট কামরাটিতে বসিয়া বঁটিতে ফল কাটিতেছে। আমি তাঁহার পানে চাহিতেই দিদি বলিল—"কেন ডাকিতেছ ভাই ?"

মধ্যবয়সী রমণী বলিল—"আপনি কি ঝি ? জামাই-বাবু ললিতাকেই ডাকিতেছে।"

দয়াদিদি বলিল—"আমি ঝি বই কি !"

ললিতা বলিল—"তা মাসীমা যখন শুদ্দুর আর জামাই-বাবু বামুন, তখন তিনি জামাইবাবুর একরকম ঝি বই কি।"

"এক রকম কেন, পুরাদস্তুর। আমি মাহিনা লইয়া উঁহার বাপের ঘরে বহুদিন চাকরী করিয়াছি।"

ললিতা উচ্চ হাসিয়া বলিল—"মাসীমার এক কথা।"

মধ্যবয়সী বলিল—"তোমার পিছনে পাঁচটা ঝি, তুমি পরের ঘরে চাকরাণী-বৃত্তি করিয়াছ ! আর এ কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিব ?"

"আমি মিথ্যা বলি নাই অহল্যা !"

আমি একান্ত বুদ্ধিহীন ছিলাম না। এই সকল কথার উত্তর প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, দয়াদিদির ঝিয়ের কার্য্যে বিধাতা একটা গোলমেলে রকমের বাদ সাধিয়াছে। সে গোল-মালটা তখন আমার বুদ্ধির সাহায্যে মীমাংসিত করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আমি মনে মনে স্থির করিলাম, দয়াদিদিকে আর ঝি বলিব না।

বস্তুতঃই তাহারা দয়াদিদির কথায় বিশ্বাস করিল না। তখন দিদি সাক্ষ্য-দানের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন, না দাদাবাবু ? তুমি ত আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিয়াছ ?"

আমি আর ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"না।"

"তবে তুমি কাকে মনে করিয়া বলিয়াছ ?"

আমি পার্শ্বস্থ যুবতী ললিতাকে দেখাইয়া দিলাম। অমনি সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ হাসির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আমি অপ্রতিভ হইলাম। তবে কি ললিতা ঝি নয় ?

মধ্যবয়সী তখন মুখ নাড়িয়া তাহাকে বলিল—"হাসিতে-ছিস যে ? খানিকটে যৌবনের লাবণ্য চুরি ক'রে, জড়োয়াবালা হাতে প'রে তুই কি জামাইবাবুর চোখে এড়িয়ে যাইবি ?"

ও হরি ! কি করিলাম ! আমি মাথা নামাইয়া চুপি চুপি ললিতার হাতখানার দিকে চাহিলাম। আমি সে বালা দেখিয়াছিলাম ; ক্ষণেকের জন্য দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া সোনার নয়, সুতরাং মূল্যবান্ নয় মনে করিয়া-ছিলাম। বসন তাহার ভূষণের অনুরূপ ছিল না। এক-খানা আধময়লা লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। বর্ণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্যামা, তিনভাগ কৃষ্ণে এক ভাগ গৌরবর্ণ মিশিয়াছে। অত খুঁটিয়া রূপ দেখিবার সে বয়স নয়, আমার তখন সে অবস্থাও নয়। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাকে সম্ভ্রান্তা বুঝাইতে, তাহার রূপ সে সময়ে আমাকে কোনও সাহায্য করে নাই। তাহার উপর পাখা লইয়া তাহার বাতাস করিবার আগ্রহে তাহাকে আমি ঝিই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে তাহাকে ত লক্ষ্য করিয়া বলি নাই ! এখন কাহাকেও আর ঝি বলা চলে না দেখিয়া, আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম।

"যাক্ তোরা আর আমার ভাইকে বিরক্ত করিস্ নি।"—এই বলিয়া দয়াদিদি একখানি রূপার রেকাবি সুপক্ক আম্র ও অন্যান্য ফল এবং মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তার পর ললিতাকে জল আনিতে এবং অহল্যাকে ভাল করিয়া একটি পান সাজিতে আদেশ দিয়া, আমাকে বলিল—"জল খাও।" আমি আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। দয়াদিদি বলিল—"না খাইলে বড় কষ্ট হইবে। দু'পুরের এদিকে অন্ন মুখে দিতে পাইবে না। সারারাত্রি বোধ হয়, একটু সময়ের জন্যও ঘুমাইতে পাও নাই। পেট ভরিয়া এখন আহার করিয়া, নিদ্রা যাও। নহিলে অসুখ করিবে।"

বাসায় দয়াদিদি যখন চাকরী করিত, তখন তাহার জেদ কিরূপ, আমি জানিতাম। মায়ের জেদ অনেকবার অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহার জেদ পারি নাই। আমি জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার মধ্যে ললিতা ও অহল্যা দুইজনেই ছোট কামরাটির ভিতরে চলিয়া গেল।

দয়াদিদি অবকাশ পাইয়া বলিল—"আমাকে ডাকিতে-ছিলে কেন ?

সূর্য্যোদয়ের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমাদিগের কথার অবসরে বালসূর্য্য মার্ত্তণ্ড হইয়াছে। আমি মুখ ফিরাইয়া দিদির

মুখপানে চাহিয়া হাসিলাম। দিদি আমাকে একটু মিষ্ট তিরস্কার করিল। বলিল—"অমন ঠাকুরমার নাতী তুমি, তুমি মিথ্যা কহিবে কেন?"

"আমি তোমাকে কি বলিব?"

"কেন, ঝি বলিবে। পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই তোমাদের ঘরে ঝি হইয়াছি।"

"আমি ঝি বলিব না।"

দিদি ঈষৎস্মিতবিকশিত মুখে বলিল—"তবে কি বলিবে?"

"আমি 'মা' বলিব।"

তড়িতের ক্রিয়াবশে যেন দয়াদিদির চক্ষু হইতে জলধারা গণ্ড বহিয়া ছুটিয়া গেল। আত্মহারার মত দিদি আমার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতে মুখ বাড়াইল। কিন্তু কি বুঝিয়া নিবৃত্ত হইল। বোধ হয়, দিদি বুঝিয়াছিল, সে শূদ্রাণী আর আমি ব্রাহ্মণকুমার। দিদি বলিল—"না ভাই, অত ভাগ্য আমার সহিবে না। তুমি আমাকে দিদি বলিয়ো।"

মা কোথায়? রূপে না কথায়? চেতনা মায়ের রূপ। মমতা মায়ের কথা। চেতনায় মায়ের উদ্বোধন, মমতায় অধিষ্ঠান। এই মমতার স্বরূপ না বুঝিলে মায়ের রূপানুভূতি হয় না। অনুভূতি সন্তান। তবে মমতাময়ী দয়াময়ী তোমাকে আমি মা বলিব না কেন? যাঁর হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি আমার গর্ভধারিণী মা। যাঁহার স্নেহে আমি প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছি, সেই পিতামহী আমার ধাত্রী-মা। আর যাঁহা হইতে আমার ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি একাধারে আমার গর্ভধারিণী ও ধাত্রী—জননী ও পিতামহী। সত্য কথা বলিতে কি, জগজ্জননীর স্মরণে যখনই আমি বলিয়াছি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা", তখনই সর্ব্বাগ্রে দয়াময়ীর মূর্ত্তি আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

দয়াদিদি পাত্রটি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আমাকে বলিল—"ইহার পরে আহার ঘটিবে কি না, ঠিক বলিতে পারি না। শুধু ফলাহারেই হয় ত আজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। সুতরাং আহারে সঙ্কোচ করিয়ো না।"

আমি বলিলাম, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ দিদি?" "আগে জল খাইয়া লও। তার পর বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে যাহা জানিতে চাও, বলিব, এখনও অনেকক্ষণ আমাদের বজরায় থাকিতে হইবে।"

দিদির আগ্রহাতিশয্যে উদর পূরিয়া আহার করিলাম। ললিতা একটি রূপার গেলাসে জল, আর অহল্যা একটি রূপার ডিপায় পান লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। পান দিয়া অহল্যা শয্যা বিছাইল।

আমি শয়ন করিলাম। হাতে পাখা লইয়া, মাথার শিয়রে বসিয়া দিদি নিজে এবারে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

সাগরে নিক্ষিপ্ত জীবের ভাগ্যবশে প্রাপ্ত স্থিরচ্ছায়া-দ্রুমাকীর্ণ তটভূমির মত দয়াময়ী দেবীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতলে আশ্রয় পাইয়া অচিরে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

৩৫

ঈশ্বরের নামে পাঠানগণের সমবেত কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেলিয়া দেখি, দিদি তখনও পর্য্যন্ত আমার শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। আমাকে জাগিতে দেখিয়াই দিদি বলিয়া উঠিল—"উঠ হরিহর, আমরা যথাস্থানে পৌছিয়াছি।"

আমি সর্ব্বপ্রথম দিদির মুখে আমার নাম শুনিলাম। শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিলাম। খড়খড়ির ভিতর মুখ দিয়া দেখি, কলিকাতার সন্নিহিত গঙ্গার ন্যায় এক প্রশস্ত নদীর তীরে বজরা ভিড়িয়াছে। তার অপর পারে শ্যামশষ্পাচ্ছন্ন নীলকাশ-স্পর্শী প্রান্তর। এপারে আম্র, পনসাদি বিশাল তরু-সমাচ্ছন্ন উদ্যানভূমি। অনুচরেরা নৌকা তীরে বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বজরার ভিতরে ললিতা ও অহল্যা বজরার এক কোণ আশ্রয় করিয়া তখনও ঘুমাইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরা উঠিতেছে না কেন?"

"এখনি সকলকেই উঠিতে হইবে। এখনও একটু বিলম্ব আছে বলিয়া, উহাদের উঠাই নাই। সর্দ্দার উহাদের জন্য পাল্কী আনিতে গিয়াছে। সে ফিরিলেই উঠাইব। উহারাও তোমার মত সারারাত্রি জাগিয়াছে।"

"উহারা জাগিয়াছে কেন?"

"উহারা বাঘের ভয়ে ঘুমাইতে পারে নাই। বনের ভিতরে বাঘ কেবল গর্জ্জন করিয়াছে।"

"তা হ'লে তুমিও ত সারারাত্রি জাগিয়াছ! তুমি ঘুমাইলে না কেন?"

"আমি ত আর বাঘের ভয়ে জাগিয়া ছিলাম না। আমি জাগিয়াছিলাম, তোমার জন্য উৎকণ্ঠায়। সে উৎকণ্ঠা ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। এইবারে দূর হইল। তোমাকে প্রাণে প্রাণে তীরে আনিয়াছি। এইবারে ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইব।"

"এইখানেই তোমার ঘর?"

"এখন তাই বই কি। তবে আগেকার ঘর নয়। আর পরেও থাকিবে কি না বলিতে পারি না।"

"এ আমি কোথায় আসিয়াছি?"

দয়াদিদি বিনত বিভাসিত মুখে বলিয়া উঠিল—"তা তোমাকে বলিব কেন? তোমাকে যে চুরি করিয়া আনিয়াছি। স্থানের নাম তোমার বাবা-মা জানিতে পারিলেই আমাকে ধরিয়া জেলে দিবে।"

অনেক ধীবর ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া নদীবক্ষে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন ঠিক এমনি সময় গাহিয়া উঠিল :—

"কানু এখন কালাপানিতে—শোন্ গো ললিতে!
রাজার বেশে বজরা চেপে যাচ্ছে চন্দ্রাবলী আনিতে।
রাজার ধর্ম্ম নিগূঢ় মর্ম্ম বোঝা বড় দায়;
রাইকে বুঝ্‌ব বাপের বেটী
যদি তারে ইসারায়
ধ'রে আনতে পারে কিনারায়।
নইলে একূল ওকূল দুকূল যে যায়।
দরিয়ার চোরা বালিতে—ওগো ললিতে!"

গানের সুর ললিতার ঘুমন্ত কানে প্রবেশ করিল। সে স্বপ্নোত্থিতার মত উঠিয়া বসিল। চারিদিক্ চাহিল। বোধ হইল, সে সুষুপ্ত হইয়াছিল। ঘুমের ঘোরে সে স্থান, কাল, সঙ্গ সমস্তই ভুলিয়াছে। উঠিয়া এখন সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইতেছে। আমাদের পানেও সে একবার চাহিল। গানের মিষ্টতায় আমরা উভয়েই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। দয়াদিদি কোনও কথা কহিল না।

ললিতা এইবারে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা! তুমি কি আমাকে ডাকিলে?"

মাসীমাকে উত্তর দিতে হইল না। ধীবর গাহিতে গাহিতে গানের শেষ কলিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

"দরিয়ার চোরা বালিতে—ওগো ললিতে?"

আমি বলিলাম—"কে ডাকিতেছে, বুঝিলে?"

ধীবর গীতশেষে আবার গানের প্রথমাংশের পুনরাবৃত্তি করিল। অমনি অন্য নৌকা হইতে হাতে পায়ে হাল চালাইতে চালাইতে অন্য এক ধীবর ললিতার নামে এক দীর্ঘতান ধরিল!

ললিতা তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"দূর মুখপোড়ারা! আমরা যে কানুকে কোন্ কালে কিনারায় আনিয়াছি।" এই বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

দয়াদিদি বলিল—"আর কেন, অহল্যাকে ডাকিয়া তোল্। পাল্কী আসিতেছে।"

সত্য সত্যই দেখি, আর দুইখানা পাল্কী লইয়া কতকগুলা উড়িয়া বেহারা নদীতীরে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে আরও কতকগুলা বেহারা আসিয়াছিল। তাহারা আমার পাল্কী লইতে বজরায় উঠিল। এতক্ষণ সর্দারকে দেখি নাই। এখন দেখি, সে লাঠি কাঁধে তীরস্থ এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্কতার সহিত উঠাইতে বেহারাদের আদেশ করিতেছে।

আমি পাল্কীতে চড়িয়া বজরাত্যাগ করিলাম। অপর দুইটি শিবিকার একটিতে দয়াদিদি, অপরটিতে ললিতা আরোহণ করিল। অহল্যা ললিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিল। তীরের উপর উঠিতেই ললিতার শিবিকাদ্বার রুদ্ধ হইল। তখন বুঝিলাম, ললিতা ঝি নহে। ঝিয়ের মধ্যে যদি কেউ আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে সে একমাত্র অহল্যা।

অশ্বত্থতলে আমার পাল্কী উপস্থিত হইতে না হইতেই সর্দার আমার শিবিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া একটি লম্বা গোছের সেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"হুজুর! যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিলাম, আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব। আসিয়া শুনিলাম, বেটীর সাদী হইয়া গিয়াছে। তবে আমি যখন কথা দিয়াছি, সে কথা আর নয় হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে তার নিকা দিব। তোমাকে জামাই না করিয়া ছাড়িতেছি না।

রহস্যের মর্ম্ম আমি যেন এখন অনেকটা বুঝিয়াছি। পাল্কীতে উঠিয়াই গম্যস্থানের একটা মনের মত ছবি আঁকিয়া তাহার ভিতরে আমি বিচরণ করিতেছি, আমি তাহার ভিতরে যাহাকে খুঁজিতেছি, তাহার সেই মুখখানি —আমলকীতল-সান্নিধ্যে আমার বইশ্লেট বগলে করিয়া, আমার পানে যে চাহিয়াছিল, যে মুখখানি দক্ষিণরায় ঠাকুরের আশিস্-পুষ্পের মত আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সেই মুখখানিই কেবল যেন আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াদিদি কি সে মুখখানি পাঠানের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে? অদৃষ্টে যা থাকুক, আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও সেই মুখখানি দেখিব। হুগলীর বকুলতলে আলো-আঁধারের মাঝে পড়িয়া, ভয়বিস্ময়ের বেড়ায় জড়িয়া সে মুখ দেখিয়াও আমার দেখা হয় নাই। চারি চক্ষুর মিলনসময়ে আমার সম্মুখে কেবলমাত্র দুটি নেত্র অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দীঘির কালোজলে ফুল্লারবিন্দের আয়ত পত্রের মত নিমেষের জন্য ভাসিয়া আবার অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করিয়াছিল। মুখখানি দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। আজ আমার সেই মুখ দেখিবার আশার যেন আভাস আসিতেছে। আমি ভাবিলাম, হউক পাঠান, সেই মুখ যদি পাঠানের ঘরেই লুকানো থাকে,

আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও তাহা দেখিয়া আসিব। জানিতে এক দিদি। আর কে এখানে এ ঘটনা জানিতে আসিতেছে ?

সর্দার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হুজুর, রাজী আছ ?"

আমি চক্ষু মুদিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে বলিলাম—"আছি।"

সর্দার হাসিয়া উঠিল। ললিতা বন্ধ পাক্কীর ভিতরেই হাসিল। অহল্যা বলিল—"কি মাসীমা, শুনিলে ?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"শুনিয়াছি। তাই ত আমার ঠিক উত্তর দিয়াছে। তোরা কি মনে করিয়াছিস্, হরিহর এখনও কিছু বুঝে নাই ? সর্দারকে সে এখনও চিনে নাই ? সে বুঝিয়াছে, সর্দারের কন্যার দুইবার বিবাহ হইতে পারে না। সে কন্যা ভাগ্যবতী পতিব্রতা—সতী।"

এই বলিয়া দয়াদিদি সর্দারকে যাত্রার অনুরোধ করিল। বলিল—"সর্দার! আর বিলম্ব কেন ? যে অসমসাহসিক কাজ করিয়াছ, তাহা ইহজীবনে ভুলিব না। যে স্থানে গিয়াছিলাম, তাহাও ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। আর ললিতা ও অহল্যার ঋণ, মরণের পরও সঙ্গে লইয়া যাইব। তোরা যে জানিয়া শুনিয়া ওরূপ স্থানে আমার সঙ্গে যাইতে সাহস করিয়াছিলি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তোরা কখন মানুষ ন'স।"

ললিতা কি উত্তর করিল, তাহা আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, সুন্দরবনের জঙ্গল যে কিরূপ, তাহা তাহাদের মধ্যে কেহই আগে জানিত না। জানিলে তাহারা দয়াদিদির সঙ্গিনী হইতে সাহস করিত না।

আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবার জন্য সকলেই অল্লাধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তবু কি ছাই এ পথের শেষ আছে! তাহার উপর এবারে কেবল গ্রাম্য পথে চলিয়াছি। অনেক সময়েই পথ এক একটা বিশাল আম্রকানন ভেদ করিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম, বাহকগণের সানুনাসিক আবেদনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে বালকবালিকাগুলার মুখে উচ্চচীৎকার পুরিয়া পথের উভয় পার্শ্বে সেগুলাকে সমবেত করিতেছে। বিরক্ত হইয়া আমি পাক্কীতে শুইয়া পড়িলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম পিতামাতাকে স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাগুলাও মনোমধ্যে উদিত হইল। এই পাক্কীর মধ্যেই বদ্ধচক্ষে কাল আমি না পুত্রবিয়োগিনী জননীর আকুল আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি ? মুক্তচক্ষু লজ্জায় পলকের সাহায্যে আপনাকে অন্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অমনি নিশীথের স্বতঃসঞ্চারী স্বপ্নবিষাদ দিবসের সংগোপনে আমার পলকমধ্যে অশ্রুবিন্দু রচনা করিল।

কিন্তু হায়, বিধাতা যে আজ আমাকে কাঁদিতে দেয় নাই। অশ্রুবিন্দু সুতরাং গণ্ডস্পর্শেরও অবকাশ পাইল না। অপাঙ্গে আশ্রয় লইতে না লইতে, অসংখ্য বাষ্পভাণ্ডের বিকট আরাবে পথ হইতেই তাহা মুক্তাকাশে মিলাইয়া গেল।

মুখ বাহির করিয়া দেখি, আমি এক অপূর্ব্ব পুরীর পত্রপুষ্পপতাকাসজ্জিত বিচিত্রতোরণ-দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

৩৬

একটা রোমান্স্ রচনা করিতে আমি এই হরণ-কাহিনীর অবতারণা করি নাই। কতকগুলি ঘটনা, একটির পর একটি, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, বিচিত্র ভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার মধ্যে যদি কোনওটিতে রোমান্সের কিছু রঙ লাগিয়া থাকে, সেটি কেবল দয়াদিদির আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনে।

এখানে বলা অবান্তর হইবে না বুঝিয়া, যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশত্যাগের পূর্ব্বে পিতামহী দাক্ষায়ণীকে সঙ্গে লইয়া প্রথমেই তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য তাহাকে তাহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি কাশীযাত্রা করিবেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন সেই স্থানেই অতিবাহিত করিবেন। দয়াময়ী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না জানিয়া, একমাত্র তাহাকেই তীর্থবাসের সঙ্গিনী করিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

দয়াদিদিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। পাকস্পর্শ-ক্রিয়া উপলক্ষে যে কয়দিন দাক্ষায়ণী আমাদের গৃহে উপস্থিত ছিল, সেই কয়দিন নিভৃতে এই ক্ষুদ্র বালিকার সঙ্গে দয়াময়ীর অনেক গোপন কথা চলিয়াছিল। সে কথা অন্যের জানা দূরে থাকুক, আমার পিতামহী পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সে রহস্যকথা কাহারও কাছে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়া, দীন তন্তুবায়কন্যা তাহা চিরদিন মন্ত্রের মত গোপন রাখিয়াছে। আজিও পর্য্যন্ত আমি তাহা জানিতে পারি নাই। জানিবার জন্য আমি দুই একবার দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম ; দিদি অনুরোধ রাখে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া উত্তর করিত—"ভাই! সে গুহ্যকথা। সে কথা শুনিবার অধিকার হইতে অকারণ

তোমরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছ। পতিব্রতার গুহ্য কথা। তুমি যদি অনুমান করিতে পার, তা হ'লে তুমিও ধন্য।"

সেই গভীর রহস্যাত্মক কথা আর তাহার কাছে জানিতে সাহস করি নাই। যথাশক্তি একটা অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনী-বর্ণনান্তে শ্রোতৃবর্গকেও আমি অনুমান করিবার ভার দিব।

পিতামহী—সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নীকে দাক্ষায়ণী-গ্রহণে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুরোধ রাখেন নাই। বলিয়াছিলেন—"যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার পৌত্রকে দান করিয়াছি, তাহাতে আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার। তীর্থে দাক্ষায়ণী আপনার সেবায় জীবন সার্থক করিবে।"

পিতামহী ব্রাহ্মণদম্পতির কথায় আশ্বস্তা হইলেন না। তিনি দাক্ষায়ণীর পানে চাহিয়া তাঁহাদের বলিলেন—"এই এতটুকু বালিকা! সে বাপ মা ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে কেন? আমি ত আর ফিরিব না।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ব্রাহ্মণী দাক্ষায়ণীকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বালিকা নিজেই পিতামহীর প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল। দয়াদিদির মুখে যাহা শুনিয়াছি, দশ বৎসরের একটা ছোট মেয়ের মুখের সে কথা শুনাইয়া প্রতীচ্য জ্ঞান-গর্ব্বিত আপনাদের কাছে আমি হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না। তবে সে কথা পিতামহীর নীরস চক্ষে জল আনিয়াছিল। তিনি তখনই পৌত্রবধূকে কোলে লইয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। কোলে লইয়াই তিনি তাহার জনক-জননীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদায়-দানের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী, দাক্ষায়ণীর মুক্ত কেশরাশি গুছাইয়া ঝুঁটির আকারে মাথার পুরোভাগে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার ব্যাহৃতিহোমকুণ্ডের ভস্মের কিয়দংশ একটি অনতিবৃহৎ কাঠের কৌটায় পূরিয়া কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মা দিয়াছিলেন—আর একটি কৌটাপূর্ণ করিয়া সিন্দূর।

জনক-জননীর দত্ত আয়তির উপযোগী এই অপূর্ব্ব সম্পত্তি লইয়া দাক্ষায়ণী আমার পিতামহীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিল।

যখন তাহারা গৃহত্যাগ করিল, তখনও অনেকটা রাত্রি অবশিষ্ট ছিল। গ্রামের কেহ তাহাদের স্থানত্যাগ জানিতে পারে নাই। দাক্ষায়ণীর পূর্ব্বোক্ত দিদিমা সেইদিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তিনিও বালিকার প্রব্রজ্যা জানিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গ্রামপ্রান্ত পর্য্যন্ত পিতামহীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই সময় পথ চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মাতা ও আমার পিতামহীর অগোচরে দয়াদিদির সঙ্গে ব্রাহ্মণের দুই চারিটা কথা হইয়াছিল। কথা কেন, দয়াময়ী আমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে গোটাকতক প্রশ্ন করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুলতলে ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব শাস্ত্রের বিধান রক্ষা করিয়া আমাকে কন্যা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়াময়ী সে দানের সাক্ষী ছিল।

দয়াদিদি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! আপনার এ কন্যার স্বামী কে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"নারায়ণ ইহার স্বামী।"

"কোন্ নারায়ণ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ সহসা তাহার কোনও উত্তর দিলেন না। রমণীর, বিশেষতঃ শূদ্রারমণীর মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিবার তিনি কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। উত্তর দিলেন না কেন;—আমার বোধে, ব্রাহ্মণ উত্তর দিতে পারেন নাই।

দয়াদিদি বলিয়াছিল, বহুক্ষণ পথের দিকে চক্ষু রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। একটিও কথা কহিলেন না।

যখন তাঁহারা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া প্রান্তরে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছেন, নদীও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন দয়াদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! বকুলতলে আমার সম্মুখে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেগুলা কি বিধিসঙ্গত হয় নাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছি।"

"আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সাধু। সত্যরক্ষার জন্য আপনি যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার মূল্য আপনি যেমন বুঝিয়াছেন, অন্যে তেমন বুঝিবে না।"

"মা! তুমি দেখিতেছি পরমা বুদ্ধিমতী। তুমি ত সে দানকালে উপস্থিত ছিলে। কার্য্যের কি কোন ত্রুটি তোমার বোধ হইয়াছে?"

"আমি এরূপ বিবাহ এ জন্মে আর কখনও দেখি নাই।"

"কি করিব মা! আমি তখন বিপন্ন। তাড়াতাড়ি দানকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে। তবে যথাসম্ভব অনুষ্ঠানের আমি ত্রুটি করি নাই।"

"না! ঠাকুর, তা বলিতেছি না। আমি জন্ম-জন্মান্তরের বহুপুণ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন দেখিয়াছি। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লক্ষ্মী নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছে—নারায়ণকে আঁচলে বাঁধিয়া পথ চলিতেছে।"

"মা! আমারও সে সময়ে তাই বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণীরও হইয়াছিল।" "তবে এরূপ করিলেন কেন?"

"কুশণ্ডিকার কথা কহিতেছ?"

"কুশণ্ডিকা কি আমি জানি না! কন্যা নারায়ণকে দিয়াছেন, এই বোধই যদি আপনার হইয়াছিল, তবে আবার একটা পাথর কন্যার গলায় ঝুলাইলেন কেন?"

"আমি এই শিলায় হরিহরের নারায়ণত্ব আরোপ করিয়াছি।"

"তার পর?"

"তার পর কি? আমি তোমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়াও যেন পারিতেছি না।"

"আপনার কন্যা পত্নীরূপে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, দাক্ষায়ণী-হরিহরের আর কখন মিলন হইবে?"

"আপনি কি মনে করেন?"

"আমার ত মনে হয় না। তাহার গর্ব্বান্ধ পিতা এ দরিদ্রের কন্যাকে কখনও তাহার গৃহে স্থান দিবে না।"

"তিনি না দিলেও ইহাদের মিলনে বাধা কি? হরিহরের পিতামাতার দম্ভ কি এ মিলন রোধ করিতে পারে? সীতার মত দুঃখিনীর কথা কেহ কখন শুনে নাই। বিধাতা তাঁহাকে পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। এখন হরিহরের সঙ্গে যদি দাক্ষায়ণীর কখন সাক্ষাৎ হয়, দাক্ষায়ণী তাহাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে?"

"যখন সীতার কথা তুলিলে, তখন বলি, রামচন্দ্র ত অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার স্বর্ণ-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই সীতার অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছিলেন; তাহাতেই আপনাকে সস্ত্রীক বোধে যজ্ঞকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন!"

"রামচন্দ্র পুরুষ মানুষ। স্বর্ণ-সীতা না করিয়া, আর একটা বিবাহ করিলেও তাঁর ক্ষতি ছিল না। সীতা ত আর একটা স্বর্ণ-রাম রচনা করিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সীতা তাঁহার হৃদয়ের রামমূর্ত্তি ছাড়া বাহিরের কোন বস্তুতে পতির আরোপ করেন নাই। করিতে তাঁহার সতীত্ব নিষেধ করিয়াছিল। করিলে, আপনাকে পরিত্যক্তা মনে করিয়া, কখন তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে হইত না।

"তুমি কে?" আমি ঝি।" "তুমি স্বয়ং প্রজ্ঞা—ঝি কেন?"

"না ঠাকুর, বোকা তাঁতীর মেয়েকে অমন গোলমেলে কথা বলিও না। তোমার কন্যার মূর্ত্তি দেখিয়া এ অন্ধের চোখ ফুটিয়াছে। তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া এ মূর্খ তাঁতিনীর জ্ঞান জন্মিয়াছে। হাঁ ঠাকুর, অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ; —বলিতে পার, নারীর সতীত্ব কি?"

"ব্রাহ্মণ সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর সমীপস্থ হইয়াই তাহাকে বলিলেন—"দাক্ষায়ণি!"

দাক্ষায়ণী পিতামহীর হাত ধরিয়া পথ চলিতেছিল। পিতার সম্বোধন শুনিবামাত্র সে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পিতামহী ও তাহার মাতা দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, দাক্ষায়ণীকে নিভৃতে লইয়া গেলেন।

দয়াদিদিও দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেও তাহাদের নিকটে গেল না। তাহার যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সে আগে হইতেই দাক্ষায়ণীর মনোভাব বিদিত হইয়াছিল। সুতরাং দাক্ষায়ণী যে কি উত্তর দিবে, তাহা আগে হইতেই তাহার জানা ছিল; সে সেই অন্ধের অজ্ঞেয় গুহ্য কথা।

নিভৃতেই পিতা ও পুত্রীর মধ্যে কতকগুলা প্রশ্নোত্তর হইল। কথা শেষে ব্রাহ্মণ দয়াদিদির নিকটে আসিলেন। দাক্ষায়ণী আবার পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল। নিকটস্থ হইয়া ব্রাহ্মণ দয়াদিদিকে বলিলেন—"মা! মিছে শাস্ত্র পড়িয়াছি! শাস্ত্রের শব্দার্থ লইয়াই এতকাল কেবল সময় অতিবাহিত করিয়াছি; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। কন্যাকে নারায়ণ-ব্রত গ্রহণ করাইয়াছি। পতিব্রতা হইতে উপদেশ দিয়াছি। অথচ ব্রতের মর্ম্ম বুঝি নাই। নারায়ণের সঙ্গে পতিব্রতার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানেও নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমার পাণ্ডিত্য-দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। শুন মা! এখন যদি আমার এই কন্যা এই বালা সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তিতে চণ্ডালেরও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমরা নিমন্ত্রণ করিও। আমি সেই চণ্ডালান্ন গ্রহণ করিয়া আসিব। যাহার পূর্ব্বমূর্ত্তি এক যমকে নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে, আমি তাহাকেই কি না সাধারণ তৈজসপত্রের ন্যায় দানের বস্তু জ্ঞান করিয়াছি!"

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে প্রতিনিবৃত্তা হইতে আদেশ করিলেন। আশীর্ব্বাদ-প্রণামাদি কার্য্য সেই প্রান্তর-মধ্যে একরূপ নিঃশব্দে শুধু ইঙ্গিতে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পিতামহী একখানি শালতী ভাড়া করিলেন। দেশবাসীর অজ্ঞাতসারে, পশু-পক্ষীর অলক্ষ্যে কাহার নাম লইয়া জানি না, তিনটি পরস্পরাশ্রয়কারিণী অনন্তসহায়া অবলা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

৩৭

দ্বিতীয় দিবস রাত্রির প্রথম প্রহরের পর সকলে কালীঘাটে উপস্থিত হন। পিতামহী পঞ্চাশটি মাত্র টাকা পথের সম্বলস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে আশী টাকা তাঁহার নিজস্ব বোধে তিনি পিতাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, টাকা কয়টি তাহারই ব্যয়াবশেষ। দাক্ষায়নী যে সঙ্গিনী হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন—দুই দুইটি বিধবা স্ত্রীলোক—পথের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া যাহা থাকিবে, তাহাতে তাঁহাদের কাশীবাসের অন্ততঃ তিনটে মাসের সঙ্কুলান হইবে। কাশীতে গিয়াই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদাকে পত্র লিখিবেন। পত্র পাইলেই ঠাকুরদা তাঁহার কাশীতে স্বচ্ছন্দবাসের ব্যবস্থা করিবেন। দেশে তাঁহার কাছে যাইবার কথা প্রকাশ করিলে, পাছে ঠাকুরদা বাধা দেন, এই জন্য তিনি তাঁহাকেও সঙ্কল্পের কথা শুনান নাই।

যদি পত্র পাইয়া ঠাকুরদা টাকা পাঠাইবার কোনও ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! দুই দুইটা বিধবা। তাহাদের জীবনের মূল্য কি? যদি অন্নাভাবে উপবাসে ভারতের পবিত্রতম তীর্থে তাহাদের মৃত্যুই ঘটে, সে ত হিন্দু-বিধবার পরম ভাগ্যেরই কথা!

দয়াদিদির সঙ্গে কাশীবাস সম্বন্ধে পিতামহীর উক্ত পরামর্শ স্থির হইয়াছিল। দয়াদিদিও পিতামহীর কথায় সায় দিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন ত আর সে ব্যবস্থা চলিবে না! তাঁহারা না হয় উপবাসে দুই এক দিন অতিবাহিত করিতে পারেন, কিন্তু বালিকাকে তাঁহারা কেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপবাসী রাখিবেন?

শালতীতে যে সময় দাক্ষায়ণী ঘুমাইতেছিল, সেই সময় পিতামহী দয়াদিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হাঁ দয়া, নাতবৌ সঙ্গে চলিল—এ সামান্য সম্বল লইয়া, কি সাহসে কাশী যাইব?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"কাশী-প্রাপ্তি কি আর আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে?"

"তাই ত দেখিতেছি।"

"এখন ত ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়াছ। প্রথমতঃ কালীঘাটে চল। তার পর দেখা যাক্‌, মা আমাদের কোথায় লইয়া যায়।"

"তাই ত দয়া, কোথায় যাইতেছি, তাতো বুঝিতে পারিতেছি না!"

"বুঝিবার দরকার কি ঠাকুর-মা? তুমি ত আর ঘরে ফিরিবে না, মনস্থ করিয়াছ?"

"ঘরে আর ফিরিব না।"

"তোমার নাতবৌএর যদি শ্বশুর-ঘর করা অদৃষ্টে থাকে?"

"থাকে, সে যাইবে।"

"তা হ'লে তুমি আর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছ না?"

"তাহারা সম্পর্ক রাখিতে দিল কই, দয়া!"

"তবে তুমি স্থানের ভাবনা ভাবিতেছ কেন? সন্ন্যাসিনীর থাকিবার স্থানের অভাব কি!"

"সে তোর আমার বেলায় না হয় হইল। এই যে ননীর পুতুল সঙ্গে চলিল—"

ঠিক এমন সময়ে দাক্ষায়ণী যেন ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিয়া উঠিল—"আমার জন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে না ঠাকুর মা!"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"তাহার কথা শুনিবামাত্র আমরা দুইজনেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, যেন কপটনিদ্রিতা চিরজাগরিতার কাছে আমরা জাগিয়া ঘুমাইতেছি। দাক্ষায়ণীর এক কথাতেই আমাদের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল।

পিতামহী বলিলেন—"তাই ত নাতবৌ, তা হ'লে ত তুই আমাদের সকল কথা শুনিয়াছিস্!"

"শুনিয়াছি ঠাকুর মা।"

দয়াদিদি বলিলেন—"ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুমি জাগিয়া ঘুমাইতেছ!"

"ঘুম চোখে কিছুতেই আসিতেছে না।"

পিতামহী বলিলেন—"তুই ভাই, আমাদের আসিবার সময়ে বাপমাকে জড়াইয়া ধরিলি না কেন?"

"জড়াইতে দিল কই? আমি একটা কথা কহিতে না কহিতে তাহারা তোমার সঙ্গে আমাকে যাইতে বলিল।"

"তুই যাইব না বলিলি না কেন?"

দাক্ষায়ণী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। পিতামহী উত্তর না পাইয়া মনে করিলেন, দাক্ষায়ণী বড় অনিচ্ছায়, শুধু পিতা মাতার শাসনে তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাই ত ভাই, তোর বাপ মা কি নিষ্ঠুর। পণ্ডিত হইলেই কি মানুষকে নির্ম্মম হইতে হয়!"

"বাবাকে নিষ্ঠুর কেমন করিয়া বলিব! বাবা ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিয়াছিল।"

"তবে?" "মা থাকিতে দিল না।"

"মা দিল না?"

"না। বলিল, বিদেশে আমাকে তোমার সেবা করিতে হইবে।"

"কেন, আমার কি সেবা করিবার লোক নাই?"

"কই?"

"কেন, তোর দয়া-ঠাকুরঝি কি করিতে সঙ্গে চলিয়াছে?"

পিতামহী দয়াদিদির সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তবে ক্ষুদ্র বালিকার মুখে ঠাকুরঝি কথাটা শোভা পায় না বলিয়া দয়াময়ী তাহাকে দিদি বলিতে উপদেশ দিয়াছিল।

দাক্ষায়ণী বলিল—"দিদি তোমাকে রাঁধিয়া দিলে তুমি খাইতে পারিবে?"

"তুই আমার সঙ্গে রাঁধুনী চলিয়াছিস্ নাকি?"

'নয় ত কি?"

"এই বিধবা বুড়ীর পেট পুরাইতে তোকে হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে হইবে?"

"আমি আর দিদি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই যে ঠাকুরমা!"

পিতামহী এ কথার কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশ্বাস-শব্দ দাক্ষায়ণীর কাণে পশিল। সে অমনি বলিয়া উঠিল—"তবে কি তুমি আমারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না?"

এ প্রশ্নেরও পিতামহী উত্তর করিলেন না। তিনি আমার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়া উঠিলেন—'হা হতভাগ্য সন্তান!'

মনের আবেগে পিতামহী পুত্রকে তিরস্কারচ্ছলে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন; দাক্ষায়ণী বাধা দিয়া বলিল—"ঠাকুরমা! মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা কখনও করিও না—কাহারও মুখে তাঁহাদের নিন্দা শুনিও না।"

দয়াদিদি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাক্ষায়ণীর কথা শুনিতেছিল; এইবারে সে পিতামহীর হইয়া উত্তর করিল—"ঠাকুরমা যে তাঁদের মা!"

"আর আমি যে তাঁদের বউ!"

"কেহ যদি তোর সমুখে তাদের নিন্দা করে, তা হ'লে তুই কি কর্‌বি?"

"তখনি সে স্থান ত্যাগ করিব।"

"আমরা যদি নিন্দা করি?"

"কেন তোমরা নিন্দা করিবে? বাবা ও মা আমাকে ত দেখে নাই—আমিও তাদের দেখি নাই। তখন তোমরা কেন তাদের নিন্দা আমার কাছে করিবে? তোমাদের অধর্ম্ম হবে না?"

দয়াদিদি আমাকে বলিয়াছিল—"ভাই! আমি তোমাকে দাক্ষায়ণীর কথা শুনাইলাম, কিন্তু তাহার কথার ঝঙ্কার শুনাইতে পারিলাম না। নির্জ্জনে তাহার মর্ম্মকথা শুনিয়াছিলাম। এখন পিতামহীর সঙ্গে তাহার বাহিরের কথা শুনিতেছিলাম। শুনিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। আনন্দে একটু আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর কথার ঝঙ্কার শুনিয়া আমার নীরব হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আনন্দের আধিক্যবশে আর একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কথা কহিবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তোমাদের হুগলী হইতে আসিবার পর হইতেই ঠাকুরমার মর্ম্ম-বেদনা একরূপ অসহ্য হইয়াছিল। আমি তোমাকেও না জানাইয়া বাসা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। মনে করিও না যে, স্বেচ্ছায় আসিয়াছি। তোমার বিবাহের ঘটকালী করিতে গিয়া আমি পুরস্কারের উপর পুরস্কার পাইয়াছি। তার মধ্যে একটা পুরস্কার ঠাকুর-মায়ের সঙ্গ। হুগলীতে বড় সৌভাগ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নইলে তোমার বাপের মতন না-হিন্দু, না-কৃশ্চান, না-কিছু আবার কোন বাবুর ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করিতে হইত। বাপমায়ের পুণ্যে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ। ভাই! সে বড় অনুরোধের নিমন্ত্রণ—আমি এড়াইতে পারিলাম না।

ঠাকুরমা'র দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়া দেখি, তোমরা তার মনে বড়ই ঘা দিয়াছ। অমন ধীর শান্ত মেয়ে আমি দেখি নাই। তোমরা তাহাকে চঞ্চল করিয়াছ।

"স্বামীর স্বর্গচ্যুতি-ভয়ে ঠাকুরমা চঞ্চল। ব্রাহ্মণের অকার্য্য ম্লেচ্ছের চাকুরি। যে বাপ মুখে রক্ত তুলিয়া সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, পূজারীর দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া হাকিমের আসনে বসাইয়া দিয়াছে, সেই সন্তান পিতৃসত্য পালন করিল না। তাঁহার পরকালের কাজও করিল না।

"তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া অবধি একদণ্ডের জন্য ঠাকুর-মার মর্ম্মব্যথার বিরাম দেখি নাই। দাক্ষায়ণীকে ঘরে আনিবার পর হইতে সে ব্যথা আবার চতুর্গুণ বাড়িয়াছে।

"বিবাহের যেমন অনুষ্ঠান, দাক্ষায়ণীর বিবাহ-ব্যাপারে ঠাকুরমা সে অনুষ্ঠানের কিছুই দেখিতে পান নাই। গোবিন্দ ঠাকুর-দা'র উৎসাহে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সত্য কথায়, গ্রামবাসীদের আশ্বাসবাক্যে—উপায়ান্তর না দেখিয়া—দাক্ষায়ণীকে তিনি পৌত্রবধূ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার হাতের রান্না মুখে দিয়াছেন। কিন্তু সেকালের গৃহিণী এখনও বুঝিতে পারেন নাই,

হরিহরের সঙ্গে দাক্ষায়ণীর কখন্ কেমন করিয়া বিবাহ হইল!

"সেই সমস্ত মর্ম্মবেদনার কথা আমি শুনিয়াছি। শুনিয়া অশ্রুজল ফেলিয়াছি। শূদ্রের মেয়ে তোমাদের বিবাহ-রহস্য যখন বুঝি নাই, তখন ঠাকুরমাকে সান্ত্বনা দিবারও কোনও উপায় দেখি নাই।

"অথচ কয়দিনের একত্রবাসে দাক্ষায়ণীর উপর ঠাকুরমার যে মমতা পড়িয়াছে, তাই, আমার মনে হয়, তোমার পিতা, এমন কি তুমি পর্য্যন্ত সে মমতা পাও নাই।

"অন্যান্য কারণের মধ্যে পাড়াপড়সীর কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা হইতে আত্মরক্ষাও তাঁহার গৃহত্যাগের একটা কারণ ছিল।

"একদিনের নির্জ্জন কথায় আমি দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তোমার ও সেই সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক বুঝিয়াছিলাম। সেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক লইয়া কথা-বার্ত্তায় আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। সম্পর্কটা ঠাকুরমাকে পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরণকাল বৃদ্ধা যাহাকে পথের সঙ্গিনী করিতে চলিয়াছে, যাহার হাতের রান্না খাইয়া তাহাকে জীবনরক্ষা করিতে হইবে, সে তার কে, এটা বুড়ীকে বুঝাইতে না পারিলে আমারই বা মনে শান্তি আসিবে কেন? এই জন্য আমিও আর নীরব না রহিয়া তাহাদের কথায় যোগ দিয়াছিলাম।

"তাহার কথার ঝঙ্কারে নিরস্ত না হইয়া আমি আবার বলিলাম—'তা যা হইবার হইবে, আমরা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা করিতে ছাড়িব না। যখন নিন্দার কাজ করিতে পারে, তখন আমরা তাহা বলিতে পারি না?'

"এই কথা যেমন বলা, অমনি দাক্ষায়ণী, পাগলিনীর মত, আমাদের সঙ্গত্যাগ করিতে 'ছই' হইতে বাহির হইবার জন্য স্থানত্যাগ করিয়া ছুটিল। উঠিতে গিয়া তাহার মাথায় ছইএর আঘাত লাগিল। বালিকা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে আমাকে ডিঙ্গাইয়া, ঠাকুরমাকে ডিঙ্গাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

"ঠাকুরমা বালিকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া বক্ষের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—'দাক্ষায়ণি, তুই ছাড়া আপনার বলিবার আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুইও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবি?'

"আমি তাহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিলাম। আর কখন তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না শুনিয়া, বালিকার ক্রোধ দূর হইল।

"ভাই! মন-মুখ এক না হইলে সতী হয় না। পতি-ধর্ম্মে সতীর রহস্য পর্য্যন্ত সয় না।

"সেই দিন হইতে আর একটি দিনের জন্যও আমি তোমাদের কথা লইয়া দাক্ষায়ণীকে রহস্য করি নাই।

"ঠাকুরমাও তখন হইতে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মনে সাহস আসিল। তিনি বুঝিলেন, পবিত্রা কুলবধূর আবির্ভাবে, তাঁহার অঙ্গীকারমুক্ত স্বামীর স্বর্গের পথ মুক্ত হইয়াছে। আঁচলে তীর্থ বাঁধা পড়িয়াছে। পথের বিভীষিকা মিটিয়াছে।

* * * *

"যখন কালীঘাটে শালতী পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মায়ের আরতি হইয়া গিয়াছে। স্থান ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হইতেছে।

"তীরে উঠা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া আমরা সে রাত্রি শালতীতেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম।"

৩৮

"সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে একটা বিকট চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, অসংখ্য লোক বাঁধাঘাটে জড় হইয়াছে। ঘাট হইতে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত পরদায়-ঘেরা একটা পথ প্রস্তুত হইয়াছে। আর সেই পরদার পার্শ্বে অসংখ্য কাঙ্গালী কর্কশ-কণ্ঠে 'রাণীমায়িকি জয়' বলিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে।

"বুঝিলাম, কোন ধনি গৃহিণী আজ তীর্থদর্শনে আসিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক। রাণীকে দেখিতে আমার বাধা ছিল না। কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি শালতী হইতে তীরে নামিলাম।

"শয়নকালে আমি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে পাছে ব্রাহ্মণকন্যার অঙ্গে পা ঠেকিয়া যায়, এই ভয়ে ছইয়ের বাহিরে পা রাখিয়া আমি একরূপ বহির্ভাগেই শুইয়াছিলাম ঠাকুর-মা ছিলেন ছইএর অপর দিকে। মধ্যভাগে ছিল দাক্ষায়ণী।

"রাণী দেখিবার আগ্রহে আমি তাহাদের দিকে আর লক্ষ্য করি নাই। যেখানে আমাদের শালতী বাঁধা ছিল, ঘাট সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে।

"তীরভূমি ধরিয়া যেই আমি ঘাটে উঠিতে যাইতেছি, অমনি এক নিদারুণ দৃশ্যে আমার মর্ম্মভেদ হইয়া গেল।

"দেখি—দাক্ষায়ণী ঘাটের পার্শ্বে একস্থানে জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া আছে। বসিয়া আছে বলি কেন, পড়িয়া আছে। এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী তাহাকে

ধরিয়া,. তাহার মুখে, চোখে, অঙ্গে জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গের কাদা ধুইয়া দিতেছে। সে কেবল দুইহাতে গলার পুঁটুলিটি ধরিয়া আছে।

"আমি ঘুমাই নাই— মরিয়াছিলাম! নইলে দাক্ষায়ণী উঠিয়া আসিয়াছে, আমি জানিতে পারিলাম না কেন? সে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে, আমি জানিতাম, কিন্তু সে দিনও যে, প্রত্যূষে উঠিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলের অলক্ষ্যে সে গলার ঠাকুরটির পূজা করিত। শয্যায় বসিয়াই পূজা করিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কেন, গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে তাঁহার পূজা করিতে সে উঠিয়া আসিয়াছিল। এমন সময় অসংখ্য অনুচর ও কাঙ্গালী সঙ্গে লইয়া, পাল্কীতে চড়িয়া কোথা-কার রাণী গঙ্গাস্নানে আসিল।

"অনেক লোক—সকলে যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। অন্ধকারে ঘাটের ধারে কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালিকা ছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। অথবা পশুগুলা দেখিয়াও দেখে নাই। রাণীর আবরু বজায় রাখিতে ব্যস্ত চাকর-দারোয়ান-গুলার ঠেলাঠেলিতে বালিকা শানের উপর পড়িয়া গিয়াছে! পড়িয়া শরীরের নানা স্থানে আঘাত পাইয়াছে। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী দৈববশে সেখানে উপস্থিত না থাকিলে, পশুগুলার পায়ের তলায় পড়িয়া দাক্ষায়ণীর জীবন থাকিত কি না সন্দেহ।

"আমি দাক্ষায়ণীকে ডাকিলাম। বালিকা তখনও ক্লান্ত। উত্তর দিতে তাহার শক্তি ছিল না। ব্রহ্মচারী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন।

"আর প্রশ্ন না করিয়া আমি ঘাটের উপর উঠিলাম। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমি জ্ঞান-শূন্যের মত হইয়াছি। সে কত বড় রাণী, একবার আমি দেখিব।

"আমি হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘাটে উঠিলাম। সেখান হইতে রাণীদর্শনের সুবিধা হইল না। আমি লোক ঠেলিয়া জলে পড়িলাম। চাকর-দারোয়ানগুলা পরদার খুঁটি ধরিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষেরটা কোমর পর্য্যন্ত জলে নামিয়াছিল। আমি সাঁতারিয়া তাকে অতিক্রম করিলাম। একেবারে রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

"দেখি পরদার ভিতরে কতকগুলা মেয়ে কিল-বিল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে সধবা-বিধবা দুইই আছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টা রাণী, কোন্‌টা কে, কিছুই আমি তখন দেখি নাই।

"আমাকে দেখিবামাত্র তাহাদের ভিতর হইতে একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল—'আরে মর্! এখানে কি?'

"সে আমাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিল। আমি বলিলাম 'ভয় নাই। আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই।'

"সে বলিল—'তবে কি করিতে আসিয়াছিস্?'

'তোদের মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।'

"এই বলিয়া আমি—যাহা জীবনে কখন করি নাই—তীব্র– নারীর পক্ষে অতি তীব্র ভাষায় তাহাদের গালি দিলাম। এখন তাহা মুখে আনিতে লজ্জা করে।

"আমার গালি শুনিয়া সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পর এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হইয়াছে!'

"তাহার মুখ দেখিয়া, কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সেই রাণী। তখনও আমার ক্রোধের তীব্রতার উপশম হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম 'পরদা উঠাইয়া কি করিয়াছিস্, দেখিয়া আয়! সতীর বুকে পা দিয়া সতীর রাজ্যে ধর্ম্ম করিতে আসিয়াছিস্?'

"তার পর আরও কত কি বলিয়াছিলাম—সমস্ত আমার মনে নাই। তবে আমার মনে আছে, তাহার ঐশ্বর্য্যের ও বৈধব্যের অনুচিত অঙ্গসৌষ্ঠবে আমি যথেষ্ট অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। তাহার নরজন্মে ধিক্কার দিয়াছিলাম।

"অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তাহার সঙ্গিনীগুলা আমাকে গাল দিবার উপক্রম করিতে না করিতে আমি আবার সাঁতারিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

"বাহিরের অনেক লোক আমার যাতায়াত দেখিল, দারোয়ান-চাকরগুলার কেহ কেহও যে দেখিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ব্যাপারটা কি হইল, কেহ বড় বুঝিতে পারিল না। বাহিরের কোলাহলে আমার তীব্র তিরস্কার ডুবিয়া গিয়াছিল।

"ফিরিয়া দেখি, ব্রহ্মচারী তখনও পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণীর শুশ্রূষা করিতেছেন। দাক্ষায়ণীও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সে দাঁড়াইয়াছে।

"তাহার অঙ্গে ত আঘাত লাগে নাই; সে আঘাত আমার বুকের পাঁজরা যেন চূর্ণ করিতেছিল! আমি চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—'আমাকে কেন লুকাইয়া চলিয়া আসিলি ভাই? এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলি!'

"আমার আত্মীয়তার কথা, আমার মুখের 'ভাই' শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাঁ মা! এটি তোমার কে?'

"তখনও পর্য্যন্ত আমার মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই। ব্রহ্মচারীর বাক্যে তাহাকে আমার মূর্খ বলিয়াই বোধ হইল। মনে হইল, সে দৃষ্টিহীন। তার ব্রহ্মচর্য্যের এখনও

কোন ফল হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম—এটি কি শুধু আমার কে? এতক্ষণ তবে কি শুশ্রূষা করিলে ব্রাহ্মণ?

'সাক্ষাৎ গৌরী।'

"তাই বলুন। আমি এটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি। কিন্তু ঠাকুর, পথেই বুঝি ইহাকে আজ হারাইতে বসিয়াছিলাম।'

"ব্রাহ্মণ আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না! বলিলেন—'মা, পথে হারাইবার সামগ্রী নয়। সুতরাং মায়ের এ ভূপতনে আক্ষেপ করিও না। সতী আজ মাটিতে পড়িয়া, ধূলায় ধূসরিত হইয়া, কোমল অঙ্গে আঘাত লইয়া পথের কণ্টক দূর করিয়াছেন! পথ আজ মুক্ত।'

ব্রাহ্মণের আশ্বাস-বাণীর অর্থ বুঝিলাম না। কিন্তু আশ্বাসে মনে আনন্দ হইল। আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করাইতে গেলাম, ব্রাহ্মণ প্রণাম গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এতক্ষণ ঠাকুরমা হয় ত জাগিয়াছেন। উভয়কেই না দেখিয়া হয় ত ব্যাকুলভাবে আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"ঘাটের নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত অন্তর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—'একবার দাঁড়াও।'

"ফিরিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ঘাট হইতে নামিয়া তীরভূমি ধরিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আমি দাঁড়াইতে বৃদ্ধ আমার নিকট আসিল এবং দাক্ষায়ণীর আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্যক্তি রাণীর কর্ম্মচারী।

"আমি তাহাকে দাক্ষায়ণীর অঙ্গে আঘাত-চিহ্ন দেখাইলাম। ইত্যবসরে দেখি, ঠাকুর-মাও শালতী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছেন।

"ঠাকুর-মা দাক্ষায়ণীর অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলতার সহিত আমাকে কতকগুলা প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরেই বৃদ্ধ সমস্ত ঘটনা অবগত হইল। দাক্ষায়ণীর মাথায় এক স্থানের ক্ষত হইতে তখনও পর্য্যন্ত অল্প রক্ত পড়িতেছিল।

"বৃদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিল। ঠাকুর-মা সমস্ত দোষ দাক্ষায়ণীর স্কন্ধে আরোপ করিয়া, তাহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। কেন সে গিন্নী-বুড়ীর মত কাহাকেও না জানাইয়া অমন অসময়ে ঘাটে গিয়াছিল? মাটিতে পড়িয়াছিল, তাই বালিকাকে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে। আদিগঙ্গার খরস্রোতে পড়িলে কি সর্ব্বনাশ যে না ঘটিতে পারিত, তাহা কে বলিবে?

বৃদ্ধ সেই সময় দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুরমার সম্বন্ধের পরিচয় পাইল। তাহার গলার পুঁটুলিটিরও পরিচয় এই সঙ্গে বৃদ্ধ জানিতে পারিল।

"জানিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা চাহিয়া বৃদ্ধ স্থানত্যাগ করিল।

"এদিকেও দেখি, কোলাহলচীৎকার সঙ্গে লইয়া, রাণী ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

৩৯

"আমরা ভিখারিণীর পথ ধরিয়াছি, কিন্তু ভিখারিণীর ভাব এখনও ধরিতে পারি নাই। চক্ষু-লজ্জায় তিনটি প্রাণী একসঙ্গে কোনও গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে পারি নাই। পরদিন যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে, এই মনে করিয়া সেদিনের মত মন্দিরের কাছেই এক চটিতে বাসা লইয়াছি।

"দেবী-দর্শনান্তে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা তিন জনে একটা চ্যাটাইএর উপর বসিয়া বিশ্রাম লইতেছিলাম। আমি দাক্ষায়ণীর অঙ্গের কোথায় কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, পরীক্ষা করিতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বেও বার দুই তিন পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতেও মনস্তুষ্টি হয় নাই, আবার করিতেছি। আহত স্থানগুলির কোথায় কিরূপ ব্যথা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঠাকুর-মা চিন্তান্বিতার মত নীরবে চ্যাটাইয়ের এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

"এমন সময় সেই প্রাতঃকালের বৃদ্ধ একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের চটির মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহারা আমাদের দেখিতে পায় নাই। আমি দেখিলাম, সে চটিওয়ালাকে কি বলিল। কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না। চটিওয়ালা কি উত্তর করিল—তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে হইল, তাহারা যেন আমাদেরই অন্বেষণ করিতেছে। দেখি, লোকটা উত্তর শুনিয়া চলিয়া যায়। কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, জানিতে আমার সাধ হইল। আমি সেই দূর হইতেই বৃদ্ধকে ডাকিলাম। আমাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল—'এই যে মা, তুমি এইখানেই রহিয়াছ!'

"বুঝিলাম, বৃদ্ধ আমাদিগকেই খুঁজিতেছিল। চটিওয়ালা হয় তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই; নয় বুঝিয়াও বুঝে নাই। হয় ত তাহার মনে দুরভিসন্ধি ছিল। চটিওয়ালার প্রতি বৃদ্ধের তিরস্কারে সেটা কতকটা অনুমান করিলাম। এ দিকেও আমরা দেখিতেছি, চটিতে অন্যান্য যে সকল তীর্থযাত্রী আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা আহারাদি

শেষ করিয়া একে একে চটি পরিত্যাগ করিল। আমরা তিনটি প্রাণীই কেবল অন্যত্র স্থানাভাবে পড়িয়া আছি। চটিওয়ালা এর পূর্ব্বে বার দুই তিন সেখানে আমাদের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প জানিয়া লইয়াছে এবং সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে।

"বৃদ্ধের তিরস্কারে চটিওয়ালা, বোধ হইল, যেন মূর্খতার ভাণ দেখাইল। সে বলিল—'আপনি যে ইহাদেরই খুঁজিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।' সুতরাং আমার প্রতি উল্লাসযুক্ত সম্বোধন আমার পক্ষে আত্মীয়ের আশ্বাস বলিয়াই বোধ হইল।

"তথাপি সে কি কথা কহিবে, জানি না। ঠাকুর-মার সম্মুখে কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গেলাম।

"বৃদ্ধ বলিল—'মা! তোমাকে খুঁজিতে সারা চটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি!'

"আমি বলিলাম—'কেন?'

বৃদ্ধ।—একবার রাণীমার সঙ্গে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

"আমি।—'কিসের জন্য?'

বৃদ্ধ।—'তা মা আমি বলিতে পারি না।'

"এই সময়ে আমি একবার তাহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকের পানে চাহিলাম। দেখিয়া বুঝিলাম, স্নানের সময় সে রাণীর সঙ্গে ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম—'কি গো! আমাকে তোরা ধরিয়া জেলে দিবি নাকি?'

"'না মা, রাণীমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। একবার তোমার সঙ্গে গোটা দুই কথা কহিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।'

"মুখে যাই বলি, দাক্ষায়ণী ও ঠাকুরমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আজ চটিতে বালিকাকে লইয়া রাত্রিবাস করিতেই আমার ভয় করিতেছে। ভয় বলি কেন, রাত্রিবাসের কথা মনে উঠিতেই আমার বুক গুর-গুর করিতেছে। কালীঘাট বড় বিষম স্থান। ঠাকুর-মার কাছে কিছু টাকাও আছে চটিওয়ালাকেও বিশ্বাস নাই। মা কালীর কাছে প্রাতঃকালে, সেই জন্য অবিরাম মাথা খুঁড়িয়া, আমি একটি আশ্রয় চাহিয়াছিলাম।

"স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। মন যাইতেই আমাকে আদেশ করিল। আমি বলিলাম—'চল'।

"ঠাকুরমার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলাম এবং আমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের চটির বাহির হইতে নিষেধ করিয়া বৃদ্ধের অনুসরণ করিলাম।"

* * * *

কোথা হইতে কেমন করিয়া এক একটা ঘটনার এরূপ বিচিত্রভাবে সংযোগ উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দৈব না বলিয়া থাকিবার যো নাই। তাহার স্বাভাবিক কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিতে পারা যায় না, এরূপ নহে। কিন্তু করিতে গেলে ঘটনার গাম্ভীর্য্যের যেন অনেকটা হানি ঘটে। তাহার কাব্য-মাধুর্য্যটুকুও বিনষ্ট হইয়া যায়।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"সে দিন অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত যেন একটা দৈবলীলার স্রোত চলিয়াছিল। সেই অদ্ভুত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে আমি যেন অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার হাত স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"চটির বাহিরে পা দিয়াই দেখি, চারিজন বেহারা একখানি পাল্কী চটির সম্মুখে রাস্তায় রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাল্কীর পার্শ্বে এক জন দরোয়ান।

"বৃদ্ধের আবাহনের ভাবে বুঝিয়াছিলাম—পাল্কী আমাকেই লইয়া যাইবার জন্য। তথাপি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ রাণীর পাল্কী এখানে কেন?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'তোমাকেই লইয়া যাইবার জন্য।'

"আমি তাহাকে নিজের মলিন বস্ত্র দেখাইয়া বলিলাম—'ঝিকে কি তামাসা করিবার জন্য তোমাদের রাণী এই পাল্কী পাঠাইয়াছেন? পদব্রজে চল—আমি পাল্কীতে উঠিব না!'

"বৃদ্ধ বলিল—'রাণীমা'র আদেশ। আপনি না উঠিলে আমাদিগকে তিরস্কার পাইতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের বাসা এখান হইতে নিতান্ত নিকটে নয়।'

"আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—'তার পর? কা'ল যখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইব?'

"স্ত্রীলোকটি বলিল—'তুমি প্রবেশ কর। আমি পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছি। কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না।'

'আমাকে উঠিতেই হইবে?'

'উঠিতেই হইবে।'

'তবে শুন, যদি একেবারে বাড়ীর অন্দরে পাল্কী লইয়া রাণীর সম্মুখে দ্বার মুক্ত কর, তবেই আমি উঠি, নহিলে উঠিব না।'

"বৃদ্ধ বলিল—'তাহাই হইবে।'

"আমি পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।"

*   *   *   *

"কিছুক্ষণ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই বন্ধ পাল্কীর ভিতরে বসিয়া আমি রাণীর বাসার দুয়ারে পৌঁছিবার আশা করিতেছি, কিন্তু কই, 'এখনও ত পাল্কীর গতি ও বেহারাদের চীৎকারের বিরাম হইল না! এ তবে আমি কোথায় চলিতেছি! নিতান্ত নিকটে নয় কেন, রাণীর বাসা চটি হইতে যে অনেক দূর! তাই ত! পৌঁছিয়া রাণীর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ করিয়া চটিতে ফিরিতে যে রাত্রি হইবে! ঠাকুরমা যে চিন্তাভরে ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে ত কোন কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই।

"ভীত হইয়া আমি পাল্কীর দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিতেই—কি আশ্চর্য্য।—দেখি, ব্রহ্মচারী পাল্কী হইতে কিছু দূরে পথ ধরিয়া বিপরীত মুখে চলিয়াছেন। দরজা খুলিতেই তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। আমি দুই হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি অমনি হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও মুখ ফিরাইয়া গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। আপনা আপনি মনে আশ্বাস আসিল। আমি একেবারে দরজা বন্ধ করিলাম।

"অল্প দূর যাইতে না যাইতেই এবারে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এক কোলাহলপূর্ণ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"দ্বার পার করিয়া, উঠান পার করিয়া, জনকোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া বেহারারা যে স্থানে পাল্কী রাখিল, সে স্থান নিস্তব্ধ।

"পাল্কী ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে বাহির হইতে কে দরজা খুলিল এবং অতি মৃদুভাবে আমাকে বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাহিরে আসিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তিনি রাণী। প্রাতঃকালে তাঁহাকেই আমি অতি তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলাম।

"সেখানে তাঁহার পরিচারিকা অথবা আত্মীয়ের মধ্যে কেহ ছিল না। বেহারারা পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল। সুতরাং দুই জন ভিন্ন আর সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি রহিল না।

"আমাকে বাহিরে আসিতে বলিয়াই রাণী চুপ করিয়াছেন। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া; তিনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহার মুখেও একটি কথা নাই।

"তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমাকে আয়ত্তে আনিয়া তিনি যেন প্রাতঃকালের গালির যোগ্য প্রতিশোধের চিন্তা করিতেছেন।

"কালীঘাট সহর—আমি দরিদ্র আর সে রাণী বলিয়া—প্রকাশ্য স্থানে আমার উপর তাহার অত্যাচারের সাহস নাই। তাই হয় ত মিষ্ট বাক্যের নিমন্ত্রণে আমাকে সে নিজের অধিকারে আনয়ন করিয়াছে।

"রাণী যখন কথা কহিল না, তখন আমিই কথা কহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম 'লোক পাঠাইয়া আমাকে কি জন্য আনাইলে রাণি?'

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে আনিতে গিয়াছিল, সে ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্কীর সঙ্গে সে ছুটিতে পারে নাই—বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

"সে আসিয়া আমাদিগের তদবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল— 'মা! বহুকষ্টে বাহির করিয়াছি। সারা কালীঘাট তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি।'

"রাণী এইবারে কথা কহিল; স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—'দেওয়ান?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'দেওয়ান এঁর সঙ্গীগুলিকে আগুলিতে চটির দোরে দরোয়ানকে লইয়া বসিয়া আছেন।'

'শীঘ্র উপরে গিয়া আমার ঘরে ইঁহার বসিবার আসন রাখিয়া আয়।'

"সে চলিয়া গেলে, আমি আবার আমাকে আনানো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। স্ত্রীলোকটির উত্তরে আমার মনে ভয় ও ভরসার দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তবে আসনের কথার ভরসাই এখন মনোমধ্যে প্রবল হইয়াছে।

"রাণী আমার প্রশ্নে এবারে একটু হাসিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘশ্বাস। আমি বড়ই বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিলাম। দেখি, তার গণ্ডের উপর ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

'দয়াদিদি! আমাকে চিনিতে পারিলে না?'

"আমি আবার চাহিলাম—আবার চাহিলাম—কই! কে তুমি? কে তুমি?—আমার আত্মীয়? চক্ষু মুদিয়া রাণীর মুখশ্রীকে মস্তিষ্কপথে পাঠাইলাম। সে পূর্ব্বজীবনের লুপ্ত স্মৃতিকে টানিয়া আনিতে মস্তিষ্কের প্রতি বিবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল-কে তুমি, ভিখারিণীকে আয়ত্তে পাইয়া সম্পর্কের পীড়নে তাকে নিষ্পীড়িত করিতে, রাণীরূপে তার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছ?

'চিনিতে পারিলে না—পারিলে না দয়াদিদি!'

'নন্দরাণী!'

নন্দরাণী কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আমার

দৃষ্টি জলে অবরুদ্ধ হইল। পরস্পরে বাহুপাশে আবদ্ধ—পরস্পরের স্কন্ধে পরস্পরের নির্ভরে বহুক্ষণ আমরা উভয়েই সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

৪০

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দয়াদিদির পিতা ও শ্বশুর উভয়েরই অবস্থা এক সময়ে বেশ সচ্ছল ছিল। দয়াদিদির পিতা সে সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। যে গ্রামে তাঁহার বাস, সেখানে প্রতি সপ্তাহে দুইবার কাপড়ের হাট বসিত। প্রতি হাটে প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকার কাপড়ের আমদানী রপ্তানী হইত। সেই হাটেই দয়াদিদির পিতার আড়ত ছিল।

নন্দরাণীর পিতা হারাধন সেই আড়তে সরকারী করিতেন। চাকরী উপলক্ষে হারাধন দয়াদিদিদের গ্রামেই বাস করিয়াছিলেন। বহুকালের ভৃত্য এবং বিশ্বাসী বলিয়া দয়াদিদির পিতার সঙ্গে হারাধনের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। হারাধনের উপাধি ছিল—মজুমদার, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ।

সেই গ্রামেই নন্দরাণীর জন্ম। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে আত্মীয়তার জন্য উভয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং সেই জন্য "মজুমদার মহাশয়ে"র কন্যা নন্দরাণীর সহিত শৈশব হইতেই দয়াদিদি সখীত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিল।

নন্দরাণী দয়াদিদির অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। দেখিতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তাহার মুখ, চোক, অঙ্গের গঠনে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না।

নন্দরাণী দয়াদিদির বিবাহ দেখিয়াছিল। কিন্তু দয়াদিদি নন্দরাণীর বিবাহ দেখে নাই। দশ বৎসর বয়সে দয়াদিদির বিবাহ। বারো বৎসর বয়সে 'দ্বিরাগমনে' সে প্রথম শ্বশুর-ঘর করিতে যায়। যাইবার সময় সে নন্দরাণীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়াছিল মাত্র। শ্বশুরগৃহ হইতে ফিরিয়া সে আর নন্দরাণীকে দেখিতে পায় নাই।

দয়াদিদির শ্বশুরগৃহ-অবস্থানকালে ম্যালেরিয়া নূতনের সমস্ত প্রকোপ লইয়া তাহার পিতার দেশ আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে গ্রামের বহুলোক মরিল। মজুমদার মহাশয়ের গৃহও সে আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাঁহার স্ত্রী মরিল, পুত্র মরিল, নন্দরাণী মরিতে মরিতে বাঁচিল। একমাত্র কন্যাকে লইয়া জর ও জরাজীর্ণ মজুমদার মহাশয় নিজের দেশে পলাইল।

শুধু নন্দরাণীকে নয়, দেশে ফিরিয়া দয়াদিদি তাহার গ্রামের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাইল না। তাহার এক বৎসরের পিতৃগৃহে অনুপস্থিতির সময়মধ্যে ম্যালেরিয়া গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে গ্রাস করিয়াছে। তাহার পিতার জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজন লইয়া যে তাঁতিপাড়া, তাহাও এই সময়ের মধ্যে একরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজ বাটীর লোকের মধ্যেও দুই তিন জন তাহার দৃষ্টি হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র নন্দরাণীর চিন্তায় কাতর হইতে দয়াদিদির বহুদিন অবসর রহিল না। তার পর হইতে দুর্ঘটনাপরম্পরায় তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল আট দশ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। শোকসন্তপ্তা দয়াময়ীর ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, যেন নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে নন্দরাণীর সঙ্গে দয়াদিদির পুনঃসাক্ষাৎ। সেই জন্য প্রথমে সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শুধু পারে নাই কেন, এই সময়ের মধ্যে উভয়ের অবস্থার এরূপ পার্থক্য হইয়াছে যে, দয়াদিদি নন্দরাণীকে চিনিয়াও চিনিতে সাহস করে নাই।

নন্দরাণীর এই অদ্ভুত অবস্থা-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলিব। দেশে ফিরিয়া মজুমদার মহাশয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেখানে ম্যালেরিয়ার দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগের জন্য তিনি কন্যার বিবাহের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বোপার্জ্জিত সামান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির এবং কন্যার ভার শ্যালকের উপর দিয়া গিয়াছিলেন।

নন্দরাণীর যখন পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার বয়স এগারো বৎসর। দুর্ঘটনাগুলা না ঘটিলে এই সময়ের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। পিতার মৃত্যুর পরেও তাহার বিবাহের সুযোগ ঘটিল না। সে ক্রমাগত তিন বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিল। তাহার দেহ কঙ্কালসার হইল। জীবনের আশা রহিল না।

তিন বৎসর পরে সে যখন রোগমুক্ত হইল, তখন লোকচক্ষে সে একাদশ বৎসরেরই বালিকা ছিল। রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছয়মাসের মধ্যে কন্যার জলের মত কৈশোর-লাবণ্য চারিধার হইতে যেন নন্দরাণীর অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার মাতুল এতদিন পরে তাহার জন্য পাত্র দেখিবার প্রয়োজন বুঝিল। তাহাদের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলায়, কাঁসাই নদীর তীরে একটি গ্রামে। একদিন নন্দরাণী তাহার প্রতিবেশিনী একটি বৃদ্ধার সঙ্গে

নদীতে স্নান করিতেছিল। সেই সময়ে সে দেশের জমীদারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

তাঁহার নাম ছিল—রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—এক কথায় সাধারণ্যে সর্ব্বপরিচিত নাম রাজাবাবু। দেশে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। বাঘে গরুতে জল খাইত। সম্পত্তির অধিকার লইয়া তাঁহার আদেশে কত যে মারামারি, কাটাকাটি, গ্রামদাহাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আইনের জাল-বন্ধনে তখনও পর্য্যন্ত জমীদারের প্রতাপ এখনকার মত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রজাগণ তখনও পর্য্যন্ত জমীদারকে রাজার মত দেখিত, ভয় করিত, শ্রদ্ধা দেখাইত। নিজের স্বত্বে অভিমানী, কথায় কথায় জমীদারের সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইতে আদালতে উপস্থিত হইত না। তাহাদিগের আপনা আপনির ভিতরে অনেক মোকদ্দমা তাহারা জমীদারের সালিসীতেই মিটাইয়া লইত।

গবর্ণমেণ্টের দত্ত উপাধি না হইলেও প্রজাসকল রাজাবাবুকে রাজা বলিত। সুতরাং তাঁহার পত্নী রাণী।

রাজাবাবুর যখন বাট বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। তাঁহার গর্ভে পুত্রকন্যা কিছুই হয় নাই। বিষয়ের উত্তরাধিকারিতার নিমিত্ত 'রাজদম্পতির' হৃদয়ে তীব্র সন্তান-আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, পত্নীর শাসনে রাজাবাবু পুত্রার্থে পত্ন্যন্তর-গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি পত্নীর মনোমত কোন এক সুলক্ষণ বালকের মাতৃক্রোড়-পরিত্যাগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধা "রাণীর" পরলোক-প্রাপ্তি হইল। রাজাবাবুরও পুত্রহীনতার একটা দুর্নাম অপনোদনের সুযোগ ঘটিল; বিশেষতঃ, গৃহিণীর অদর্শনে নন্দীগ্রামের বিশাল অট্টালিকার অন্তঃসারশূন্যতা একটা বিকট গ্রাসের লক্ষণ লইয়া রাজাবাবুকে নিত্য এমন বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল যে, তিনি অচিরে তাহাকে পূর্ণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না।

পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই,—তবে যে কোন সূত্রেই হউক, অথবা বিধাতার একান্ত নির্ব্বন্ধেই হউক, পুনর্জীবনাগতা কিশোরী নন্দরাণী পত্নীবিয়োগবিধুর জলবিহারী স্থিরসঙ্কল্প রাজাবাবুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এই ষষ্টিপর বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার পট্ট-উত্তরীয়াঞ্চলে আবদ্ধা নন্দরাণী নন্দীগ্রামের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর মাতুল ও তাহার দুই এক জন প্রতিবেশীর বৈষয়িক উন্নতিলাভ হইল।

সকলেই মনে করিয়াছিল, বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজাবাবু তাঁহার নবাগতা গৃহলক্ষ্মীটিকে তাঁহার অন্তঃপ্রজ্বলিত আত্মীয়বর্গের তত্ত্বাবধানে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। দেশের লোকের চক্ষু নিত্যবিস্ফারণে ঊর্দ্ধনেত্রে পরিণত করিয়া, নন্দরাণী পূরা পঁচিশটি বৎসর তাহার আয়তি ধরিয়া রাখিল।

আরও বিচিত্র কথা—এই পঁচিশ বৎসরে নন্দরাণীর এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। এই পুত্র ও কন্যা এবং কুলরক্ষিণী ভার্য্যাকে পশ্চাতে রাখিয়া, রাজাবাবু জীবনটি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া, বৎসর-দুই-পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নন্দরাণীর পুত্রের নাম হরেন্দ্রনারায়ণ। কন্যার নাম ললিতা। কন্যা জ্যেষ্ঠা, বয়স এখন একুশ বৎসর; পুত্রের বয়স উনিশ।

পুত্রের বিবাহ শীঘ্র দিবার প্রয়োজন বুঝিলেও কালাশৌচের জন্য নন্দরাণী তাহার বিবাহ এখনও দিতে পারে নাই। বিবাহ দিবার ইচ্ছায় তাহার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধানে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং সেই সূত্রে দেবদর্শন উপলক্ষ করিয়া, কালীঘাটে বাসা লইয়াছিল। এইখানেই দেবীর কৃপায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে নন্দরাণীর সহিত দয়াদিদির পুনর্মিলন ঘটিল। দেবীর কৃপায় তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক এক শক্তিমতী ভূম্যধিকারিণীর আশ্রয়লাভ করিল।

৪১

কালীঘাটে নন্দরাণীর বাসায় দিন দুই অবস্থানের পর দয়াদিদি প্রভৃতি তাহাদিগের সঙ্গে নন্দীগ্রামে গমন করেন। আমাকে তাহারা যেরূপ দুর্গম পথ দিয়া নন্দীগ্রামে লইয়া গিয়াছিল, সে পথ দিয়া ইহারা যায় নাই।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—কালীঘাট হইতে বজরায় চড়িয়া প্রথমে আমরা তমলুকে যাই। সে স্থান হইতে পাল্কী করিয়া, আমরা নন্দরাণীর স্বামীর দেশে উপস্থিত হই। মধ্যে কত খালবিল যে আমাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখন সে দেশের পথ কি রকম, জানি না। সে সময় তাহা কিন্তু বড় দুর্গম ছিল। ধনিপত্নীর সঙ্গে চলিয়াছিলাম বলিয়া, আমরা ততটা পথকষ্ট অনুভব করি নাই।

"গ্রামে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ। সেখানে উপস্থিত হইয়াই নন্দরাণীর বাড়ী ও বৈভব দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কালীঘাটে তাহার সঙ্গের লোকলস্কর দেখিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়াছিলাম। নন্দীগ্রামে গিয়া দেখিলাম, তাহা আমার অনুমানকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

"এখন আমি নিঃস্ব হইয়াছি। কিন্তু এক সময়ে ধনীর কন্যা ও ধনীর পুত্রবধূ ছিলাম। ধনীর সংস্পর্শে সে সময় অনেকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছিলাম। সুতরাং কালীঘাটে নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া, আমি তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছু বুঝিতে পারি নাই। এমন কি, তাহাকে সকলে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া, আমি মনে মনে কিছু বিরক্ত হইয়াছিলাম।

"কিন্তু নন্দীগ্রামে আসিয়া বুঝিলাম—সে রাণী বটে!

"তুমিও সে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়াছিলে। তবে তখন নিতান্ত বালক বলিয়া এবং নানা কারণে চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির ছিলে বলিয়া, তাহা তুমি সম্যক্ বুঝিতে পার নাই।

"প্রথমে সে আমাদিগকে তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতরেই স্থান দিল। কিন্তু সেখানে প্রবেশের পর হইতেই তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শুধু আমার নহে; ঠাকুর-মাও এই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, যেন কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

"নন্দরাণীর ব্যবহারে কোনও ত্রুটি ছিল না। সে আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতই শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল। ঠাকুরমাকে ও দাক্ষায়ণীকেও সে ভক্তি দেখাইতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। তাহার পুত্র, কন্যা ও জামাতাকে দেখিলাম। দেখিলাম কেন, নন্দরাণী তাহাদিগকে দেখাইল। আমি তাঁতীর মেয়ে—তাহারা কায়স্থ। সমাজে আমা হইতে তাহাদের উচ্চস্থান।—নন্দরাণী তথাপি তাহাদের জন্য আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

"দাস-দাসী রাণীর আদেশে, রাণীর মতই আমাদের সেবা করিতে লাগিল। তথাপি সঙ্কোচ শুধু আমাদের নিজের জন্য নয়। দাক্ষায়ণীর জন্য, সেটা যেন বিশেষ-রূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। দাক্ষায়ণী সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি যেন বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না। সে তাহার গলার ঠাকুরটি লইয়া যেন ত্রস্তভাবে সেখানে দিনযাপন করিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে তাহার সমবয়সী অনেক বালিকা ছিল। ধনীর গৃহে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, অনেক আত্মীয়কুটুম্ব—দরিদ্র নন্দরাণীর গৃহে প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহাদের পুত্রকন্যাদিতে সে বিশাল অট্টালিকা একরূপ পরিপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে দাক্ষায়ণীর বয়সী অনেকেই তাহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতে আসিত। কিন্তু এই অল্পভাষিণী বালিকার কাছে তাহারা বয়সোচিত প্রগল্‌ভতার সামঞ্জস্যমাত্রও প্রশ্রয় পাইত না।

"আমি বুঝিলাম, সে বাড়ীতে সে অসংখ্য লোকের মধ্যে আমাদের থাকা চলিবে না। সেখানে দিন চারি পাঁচ অবস্থানের পর আমি নন্দরাণীকে আমার মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম।

"আমাদের অবস্থার ব্যাপার আমি এ পর্য্যন্ত নন্দরাণীকে খুলিয়া বলি নাই। পিতামহী ও দাক্ষায়ণীর বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করি নাই। দাক্ষায়ণীর অবস্থার কথা বুঝিবার লোক আমাদের দেশে সেই সময় হইতেই বিরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সে কথা তুলিয়া, বিশেষতঃ ধনীর নিকটে তাহার উত্থাপনে ফল নাই বুঝিয়া, আমি দাক্ষায়ণীর ইতিহাস নন্দরাণীর কাছে যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিলাম।

"এখন দেখিলাম—না বলিলে আর চলে না। বিশেষতঃ ঠাকুরমা যখন একদিন মুখ ফুটিয়া আমার কাছে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তখন অগত্যা নন্দরাণীর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

"গন্তব্য স্থানের কোনও নির্দ্দেশ ছিল না বলিয়া, নন্দরাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমরা তাহার সঙ্গে নন্দীগ্রামে আসিয়াছি। দাক্ষায়ণীর গলার ঠাকুরটির উপর সব নির্ভর করিয়া পথে বাহির হইয়াছি। এই জন্য নন্দরাণীর সঙ্গে অতদূরে আসিতে আমরা দ্বিধা করি নাই।

"যখন নন্দরাণী আমার কাছে ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর প্রকৃত ইতিহাস শুনিল, হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনার পর ঘটনা যখন তাহার কাছে বিবৃত করিলাম, তখন সে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমার সম্মুখে হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। মনে হইল, যেন সে আমার কথা উপলব্ধি করিতে পারিল না।

"আমি উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণের জন্য নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে যেন কি এক কঠোর চিন্তায় তন্ময় হইয়াছে। তাহার মুখশ্রী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্ণের উপর বর্ণ মাখিয়া চিন্তার ক্রম-পরিবর্ত্তিত ভাবতরঙ্গে যেন অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে।

"কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার তন্ময়তা ঘুচিয়াছে বুঝিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'রাণি! আমার এ ইতিহাস শুনিয়া কিছু কি বুঝিতে পারিলে?'

"চিন্তাশেষে দেখি, নন্দরাণীর অপাঙ্গে অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছে। আমার প্রশ্নের প্রহারেই যেন সে অশ্রু গণ্ডে পতিত হইল। সত্যকথা বলিতে কি, এ অশ্রুপতনের কারণ আমি কখন নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, দাক্ষায়ণীর কাহিনী শুনিয়া নারীর করুণ হৃদয় হয় ত গলিয়া গিয়াছে। অশ্রুবিন্দু মমতাময়ী নারীর আর্ত্তের উদ্দেশে আকাশে নিক্ষিপ্ত চিরন্তন উপহার।

"আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন

করিতে যাইতেছি, এমন সময় নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'দয়াদিদি! আমি ত বুঝি নাই; বুঝিতে পারিবও না। বুঝিবার অবস্থা গিয়াছে। তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ?'

"আমি একটু বিস্মিতের ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার কি মনে হয়?'

'কিছু মনে করিও না। আমার মনে হয়, তুমিও বুঝিতে পার নাই?'

"আমি অতি উল্লাসে নন্দরাণীর হাত ছুটি সবলে জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—'নন্দরাণি! ঠিক বলিয়াছ—আমিও বুঝিতে পারি নাই। তবে তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া বুঝিলাম, বিধাতা তোমাকে যে রাণী করিয়াছেন, তা ভুল করিয়া করেন নাই। তুমি রাণী হইবারই যোগ্য।'

"এ সুখ্যাতির বাক্য নন্দরাণীর যেন মনোমত হইল না। সে বলিল—'তবে কি জান দয়াদিদি, তোমার একদিন বুঝিবার উপায় আছে। আমার নাই।'

"আমি বলিলাম—'আমার যদি থাকে, তা হ'লে তোমারও আছে।'

"নন্দরাণী মাথা নাড়িল এবং বলিল—'ভগবান্, তোমার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া দয়া করিয়া তোমাকে সতীর সঙ্গ দান করিয়াছেন। আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়া জন্মের মত বুঝিবার শক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন। যে সদ্‌বুদ্ধিতে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়, ধনের অহঙ্কারে তাহা অনেককাল চাপা পড়িয়াছে।'

"নন্দরাণীর এ আক্ষেপটা আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। এতটা আক্ষেপের কারণ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ধনের যে একটা খুব গর্ব্ব জন্মিয়াছে, সেটা তাহার সঙ্গে ছুই চারি দিনের সহবাসেই বুঝিয়াছিলাম। আমার ও ঠাকুরমার কাছে যথেষ্ট দীনতা-প্রদর্শন সত্ত্বেও বাড়ীর ভিতরে অন্যত্র অনেক বিষয়ে তাহার অহঙ্কারকে পূর্ণমাত্রায় ফুটিতে দেখিয়াছি।

"আমাকে ইহার মধ্যে সে এক দিন তাহার জমীদারী পরিচালনা দেখাইয়াছে। তাহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ এখনও নাবালক। স্বামীর উইলের মর্ম্মানুসারে অছিস্বরূপ তাহাকেই জমীদারীর কার্য্য করিতে হয়। তাহার স্বামী যে ঘরে বসিয়া প্রজাদিগের মামলা-মোকদ্দমা শুনিতেন, সেই সুন্দর সাজানো ঘরের একাংশে চিক দিয়া, তাহারই ভিতর হইতে নন্দরাণী স্বামীর ন্যায় বিচারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। একটা ঝি তাম্বূলের পাত্র লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। ছুইটা ঝি অবিরাম পশ্চাৎ হইতে বাতাস করে। পরিধানে ফিন্‌ফিনে চন্দ্রকোণা ধুতি। কিন্তু সৌষ্ঠবে তাহার কাছে সধবার পরিহিত শাড়ী হার মানিয়া যায়। প্রজাদিগকে তাহার আদেশ শুনাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের আবেদন তাহাকে শুনাইবার জন্য চিকের বাহিরে এক জন 'পেস্‌কার' দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃপুরিকার সরমঢাকা অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য প্রজাদিগকে শুনাইবার জন্য পেস্‌কারের আর বড় প্রয়োজন হয় না। তাহারা বিনা আয়াসেই রাণী-মুখ-নিঃসৃত বাক্য শুনিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

"তাহার ধনের অহঙ্কার অনেকটা দেখিয়াছি। তথাপি তাহার আক্ষেপ ও তজ্জনিত অশ্রুজলের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানি না, অপ্রয়োজনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করাও পাপ। সুতরাং নন্দরাণীর আক্ষেপের কারণ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে বলিলাম—'রাণি!'—

"কথা কহিতে না কহিতে নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'এখানে কেহ নাই এবং আমার হুকুম ভিন্ন আর কেহ এখন এখানে আসিবে না! তুমি আমাকে নন্দরাণীই বল।'

"'কেন?—ভগবান্ যখন তোমাকে রাণী করিয়াছেন, তখন বলিতে বাধা কি?'

'বাধা নাই; এবং কয়দিন তোমার মুখে 'নন্দরাণী' শুনিয়া—আমি বিরক্ত না হইলেও—আমার আত্মীয়কুটুম্ব ও দাসীগুলা বিরক্ত হইয়াছে।'

'আমি তাহা জানি এবং সেই জন্যই সাবধান হইয়াছি। দোষ তাহাদের নয়, দোষ আমার। ভগবান্ যাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন, তাকে মর্য্যাদা না দেখাইলে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়।'

'তা হ'ক, তুমি আমাকে নন্দরাণী বল। শুধু এখন নয়, ইহার পরেও বলিবে। সকলের সুমুখে বলিবে। বাল্যে যেরূপ ভালবাসার আগ্রহে তোমাদের দীন কর্ম্মচারীর কন্যাকে কখন নন্দরাণী, কখন নন্দ, কখন বা নন্দী বলিয়া ডাকিতে, এখনও তোমার যখন যেরূপ অভিরুচি, সেই নামে আমাকে সম্বোধন করিও।'

"আমি কেবল নন্দরাণীর মুখের পানে চাহিলাম।

"নন্দরাণী বলিতে লাগিল—'ঐশ্বর্য্যমদে এমন অন্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি কে, কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছি, সব ভুলিয়াছিলাম। এক একবার বাপমায়ের জন্য আমার আক্ষেপ হইত। কিন্তু সে কিসের জন্য? তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কন্যার ঐশ্বর্য্যটা দেখিতে পাইত। এই ঐশ্বর্য্য তাহারা দেখিতে পাইল না বলিয়াই দুঃখ। কিন্তু তাহারা কি করিয়া যে জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছে, সে বিষয় এক দিনের জন্যও আমার ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। তাহাদের শোচনীয়

মৃত্যু-চিন্তায় আমার দুঃখ আসে নাই। আজ আমার পুত্র-কন্যার সামান্য একটু মাথা ধরিলে, ডাক্তার অষ্টপ্রহর আসিয়া তাহাদের তত্ত্ব লয়। কিন্তু আমার ভাই—'

"নন্দরাণীর চোখে এইবারে ধারা ছুটিল। আমি বুঝিলাম, ঐশ্বর্য্যমদ এতকাল ধরিয়া অতি যত্নে নন্দরাণীর বাল্যস্মৃতিগুলাকে আগুলিয়াছিল। কোনও ক্রমে তাহাদিগকে তাহার মনের কাছে আসিতে দেয় নাই। ব্রাহ্মণবালিকার পুণ্যকাহিনী আজ সেই দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

"নন্দীগ্রামের রাণী, আবার আমাদের গ্রামের সেই মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা নন্দরাণী হইয়াছে।

"ক্ষণেক নীরবতায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া নন্দরাণী আবার বলিতে লাগিল—'আমার ভাই—আমার পিতার একমাত্র বংশধর। ডাক্তার ও ঔষধের অভাবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়াছি। সেই সঙ্গে তোমার পিতা ও তাঁহার পরিবারবর্গের মহত্বও দেখিয়াছি। আমার ভাইকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের কি ব্যাকুলতা! আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে তোমার মা পুত্রবিয়োগিনীর মত মাটিতে পড়িয়া রোদন করিয়াছে!'

"আমি বাধা দিলাম। বলিলাম—'আর পূর্ব্বকথা তুলিয়ো না বোন্। ভগবানের কৃপায় উত্তরোত্তর তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তোমার পুত্রকন্যা সুস্থ, দীর্ঘজীবী ও সুখী হউক। ঐশ্বর্য্য ভগবান্ যখন দিয়াছেন, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তবে তাহার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। তোমাকে সেই সে কালের ছোট বোন্-এর মত দেখিলেও তোমাকে রাণী বলিব। তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না।"

'তা হইলে, এতকাল পরে যে সামান্য একটু আলোক এই অন্ধ চক্ষুতে ফুটিয়াছে, সেটি আবার নিবিয়া যাইবে।'

"'তাহা যাইবার যদি ভয় দেখাও, তাহা হইলে যখন যেমন বুঝিব, সেই ভাবেই তোমাকে সম্বোধন করিব।'

"এই সময় নন্দরাণী আমাকে গোটাকতক মনের কথা খুলিয়া বলিল। সেই কথাশেষে বুঝিলাম, এই কয়দিন একত্র বাসের পর আজ নন্দরাণীর সহিত আমার সেই বাল্যকালের সখীত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

"সখীত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহাকে অনেকগুলা মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। বলিবার যোগ্য আর যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা সময়ান্তরে একটা অবকাশে তাহাকে বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।

"আসল কথা, কথোপকথনের শেষে সে দিন আমি ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর ভবিষ্যৎ-স্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ইহার পর দুঃখে অনভ্যস্তা দু'টি ব্রাহ্মণকন্যাকে দু'টি উদরান্নের জন্য আর বোধ হয় ইতস্ততঃ ঘুরিতে হইবে'না। 'বোধ হয়' বলিলাম কেন, নন্দীগ্রামে বাস কেবল ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর পছন্দের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারা যদি বলে, সেখানে থাকিব না, তাহা হইলে আমার একান্ত অনিচ্ছা, অথবা নন্দরাণীর একান্ত আগ্রহ সত্বেও, আমাকে নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে। তখন ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি রাখিবার উপায় থাকিবে না।

"সেই একমাত্র পছন্দের অপেক্ষায় আমি একটিমাত্র মনের কথা - মনের আসল কথা সে দিন নন্দরাণীকে বলিতে পারিলাম না। সেটি তোমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর পুনর্ম্মিলন-সংঘটন।

"নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া এবং তাহাদের প্রতাপের কথা শুনিয়া, আমার আশা হইল, ইহাদের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হউক, আমি দাক্ষায়ণীর স্বামি-সম্মিলন ঘটাইতে সমর্থ হইব।

"আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে, বিধিপ্রেরিতা হইয়া আমরা তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। নন্দীগ্রামে তিনি আমাদের সুখ অসম্পূর্ণ রাখিবেন না।

* * * * *

"পরদিন প্রাতঃকালে নন্দরাণীর অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট একটি সুন্দর নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম।

"সেখানে আমাদের স্বচ্ছন্দে অবস্থানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা হইল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য ঝি-চাকর নিযুক্ত হইল। ফটকে দরোয়ান বসিল। ললিতার স্বামী ব্রজমোহনের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল।"

৪২

এই বাগান-বাড়ীতে আসিবার পর হইতেই, দয়াদিদির মনে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমাকে মিলিত দেখিবার বাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, এমন শক্তিমান্ জমীদারের আশ্রয় পাইয়াও, যদি সে শুভকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে না পারিল, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে বোধ হয়, আর তাহা ঘটিয়া উঠিবে না—এরূপ শুভ-সুযোগ জীবনে প্রায়ই একটিবারের জন্য আসে—আর আসে না।

আমাদের দেশের লোক কেহ নন্দীগ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। দয়াদিদিও কখন শুনে নাই।

নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার বোধ হইয়াছে, সে দাক্ষায়ণী ও পিতামহীকে সাতসমুদ্র তেরনদীপারে উপস্থিত করিয়াছে।

ভগ্নমন ও ভগ্নদেহ লইয়া পিতামহী আবার যে সে স্থান হইতে প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিতে পারিবে, দয়াময়ীর সে আশা রহিল না। পিতামহীকে দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়াই সেটা সে বুঝিতে পারিয়াছে।

তাহার বোধ হইল যেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত, দেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখ প্রাণকে তিনি কোনও প্রকারে জোর করিয়া দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। একটু অন্যমনস্ক হইলেই, যেন সে পিঞ্জর ফেলিয়া অনন্ত আকাশলক্ষ্যে ছুটিয়া যাইবে।

দাক্ষায়ণীকে পাইয়া, তাঁহার সুখেরও অবধি ছিল না—দুঃখেরও অবধি ছিল না। যুগে যুগে অজস্র-সঞ্চিত পুণ্য না হইলে দাক্ষায়ণীর মত বধূ কখন ঘর আলো করিতে আসে না। কিন্তু বড় দুঃখ, বধূ যদি আসিল, সে চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই, গৃহস্বামীর পাপে ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। বধূ, শ্বশুরগৃহবাসের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াও, তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইল না!

শৈত্য ও উত্তাপের অত্যধিক আকর্ষণ বিকর্ষণে শৈলদেহ-গ্রন্থিসকল উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া কালে তাহাকে যেরূপ বালুকাস্তূপে পরিণত করে, উল্লাস-বিষাদের নিত্য ঘাত-প্রতিঘাতে পিতামহীর হৃদয়ও দিন দিন সেইরূপ চূর্ণ হইতেছিল।

এতদিন নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া দয়াদিদির তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ হয় নাই। দুই চারি দিন নূতন বাড়ীতে বাস করিতে না করিতে পিতামহীর অবস্থা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিল, ঠাকুরমা অধিকদিন বাঁচিবেন না। বালিকা দাক্ষায়ণী সেটা বুঝিতে পারে নাই। পিতামহী, সদানন্দময়ীরূপে তাহাকে অঙ্কগত করিয়া, নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে দেন নাই। বিশেষতঃ, নূতন বাসায় আসিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যের আবরণভার তিনজনের কাহারও সহ্য হইতেছিল না—দাক্ষায়ণীর একেবারেই না। সাধ করিয়া যাহার পিতা-মাতা দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাহাদের ভাবপুষ্টা বালিকা, নন্দরাণীর অট্টালিকার মধ্যে কাঞ্চন-পিঞ্জরাবদ্ধা পাখীটির মত নিজের সৌভাগ্যের মর্ম্মটা ভাল বুঝিতে পারিতে-ছিল না।

বাগানবাড়ীতে আসিয়া তাহার অনেকটা স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বালিকা এরূপ বাড়ী জীবনে কখন দেখে নাই। তবু স্থান নির্জ্জন এবং রাজান্তঃপুরযোগ্য কোলা-হল হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা দুই দিনের ভিতরেই তাহার অন্তর হইতে দূর হইয়া গিয়াছে।

পিতামহীর দৈহিক অবস্থা দাক্ষায়ণী বুঝিতে না পারিলেও, দয়াদিদির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে মনে মনে স্থির করিল, ঠাকুরমার অবসাদের ঔষধ-সংগ্রহের একবার চেষ্টা করিবে। সে ঔষধে পিতামহীর জীবনরক্ষা হয়, সুখের কথা; না হয় তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে চিত্তের অপ্রসন্নতা অন্ততঃ বিদূরিত হইবে।

দয়াদিদি আমার হরণ-ব্যাপারের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল। তাহাতে সাধারণের সন্তুষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলেও, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। শুনিয়া বুঝিয়া-ছিলাম, কথাটা লোকচক্ষে বিগর্হিত হইলেও, তাহা করা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় ছিল না; অথবা, উপায় থাকিলেও তদবলম্বনে তাহার সাহস ছিল না।

সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অসদুপায় অবলম্বনের যে ফল, তাহা ফলিয়াছিল। তথাপি, আমি তজ্জন্য দয়াদিদিকে দোষ দিতে পারি না। দোষ যাহা, তাহা আমার ভাগ্যের।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"প্রথম তিনদিন ঠাকুরমা'র অবস্থা বুঝিবার আমি অবসর পাই নাই। প্রথম দিনটা ঘর গুছাইতেই একরূপ কাটিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কাহারও গুছাইয়া রাখিবার মত সম্বল কিছুই ছিল না; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, নন্দরাণী আগে হইতেই সেখানে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী অনেক দ্রব্যই পাঠাইয়াছে। ব্রজমোহনের উপর সেগুলি গুছাইয়া রাখিবার ভার ছিল; কিন্তু আমরা এত শীঘ্র নন্দরাণীর ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছি যে, সে এই অল্পসময়ের মধ্যে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রক্ষা করিতে পারে নাই।

"সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, ব্রজমোহনের সাহায্যেই আমাকে দিনটা অতিবাহিত করিতে হইল।

"দ্বিতীয়, তৃতীয় দিবস সুবিধা হইল না। আমা-দিগকে, বিশেষতঃ দাক্ষায়ণীকে দেখিবার জন্য গ্রামবাসিনী বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, সধবা, বিধবা, অনূঢ়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরজাতীয়া স্ত্রীলোক, একরূপ দলে দলে আসিতে লাগিল। দাক্ষায়ণীর কথা ইতিমধ্যে রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া সারাগ্রামটায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

"তৃতীয় দিনের শেষভাগে জনতা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, বাধ্য হইয়া ব্রজমোহনকে সেখানে

সর্ব্বসাধারণের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে হইল। তৃতীয় দিবসে আমরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম। মেয়েগুলা যে আসিয়া শুধু আমাদের দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে, তাহা নয়। তাহাদের অবিরাম প্রশ্নে আমাকে উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। দাক্ষায়ণী বালিকা; সে সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? ঠাকুরমা উত্তর দিতে অশক্ত; তাহাদের প্রশ্নের যথা-সম্ভব উত্তর আমিই দিতে লাগিলাম। শেষে উত্তর দেওয়া আমারও পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রজ-মোহন সেটা বুঝিল এবং লোকজনের আসা একরূপ বন্ধ করিয়া দিল।

"চতুর্থ দিবসে আমরা লোকের দেখা হইতে নিস্তার পাইয়াছি।

"এতদিন কিন্তু রাজবাড়ী হইতে কেহই আমাদের দেখিতে আসে নাই—না নন্দরাণী, না তাহার কন্যা ললিতা, না তাহাদের অপর কোন আত্মীয়া। একমাত্র ব্রজমোহন মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইতে-ছিল। আমরা, অন্ত সকল বিষয়ে তাহাদের আচরণে নিশ্চিন্ত হইলেও, তাহাদের না আসাতে কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

"প্রথম তিন দিন মনে করিলাম—বহুলোকের সমাগম দেখিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ হইবে না বলিয়া, তাহারা আসে নাই; অথবা, আসিয়া, বাগানের ফটক হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

"চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা পর্য্যন্তও যখন কেহ আসিল না, তখন আমাদের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল।

দাক্ষায়ণী অবশ্য আজ লোকের অভাবে কতকটা ফুরসৎ পাইয়া, বাড়ীর সংলগ্ন সুন্দর পুষ্করিণীর তীরে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোক না থাকিলেও, সেখানে তাহার সঙ্গীর অভাব ছিল না। পুষ্করিণীর চারিধারে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের গাছ ছিল। মাঝে মাঝে সুন্দর কেয়ারিকরা কামিনীফুলের গাছ আপনাদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার আবরণে এক একটি কুঞ্জের মূর্ত্তিতে, সেই ছোট ছোট ফুলগাছগুলির অভিভাবিকা-সঙ্গিনীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা, সেই সকল ফুলগাছের পার্শ্বে এক একবার দাঁড়াইয়া, শুধু দৃষ্টি দিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল।

"প্রয়োজন হইয়াছিল—ঠাকুরমার এবং তাঁহাদের জন্য, তাহা হইতেও অধিক প্রয়োজন হইয়াছিল—আমার। নন্দরাণীর পরিচয় সম্বল করিয়া আমিই ত তাহাদের এখানে আনিয়াছি।

"একবার মনে করিলাম, ব্রজমোহনকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে করিলাম, দেখিই না, কত দিন তাহারা না আসিয়া থাকিতে পারে। দুইচারি দিন অপেক্ষা করিব। আসে ভালই, না আসে, পুরীর পথ ধরিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইব। আমরা ত সন্ন্যাসিনী; লোকের সঙ্গে আমাদের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন কি?

"ঠাকুরমার মনে কিন্তু কি যেন একটা কি অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে! সেটা প্রথম প্রথম ঠিক করিতে না পারিলেও, আমি মনে মনে বুঝিয়াছিলাম,—নন্দীগ্রামে আমাদের অবস্থানে তিনি বিশেষ সুখী ছিলেন না।

"আমি তাঁতীর মেয়ে—ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণকন্যা দুটির সঙ্গিনী হইয়াছি। সঙ্গিনী হইবার পর হইতে এই কয়মাস ধরিয়া তাঁহাদের আচারনিষ্ঠা দেখিতেছি।

শুধু ব্রাহ্মণকন্যা বলি কেন—ইহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধা বিধবা, অপর এক জন কুমারী ব্রহ্মচারিণী। দুই জনেই বিষম কঠোরতা অবলম্বনে, অতি সন্তর্পণে, জীবনযাপন করিতেছেন।

"আমি তাহাদের মধ্যে পড়িয়া, সঙ্গগুণে অল্পে অল্পে 'বামনী' হইতেছিলাম। আমারও আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে অনেকটা ব্রাহ্মণ-বিধবার মত হইতেছিল। আমা-দের জাতির বিধবাদের যে সমস্ত আচার দোষাবহ নয়, সেগুলা ক্রমে-ক্রমে আমার চক্ষে মন্দ ঠেকিতে লাগিল। আমি এখন ইহাদেরই মত হবিষ্যাশী একাহারী। ঠাকুরমার মত আমিও একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাস করি। প্রথম প্রথম বড়ই ক্লেশ হইত; কিন্তু ঠাকুরমাকে সম্মুখে আদর্শ পাইয়া অভ্যাসবশে এখন আমার কষ্ট সহিবার ক্ষমতা হইয়াছে। সত্যকথা বলিতেছি, আমি তাঁতীর মেয়ে এ কথা না বলিলে কাহারও আমাকে শূদ্রাণী বুঝি-বার সাধ্য ছিল না। দেশভেদে আচারভেদ। আমা-দের দেশে কায়স্থ-বিধবারাই ব্রাহ্মণ-বিধবারই মত আচার পালন করেন। কিন্তু এখানে তাহার কিছু পার্থক্য দেখিলাম। শুধু কায়স্থ নয়,—এ স্থানের ব্রাহ্মণ-বিধবারাও আমাদের দেশের মত বৈধব্যের কঠোরতা অবলম্বন করে না।

"নন্দরাণীর বাড়ীতে আসিয়া এই পার্থক্যটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। যদিও ঠাকুরমা ইহার জন্য তাহাদের কাহাকেও দোষ দিতেন না, তথাপি রাজ-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সংস্রবে তাঁহার কেমন একটা কুণ্ঠাবোধ হইত। সেখানে যে কয়দিন ছিলাম, সেই কয়-দিনই তাঁহাকে দেখিয়া সেটা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।

"কিন্তু রাজবাড়ী হইতে অনেকটা দূরে আসিয়াও তাঁহার মনের অস্থিরতা কেন যে দূর হইতেছিল না, সেটা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদাই চিন্তাকুলিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন।

"আমি কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করি নাই; প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজন বুঝি নাই। দাক্ষায়ণী এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি অনেকটা আনন্দিত আছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছিলাম। তোমরা যাহা বল, অথবা যাহা বুঝ, আমি কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর সহচরী হইবার পর হইতে সেই ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

"আমি তাহাকে সর্ব্বদা ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতাম। চেষ্টায় সফল হইতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, সে তাহার দৃষ্টির এক আনা অংশ বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট পনেরো-আনা ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

"সেই পনেরো-আনা দৃষ্টি-শক্তি লইয়া লোকের ভিতরে যখন সে একবার চক্ষু স্থাপিত করিত, তখন ভিতরের কোন সামগ্রী তাহার আর অগোচর রহিত না।

"এ আমি নিজের বেলায় একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দাক্ষায়ণী কতকটা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছিল। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই আমার কিন্তু মনোমধ্যে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল। অবশ্য নানা উপদেশে মনকে অনেকটা শান্ত করিলেও বুদ্‌বুদ্‌গুলাকে নিবারণ করিতে পারিতেছিলাম না। একদিন সেই এক-একটা বুদ্‌বুদের মাথায় আমার পূর্ব্ব-জীবনের এক-একটা ছবি তাহার সমস্ত সুখ দুঃখের কথা বুকে পুরিয়া, আমার কানের ভিতরে ধ্বনি তুলিতে লাগিল। পিতার ঐশ্বর্য্য, শ্বশুরের সম্পদ, সম্পত্তির নাশ, মৃত্যুর লীলা, পুত্রের অপঘাত—ছবিগুলার সারি এক-একটা সূচীর আকারে আমার বক্ষ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

"দাক্ষায়ণী আমার পার্শ্বে বসিয়া সম্মুখে একখানি আর্‌সী রাখিয়া, সিঁথায় সিন্দুর দিতেছিল এবং মাতৃদত্ত সেই ভস্মমাখা সিন্দুরে অতি-যত্নে কপালে টিপ পরিতেছিল। চোখ ঘুরাইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, সে যেন নিজের সেই অবস্থানের অপূর্ব্ব রূপটি ওলটপালট করিয়া দেখিতেছিল।

"দেখিতে দেখিতে আর্‌সী হইতে চোখ তুলিয়াই সে বলিয়া উঠিল—'হাঁ দিদি, তুমি শ্বশুরঘর ছাড়িয়া আসিলে কেন?'

"কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রত্যুত্তরে আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম—'কেন ভাই, আসিয়া কি অন্যায় করিয়াছি?'

'আগে বল, কেন ছাড়িয়া আসিয়াছ?'

"বংশের সব নির্ম্মূল হইয়া গেল ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল; একমাত্র ছেলে ছিল, তাকেও শৃগালে খাইল—এই সকল কারণে সেখানে তিষ্ঠিতে পরিলাম না।'

"দাক্ষায়ণী শুনিল, কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—হাঁ ভাই, আমি কি শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া অন্যায় করিয়াছি?'

"দাক্ষায়ণী ন্যায়-অন্যায়ের কথা কিছুই না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'শ্বশুরের বাস্তুভিটায় সন্ধ্যার দীপ জ্বলিবার জন্য তোমার শ্বশুরবংশের আর কেহ কি অবশিষ্ট আছে?"

"আমি বলিলাম—'কেহ নাই।'

"কেহ নাই?'

"'না দাক্ষায়ণী, আমি বংশের শেষ বধূ।'"

"দাক্ষায়ণী আর্‌সী হইতে মুখ তুলিল—আমার মুখের পানে অতি কোমলদৃষ্টিতে চাহিল। সেই মধুময় দৃষ্টিই আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিল; তাহার চাহনিতেই বুঝিলাম, আমি অন্যায় করিয়াছি।

"আমি কৈফিয়ত দিবার জন্য বলিলাম 'পোড়া পেটের জন্য আমাকে ঘর ছাড়িতে হইয়াছে।'

"এইবার বালিকা ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল—'না দিদি, ও কথা বলিও না। ও কথা বলিলে মিথ্যাকথা হয়। আমার বাবার পায়ে তুমি হাত দিয়াছ, তুমি সত্য বলিতে ভয় পাইতেছ কেন?'

"আর আমি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না; চিন্তার ভারে আক্রান্ত হইয়া তাহার সমীপে বসিয়া রহিলাম—অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে যে ঈর্ষ্যা জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। আমার বোধ হইল, আমার শ্বশুরের অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট ইটগুলি সব সোনার। আমি, সে অতুল ঐশ্বর্য্যর মর্ম্ম না বুঝিয়া, নিজেকে দরিদ্র ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিয়াছি। আমি গ্রামত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর দুইটি ঘর অবশিষ্ট ছিল ঘর দুইটি অর্দ্ধভগ্ন হইলেও, আমার মত বিধবার সেখানে যথেষ্ট স্থান ছিল। বাস করিতে ইচ্ছা করিলে—গ্রামে আমার যে চাকরী জুটিত না, এমন নহে। শুধু অভিমানে ও লজ্জায়, আমি গ্রামবাসীর কাহারও গৃহে চাকরী স্বীকার করিতে পারি নাই।

"আমি সেই দশমবর্ষীয়া ক্ষুদ্র বালিকার কাছে অপরাধ স্বীকার করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি যে এই অধর্ম্মের কাজ করিয়াছি, তাহাতে আমার গতি কি হইবে?'

"দাক্ষায়ণী হাসিয়া উত্তর করিল—'তোমার যা গতি দিদি, আমারও তাই। আমি ত তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।'

"এই এক কথাতেই আমি আশ্বস্ত হইলাম। পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাহার পদধূলি লইলাম।

"রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখিলাম—আমার স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি শ্বশুরকুলের চৌদ্দপুরুষ, আমার সেই ভগ্নগৃহের ঘনান্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। মুক্তির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, সকলে একসঙ্গে যেন কাহার সাহায্য-প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। আমি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে কাতরকণ্ঠে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল। 'ওগো! বংশের শেষপ্রতিনিধি মমতাময়ী কুলবধূ! শীঘ্র আমাদিগকে এই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত কর।' কিন্তু হায়, আমার হাতে দীপ নাই! আমি তাহাদের মুক্ত করিব কি—আমি নিজেই গাঢ়-অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইয়াছি। মুক্ত করিব কি, আমিই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

"আমার মনে তখন এক বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার দীপ দূরে ফেলিয়া, হায়, কি লোভে আমি শ্বশুরের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়াছি? আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল, বক্ষ বিদীর্ণপ্রায় হইল। এমন সময় দেখি—দাক্ষায়ণী, এক অপূর্ব্ব সোনার প্রদীপহস্তে, বাড়ীর সম্মুখের পথ আলোকিত করিতে করিতে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই আমাকে বলিল—'দিদি! তোর চৌদ্দ-পুরুষের ঐশ্বর্য্য এই বাস্তুভিটার দীপ! ইহাকে নিক্ষেপ করিয়া, তুই কার ভস্ম-সম্পত্তিতে লোভ করিয়াছিস? এই নে—ইহার সাহায্যে তুই তোর চৌদ্দপুরুষকে অন্ধকার কারাগার হইতে উদ্ধার কর্।'

"পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া বুঝিয়াছিলাম—স্বর্ণদীপ হাতে লইয়া সতী সংসারের অন্ধকারময় পথে বাহির হইয়াছে; জন্মান্তরের পুণ্যফলে আমি তার আঁচল ধরিয়াছি। কার্পণ্য না করিয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যদি তাহার সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে শ্বশুরকুলের মুক্তির জন্য আমার আর চিন্তা করিতে হইবে না।

"সুতরাং, নূতন বাড়ীতে আসিবার পর হইতে, নন্দরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রফুল্ল দেখিয়াই কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; ভাবিলাম, দাক্ষায়ণীর প্রতি অগাধ স্নেহই পিতামহীর ব্যাকুলতার কারণ হইয়াছে।

"আমাদের বাড়ীখানি খুব বড় না হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। গৃহস্থের হিসাবে তাহাকে ঠিক বাড়ী বলা চলে না—অনেকটা বৈঠকখানারই ধরণের। তাহার সদর অন্দর দুই'ই সমান ছিল। কেবল একটা রান্নাবাড়ী তাহার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বলিয়া, তাহা আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছিল। তবে সে বাগানে পুরুষ-মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল; এইজন্য আমাদের সদর-অন্দর আলাহিদা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাহিরের দিকে এক দরোয়ান পাহারা দিত; সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে দুই জন বিধবা, আর একটি বালিকা; সুতরাং দরোয়ানকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবার মত লোক আমাদের মধ্যে কেহই ছিল না।

"দাক্ষায়ণী পুষ্করিণীতীরে বেড়াইতেছিল। আমি বাহিরদিকের বারান্দায় বসিয়া, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখিয়া, তাহার গতিবিধি দেখিতেছিলাম। দূরে ফটকের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের রোয়াকে বসিয়া, দরোয়ান অতি তন্ময়তার সহিত সিদ্ধি বাটিতেছিল। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া, মাদকসেবনের পূর্ব্বেই তার চিন্তার নেশায় বুঁদ হইয়াছিল।

"আমি দেখিলাম, দাক্ষায়ণী বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্করিণীর তীর পরিত্যাগ করিয়া ফটকের দিগভিমুখে চলিল। ভাবিলাম, সদরের দিকে যাইতে তাহাকে নিষেধ করি। আবার ভাবিলাম, সঙ্গিহীন বালিকার ইচ্ছামত ভ্রমণের আনন্দে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বাধা দিলাম না। দাক্ষায়ণী দরোয়ানের সম্মুখ দিয়া, বাড়ীর অপরপার্শ্বের আম কাঁটালের বাগানের দিকে চলিয়া গেল। যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখান হইতে আর তাহাকে দেখা গেল না। দেখিলাম, দরোয়ানও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

"তাহার দাসীত্ব গ্রহণের দিন হইতে আমি তাহাকে সর্ব্বদাই চোখে-চোখে রাখিয়া আসিতেছি। জাগরণে, এক দণ্ডের জন্যও যে তাহাকে কাছছাড়া করিয়াছি, অথবা একা থাকিতে দিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না।

"সুতরাং দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র বাড়ীর অপর পার্শ্বের বারান্দায় যাইবার জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্য হইতে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটায় অনুমান হইল, একটা গুরু-সামগ্রী যেন মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"আমি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল; দেখি, ঠাকুরমা মেঝেয় পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন! আমি সে দৃশ্য দেখিয়া, নিজেই প্রথমে সংজ্ঞাহারার মত হইলাম। সেখানে তৃতীয়ব্যক্তি ছিল না। ঝি কাজকর্ম্ম সারিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য ছুটী লইয়া নিজের বাড়ীতে গিয়াছে। ঠাকুরমার সাহায্য করিতে আমি একা! দাক্ষায়ণীকে ডাকিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; সে বালিকা, মায়ের অবস্থা দেখিলে ভয়ে ব্যাকুল হইতে পারে।

"মুহূর্ত্তে সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলাম। ক্ষিপ্রগতিতে অপর গৃহে রক্ষিত জলের ঘড়া লইয়া আসিলাম। জলাধার ভূমিতে রাখিয়া, একবার অঞ্চলে কোমর বাঁধিলাম।

"সেই ঘরের একপার্শ্বে মেজের উপরেই ঠাকুরমার শয্যা ছিল। আমি ভাবিলাম, শয্যা বিছাইয়া, অগ্রে তাহার উপর শয়ন করাইয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করি—অথবা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া পরে শয্যার উপর রক্ষা করি? শেষোক্ত কার্য্যটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, আমি কলসী হইতে প্রথমে অঞ্জলি পূরিয়া জল লইলাম। ঠাকুরমাকে তদবস্থ দেখিয়া, চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্যবশতঃ আমি একটা ঘটী আনিতে ভুলিয়াছিলাম। এই জন্য এক হস্তের অঞ্জলি ভিন্ন জল-সংগ্রহের আমার অপর উপায় ছিল না।

"মুখে জল দিতে গিয়া আমার মনে হইল, ব্রাহ্মণ-কন্যার বিশেষতঃ ঠাকুরমার মত নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার মুখে শূদ্রাণী হইয়া কেমন করিয়া অঞ্জলির জল দিব।

"মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত হইতে জল পড়িয়া গেল। যাহা জীবনে কখন করি নাই, তাহা করিতে আমার সাহস হইল না। হিন্দুবিধবা দেহটাকে সত্য সত্যই আত্মার পিঞ্জর মনে করিয়া থাকে। নিজে ভাঙিলে আত্মহত্যা হয় জানিয়া, পবিত্র স্থানে পবিত্র মুহূর্ত্তে পবিত্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

"মুখে জল দিতে সাহসী না হইয়া, সিক্তহস্ত তাঁহার বক্ষে সংলগ্ন করিয়া আমি তাঁহাকে ডাকিলাম—উপর্য্যুপরি তিনবার ডাকিলাম—ঠাকুরমার সংজ্ঞা ফিরিল না। তখন মনে করিলাম, শুশ্রূষার জন্য দাক্ষায়ণীকে লইয়া আসি।

"চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়াই বাগানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। তখন সন্ধ্যার একরূপ সূচনা হইয়াছে। জগৎকে আচ্ছন্ন করিবার প্রাক্কালে আঁধারের দেবতা নিজের দলবল লইয়া সঙ্গোপনে যেন গাছের ঝোপ আশ্রয় করিতেছে। বাগানের বাহিরে দাক্ষায়ণী ত নাই!—বাগানের ভিতরেও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না!

"আমি ডাকিলাম—'দাক্ষায়ণি!'—উত্তর পাইলাম না! একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয়বারেও যখন তাহার উত্তর পাইলাম না, তখন বুঝিলাম, সে বাগানের ভিতর নাই। হয় ত এদিকে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াইয়া আবার সে পুষ্করিণীর দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

"বাড়ী বেড়িয়া পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, যেন বাবুর মত কে এক জন—সন্ত্রস্তভাবে ফটকের দিকে চলিয়া গেল।

"কে গেল, গেল—কি না গেল, তাহা জানিবার তখন সময় ছিল না। আমি দেখিলাম, দরোয়ান তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ একমনে সিদ্ধি বাটিতেছে। আমার উপস্থিতি যখন তাহার লক্ষ্য হইল না, তখন বুঝিলাম—সেই অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার অলক্ষ্যে বাগানে প্রবেশ করিয়া আবার চলিয়া গিয়াছে।

"পুষ্করিণীর দিকে আসিয়াও দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল! এখন একরূপ হাসিতে হাসিতেই সে দিনের কথা বলিতেছি; কিন্তু আমার সে দিনের অবস্থা কেহ স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলেই আমার আতঙ্কটাও সেই সঙ্গে প্রণিধান করিতে পারিবেন। একদিকে, পিতামহী সংজ্ঞাশূন্যা অবস্থায় পড়িয়া আছেন; অন্যদিকে দাক্ষায়ণীর দেখা মিলিতেছে না—সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন, কোথা হইতে কেমন-করিয়া-আসা একটা লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি। আমার বুক এরূপ তীব্রবেগে কাঁপিয়া উঠিল যে, মনে হইল আমিও বুঝি পিতামহীর মত পথের মাঝে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হই।

"অতি কষ্টে হৃদয়কে একরূপ স্থির করিলাম। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে জলাশয়, দক্ষিণে ফটক, পশ্চিমে বাগান। এ তিনদিকেই আমি দেখিলাম। দেখিতে বাকি শুধু উত্তরদিক; কিন্তু সে দিকে বেড়াইবার স্থান ছিল না। উত্তরদিকেই আমাদের পাকশালা; তাহার দুইচারি হাত দূরেই বাগানের উত্তর সীমার প্রাচীর, তাহার গায়ে একটি ছোট দ্বার দেখিয়াছি মাত্র সে দ্বার আমরা আজিও পর্য্যন্ত কেহ খুলি নাই। সুতরাং প্রাচীরের ওপাশে কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

"পিতামহীর অবস্থা কি হইল—বুড়ী বাঁচিল কি মরিল

—তাহা দেখিবার এখন আমার সময় নাই। আমি রান্নাঘর বেড়িয়া উত্তরদিকের প্রাচীরের গায়ের সেই ছোট দ্বারটির নিকট উপস্থিত হইলাম।

"উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার খোলা। দ্বার হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখি, একটি সরু খাড়ি। একটি ছোট শানবাঁধা ঘাট দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া খাড়িমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখন কূলে কূলে জোয়ার; প্রচণ্ড-বেগে জলরাশি বাগানের প্রাচীরের গা বাহিয়াই যেন ছুটিয়াছে। ঘাটের সবেমাত্র চারিটি ধাপ ডুবিতে বাকি আছে—তাহা ডুবিতেও আর বড় বিলম্ব নাই। যেরূপ তেজে এখনও জল ছুটিতেছে, আর একটুপরেই তাহা দ্বারের চোকাঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে।

"খাড়ি ও সেই সঙ্গে দ্বার খোলা দেখিয়া আমার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি একেবারে বুঝিলাম, দাক্ষায়ণীকে হারাইয়াছি। কৌতূহলবশে দ্বার খুলিয়া, বালিকা সিঁড়ি বাহিয়া জলে নামিয়াছে, অমনি কোনও রকমে পদস্খলিত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে!

"কি করিব? ঠাকুরমার ঐরূপ অবস্থা—বুঝি আর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে নাই; এদিকে দাক্ষায়ণীও স্রোতে ভাসিল! তবে আমার আর জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? মনে করিলাম, আমিও স্রোতের জলে ঝাঁপ দিই। সহসা তখন মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, যদ্যপি জলে পড়িলে মৃত্যু হইবে বুঝিলাম, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই—শ্রাবণের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘাচ্ছাদিত আকাশতলে, নদীর জোয়ারেরই মত প্রচণ্ডবেগে আগত অন্ধকারমুখী সন্ধ্যায়—আমি নদীজলে ঝাঁপ দিতাম; কিন্তু জলে পড়িয়া দাক্ষায়ণী ডুবিয়াছে বলিয়া, আমি অভাগিনীও যে ডুবিব, তাহার সম্ভাবনা কি? দাক্ষায়ণী সাঁতার জানে না, আমি সাঁতার জানি। ডুবিতে গিয়া, যদি নদীতীরের কোন স্থানে সংলগ্ন হই?

"একবার ঠাকুরমাকে দেখিয়া পরে মরিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিব, স্থির করিলাম। মৃত্যুর সংকল্পই আমার সার হইল। মরণ-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আরাধ্য সচল দেবীর প্রতিমাটি আমার চোখের উপর পড়িয়া গেল। দ্বার বন্ধ করিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই দেখি—দাক্ষায়ণী! এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সে যেন আমাকেই অন্বেষণ করিতেছে।

"দেখিবামাত্র অতিহর্ষে এমন বেগে গণ্ডপথে অশ্রুধারা ছুটিল যে, আমি কিছুক্ষণের জন্য দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। চলিতে চলিতে আমাকে একবার দাঁড়াইতে হইল; সেই অবস্থাতেই বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে আমি বলিয়া উঠিলাম—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি দাক্ষায়ণি?'

"দাক্ষায়ণী এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পায় নাই—দেখিতে পাইলে সে চুপ করিয়া থাকিত না। অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বেশ ঘন হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী ঢাকিবার অন্ধকার বিধাতার ভাণ্ডারে নাই বলিয়াই আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'তুমি কোথায়? আমিই ত তোমাকে খুঁজিতেছি। ঠাকুরমা তোমাকে ডাকিতেছেন।

'ঠাকুরমা কেমন আছেন?'

'কেন তাঁর কি হইয়াছে।'

"এই প্রশ্নেই বুঝিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন। দাক্ষায়ণীকে তিনি তাঁহার মূর্চ্ছার কথা বলেন নাই। প্রশ্ন করিয়া আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। দাক্ষায়ণীকে ত মিথ্যাকথা কহিতে পারিব না। সেই সত্যবাদিনীর সঙ্গিনী হইয়াও যদি মিথ্যা কহিতে হয়, তাহা হইলে জন্মই বৃথা। অথচ ঠাকুরমা যখন শুনান নাই, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, দাক্ষায়ণীকে অসুখের কথা বলাটা আমি ভাল বিবেচনা করিলাম না। এই জন্য তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, আমি প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ দোর কি তুমি খুলিয়াছিলে?'

দাক্ষায়ণী বলিল— 'না।'

"তবে কে খুলিল?"

"দাক্ষায়ণী বলিল, 'ঘরে চল; সেখানে গেলেই সকল কথা জানিতে পারিবে। ঠাকুরমা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

"ঘরে ফিরিয়া দেখি, ও মা! এ কে!—খুড়া-মহাশয় কোথা হইতে আসিলে?'

"খুড়ামহাশয় উচ্চ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল—'যমপুরী হইতে আসিতেছি, বেটি, তোমার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। দুনিয়ায় এমন কোন্ জায়গা আছে যে, সেখানে লুকাইয়া যমকে ফাঁকি দিবে?'

"খুড়া একখানি অতি সুন্দর লালপেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়াছিল। গায়ে একটি পরিষ্কার বেনিয়ান ও মাথায় পাগড়ী ছিল। খুড়ার বেশের পারিপাট্য এই আমি প্রথম দেখিলাম। যতদিন তাহাদের দেশে ছিলাম, একদিনও হাঁটুর নীচের পড়া কাপড় তাঁহাকে পরিতে দেখি নাই। একখানি গামছা কাঁধে থাকিয়া সর্ব্বদাই উত্তরীয়ের কাজ করিত। আমি বলিলাম- 'খুড়া, এ রাজবেশ কোথায় পাইলে?' খুড়া বলিল,—'রাজার বাড়ী আসিতেছি, এ বেশ না হ'লে মানাইবে কেন? শুধু কি তাই, সঙ্গে আমার বরকন্দাজ আসিয়াছে।'—'তুমিই কি বাবুবেশে বাগানে বেড়াইতেছিলে?' খুড়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—'বাগানটা যেন নিজের মনে

হইয়া গেল। পা আপনা আপনি 'চারি' করিতে লাগিল। কিন্তু হাঁ দয়াময়ি, খুব পাহারাদার ত তোমাদের ফটকে রহিয়াছে। কতবার তাহার পাশ দিয়া আসিলাম, সে ত দেখিতে পাইল না!' আমি বলিলাম—'এখন সে নন্দী-ভৃঙ্গীকে দেখিতেছে। বাবু দেখিবার তার সময় নাই।'

"এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত উদ্বেগ-আতঙ্ক উল্লাসে পরিণত হইয়াছে। আমি খুড়াকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম,—'তোমাদের বউ থাকিতে যমপুরীর কাহারও এখানে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি শিবের পুত্র গণেশ—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—তাই এই সতীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ।'

"অধিকক্ষণ ধরিয়া আলাপের তখন অবকাশ ছিল না। ঠাকুরমাকে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার তথ্য লওয়া প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

"দেখিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন; ইহারই মধ্যে হাত-পা-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আহ্নিকে বসিয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে কোনও কথা কহিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। আমি আবার খুড়ামহাশয়ের কাছে ফিরিলাম!

"খুড়ামহাশয়ের আগমনে আমি বিশেষ বিস্মিত হই নাই। হুগলীতে খুড়ার চরিত্রের আভাস পাইয়াছিলাম। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের গ্রামে থাকিয়া, তাঁহাকে বিশেষভাবে চিনিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, খুড়া আমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইবেই—আমাদের সন্ধান না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না। ঠাকুরমা'র উপর তার ভক্তি অতুলনীয়, অগাধ! তবে এত শীঘ্র যে সে আমাদের খুঁজিয়া পাইবে, এটা বিশ্বাস করি নাই।

"তাহাকে পাইয়া, আমাদের সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। নন্দরাণী ও তাহার আত্মীয়বর্গের অনুপস্থিতিতে যদিও আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার কিছু ছিল না, তথাপি আমার মন একেবারে আশঙ্কা-শূন্য হয় নাই। আমরা তিনটি স্ত্রীলোক; আসিয়াছি—দেশ হইতে অনেক দূরে; পড়িয়াছি এক বলবান্ জমীদারের আয়ত্তের ভিতরে। এ দেশের লোকের সঙ্গে এখনও আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।

"নানাকারণে স্বভাবতঃই আমার মন কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। বিশেষতঃ ক্ষণ-পূর্ব্বে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। এখন সেটা অমূলক বুঝিলেও, আমি মনে মনে পূর্ব্ব-ভয়ের দুই একটা কারণ গড়িয়া লইয়াছিলাম।

"এখনও নিতান্ত বালিকা হইলেও, দাক্ষায়ণীর রূপ অপূর্ব্ব। এই বালিকা-বয়সেও তাহার নয়নাভিরাম রূপের জ্যোতিঃ লোকের দৃষ্টি যেন সবলে আকর্ষণ করে;—তা সে পুরুষই হউক, অথবা স্ত্রীলোকই হউক। এখানে আসিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই বালিকার রূপের খ্যাতি গ্রামের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে! সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"আমি কিন্তু বুক দিয়া ঢাকিয়া, পুরুষমানুষের দৃষ্টি হইতে সে রূপ সরাইয়া রাখিয়াছি। ললিতার স্বামী ব্রজমোহন দেখিয়াছে কি না, জানি না; রাজবাড়ীর আর কেহ, এমন কি, নন্দরাণীর পুত্রকেও আমি দাক্ষায়ণীকে দেখিতে দিই নাই। যখন তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন বালক—মাকে দেখিবার অছিলায়—মাঝে মাঝে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। অন্বেষণ করিতে করিতে, মহলের যে অংশে আমরা থাকিতাম, সেই দিকে আসিত। তার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম—মাতৃ-অন্বেষণের ছলে সে দাক্ষায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছে।

"উনিশ বৎসর বয়সের হইলেও, হরেন্দ্রের আকার বালকেরই মত ছিল; মুখে-চোখেও আমি তাহার বালকভাবই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীকে দেখিবার আকিঞ্চন তাহার কৌতূহলমাত্র, আমি অনুমান করিয়াছিলাম;—তাহার দুরভিসন্ধি অনুমান করি নাই। এই জন্য কাহাকেও তাহার কথা বলি নাই। একবার তাহার কৌতূহল চরিতার্থ দেখিতে আমার ইচ্ছাও হইয়াছিল; কিন্তু আমি ত জোর করিয়া অথবা কৌশল করিয়া দাক্ষায়ণীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব না! সুযোগ ঘটিলে সে তাহাকে দেখিতে পাইত; সুযোগ ঘটে নাই, তাই, দেখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও, সে দেখিতে পায় নাই।

"আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় ত হরেন্দ্রই দাক্ষায়ণীকে দেখিবার লোভে সকলের অজ্ঞাতসারে বাগানে প্রবেশ করিয়াছে।

"সে তা করিলে, আমার বিলক্ষণ চিন্তার বিষয় হইত। তা করিলে, আমাদের নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইত; দুই দিনও আমাদের সেখানে বাস চলিত না।

"তৎপরিবর্ত্তে খুড়ামহাশয়কে দেখিয়া আমি সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইলাম।

"বহুদূর হইতে, তিন চারি দিন ধরিয়া খুড়া আসিতেছে। তাহার পথের ক্লেশ আমাদের নিজের কষ্ট হইতেই আমি অনুমান করিয়া লইয়াছি। তবু নন্দরাণী আমাদিগকে রাণীর মত যত্নেই লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং, তাহাকেও সে সময় অন্য প্রশ্নে উত্তাক্ত না করিয়া তাহার পরিচর্য্যাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বোধ করিলাম।

"আমি বলিলাম—'আজ বোধ হয়, সারাদিন অনাহার হয় নাই।'

"সারাদিন কেন—চারিদিন সারাপথ কেবল হাড়ের মত চিড়ে চিবাইয়াছি।'

"আমি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, একটা ঘটী জলপূর্ণ করিয়া আনিলাম। দাক্ষায়ণী পূর্ব্বেই তাহাকে বসিবার আসন দিয়াছিল। পা ধুয়াইয়া দিবার জন্ম তাহাকে আসন ত্যাগ করিতে বলিলাম। খুড়া বলিল, 'পুষ্করিণীতে পা ধুইয়াছি।'

"এই সময়ে রাজার দেবালয়ে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীর দেউড়ী হইতে নহবতের ধ্বনি উঠিল। আমি বলিলাম—'তবে শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মুখে কিছু জল দাও।'

'জল পরে দিব। আগে তামাক খাইব।'

'সর্ব্বনাশ! তামাক কোথা পাইব?'

"তামাক নাই শুনিয়া, খুড়া একটু তেজস্বিতার সহিত বলিয়া উঠিল—'সে কি দয়াময়ি! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আমার জ্যেঠাইমাকে সঙ্গে আনিয়া সংসার পাতিয়াছ। আমার মত দু'দশটা ভূতপ্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিবে, এটা কি বুঝিতে পার নাই?'

'তুমি কি ভূত?'

"শুধু ভূত—গো-ভূত। আমি জানি, যখন ঘর ছাড়িয়াই তোমরা আসিয়াছ, তখন তীর্থস্থান ভিন্ন অন্য কোথাও তোমরা যাইবে না। এমন ভাগাড়ে আসিবে, তা কেমন করিয়া জানিব? ভারতের সমস্ত তীর্থ খুঁজিয়া তোমাদের বাহির করিবার জন্য দাদা আমাকে পথের খরচ দিয়াছেন। মানুষ হইলে ফাঁকতালে তীর্থ দেখিয়া আসিতাম। গো-ভূত বলিয়া এই ভাগাড়ে আসিয়াছি।'

"খুড়ার কথায় লজ্জিত হইবার কারণ থাকিলেও, মনে মনে বড় খুসী হইলাম। হরিহরের বাপ-মা তাঁদের ভ্রম বুঝিয়াছেন—মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়াছেন—মাকে ফিরাইতে লোক পাঠাইয়াছেন। মায়ের সঙ্গে দাক্ষায়ণীও নিশ্চয়ই এইবার শ্বশুরের ঘরে স্থান পাইবে; হরিহরের সঙ্গে মিলিত হইবে।

"মনের উল্লাস মনেই রাখিয়া, আমি খুড়ামহাশয়কে—'অপেক্ষা কর, আমি তামাকের ব্যবস্থা করিতেছি।' এই বলিয়াই আমি ডাকিলাম—'ঝি!' উত্তর পাইলাম না। ভৃত্য স্বরূপচন্দ্র সন্ধ্যার পর হইতেই বারান্দায় থাকিয়া, সারারাত্রি আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। এতক্ষণে আসিয়াছে মনে করিয়া ডাকিলাম—'স্বরূপ!' তাহারও উত্তর পাইলাম না।

"খুড়া বলিল—'ইহাদের কেন ডাকিতেছ?'

"দোকান হইতে হুঁকা, কলিকা, তামাক আনিয়া দিবার জন্য।"

"অত কষ্ট তোমাকে করিতে হইবে না' এই বলিয়া খুড়া বারান্দার দিক্ লক্ষ্য করিয়া একটু মিঠেকড়া সুরে কাহারে ডাকিল—'ভাই গো-ভূত!'

"বারান্দা হইতে কে উত্তর দিল—'হুজুর!'

'একটু তামাক সাজ।'

"স্বর যেন পরিচিত; যেন কোথায় কতদিন ধরিয়া শুনিয়াছি। বিস্মিতভাবে খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছ?'

"নিজেই গিয়া দেখিয়া আইস।'—এই বলিয়া খুড়া আসনত্যাগ করিল এবং একটা পুঁটুলির সঙ্গে বাঁধা হুঁকা বাহির করিল। আমার হাতে দিয়া বলিল—'দয়াময়ি! এইটাকে আগে পেট ভরিয়া জল খাওয়াইয়া দাও।' এই বলিয়াই খুড়া গান ধরিল—

'যে ভাব জানে না, ওরে মন, তার কিসের আনাগোনা।
যে ভাবের ভাবুক, সেই বোঝে রে ধিন্তাধিনা পাকা-নোনা॥'

"খুড়ার গান শুনিতে শুনিতে, হুঁকাতে জল পূরিবার জন্য আমি ঘাটে চলিলাম। বারান্দায় পা দিবামাত্র, কে এক জন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"আমাকে ব্রাহ্মণী-জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে মনে করিয়া আমি নিজের অবস্থা জানাইয়া, তাহাকে প্রতিপ্রণাম করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে বলিয়া উঠিল, 'খুড়ী, আমি যে কার্ত্তিক।'

* * * *

"সে রাত্রির আনন্দের কথা তোমাকে আর কি বলিব হরিহর! আনন্দে সারারাত্রির মধ্যে এক লহমার জন্যও আমি চোখের পলক ফেলিতে পারি নাই। সে দিনের সন্ধ্যাকালের বিষম আতঙ্কমুখে কোথা হইতে যেন কার্ত্তিক-গণেশ দুই পুত্র দ্বারিরূপে মন্দিরদ্বার আগুলিতে ছুটিয়া আসিয়াছে!"

৪৩

পিতামহীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গণেশখুড়া প্রথমেই কালীঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, যদি সেখানে সে পিতামহীসম্বন্ধে কোনও কিছু জানিতে পারে। যদি না পারে, খুড়া স্থির করিয়াছিল, সে স্থান হইতে একেবারে কাশী অভিমুখে চলিয়া যাইবে। কাশীই হিন্দুর পক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দু-বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতীর্থ—তাহার শেষজীবনের পবিত্রতম অবস্থান-ভূমি।

গণেশখুড়া কালীঘাটে, নানা উপায়ে, ঠাকুরমার তত্ত্ব

লইবার চেষ্টা করিল; তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। এইখানে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মচারীর সাহায্যেই খুড়া নন্দীগ্রামে পিতামহীর অবস্থান জানিতে পারিয়াছিল।

অনুসন্ধানের সূত্র ধরিয়া খুড়া নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু মাঝখান হইতে খুড়া, তাহার পরম-স্নেহাস্পদ পেয়াদাপ্রবর, শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র সরদারকে কোথায় লাভ করিল? গণেশখুড়া দয়াদিদির কাছে ঐরূপ ভাবেই কার্ত্তিকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল। এ মিলনে একটু বিশেষত্ব ছিল। কেন না, তাহার সঙ্গে খুড়ার পুনর্ম্মিলনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আমাদেরই ছিল না, তা খুড়ার! আমরা জানিতাম, চাকরীসূত্রে আর আমরা হুগলীতে প্রত্যাগমন করিব না। সুতরাং বন্ধুরূপে আমরা এই এক-বৎসর সেখানে যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদের সঙ্গে সে মিষ্টসম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকের সঙ্গে হয় ত এ জীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না!—কার্ত্তিকও তাহাদের মধ্যে এক জন।

দৈবঘটনায় সেই কার্ত্তিক নন্দীগ্রামে গণেশখুড়ার সঙ্গী! কালীঘাটেই তাহার সহিত গণেশখুড়ার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের পরেই বিনা মাহিনার চাকর-রূপে সে খুড়ার অনুগামী হইয়াছে।

গণেশখুড়াকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও কার্ত্তিককে তাহার সঙ্গে দেখিয়া দয়াদিদি অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে তাহার অনুগমন-সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন করিয়াছিল—উভয়কেই করিয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে সদুত্তর দেয় নাই। প্রশ্নে বুঝিয়াছিল, কার্ত্তিক চাকরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন আসিয়াছে, তাহা দুই জনের কেহই তাহাকে পরিষ্কাররূপে বলে নাই।

দয়াদিদি জানিত, কার্ত্তিক যে চাকরী করে, তাহার মাহিনা অল্প হইলেও, পাঁচরকমে সে অনেক পয়সা রোজগার করিত। এমন চাকরী সে হঠাৎ পরিত্যাগ কেন করিল, দয়াদিদির জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।—ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

ইচ্ছা পূর্ণ হইতে গণেশখুড়াই দেয় নাই। সে দয়াদিদিকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—"আমরা আসিয়াছি, এইমাত্র জানিয়া রাখ। কার্ত্তিককে কালীর দানরূপে পাইয়াছি। তাহার সংসারে কেহ নাই। তাহার অসদুপায়ের উপার্জ্জনে যাহা কিছু সে কিনিয়াছিল, মা কালী করুণাবশে তাহা সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহাকে তোমাদের চাকর করিয়া রাখিতে ইচ্ছা কর—আমরণ সে তোমাদের চাকরী করিবে।"

দয়াদিদি ইহার পর কার্ত্তিককে তৎসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। সে তাহাদের রক্ষিরূপে সঙ্গে থাকিবে—এই জানিয়াই দয়াদিদি' আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিকের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। এরূপ বিজ্ঞ ভৃত্যকে সে যথেষ্ট লাভ মনে করিয়াছিল।

কিন্তু, একটা প্রশ্ন করিবার লোভ দয়াদিদি ত্যাগ করিতে পারে নাই। আহারাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করাইয়া সে যখন কার্ত্তিকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছিল, তখনও কার্ত্তিক তাহাকে 'খুড়ীমা' বলিয়া সম্বোধন করিল।

হুগলীতে কার্ত্তিক দয়াদিদিকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিত। এক দিনও তাহার মুখ হইতে একটা সামান্য সম্মান-সূচক বাক্য বহির্গত হইতে সে শুনে নাই। আজ উপর্য্যুপরি তাহার মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব আপ্যায়নকথা নির্গত হইতে শুনিয়া দয়াদিদি জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ, কার্ত্তিক! বাছিয়া বাছিয়া এ সম্পর্ক কোথা হইতে পাইলে?"

কার্ত্তিক বলিল—"তোমাকে দেখিয়া প্রথমটা আমি কতকটা হতভম্বের মত হইয়াছিলাম। সেখানে তোমাকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিতাম। এক দিন ভুলে 'ঝি-মা' পর্য্যন্ত বলি নাই। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিব, ভাবিতে গিয়া মুখ হইতে ঐ কথাটাই বাহির হইয়া গিয়াছে!"

"তা, এত সম্পর্ক থাকিতে, অমন উদ্ভট্-সম্পর্কই বা মনে উদয় হইল কেন? আমাকে 'ঝি-মা' ত বলিতে পার।"

"তোমার মুখ দেখিয়া তোমাকে 'ঝি' বলিতে আমার সাহস হইল না।"

"এখানকার চাকর-বাকরে আমাকে 'মাসীমা' বলিয়া ডাকে—রাজার পুত্রকন্তাও আমাকে ঐ সম্পর্কে সম্বোধন করিয়া থাকে। তুমিও আমাকে তাই বলিও।"

"তুমি বলিতে বল, বলিব; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া হঠাৎ আজ আমার এক খুড়ীমার কথা মনে পড়িয়া গেল!"

"সে কি তোমাদেরই জাত?"

"না। অনেক দিন আগে আমি তাহাদের ঘরে চাকরী করিতাম। তুমি যেমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার পা দিয়াছ, অমনি দেওয়ালের আলোটা তোমার মুখের উপর পড়িল;—পড়িতেই মনটা যেন কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বহু দিন পূর্ব্বে দেখা একখানি মুখ আমার মনে পড়িল; আমি তাঁহাকে 'খুড়ীমা' বলিতাম—তাঁহার স্বামীকে 'খুড়া মহাশয়' বলিতাম। সেই সব কথা মনে হঠাৎ জাগিয়া উঠিতেই আমি তোমাকে 'খুড়ীমা' বলিয়াছি।"

"হুগলীতে ত আমাকে কতকাল দেখিয়াছ; সেখানে কি এক দিনও তা'র কথা মনে পড়ে নাই?"

"কই, তা' ত পড়ে নাই!"

"তাদের ঘরে কি চাকরী করিতে?"

"রাখালি করিতাম।"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—'রাখালের কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিত হইয়াছিলাম। আমি তাহার মুখের পানে একদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার এখনকার আধপাকা দাড়ীগোঁফঢাকা মুখখানা কিয়ৎক্ষণ দেখিতে দেখিতে আমারও বহুপূর্ব্বের একখানা শ্মশ্রুগুম্ফ-বিরহিত মুখ মনে পড়িয়া গেল!'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কত দিন তাহাদের গৃহের চাকরী পরিত্যাগ করিয়াছ?'

'প্রায় পঁচিশ বৎসর।'

'কেন পরিত্যাগ করিলে?'

"তাহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কার্ত্তিক প্রথমে একবার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমি তাহার সে ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর শুনিতে একটু জেদ করিলাম। বলিলাম—'বল না—কেন পরিত্যাগ করিলে।' কার্ত্তিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন সে বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছে না।

"তাই দেখিয়া, আমি বলিলাম—'তা হ'লে, বোধ হয়, তুমি কোনও অকার্য্য করিয়াছিলে?'

"কার্ত্তিক একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'করিয়াছিলাম,—খুড়ীমার একছড়া মুড়কিমাদুলী।'

"শুনিয়া কার্ত্তিকসম্বন্ধে সমস্তই বুঝিলাম। সে ত আমার শ্বশুরগৃহেই চাকরী করিত। আমারই মুড়কি-মাদুলী সে চুরি করিয়াছিল।'

"সে অপ্রিয় কথোপকথন হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমি তাহার কাছে অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম;—বলিলাম—'খুড়া মহাশয়ের কাছে শুনিলাম, তোমার সংসারে কেহ নাই।'

'কেহ নাই! অসদুপায়ের উপার্জ্জনে সংসার পাতিয়াছিলাম, সে সংসার টিঁকিবে কেন? এক পুরুষেই শেষ হইয়াছে। একটা ডাকাতীর আসামী হইয়া দায়মাল যাইতেছিলাম। হুজুরের শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম। সেই অবধি তাঁহারই আরদালি হইয়াছিলাম।'

"কিন্তু তোমার ত মা-বাপ-ভাই-ভগিনীতে পরিপূর্ণ জাজ্বল্যমান সংসার ছিল! সকলেই ত আর অধর্ম্মের অর্থ উপার্জ্জন করে নাই! আমি জানি—তোমার বাপ মধু, এক জন ধার্ম্মিক ছিল।"

"এই কথা শুনিবামাত্র কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—'তুমি কেমন করিয়া জানিলে?'

"আমি সে কথার উত্তর না দিয়া আবার বলিলাম—'তোমার নাম কার্ত্তিক ছিল না?'

কার্ত্তিকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি?'

'তোমার নাম ছিল—বনমালী, মনিবের বাড়ীর মেয়েছেলেরা তোমাকে 'বুনো' বলিয়া ডাকিত।'

'কে তুমি?'

'আমি সেই তোমার খুড়ীমা।'

"সে তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল। দেখিয়া দেখিয়াও সে যেন দেখার মীমাংসা করিতে পারিল না।

"আমি বলিলাম—'আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না?'

'কেমন করিয়া হইবে?'

"সে আমার শ্বশুরগৃহে রাখালির কাজ করিত। আমাদের ঐশ্বর্য্য সে দেখিয়াছে। সে বাড়ীর বধূ আমি, উদরান্নের জন্য পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছি—ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? আমার কথায় তাহার মাথা গুলাইয়া গিয়াছে। সে বিড়-বিড় করিয়া কি দু'চার কথা আপনার মনে বলিল—আমি বুঝিতে পারিলাম না। তার পর সে আমাকে বলিল—'হুগলীতে তবে কি, আমি তোমাকে দেখি নাই?'

'আমার কাঠামোকে দেখিয়াছিলে।'

'তোমাদের সে ঐশ্বর্য্য?'

'তার কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়! কিছু থাকিলে কি আর পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিতাম?'

"কার্ত্তিক শুনিল। এবারে হুঙ্কারের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার পর বলিল—'অমন ধর্ম্মের সংসারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! রাজার বউ, আজ দাসী হইয়াছে!'

"এই বলিয়াই কার্ত্তিক আমার পদপ্রান্তস্থ ভূমিতে মাথা সংলগ্ন করিল। আমি বলিলাম—'যা'রা চলিয়া গিয়াছে, তা'রা ত পুণ্যবান্;—আমি পাপিষ্ঠা, তাহাদের শোকে অহোরাত্র জ্বলিবার জন্য বাঁচিয়া আছি!'

"কার্ত্তিক বোধ হয়, আমার এ উত্তর শুনিতে পাইল না। সে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবনতমস্তকে আমার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। তার পর সহসা বালকের মত ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিব কি!—কোথা হইতে

অতর্কিতে এক বিপুল শোকাবেগ আসিয়া আমার হৃদয় ঘেরিয়া ফেলিল; দেখিতে দেখিতে আমারও চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

"এই সময়ে খুড়া মহাশয় ঠাকুরমার ঘরে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কার্ত্তিকের কান্নার শব্দ শুনিয়া খুড়া বাহিরে আসিল।

"তাহার ক্রন্দনের কারণ খুড়া বোধ হয় অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। তাই সে ঈষৎ রুক্ষস্বরে কার্ত্তিককে বলিল—'কি রে, গাড়োল! ইহাদিগকে চীৎকারে উত্ত্যক্ত করিতে কি এখানে তোমাকে সঙ্গে আনিলাম?'

"কার্ত্তিক বলিল—'না, খুড়াঠাকুর, আমি চীৎকার করি নাই।'

'তবে ও গাধার মধুর ডাক কার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল?'

'এক শালা নেমকহারাম খুড়ীমার মাদুলী চুরি করিয়াছিল। আজ বহুকাল পরে, খুড়ামহাশয়!—যুগপরে—এখানে তাহাকে ধরিয়াছি, ধরিয়াই দুই হাত দিয়া, চোরটার গলা টিপিয়াছি। সেই টিপুনীর জোরে সে মরণ যাতনায় গোঁ গোঁ করিয়া উঠিয়াছে!'

'কোথায় সে?'

'কোথায় সে! শুনিলে—কার্ত্তিকের হাতের সে টিপ খাইয়াছে। এ শুনিয়াও সে কোথায়, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার কাছে হার মানিয়াছি বলিয়া কি আমি দুনিয়ার যা'র তা'র কাছে হার মানিব? এক টিপুনিতেই তা'র ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছি।'

"তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া, খুড়া কিছুক্ষণ যেন অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া আমারও শোকাবেগ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গেল। আমার মুখে হাসি আসিল।

"খুড়া আর কার্ত্তিককে কিছু না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁ দয়াময়ি! গাড়োলটা বলে কি?'

"আমি তাহাকে কার্ত্তিকের কথায় কান দিতে নিষেধ করিলাম এবং আমাদের পরস্পরের পূর্ব্বসম্বন্ধের যৎসামান্য আভাস দিলাম। কার্ত্তিক সেই আভাস অবলম্বন করিয়া খুড়াকে আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস শুনাইতে বসিয়া গেল।

"খুড়া হুঁকা-হাতে শুনিতে বসিল। কার্ত্তিক তামাক সাজিতে সাজিতে গল্প আরম্ভ করিল। আমি আর সে পুরাকাহিনী শুনিয়া মনটাকে নিরর্থক অবসন্ন করা ভাল বোধ করিলাম না। আমি ঠাকুরমা'র কাছে চলিয়া গেলাম।

"ঠাকুরমার ঘরের সমীপে উপস্থিত হইতেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হইল। সে কথাবার্ত্তায় বাধা না দিয়া, তাহা শুনিবার জন্য দোরের পার্শ্বেই একটু কান পাতিয়া দাঁড়াইলাম।

"এটা ওটা দুই চারিটা কথার পর ঠাকুরমা বলিলেন—'নাতবৌ! তোমাকে লইয়া যাইবার লোক আসিয়াছে—কাল'ই তোমার খুড়শ্বশুরের সঙ্গে দেশে চলিয়া যাও।'

"দাক্ষায়ণী। 'আমি একা যাইব?'

"ঠাকুরমা। 'ভাল, দয়াময়ীকেও তোমার সঙ্গে দিব।'

"দাক্ষায়ণী। 'আর তুমি?'

"ঠাকুরমা। 'আমিও যতদূর পারি, তোমাদের সঙ্গে যাইব?'

"দাক্ষায়ণী। 'বাড়ী যাইবে না?'

"ঠাকুরমা। 'আমি আর বাড়ী কোন্ মুখে যাইব?'

"দাক্ষায়ণী। 'কেন ঠাকুরমা, বাবা-মা ত তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন!'

"ঠাকুরমা। পাঠাইয়াছেন, তুমি যাও—আমার কুললক্ষ্মী, শ্বশুরের ঘর আলো কর। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামি-সোহাগিনী হও।'

"দাক্ষায়ণী। 'তুমি, তা হ'লে, কোথায় থাকিবে?'

"ঠাকুরমা। 'তোমাদের কালীঘাট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, আমি সেখান হইতে কাশী যাইব। তবে আমার মত পাপিষ্ঠাকে বিশ্বনাথ কি চরণে স্থান দিবেন? কালীঘাট পর্য্যন্ত যদি পঁহুছিতে পারি, তা হ'লে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিব।'

"কথাটা শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম! বুঝিলাম যে, শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ঠাকুরমা আজ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সেরূপ দুর্ব্বলদেহে জীবন লইয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত পঁহুছিতেও তাঁ'র সন্দেহ হইয়াছে। দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমার এ কথার কি উত্তর করে, শুনিবার জন্য আমি আর একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাক্ষায়ণী নীরব হইয়াছে। বুদ্ধিমতী, ঠাকুরমার কথার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য যে ঝি নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঠাকুরমার শয্যাতলে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। আমাদের রক্ষকস্বরূপ চাকরেরও নাসিকাধ্বনি ভিতরদিকের বারান্দা হইতে শোনা যাইতেছিল। কেবল আমরা কয়জনেই জাগিয়া আছি। অন্য দিন হইলে আমরাও এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িতাম। ঠাকুরমার শরীর অসুস্থ; খুড়া মহাশয়ের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দাক্ষায়ণীও ক্লান্ত। আর অধিকক্ষণ রাত্রি জাগিলেই উভয়ের শারীরিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, তাহাদের

কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"প্রবেশ করিয়াই মিছামিছি রাত্রিজাগরণের জন্য আমি উভয়কেই তিরস্কার করিলাম। দাক্ষায়ণীকে এক অপ্রিয় বিষয় লইয়া আর বেশীক্ষণ কথা কহিতে অবসর দিলাম না। খুড়া মহাশয়কে যখন অভাবনীয়রূপে এতদূর পাইয়াছি, তখন বুঝিয়াছি, আমাদের আতঙ্ক আশঙ্কার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। পরদিন হউক অথবা তাহারও দুই এক দিন পরেই হউক, আমরা নন্দীগ্রাম পরিত্যাগ করিব।

"দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না। সে আমার তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়াই যেন, নিজের শয্যায় শয়ন করিল। আমি, ঠাকুরমা'র পদসেবার অছিলায় তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

"যখন নিশ্চিত বুঝিলাম, দাক্ষায়ণী ঘুমাইয়াছে, তখন যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে ঠাকুরমার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিলাম। ঠাকুমাকে মৃতবৎ ফেলিয়া আমি দাক্ষায়ণীর অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। তার পর, আর শুশ্রূষা করা দূরে থাক্, এ যাবৎ তাঁর অসুখসম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

"ঠাকুরমা আমার দিকে পিছন করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিলেন। যদি নিদ্রিত হ'ন, তা হ'লে, আর তাঁহাকে জাগাইব না, এই মনে করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম - 'ঠাকুরমা!'

"ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, 'কেন?'

"তোমার ঘুমের কি ব্যাঘাত করিলাম?

"ঠাকুরমা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—'না—আমি ঘুমাই নাই। কিছু কি বলিতে চাও?'

'খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হইয়াছে?'

'অন্য কোনও কথা হয় নাই। আমি তাহাকে, দেশের কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র।'

'সে কথা আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছি;—সকলেই ভাল আছে।'

'না—সকলে ভাল নাই।'

'সে কি! খুড়া ত আমাকে বলিল, সকলে ভাল আছে।'

'তুমি কা'দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ?'

'কেন—তোমার পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রের!'

'আমি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। একবার হরিহরের কথা জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিছিলাম; কিন্তু তার নাম মুখ হইতে বাহির হইল না।'

'বল কি ঠাকুরমা!'

'তা'র কল্যাণ—যে দিবানিশি কামনা করিতেছে, সেই করুক। আমি আর কল্যাণ-কামনার ছলে, মমতা জাগাইয়া তার অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করি না।'

"কথা শুনিয়া, আমি স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম; আমার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—'যার কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার গ্রামের কল্যাণ, সেই সাধুই ভাল নাই—গোবিন্দ-ঠাকুরপো আমার শোকে শয্যাগত হইয়াছেন—ইহজন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হইল না!'

'খুড়ামশাই যে আমাদের লইতে আসিয়াছে!'

'তোরা যা। দাক্ষায়ণীকে লইয়া তা'র বাপমায়ের কাছে ফিরাইয়া দে। তা'দের বলিস্, আমার যত দিন তাকে কাছে রাখিবার সামর্থ্য ছিল, রাখিয়াছি! আর আমার সামর্থ্য নাই—আমি মরিতে বসিয়াছি।'

"বলিতে-বলিতে নীরব হইলেন। এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে যে কি বলিব, বুঝিতে না পারিয়া, আমিও কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলাম।—তাঁহার মনের অবস্থা কতকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিলাম; মন দুঃখে ভরিয়া গেল। নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে মনে মনে বলিলাম—'মমতাময়ি! এত অভিমান যে, একমাত্র পুত্রের নাম পর্য্যন্ত সে অভিমানগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে!'

"মনের কথা যেন ঠাকুরমা শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—'দেখ, দয়া! শুধু মুখে কেন, পাষণ্ডপুত্রের নাম মনে-মনে উচ্চারণ করিতেও আমার ঘৃণা আসিয়াছে।'

"ঠাকুরমা আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার বলিলেন—'ইহাতে তাহারই বা দোষ কি? দোষ আমার'—বলিতে বলিতে তিনি একবার নিরস্ত হইলেন। বুঝিলাম, স্বামি-নিন্দা সাধ্বীর মুখ হইতে বাহির হইল না।

"আমি তাঁহার অসম্পূর্ণ কথা শেষ করিলাম।—'দোষ তোমার অদৃষ্টের।"

'ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালন করিয়া বংশের এক-একটা ছেলে এক-একটা সার্ব্বভৌম হইতে পারিত। যেমন করি নাই, তাহার ফল পাইয়াছি! সত্যবস্তু কি, যে জানে না, সে আজ পরের অপরাধের বিচার করিতে বসিয়াছে! হায়! লোভে, অহঙ্কারে, হতভাগা কত নিরীহের যে সর্ব্বনাশ করিবে—কত লোকের যে অভিসম্পাত আমার বংশের উপর পড়িবে—'

"শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া, আমি বলিলাম,—'ঠাকুরমা! রাত্রি অনেক হইয়াছে; একটু বিশ্রাম কর!'

"যথাসম্ভব কথায় জোর দিয়া, ঠাকুরমা বলিলেন—'বিশ্রাম? দয়া! আজ একেবারেই বিশ্রাম লইতে-ছিলাম!

'আমি তা দেখিয়াছি।'

'দেখিয়াছিস্?'

'দেখিয়াছি। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, দেখিয়াও তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না।'

'কেন, দয়াময়ি?'

'ঠাকুরমা! তোমার মুখে জল দিতে আমার সাহস হয় নাই।'

'আঃ আমার পোড়াকপাল! তোর দেওয়া জল মুখে দিয়া মরিবার আশাতেই যে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়াছি!'

"আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরমা বলিতে লাগি-লেন—'আমি যে পুত্র হারাইয়া, কন্যা পাইয়াছি! এ জন্মে তোকে গর্ভে ধরি নাই বলিয়া, আমার গর্ভ দিবারাত্রি কাঁদিতেছে!'

"ঠাকুরমার কথার মাধুর্য্য আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিতে-কাদিতে দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

"ঠাকুরমার কণ্ঠও বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি আমাকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। বুঝিলাম, গভীর শোকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় তাঁকে অধিক কথা কহা-ইলে নিরর্থক উৎপীড়িত করা হয়; বুঝিয়া—আমি আবার বাহিরে আসিলাম! দেখি, কার্ত্তিক-গণেশ দুই জনে তখনও পর্য্যন্ত মুখামুখী বসিয়া ধূমপান করিতেছে।

"আমাকে দেখিবামাত্র খুড়া বলিয়া উঠিল—'দয়াময়ি! মুড়কিমাছুলী তোমার সোনারচাঁদ ভাসুরপো'র গলায় আটকাইয়া গিয়াছে। যদি বেচারাকে বাঁচাইতে চাও, তা হইলে কা'ল থেকে ওকে প্রসাদ দিতে আরম্ভ কর। তোমার পাতের প্রসাদ অবিরত গলাধঃকরণ না করিতে পারিলে, সে মুড়কি বেচারীর হজম হইবে না!'

'বেশ! সে যা করবার, কা'ল করা যাইবে। আজ উভয়েই বিশ্রাম কর।' 'তথাস্তু।'—

"এই বলিয়া খুড়া, কার্ত্তিককে বলিল—'কি রে গাড়োল, দয়াময়ীমা'র প্রসাদ খাইবি?"

"কার্ত্তিক কলিকায় প্রাণভরা এক টান দিয়া, মুখ হইতে ধূমরাশি বাহির করিতে করিতে বলিল—'যত দিন বাঁচিব।'

"আমি তাহাদের পাগ্‌লামীর কথায় কান না দিয়া খুড়াকে বলিলাম,—'তোমার জন্য ঘরের মধ্যে বিছানা প্রস্তুত করিয়াছি।'

"খুড়া বলিল—'আপ্যায়িত।' 'তবে আর রাত্রি করিতেছ কেন?'

'রাত্রি আমি করি নাই—বিধাতা করিতেছেন।'

"তাহার উঠিবার ইচ্ছা নাই, বুঝিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

"সবেমাত্র শুইয়াছি, অমনই খুড়া আবার গান ধরিল। সেই গানের শব্দ শুনিয়া দরোয়ান দেউড়ী হইতে 'কোন্ হ্যায়'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এতক্ষণ পরে বাগানে লোক ঢুকিয়াছে বলিয়া দরোয়ানজীর হুঁস হইয়াছে।

"খুড়ামহাশয় উত্তর করিলেন—'হাম্ হ্যায়।'

"ইহার পরেই দরোয়ানজীর আগমনের নিদর্শন পাইলাম। প্রথম প্রথম, দুই একটা অর্দ্ধবীরত্বসূচক কথা; তারপর বিড়্‌বিড়্—ফিস্‌ফিস্; সর্ব্বশেষে একে-বারে চুপ্! সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্রধূমের গন্ধ আমারও গৃহপর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

"আমি বুঝিলাম, খুড়ামহাশয়ের তামাকের তলব আছে।"

৪৪

"তখনও ভোর হইয়াছে কি না সন্দেহ—কোনও স্থান হইতে একটিও পাখী সাড়া দেয় নাই, খুড়া গম্ভীর-স্বরে ডাকিয়া উঠিল—'দয়াময়ি!'

"আমি তাড়াতাড়ি মুখ-চোখে জল না দিয়াই বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই খুড়া বলিয়া উঠিল—'জ্যাঠাইমাকে উঠিতে বল, বৌমাকে উঠিতে বল। নৌকা ঠিক করা হইয়াছে। এখনি রওনা হইতে হইবে।'—দেখি, কার্ত্তিক লাঠীর ডগায় পুঁটুলি বাঁধিতেছে। খুড়ার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আমার যা যৎকিঞ্চিৎ ঘুমের ঘোর ছিল, তাহা দেশ ছাড়িয়া পলাইল। 'সে কি খুড়া, এখনি যাইব কি?'

'খাড়ীতে ভাঁটা পড়িতে সুরু হইয়াছে। দেরী করিলে 'গণ' বহিয়া যাইবে। জোয়ারের পূর্ব্বে বড় নদীতে পড়িতে পারিব না।'

'এখন কেমন করিয়া যাইব?'

'কেন, কি এমন দশো-পঞ্চাশ টাকার মালমসলা সঙ্গে আনিয়াছ?'

'ইহাদের কাহাকে ত বলা হইল না!'

'বলিবার প্রয়োজন?'

'চোরের মত কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া যাওয়া কি ভাল হয় খুড়াম'শায়?'

'বেশ, কার্ত্তিকে! দরোয়ানকে বলিয়া আয়, আমরা চলিয়া যাইতেছি।'

"খুড়ার আদেশমাত্রেই কার্ত্তিক ছুটিল। আমি বুঝিলাম, খুড়ার এ গোঁ ফিরানো আমার সাধ্য নহে। তথাপি আর একবার বলিলাম—'কয়দিন পেটে অন্ন ঢুকে নাই। আজ এখানে আহারাদি কর। একান্তই যদি যাইতে হয়, ওবেলা যাইলেও ত চলিতে পারে!'

'চলিবে না। এখন না যাওয়া হইলে, আবার কা'ল এমনি সময়। রাত্রিকালে মেয়েদের নিয়ে এ বর্ষাকালে আমি বড় নদীতে পড়িতে ভরসা করি না। পথের একস্থানেই আহারের ঠিক করিয়া লইব। মাঝি বলিয়াছে, পথে গঞ্জ আছে।'

"খুড়ার সঙ্গে তর্ক করা নিস্ফল বুঝিয়া আমি ঠাকুর-মার শরণাপন্ন হইতে চলিলাম। অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, আমাদের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বলিলেন—'কি বলিতেছ গণেশ।'

'জ্যেঠাইমা! এখনি আমাদের যাত্রা করিতে হইবে।'

'সেটা কি ভাল দেখায়! ইহারা আমাদের আনিয়াছে। নিরাশ্রয় জানিয়া আশ্রয় দিয়াছে। যত্ন করিয়াছে—'

'যত্ন ত খুব দেখিতেছি। শুনিলাম, তিন দিন তাহারা কেউ তোমাদের খোঁজ লয় নাই।'

"সে স্থান ত্যাগ করিতে খুড়া এত ব্যস্ত হইয়াছে কেন, এইবারে বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, ইহাদের ব্যবহারে খুড়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ঠাকুরমা বলিলেন—'এরূপটা হইল কেন, সেটাও ত জানা প্রয়োজন।'

খুড়া বলিল—'কিছু না। জ্যেঠাইমা! এখন যাত্রা না করিলে, একটা দিন মিছে নষ্ট হইবে।' ঠাকুরমা এবারে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'না গণেশ, যদি ইহাদের কাহারও কোন অসুখ হইয়া থাকে! গোপন-ভাবে চলিয়া গেলে তাহারা আমাদের কি মনে করিবে?'

"ঠিক এমনি সময়ে পাখীর ডাকে দাক্ষায়ণী জাগিল। অন্যদিকে কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'পাঁড়েজি বলিল, দেউড়ি ছাড়িতে তাহার উপর হুকুম নাই। ছাড়িয়া একপা বাহিরে গেলে তাহার চাকরী যাইবে।'

"খুড়া এইবারে কার্ত্তিককে তামাক সাজিতে আদেশ করিল এবং আমাকে বলিল—'বেশ দয়াময়ি, আজ, তুমি আমাদের কি খাওয়াইতে পার দেখিব।"

"আমরা যেখানে ছিলাম, তাহা রাজবাড়ী হইতে প্রায় আধপোয়া দূরে—গ্রামের একরূপ বাহিরে। প্রতিদিন প্রভাতে ব্রজমোহন আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইত। আমাদের ব্যবহারের জন্য কি কি দ্রব্য প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জানিয়া লইত। বেলা দশটা ন বাজিতেই রাজবাড়ী* হইতে চাকর আমাদের দৈনিক ব্যবহারোপযোগী খাদ্য-দ্রব্যাদি দিয়া যাইত। দুর্ভাগ্যবশে সেদিন প্রভাতে ব্রজমোহন আসিল না, সেদিন ভূরি-ভোজী দু'টি জীব আমাদের ঘরে অতিথি হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যাহা কিছু মজুদ ছিল, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে গণেশ ও কার্ত্তিক তাহার পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে। তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। থাকিলে তাহারও কিরূপ ব্যবহার হইত, আমি জানিবার অবকাশ পাই নাই। আমার মনে হইয়াছিল, পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাহাদের কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই।

"যখন ব্রজমোহনের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ রাজবাড়ী হইতে অন্য কেহও আমাদের তত্ত্ব লইতে আসিল না, তখন নবাগত অতিথি দুইটীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। প্রত্যহ যে পরিমাণে সিধা আসে, আমাদের পক্ষে তা প্রচুর হইলেও, আজ অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ না হইলে ত চলিবে না। এ দিকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না দিলে, নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা আসে, তাহাই আসিবে।

"রাজবাড়ীতে খবর পাঠাইতে আমি একবার স্বরূপের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। স্বরূপ রাজ-বাড়ীতে যাইতে সাহস করিল না। বলিল—'সেপাইরা আমাকে দেউড়ীতে ঢুকিতে দিবে না।' সে দেউড়ীতে ঢুকিতে পাইবে না, দরোয়ান ফটক ছাড়িয়া এক পাও বাহিরে যাইবে না। কি করি, তাহাদের আহারের ব্যবস্থা আমিই করিব ঠিক করিলাম। আমাদের যা কিছু পয়সা-কড়ি, সমস্তই আমার হাতে থাকিত। আমি তাহা হইতে দুইটা টাকা লইয়া কার্ত্তিককে চুপি চুপি ডাকিলাম এবং তাহার হাতে টাকা দিয়া বাজার করিয়া আনিতে বলিলাম। আমি খুড়াকে লুকাইয়া কার্য্য সারিবার চেষ্টায় ছিলাম। বোকা কার্ত্তিকের ব[illegible] তাহা হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—'বাজার কোথায়?'

"খুড়ামহাশয় তাহার বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, কার্ত্তিকের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—'সত্য সত্য তুমিই কি আমাদের সেবার ভার লইবে দয়াময়ি?' আমি বলিলাম—'বহু জন্মের ভাগ্যে তুমি তোমার কন্যাকে যখন করুণা করিতে চাহিলে, তখন রাজাদের তাহার ভাগ নি[illegible] দিব কেন? খুড়া সোল্লাসে বলিল—'বেশ বেটি, আমরা আজ তোরই অতিথি।"

"এই বলিয়াই খুড়া প্রিয়-সম্ভাষণে কার্ত্তিককে

আপ্যায়িত করিল—'বেটা ন্যাকা। ও গৃহস্থের মেয়ে, বাজার কোথায়, ও কেমন করিয়া জানিবে? তুই নিজে খুঁজিয়া দেখ্।

"আমি বলিলাম—'না কার্ত্তিক, বাজার কোথায়, আমি জানি না।'

'বাজার আছে কি না, তা জানো?'

"খুড়া তামাক টানিতে টানিতেই বলিয়া উঠিল—'ব্যাটা বাগ্‌দী এইবারে সেই হুগলীর চড় খাইল। বলি, গাঁয়ে যদি বাজার না থাকে, বড় জমীদারের গ্রাম—এখানে কি একটা গোলদারি দোকানও নাই? সেখানে, চাল, ডাল, ঘি, মসলা এ সকলও ত মিলিবে? কি বলিস দয়া?"

"আমি বলিলাম—'তা অবশ্যই আছে।'

'বস, তবে আর কি! তুই দোকান হইতে এই সকল লইয়া আয়। আমি মাছের সন্ধানে যাইতেছি। মাছ পাই ভাল, না পাই, চালে-ডালে-ঘিয়ে আমরা কাজ সারিয়া লইব।'

"ঘরে যে ঝি আছে, সেটা আমার মনেই ছিল না। আমি ডাকিলাম—'ঝি।' সে রান্নাঘর পরিষ্কার করিতে-ছিল। ডাকিতেই কাছে আসিল। গ্রামে বাজার আছে কি না, তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

"সে বলিল—'বাজার নাই, শনি-মঙ্গলবারে হাট বসে।'

'আজ ত মঙ্গলবার?'

'এতক্ষণ বোধ হয় হাট বসিয়াছে।'

"হাট বসার কথা শুনিয়াই খুড়া হুঁকা রাখিল এবং ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধ-দই মেলে?' ঝি যেন একটু গর্ব্বের সঙ্গে উত্তর করিল—'এ অঞ্চলে এমন হাট আর বিশ ক্রোশের ভিতর নাই। দুধ-দই মিলিবে না? কত চাও ঠাকুর?'

"খুড়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—'মাছ?'

"ঝি বলিল—'যত চাও। যত রকমের চাও। তবে বড় মাছ আসিলে, রাজা-মশা'য়রা আগে না লইলে কাহারও লইবার যো নাই। তাহারা লইয়া যাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহা অপরে লইতে পারিবে।'

"খুড়া এইবারে উঠিল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং কার্ত্তিকের হাতের টাকা দেখিল। দেখিয়াই আমাকে বলিল, 'এত টাকা কেন দয়াময়ি?'

"তখনকার দুই টাকা—এখনকার নয়। তখন তার কিনিবার শক্তি এখনকার দশ টাকা হইতেও বেশী। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে সে সময় দুই টাকায় সারা হাটটাই কিনিয়া আনা চলিত। সুতরাং তুচ্ছ দুটি টাকাকে 'এত' বলিয়া খুড়া অন্যায় করে নাই। 'এত' কথা শুনিয়াই আমি হাত যোড় করিয়া বলিলাম—'তোমার প্রসাদ পাইলে অনেকের জন্ম সার্থক হইবে। যদি পেটের কোনও একটু জায়গা খালি থাকে, তা হ'লে বুঝিব, তুমি যে কন্যাকে স্নেহ দেখাইতেছ, সেটা কেবল মুখের।'

"খুড়া আমার কথার উত্তর দিল না। কার্ত্তিকের বাহুমূল ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল—'অন্ধকারে আসিয়াছি, দেশটা কিরূপ, দেখা হয় নাই। চল্, নন্দীগ্রাম বস্তুটা কি, একবার দেখিয়া আসি।'

"কার্ত্তিক বলিল—'তবে দাঁড়াও হুজুর, লাঠিগাছটা লই।' খুড়া তাহা লইতে দিল না। বলিল—'তুই কাল-ভৈরব। নন্দীর গ্রামে তোর আবার ভয় কি?'

"সিঁড়ি বাহিয়া দুই জনে নীচে না নামিতে নামিতে, পিছন হইতে দাক্ষায়ণী আমাকে ডাকিয়া উঠিল। আমি মুখ ফিরাইবামাত্র বলিল—'কার্ত্তিককে ডাকিয়া লাঠিটে দাও না কেন!' আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিলাম। দাক্ষায়ণী বলিল—'খুড়াম'শায় যদি সবার বড় মাছটাই লইয়া আসেন?'

"আমি যে আরও খানিকটা সময় দাঁড়াইয়া তার মুখ দেখিব, সে অবকাশ পাইলাম না। কার্ত্তিককে ফিরাইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিলাম। দেখি, কার্ত্তিক আপনিই ফিরিতেছে। সে কাছে আসিতে আসিতে বলিল, 'খুড়া-ম'শাইয়ের যেমন কাণ্ড, আমাকে টানিয়া আনিল। কিন্তু কিসে যে তরি-তরকারি আনিব, তার হুঁস নাই। খুড়ীমা! ঘরে বড় রকমের ডালাটালা আছে?' আমি বলিলাম—'আছে, দিতেছি। ডালা লও, আর সেই সঙ্গে লাঠিগাছটাও লইয়া যাও। হাঁ কার্ত্তিক! তুমি কি ভাল লাঠিখেলা জানো? তোমার বাপ খুব লাঠি খেলিতে জানিত।'

"আমার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে দাক্ষায়ণী তার হাতে লাঠি দিল। বালিকাকে দেখিবা-মাত্র কার্ত্তিক প্রথমে যেন কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই নীরবে দাক্ষায়ণীর দুটি পায়ের উপর লাঠিগাছটি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর উঠিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে খুড়ীমা?'

'খুড়াকে ত ওই পাগল-মানুষ দেখিতেছ?'

'যদি বড় মাছটা তুলিয়া লয়? খুড়ীমা! আজ পৃথিবীর পালোয়ান একদিকে হইলেও তোমার ছেলের জয় কাড়িয়া লইতে পারিবে না।'

"আমি তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আমি জানিতাম, ডাকাতি যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের পক্ষে

এমন শুভসঙ্কেত আর নাই। ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে দস্যুরা কালীপূজা করিয়া থাকে। সেই সময় যদি কোনও কুমারী নিজের ইচ্ছায় কাহারও হাতে অস্ত্র আনিয়া দেয়, সে বিশ্বাস করে, স্বয়ং দেবী তাহাকে অস্ত্র উপহার দিয়াছেন। যুদ্ধে জয়ী হইতে সে দিন তাহার আর সন্দেহ থাকে না।

"তথাপি তাহাকে খুড়া সম্বন্ধে যথাশক্তি সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমি ডালা আনিয়া দিলাম।

"যা ভয় করিয়াছিলাম, তাই হইল। রাজবাড়ী হইতে নিত্য যেমন আমাদের সিধা আসে, ভৃত্য আজও সেইরূপ লইয়া আসিল। আমি তাহার কাছে নন্দরাণীর সংবাদ লইলাম। সে বলিল, রাণী তাঁহার পুত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কয়দিন কোথায় গিয়াছেন। আজিও আসেন নাই। ব্রজমোহন শুধু বাড়ীতে আছে। সে আজ আসিল না কেন, ভৃত্য বলিতে পারিল না।

"এইবারে সত্য সত্যই নন্দরাণীর উপর আমার রাগ হইল। তাহার আচরণের মর্ম্ম ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি প্রয়োজন বুঝিয়া কোন স্থানে তাহাকে যাইতেই হইয়াছে, আমাকে বলিতে তাহার দোষ কি ছিল? আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে আমি ততটা মনে করিতাম না; কিন্তু আমার কথা ও আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আর দুইটি অবলা আমার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাদের প্রতি নন্দরাণীর এ কি আচরণ! এইরূপ অবজ্ঞা দেখাইবে বলিয়া কি সে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া নন্দীগ্রামে লইয়া আসিল!

"ভৃত্য মাথা হইতে ডালা নামাইতেছিল। আমি বলিলাম—'আজ আমাদের আর সিধার প্রয়োজন নাই। তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।'

"আমার কথায় সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—'তোমরা কি তা হ'লে আজ কিছুই খাইবে না?'

'খাইব না কেন—তোদের মনিবদের জিনিস্ খাইব না। হাটে জিনিস আনিতে আমাদের লোক গিয়াছে।'

"সে লোকটা তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আমার কথা যেন বুঝিতে পারিল না। আমি বলিলাম—'আমাদের লইয়া যাইতে দেশ হইতে লোক আসিয়াছে। আমরা আজই এখান হইতে যাইতেছি।'

'এ আমি এখন কোথায় লইয়া যাইব? ভাঁড়ারী চলিয়া গিয়াছে।'

'চুলোয় ফেলিয়া দি গে যা।'

"সে হতভম্বের মত খানিকটা দাঁড়াইয়া, না যাওয়ার মত করিয়া বড় অনিচ্ছায় যেন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দরোয়ান আসিয়া আমাকে বলিল—'হাঁ মায়ীজী, যে দু'জন লোক আসিয়াছে, উহারা তোমাদের কে?'

"আমি ঈষৎ টিটকারির সহিত তাহাকে বলিলাম—'কা'ল থেকে এক কলিকায় সকলে গাঁজায় দম দিতেছ, পরিচয় লইবার বুঝি ফাঁক্ পাও নাই?'

'বুঝেছি, ওরা তোমাদের আপনার লোক।'

'এ অদ্ভুত আবিষ্কার কেমন করিয়া করিলে?'

'সিধা ফিরাইয়া দিলে তোমাদের ভোজন কি হইবে?'

'সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি যেমন দেউড়ী আগুলিয়া বসিয়া আছ, সেইরূপ থাক।'

"আর বেশী কথা কহিতে হইল না। হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল উঠিল। শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। দরোয়ানও কোলাহল শুনিয়া বেগে দেউড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

"কোলাহল উত্তরোত্তর বাড়িয়া আমাদের বাগান-বাড়ীর দিকেই যেন চলিয়া আসিতে লাগিল। শব্দ ঠাকুর-মারও কাণে পৌছিয়াছে। তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এত গোলমাল কিসের জন্ত দয়া?'

'এখান হইতে কেমন করিয়া বুঝিব? তবে ঠাকুরমা, আজ আমাদের ভোরে রওনা হওয়াই উচিত ছিল।'

'তখন বলিলি না কেন?'

'আমার গ্রহ। যাই হ'ক, তুমি ঘরেই যাও, আমি একটু আগে যাইয়া দেখি।'

'গণেশকে লইয়া গেল না কি?'

'তাই বা কেমন করিয়া বলিব। খুড়া ও কার্ত্তিক হাটে গিয়াছে।

"ঠাকুরমা'র যাইতে ইচ্ছা ছিল না। আমি জোর করিয়া তাঁহাকে ঘরে পাঠাইলাম এবং কি করিব, স্থির করিতে না পারিয়া দাক্ষায়ণীর কাছে ফিরিলাম। দেখিলাম, সে উনানের কাছটিতে 'আসনপিঁড়ি' হইয়া বসিয়া আছে। বসিয়া কার্ত্তিক ও খুড়ামহাশয়ের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'দিদি! খুড়ামহাশয় যদি মাছ আনেন, কেমন করিয়া কুটিবে? আঁশবটি ত ঘরে নাই।' আমি বলিলাম—'ঘোড়া হইলে চাবুকের জন্ত আটকাইবে না। আগে নিরামিষ কুটিয়া আমাদের বঁটিই আঁশ করিয়া লইব। কা'ল একাদশী—পরশু আমরা হয় ত এতক্ষণে তোমার শ্বশুরের ঘরে উপস্থিত হইয়াছি।'

'আজই কি এখান হইতে চলিয়া যাইবে?'

'তাতে আর সন্দেহ আছে? আজ ভোরেই আমাদের চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল।'

'রাণীকে না জানাইয়া যাইবে?'

'কোথায় রাণী? সে চুলায় গিয়াছে। সে কবে ফিরিবে, আর ফিরিবে কি না ফিরিবে, তার ঠিক কি? কয়দিন আমরা তার জন্য অপেক্ষা করিব?'

'কিন্তু রাণী'ত আমাদের ভাল বাসিয়াছে!'

'তার ভালবাসার কাঁথায় আগুন। আমরা বিদেশী অসহায়া তিনটি স্ত্রীলোক। আমাদিগকে একটা বনের মধ্যে ফেলিয়া, চারিদিনের মধ্যে আর সে দেখা করিল না। দেখা চুলায় যাক্, একটা মেয়েলোক পাঠাইয়া, আমরা কেমন আছি, আছি কি না আছি, খোঁজ পর্য্যন্ত লইল না।'

'কখন্ যাইবে?'

'সেটা, খুড়া আসিলেই ঠিক হইবে। খুড়া যদি আসিয়া বলে, এখনি উঠিতে হইবে, আমরা এখনি উঠিব।'

"এমন সময় খুড়া-ম'শায় ভিতর-বারান্দার দিক্ হইতে ডাকিল—'দয়াময়ি!' চকিতের মত অমনি ঘর হইতে বাহির হইলাম। খুড়াকে না দেখিয়াই উদ্দেশে তাহাকে শুনাইয়া বলিলাম—'এই তোমার নাম করিতেছিলাম। তুমি অনেক কাল বাঁচিবে!' কিন্তু খুড়াকে দেখিয়াই—এ কি! খুড়া একটা প্রায় আধমণ রুইমাছ হাতে ঝুলাইয়া আনিয়াছে। সন্দেহাকুলিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এত বড় মাছ কোথা পাইলে?'—'হাট হইতে কিনিয়া আনিলাম।' 'দাম?' 'আমার মাথার ঘি।' বুঝিলাম, খুড়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছে। 'তবে কি সবার বড় মাছটা উঠাইয়া আনিয়াছ?'

'সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়।'

"উত্তর দিব কি, আমি শুধু তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। খুড়া বলিল—'মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। শীঘ্রই এটাকে বনাইবার ব্যবস্থা কর। মাছ রাঁধিয়া আমি কার্ত্তিককে মুড়া খাওয়াইব। সে বেটা আজ আমাকে বড়ই সন্তুষ্ট করিয়াছে।'

"তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাহির-বারান্দার দিক্ হইতে কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল—'খুড়ীমা! খুড়াম'শায় আসিয়াছে?' আমাকে আর উত্তর দিতে হইল না। খুড়া ডাকিল—'কার্ত্তিকে!' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ ডালা-মাথায় আমাদের কাছে উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদি ও লাঠি ভূমিতে রাখিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল,—'হুজুর! আসিয়াছি!'

"খুড়া বলিল—'কেন রে ব্যাটা, পাঁচটা মেনীমুখো পা'কের সঙ্গে যুঝিতে গিয়া তোর চোক কপালে উঠিয়া গেছে না কি?'—'আসিয়াছি কি না, দেখিতে পাইতেছ না?'

'ছুটিয়া আসিতে হয় নাই ত?'

'এক পাও নয়। বাবুর মতই আসিয়াছি!'

"তখন এ সকল কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, আমি খুড়ার হাত হইতে মাছ লইলাম। লইলাম কেন, খুড়ার হাত হইতে মেজেয় ফেলিয়া দিলাম। কার্ত্তিক বলিল—'খুড়ীমা! খুড়াম'শায়ের পায়ে জল দাও, আর শীঘ্র তেল দাও, উনি স্নান করিয়া আসুন।—নাও খুড়াম'শায়, কথা রাখিয়া ব'স।' এই বলিয়া বারান্দার কোণে একখানা আসন ছিল, সেখানা আনিয়া খুড়ার কাছে পাতিয়া দিল।

"খুড়াকে কার্ত্তিক যে প্রতি কথায় 'হুজুর' বলিয়া সম্বোধন করে এবং খুড়া যে কেন তা সহ্য করে, আগে সেটা ভাল বুঝিতে পারি নাই। সেই সময় বুঝিলাম। দুই দুইবার 'খুড়াম'শায়' শুনিয়া খুড়া বলিল—'কি বল্লি বেটা; খুড়াম'শায়?'

'আজ্ঞা, ভুল হইয়াছে, হুজুর।'

'একটা দিনের জন্যও তুমি আমাকে বাবু হইতে দিবে না? এখানেও তুমি আমাকে গণেশের মা'র গণেশ করিতে চাও?'

'হুজুর! আমার ঘাট হইয়াছে।'

'যা, তামাক সাজ। কেউ কি আর লাঠি-সোঁটা নিয়ে আস্‌বে মনে করেছিস্?'

'যে বেটা তোমার মাথার ঘি বাহির করিবে বলিয়াছিল, তাহাকে একটুকু বুঝাইয়া দিয়াছি। তাহার মাথায় একবিন্দু বুদ্ধি থাকিলেও সে আসিবে না। তবে অন্যে আসিতে পারে। বিশেষতঃ রাজবাড়ীর সরকার—তার হাত হইতে তুমি হাটের মধ্যে মাছ কাড়িয়া লইয়াছ। সে অপমান শুধু তার নয়, রাজাদেরও তাতে অপমান হইয়াছে। তারা কি চুপ করিয়া থাকিবে?'

"আমি বলিলাম—'তাই ত খুড়াম'শায়, একটা গণ্ডগোল বাধাইলে!'

"ঈষৎ কোমল-কণ্ঠে খুড়া বলিল—'গণ্ডগোল বাধাইবার ত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাধে কই? কার্ত্তিক! সহজে আমার ক্রোধ হয় না। হুগলীতে যখন আমি তোকে প্রহার করি, তখন তোর উপর আমার এতটুকুও ক্রোধ হয় নাই। অনর্থক একটা কটু কথা কহিল বলিয়া শিক্ষা দিবার জন্য সরকারকে একটি চড় দিয়াছি—রাগে দিই নাই। কিন্তু এইবারে আমার ক্রোধ হইতেছে। অতি দূরদেশ হইতে তিন-তিনটি

অসহায়া অবলাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া এ হতভাগারা তাহাদের প্রতি এ কি হীনের মত আচরণ করিতেছে!’

“খুড়ামহাশয় আরও দুই একটা কি বলিতে যাইতেছিল। কার্ত্তিক করযোড়ে তাহাকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিল। আমিও অনুরোধ করিলাম। বলিলাম—‘যে আমাদের আনিয়াছে, সে স্ত্রীলোক। আনিয়া সে আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে। তাহার এখনকার এরূপ আচরণের কারণ যখন বুঝিতে পারিতেছি না, তখন হে নারায়ণ! তাহার উপর ক্রোধ করিবেন না।’

“খুড়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল—‘এ গণ্ডমূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার কি ক্ষতি হইবে দয়া?’ ঠিক এমনি সময়ে দাক্ষায়ণী ঘরের ভিতর হইতে আমাকে বলিল—‘দিদি, খুড়ামহাশয়কে বল, উনি ক্রোধ করিলে ইহাদের বড় ক্ষতি হইবে।’ কথা আর আমাকে শোনাইতে হইল না। খুড়া নিজেই শুনিল। শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—‘হাঁ মা জগদম্বা, আমি এমন?’ দাক্ষায়ণী জলপূর্ণ একটি ঘটি-হাতে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া খুড়ার কাছে আসিল এবং নিজহস্তে তাহার ধূলামাখা চরণ ধুইয়া দিল। খুড়া প্রথমে যেন একটু কিন্তু দেখাইল। বলিল—‘কর কি মা, এত লোক থাকিতে তুমি কেন?’ দাক্ষায়ণী কথা শুনিল না। পা ধোয়াইয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছাইয়া, একটি গড় করিয়া চলিয়া গেল।

“খুড়া বলিল—‘কার্ত্তিক! এইখান থেকেই আমার হজুরীর শেষ হইল। গণেশের মা’র গণেশের ক্রোধের মুখে এইবারে আগুন লাগাইয়া দে।’

“কার্ত্তিক খুড়াকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তামাক সাজিতে চলিয়া গেল।”

৪৫

“খুড়ার গোঁ কে ফিরাইবে? সে সেই আধমোণ মাছই রাঁধিতে বসিয়া গেল। আমি একবার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—‘আরও ত পাঁচটা সামগ্রী আছে, অত মাছ রাঁধিয়া কি হইবে?’ খুড়া শুনিল না; বলিল—‘অন্নপূর্ণার ঘর, কখন কোথা হইতে কে অভুক্ত আসে, তার ঠিক কি? কেহ না আসে, রাজবাটীতে প্রসাদ পাঠাইয়া দিব। সুতরাং আমাকে আবার তদুপযুক্ত তৈলাদিরও ব্যবস্থা করিতে হইল।

“মাছের চারি পাঁচ রকম তরকারি খুড়া নিজেই রাঁধিল। ঠাকুরমা আমার নিষেধ সত্ত্বেও সমস্ত নিরামিষ ব্যঞ্জন নিজে রাঁধিলেন। দাক্ষায়ণী উভয়েরই পরিচর্য্যা করিল। যখন সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখন বেলা প্রায় দুইটা। আমিও ইহাদের রন্ধনের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিলাম, আর প্রতিমুহূর্ত্তে রাজবাড়ী হইতে দরোয়ান আসার ভয় করিতেছিলাম। আর কেবল ভগবান্‌কে ডাকিতেছিলাম—‘হে ঠাকুর, যেন খুড়ার খাওয়াটি পণ্ড না হয়।’

“দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, কেহ আসিল না। এখন অনেকটা ভয় ঘুচিয়াছে। কাকা মহাশয় রন্ধনান্তে তাঁহার আহ্নিকের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেইটুকু সারিতে বসিয়াছে। আমি তাহার আহারের স্থান পরিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছি। এমন সময় ফটকের দিকে লোককোলাহলের মত শব্দ শ্রুত হইল। শুনিবামাত্র শরীর শিহরিল। আমি বুঝিলাম, এতক্ষণ পরে দলবদ্ধ হইয়া রাজবাড়ী হইতে গুণ্ডারা খুড়ামহাশয়কে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমি কার্ত্তিককে ভিতর হইতে ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। মনে করিলাম, স্নানান্তে সে বিশ্রাম করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, বারান্দায় কার্ত্তিক নাই। সেই স্থান হইতে কান পাতিয়া শুনিলাম। কোলাহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। মনে হইল, জনসঙ্ঘ যেন উন্মত্তের মত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বারান্দার নীচে নামিয়া ব্যাপারটা দেখিতে আমার সাহস হইল না।

“আমি ছুটিয়া খুড়ামহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ভগবানের ধ্যানে ব্রাহ্মণের চক্ষু-দুটি মুদ্রিত। আমি ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ডাকিলাম—‘খুড়ামহাশয়, খুড়ামহাশয়, খুড়ামহাশয়!’

“তৃতীয়বারের সম্বোধনে খুড়ার চক্ষু-পলক উন্মুক্ত হইল। কিন্তু তাহার চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এখনও তাহার মন সম্পূর্ণ বহির্মুখ হয় নাই। আমি আবার তাহাকে ডাকিলাম। খুড়ার উত্তর পাইতে না পাইতে কার্ত্তিক বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—‘খুড়ীমা, প্রভুকে শীঘ্র একবার বাহিরে পাঠাইয়া দাও।’

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে কোলাহলতরঙ্গ প্রবলবেগে বারান্দার সিঁড়িতে আসিয়া যেন একটা আছাড় খাইয়া নীরব হইল। বুঝিলাম, বহুলোকবাহিত একখানি পাল্কী আমাদের বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

“খুড়া গৃহ হইতে সত্বর বাহির হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিল। আমি তাহার অনুগমন করিলাম।

“বারান্দায় আসিয়া দেখি, যথার্থই একটি অপূর্ব্বসুন্দর

পাল্কী। বাস্তবিক এমন সুন্দর ও বড় পাল্কী আমি ইহার পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। কিন্তু ভিতরে? হরিহর! পাল্কীর ভিতরে সে দিন যে এক অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা সে দিনের পূর্ব্বে কিংবা পরে আর কখনও দেখি নাই। এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাল্কীর ভিতরে অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।"

"আটজন বেহারায় পাল্কী বহিয়া আনিয়াছে। তাহারা পাল্কী ভূমিতে রাখিয়া সেটাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাল্কীর দ্বারে প্রকাণ্ড লাঠি-হাতে অতিদীর্ঘদেহ এক মুসলমান-সর্দ্দার। তাহার কথা তোমাকে আর বলিতে হইবে না। তোমাকে লুঠিয়া আনিতে সেই সর্দ্দারই তোমাদের গ্রামে গিয়াছিল।"

"অন্তের সাহায্য বিনা বৃদ্ধ পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বুটের ডালের মত বর্ণ। কেশ, ভ্রূ, গুম্ফ বক্ষের রোমরাজি সমস্ত কুন্দফুলের মত শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়াই একগাছি লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্চতায় তাঁহার মাথা মুসলমান সর্দ্দারের সমান হইল। দেহে তাঁহার সামান্যমাত্রও বক্রতা আসে নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স? পরে শুনিয়াছিলাম, একশো পূরিতে আর পাঁচটি বৎসর মাত্র বাকি।"

"তাঁহার বিষয়ে অধিক আর কি বলিব! অপূর্ব্বরূপের সেই বৃদ্ধকে দেখিয়াই আমাদের দুইজনেরই হৃদয় ভক্তিতে পূরিয়া গেল।"

"সমস্ত লোক চারিধারে দাঁড়াইয়া। সকলেই নিস্তব্ধ। বাগানের দরোয়ান পর্য্যন্ত দেউড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। সে একটু দূরে চোরটির মত দাঁড়াইয়া আছে।"

"বাহিরে দাঁড়াইতেই খুড়া সিঁড়ি হইতে নামিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দেখাদেখি আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।"

"খুড়াকে যোড়হস্তে প্রতিপ্রণাম করিয়াই বৃদ্ধ অর্দ্ধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, 'বীর! তুমিই আমার হাত ধরিয়া আমাকে উপরে উঠাইয়া লও। লোকনাথ চাটুজ্জের সারাজীবনের বিজয়ফল তুমি তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া কাড়িয়া লইয়াছ। এ হাত তোমার হাতেই আমি ভর করিলাম।"

"খুড়া অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে মাঝের দালানে উঠাইয়া আনিলেন। আমি সত্বর একখানা আসন আনিয়া তাঁহার বসিবার ব্যবস্থা করিলাম।

"বৃদ্ধ বলিলেন,—'মাকে না দেখিয়া আমি বসিব না।'

"তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দেখি, অবগুণ্ঠনবতী পৌত্রবধূর হাত ধরিয়া, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে মুখ আবরিয়া ঠাকুরমা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণতা হইলেন। দাক্ষায়ণীও ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

"ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'মা! রাণী এখানে ছিল না। আমি কাশী পলাইতেছিলাম। তাহাকে লুকাইয়া পলাইতেছিলাম। খবর পাইয়া পুত্রকন্যা সঙ্গে লইয়া রাণী আমাকে দেখিতে ছুটিয়াছিল। কাহাকেও খবর দিবার সময় পায় নাই। তোমাদের কথা শুনিয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার আর কাশী যাওয়া হইল না। ব্রজমোহনও আজ এখানে নাই। এমন সময় কতকগুলা হতভাগা গণ্ডমূর্খের বুদ্ধির দোষে একটা মহা অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে। রাণী আসিয়াই আপনাদের মর্য্যাদাহানির কথা শুনিবামাত্র মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী আমি। আমি বর্ত্তমানে অতিথিসেবাপরায়ণ রাজাবাবুর ঘরে দেবতা-অতিথির অপমান হইয়াছে। মা! এই হতভাগা বৃদ্ধ সন্তানকে ক্ষমা কর।'

"ঠাকুরমা প্রথমে কোন উত্তর করিলেন না, উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দুইচারি বিন্দু অশ্রু ভূমিতে পতিত হইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন—'বাবা! আগে বসুন।'

"খুড়া বলিল—'ক্ষমা বুঝি না। আজ দ্বিপ্রহরে নারায়ণ অতিথি পাইয়াছি। বৈদিকের গৃহের এই দেবীর হাতের প্রস্তুত অন্নগ্রহণে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আতিথ্য গ্রহণে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

"কেন খাইব না ভাই? বৈদিক আমার গুরু।'

"বিচিত্র সমাবেশ! ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর পিতার নাম করিলেন। বলিলেন—'দেশপ্রসিদ্ধ মহাত্মা শিবরাম সার্ব্বভৌম আমার গুরু-পুত্র।'

"খুড়া সোল্লাসে দাক্ষায়ণীকে দেখাইয়া বলিল,—'এই যে সম্মুখে তাঁহারই কন্যা।'

"সেই অতিবৃদ্ধ অমনি ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে 'মা, মা' বলিতে বলিতে দাক্ষায়ণীর চরণপ্রান্তে প্রণত হইলেন।"

৪৬

আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা কহিতেছি। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বয়স প্রায় শত বৎসর। সুতরাং কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভকালেই বৃদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। এই শত বৎসরে বাঙ্গালার উপর দিয়া একটা যেন পৌরাণিকযুগের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। ইহার

একটা দশক ও তৎপরবর্ত্তী দশকের মধ্যে যেন সত্য-ত্রেতার ব্যবধান! ইহার মধ্যে কত যে বাস্তব ঘটনা বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহা আমি কেন, বিচক্ষণ প্রত্ন-তত্ত্ববিদেও নির্ণয় করিতে অসমর্থ

বৃদ্ধ সেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের যুগে জন্মিয়াছিলেন। এরূপ বৃদ্ধের জীবন-কাহিনী শুনিতে লোকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জাগিয়া উঠে; আমারও জাগিয়াছিল। আমি দয়াদিদির কাছে সে কাহিনী শুনিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার বাঙ্গালী-রমণীর মনে আমার আগ্রহের শতাংশও জাগে নাই। সে সেই বৃদ্ধের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিল এবং দাক্ষায়ণীও পিতামহীর মর্য্যাদা দৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল বুঝিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ উপযাচক হইয়া তাহাদের কাছে যেটুকু পরিচয় দিয়াছিলেন, একান্ত অবান্তর হইবে না বলিয়া আমি তাহা আপনাদিগকে শুনাইব।

তাঁহার নাম লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই আদিকালে কলিকাতার সন্নিহিত কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'স্বভাব'কুলীন—সেই সেকালের কুলীন। সুতরাং তিনি মাতুলগৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার পিতার বহু বিবাহ ছিল।

দাক্ষায়ণীর পিতৃপিতামহগণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলদিগের কুলগুরু। মাতুলদিগের অনুকরণে উপনয়ন-সংস্কারের অব্যবহিত পরেই তিনি দাক্ষায়ণীর পিতামহের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়াছিলেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

প্রথম উন্নতি বিবাহ। রাজাবাবুর পিতা রঘুনাথ চৌধুরী হিজলিতে কোম্পানীর তরফে নিমকির দেওয়ান ছিলেন। কোম্পানীর এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে দেওয়ানী করিয়া সে সময়ে বহু লোকে সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন। রঘুনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে এক জন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুনাথবাবুর গুরুকন্তাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার জমীদারী সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই এই দেশে তাঁহার বাস।

কার্য্যকুশলতায় রঘুনাথকে তিনি এমন সন্তুষ্ট করিলেন যে, ক্রমে রঘুনাথ তাঁহারই হস্তে জমীদারী-পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া নিজে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই 'দেওয়ান লোকনাথ' বলিয়া দেশমধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি হইল।

রাজাবাবুর যখন বিশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথের মৃত্যু হয়। রাজাবাবুর বিষয়বুদ্ধি বড় প্রখর ছিল না। সুতরাং দেওয়ানজীর উপর সম্পত্তির সমস্ত ভারই সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

অনূ্ন ষাট বৎসর তিনি এই সরকারের দেওয়ানী করিয়াছেন। রাজাবাবুর জীবদ্দশায় তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অবসর লইতে পারেন নাই। এই ষাট বৎসরে জমীদারীর আয় প্রায় দশগুণ বাড়িয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই বিখ্যাত অথচ প্রতিভাশালী দেওয়ানের উপর কথা কহিতে রাজাবাবুরও সাহস ছিল না। রাজাবাবু নামে প্রভু, দেওয়ানই প্রকৃতপক্ষে এ সংসারের কর্ত্তা ছিলেন।

জমীদারীর উন্নতিসাধন করিয়াই দেওয়ানজী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। জমীদারীর উত্তরাধিকারীর অভাব দেখিয়া সেই অভাব পূরণেও তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেওয়ানজীর আদেশেই রাজাবাবু বৃদ্ধবয়সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

দেওয়ানজীর এ চরিত্রের সমর্থন করিতে গিয়া কেন আমি তোমাদের অপ্রীতিভাজন হইব? আমি সেই বৃদ্ধের কথাই তোমাদের শুনাইয়া দিব।

কথা দয়াময়ীর মুখেই শুনিয়াছি। আমি ভাগ্যহীন—নন্দীগ্রামে যাইয়া সে দেবদুর্লভ মূর্ত্তির দর্শন পাই নাই।

শুধু আমি কেন—বাঙ্গালীর কপাল হইতে এ সৌন্দর্য্য দেখার সুখ মুছিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী চল্লিশ বৎসরে বৃদ্ধ হয় এবং পঞ্চাশ অতিক্রম করিতে না করিতেই বৈতরণীর পারে চলিয়া যায়। বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল গড়পড়তায় এখন কুড়ি বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখন পিতৃপুরুষগণ হইতে সকল বিষয়েই অধিকতর উন্নত হইয়াছি। কিন্তু হায়, পিতৃপরম্পরাপ্রাপ্ত দীর্ঘ-জীবনরূপ পুণ্য আমাদের চলিয়া গিয়াছে।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"ব্রাহ্মণের পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের আবাসে আনন্দ যেন এক অভিনব মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর দাক্ষায়ণীর সঙ্গে যখন তাঁহার সম্বন্ধের পরিচয় পাইলাম, তখন কি জানি কেন, আমার মনটা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। নন্দরাণীর সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া আমি ত ঠাকুরমাকে এ দেশে আনি নাই! ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি অচলা ভক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমি যে ব্রাহ্মণকন্তাকে আনিয়াছি! ভগবান্ আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন। অকূলে আজ তিনি আমাকে কূল দিয়াছেন। সে তীর ভূমি যেমন তেমন নয়; চোখ মিলিয়া দেখি, একটা সর্ব্বরত্ন-ভরা ছায়াকীর্ণ বাগান আমাদের প্রাপ্য হইয়াছে!

"সেবার পূর্ব্বে অতিথির পরিচয় লইতে নাই—এ

শাস্ত্র-শাসন তখন প্রায় সকল হিন্দুগৃহস্থের জানা ছিল। অতিথি—বিশেষতঃ বৃদ্ধ অতিথি—আমরা নারায়ণজ্ঞানে সকলে মিলিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিলাম।

"আহারান্তে ব্রাহ্মণ আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলিতে হইবে না, সেই সঙ্গে তাঁহার বাহকগুলির কল্যাণে খুড়ার আধ মণ মাছের তরকারির সুব্যবহার হইল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন—'আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিতেছি। আসিয়া আমার পরিচয় দিতেছি।'

"তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছি! তাঁহার পরিচয় দিবার আভাসের ভিতর কত আশ্বাস যেন নিহিত রহিয়াছে!

"এ ভাব শুধু আমার মনে উদয় হয় নাই; ঠাকুরমার মনে উদয় হইয়াছে, খুড়ামহাশয়ের মনে উদয় হইয়াছে—এমন কি, দাক্ষায়ণীর মনে উদয় হইয়াছে।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই আমার মনে গর্ব্ব হইয়াছিল। তাঁহার সেবাকার্য্যে অপর সকলের সহায়তা করিতে গিয়া আমি একটু অহঙ্কৃতার মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলাম। খুড়ামহাশয় তাহা কোনরূপে জানিতে পারিল। খুড়া অস্ফুটস্বরে আমাকে কি করিতে আদেশ করিয়াছিল। আমি শুনিতে পাই নাই। খুড়া একটু মিষ্ট রহস্যে আমাকে বলিয়াছিল 'কি দয়া, এখন হইতেই গরীবের কথা কাণে-তোলা বন্ধ করিয়া দিলি নাকি?'

"নন্দরাণীর উপর যে ক্রোধ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণের কথার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হইয়াছে। এখন আমি বরং মনে মনে লজ্জিত হইয়াছি।

"সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই—আমি ঘরের সকল স্থানে ধুনা দিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে কথা উঠিল—"কই মা দয়াময়ি!'

"কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র আমার বুঝিতে বাকি রহিল না—কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। ঠাকুরমা বলিলেন—'ছুটিয়া যা, দয়া! অতি যত্নে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া আয়। ব্রাহ্মণ যাতায়াত করিতেছেন, আর আমার বুক কাঁপিতেছে। অতি অভাগী আমি। শেষকালে কি ব্রাহ্মণের অপঘাত দেখিয়া মরিব! ছুটিয়া যা, অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে লইয়া আয়। আমি আসন পাতিয়া রাখিতেছি।'

বাহিরে পা দিতে-না-দিতে ব্রাহ্মণকে দেখিতে-না-দেখিতে তিনি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'এই লও মা, পরিচয় আমি সঙ্গে আনিয়াছি।'

"দূর হইতে দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে ঠাকুর সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিতেছেন। সে দিন কৃষ্ণা একাদশীর নিশা—দিনমানে অল্পক্ষণ মাত্র দশমী ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকারের সূচনা হইয়াছে। কে ঠাকুরের হাত ধরিয়াছিল, দূর হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

"যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহাদের নিকটস্থ হইলাম। তখন দেখিলাম, বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি মা, ললিতা?'

"হাঁ মাসীমা, আমি।"

"তখন দেখি, ব্রাহ্মণের পশ্চাতে, বারান্দা ও পুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত পথ অবলম্বনে—যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—সারি দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীও আছে; বালকও আছে, বৃদ্ধও আছে।

"আমি আর চাহিলাম না, চাহিতে সাহস করিলাম না। অতি উল্লাসের আতঙ্ক আমার বক্ষোদেশ অবরোধ করিল। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া ঠাকুরকে উপরে উঠাইতে ললিতাকে সাহায্য করিলাম। সুতরাং কে আসিয়াছে না আসিয়াছে, আমার সে সময় খুঁটিয়া দেখা ঘটিয়া উঠিল না। মনে মনে বলিলাম—'তাই ত ঠাকুর, এ কি বিচিত্র পরিচয় তুমি কয়টা বিদেশিনী ভিখারিণীকে দিতে আসিয়াছ?'

"একদিকে ললিতা, অপরদিকে আমি—দুই জনে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে বারান্দায় উঠাইলাম। অতি সন্তর্পণে একেবারে ঘরের ভিতরে ঠাকুরমার সম্মুখে লইয়া আসনে বসাইলাম। ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইলে ঠাকুরমা আবার তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ললিতা ঠাকুরমাকে প্রণাম করিল।

"এ দিকে মায়ের দালান লোকে ভরিয়া গেল। প্রথম যখন তাহাদের দেখি, তখন সকলেই নিস্তব্ধ ছিল। এখন তাহাদের ভিতর হইতে দুই চারিজন অস্ফুটস্বরে কথা আরম্ভ করিয়াছে।

"আমি ললিতাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। বলিলেন—'এখনি বসিবে কি? যা ললিতা, আগে তোর মাকে ডাকিয়া আন্।'

"আমি তখন বুঝিলাম, রাজাবাবুর সংসারে এই ব্রাহ্মণের কোন না কোন কারণে একটা বিশেষ রকমের প্রতিষ্ঠা আছে। আর এই প্রতিষ্ঠাই আমাদের ন্যায় বিদেশীর সম্মুখে তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিচয়। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা কিরূপ ও কিসের জন্য, তাহা সে সময় বুঝিতে পারি নাই। এইজন্য জানিয়াও না জানিবার মত—ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার মাও আসিয়াছেন?'

ললিতা বলিল—'শুধু মা ? আমাদের বাড়ীতে যে যেখানে আছে, দেওয়ানজীর বাড়ীতেও যে যেখানে আছে, —প্রায় সবাই আসিয়াছে।'

"ললিতার এক কথাতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় আমার জানা হইয়া গেল। আমি কিন্তু ব্রাহ্মণকে নিজের কোনও পরিচয় দিই নাই। দিনের বেলায় যখন তিনি আমাদের ঘরে অতিথি হইয়াছিলেন—আমার বেশ মনে আছে—তখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে কেহ আমার নাম ধরিয়া ডাকে নাই। অতি সম্ভ্রমের সহিত, এমন কি, একরূপ নীরবেই আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। অথচ গৃহপ্রবেশ মুখে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি চুপি চুপি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ ললিতা, তোরা কি ঠাকুরকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছিস ?'

"ললিতা বলিল—'মা বলিয়াছে।'

'তোমার মা কোথায় ?'

'মাও আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জায় তোমার কাছে আসিতে পারিতেছে না।'

আমি নন্দরাণীকে আনিবার জন্ত বাহিরে যাইতে-ছিলাম। দেওয়ানজী বাধা দিলেন। বলিলেন—'তুমি কি জন্ত যাইবে দয়াময়ি ? যাহাদের কাজ, তাহারা করুক। তুমি আমার মাকে লইয়া আইস। মাকে দেখিতেছি না কেন ?'

"আমি জানিতাম, দাক্ষায়ণী কি করিতেছে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যা করে নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছে। সে আপনি না উঠিলে এ যাবৎ আমি এক দিনও তার ধ্যানে বাধা দিই নাই। আমি ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিলাম।

"ঠাকুরমা বলিলেন—'আড়াল হইতে দেখিয়া আয়। এতক্ষণে বোধ হয়, তার ঠাকুরপূজা শেষ হইয়াছে।'

"ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ঠাকুর ?'

"'সে একটি নারায়ণ আনিয়াছে। ছ'বেলাই সে তার অর্চনা করে।'

"'স্ত্রীলোকে শালগ্রাম শিলা পূজা করে ?'—বিস্ময়ের সহিত দেওয়ানজী ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করিলেন।

"তাঁহার উত্তর শুনিবার আর সময় হইল না। ঠাকুরমা উত্তর দিতে না দিতে নন্দরাণী আসিয়া পড়িল। দেখিলাম, সে অবগুণ্ঠনবতী। আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। সে আসিয়াই ঠাকুরমার চরণপ্রান্তে মাথা দিয়া পড়িল। আমি দাক্ষায়ণীকে দেখিতে চলিলাম।

"ঠাকুরমার ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট কুঠারীর মত ঘর ছিল। দাক্ষায়ণী সেইটিকেই তার ঠাকুর-ঘর করিয়া লইয়াছিল। আমি সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে পূজা সাঙ্গ করিয়া ঠাকুরটিকে আবার পুঁটুলির ভিতর পুরিতেছে। আমি তাহাকে ব্রাহ্মণের পুনরাগমন সংবাদ শুনাইয়া বলিলাম—'সত্বর উঠিয়া আইস। তিনি তোমাকে খুঁজিতেছেন।'

"দাক্ষায়ণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় মাঝের দালানে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা মৃদু কোলাহল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানজীর ধমকে অমনি সকলেই নিস্তব্ধ।

"সে গুরুগম্ভীর স্বর শুনিয়া আমিও চমকিয়া উঠি-লাম। তাঁহার এক ধমকেই তাঁহার পূর্ণপরিচয় পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি দেওয়ান বটে।

"আমি দাক্ষায়ণীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরমার ঘরে আবার প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি, ঠাকুর-মা, নন্দরাণী, ললিতা—তিনজনেই মাঝের দালানে চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ একাকী মাথাটি হেঁট করিয়া আসনের উপর বসিয়া আছেন।

"দাক্ষায়ণী একেবারেই তাঁহার সম্মুখে যাইয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। তিনি আমাদের গৃহপ্রবেশ দেখিতে পান নাই; প্রণামকালে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বৃশ্চিকদষ্টের মত যেন শিহরিয়া উঠিলেন। দাক্ষা-য়ণীকে প্রতিপ্রণাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—'কি করিলে মা! আমি যে তোমাদের দাস।'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'কেন, ঠাকুরমা যে আপনাকে প্রণাম করেন।'

"তাঁর কাছে আমি নমস্ত হইতে পারি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ত আমার সে সম্পর্ক নয়। তুমি বেটী যে আমার ইষ্টের মূর্ত্তি। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদী ফুল কি কেহ পায়ের কাছে পড়িতে দেয় ?'

"দাক্ষায়ণী এ কথার উত্তর না দিয়া বলিল—'বাবার মুখে আপনার কথা শুনিয়াছিলাম। এ নন্দীগ্রামের কথাও তিনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন। আপনার নাম শুনিতেই বুঝিয়াছিলাম, সেই আপনি।'

"ঠাকুরপুত্রের মুখে যখন আমার কথা, নন্দীগ্রামের কথা শুনিয়াছিলে, তখন এখানে আসিয়া আমার তত্ত্ব লও নাই কেন ?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগি-লেন—'বোধ হয় মনে করিয়াছিলে বুড়া মরিয়াছে। গুরু পুত্রের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা। তখন তিনি যুবা। আমি কিন্তু সে সময় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। তুমি আমার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলে—কেমন ?'

"দাক্ষায়ণী বলিল—'না।'

"আমি বাঁচিয়া আছি, তুমি জানিতে ?'

"বাবার মুখে শুনিয়াছি।'

"তাও শুনিয়াছ ?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তা হইলে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাও শুনিয়াছ ?'

'শুনিয়াছি। বাবা বলিয়াছেন, আপনার দেহরক্ষার সময়ে তাঁহাকে দেখা দিতে হইবে।'

'তা'হলে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন আমার ভাগ্যে আছে।'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিতে আর একবার জেদ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুধু তাঁর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

'বলিস্ আর না বলিস—মা, তুই সত্যব্রতের কন্যা—তোর নিশ্চল চক্ষুতারকাই আমাকে উত্তর দিয়াছে। আমি ভাগ্যবান্ তোর সম্মুখে মরিলেও ইষ্টদর্শন করিতে করিতে আমার মরা হইবে। এখন বুঝিলাম, কাশী গঙ্গায় ভাসিয়া নন্দীগ্রামে আসিয়া লাগিয়াছে।'

"ব্রাহ্মণ এইবার দাক্ষায়ণীর নন্দীগ্রামে আগমনের নানা আধ্যাত্মিক কারণ নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দাক্ষায়ণী বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। আমি সে সকল কথার মধ্যে কেবল এইটিই বুঝিলাম, দেওয়ানজীর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়াই যেন অন্তর্যামী গুরু সত্যরক্ষার্থ তাঁহার কন্যারূপিণী ইষ্টমূর্ত্তিকে নন্দীগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন।

"ইহার পরেই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর ঠাকুরপূজার কথা তুলিলেন। বলিলেন—'শুনিলাম, তুমি নাকি মা শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের অর্চ্চনা কর ?'

"দাক্ষায়ণী কোন উত্তর না করিয়া, প্রথমে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বিস্ময়বিমুগ্ধের মত তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলাম। তাহার মধ্যে অনেক কথা আমার না শুনাই কর্ত্তব্য ছিল। দাক্ষায়ণীর দৃষ্টি যেই চোখে পড়িল, অমনি আমার চমক ভাঙিল।

"দেওয়ানজীও তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—'বাহিরের কেহ এখন যাহাতে এখানে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য মা, বাহিরে গিয়া তোমাকে একটু প্রহরীর কার্য্য করিতে হইবে। যদি—রাণীও আসিতে চান, তাঁহাকেও নিষেধ করিবে।'

"তাঁহার আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। আমারও সেখানে থাকা কর্ত্তব্য নয় বুঝিয়া তাঁহার আদেশমাত্র সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

'মাঝে দালানে পা দিয়াই যা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেই প্রশস্ত দালান একেবারে রমণীমণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরের বারান্দার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। সেখানে দ্বার অবরোধ করিয়া পুরুষেরা দাঁড়াইয়া আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত লোকসমাগম, অথচ ঘরের ভিতর হইতে তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা জানিতে পারি নাই। যে সামান্যমাত্র কথোপকথনের শব্দ আমি শুনিয়াছিলাম, দেওয়ানজীর এক হুঙ্কারেই তাহা নিস্তব্ধ হইয়াছে।

"দালানের ভিতরে ইতিমধ্যে একটা গালিচা পাতা হইয়াছে। সে স্থানের জন্য নিত্য যে আলোর বন্দোবস্ত ছিল, তাহা ছাড়া আরও দুই তিনটা আলো দালানের কোণে কোণে বসান হইয়াছে। বাহিরেও আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা ভিতর হইতে এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই, নিঃশব্দে কখন এ কাজ হইয়া গিয়াছে।

"সকলেই একরূপ নিস্তব্ধ। মধ্যস্থলে ঠাকুরমা ও নন্দরাণী। তাঁহাদের ঘেরিয়া মহিলামণ্ডলী বসিয়াছে। তাঁহারা উভয়েও নিস্তব্ধ। এতক্ষণ এরূপ নীরবে স্ত্রীলোকদের বসিয়া থাকিতে আমি আর কখন দেখি নাই।

"এই সকল দেখিয়া দেওয়ানজীর শাসন-শক্তিকে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নন্দরাণী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। দেখিয়া বুঝিলাম, তাহারা সকলে দেওয়ানজীর পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমি আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘরের দ্বার অবরোধ করিয়া বসিলাম। আমার উপস্থিতি একমাত্র ললিতা ছাড়া, ঘরের অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। অথবা দেখিয়াও দেখিল না।

বেশীক্ষণ আমাকে বসিতে হইল না। দেওয়ানজীর পরিবারসম্বন্ধে এক আধটা কথা ললিতার কাছে জানিবার জন্য চুপি চুপি যেই তাঁহাকে বলিতে যাইতেছি, অমনি পিছন দিক্ হইতে দেওয়ানজী দাক্ষায়ণীকে লইয়া দালানের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

"প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণ বহির্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া কাকে ডাকিলেন—'চন্দ্রনাথ!' বাহির হইতে সসম্ভ্রমে উত্তর উঠিল এবং এক জন প্রৌঢ় গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা মৃদু চমক-চাঞ্চল্য যেন একদিক্ হইতে অপরদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বহিয়া গেল।

"ব্রাহ্মণ বহিঃস্থ পুরুষটিকে বলিলেন—'এই তোমার কুলের ইষ্টদেবী। পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া ইহাকে দর্শন কর।'

এই বলিয়াই তিনি ললিতাকে একটা আলো লইয়া দাক্ষায়ণীর মুখের কাছে ধরিতে বলিলেন। ললিতা আদেশমতে কার্য্য করিল। আলোক-প্রতিফলিত সে

অপূর্ব্ব মুখ-সৌন্দর্য্য মহিলামণ্ডলীর দৃষ্টি অবলম্বনে যেন তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাসে ঘরটা ভরিয়া গেল।

"ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া, যে যার নিজ স্থান হইতে দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করিতে বলিলেন।

"চারিদিক্ হইতে প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল। বালক, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা—এক ঠাকুরমা ছাড়া যে যেখানে ছিল, সকলেই দাক্ষায়ণীর সম্মুখে মস্তক ভূমি-সংলগ্ন করিল। আমিই বা বাকি থাকি কেন? আমিও সেই পার্ব্বতী-প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণে উমারাণীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

"বাহিরে পুরুষেরাও নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করিল। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বসমক্ষে দাক্ষায়ণীকে আর একবার প্রণাম করিলেন। ললিতাও আমার হাতে আলো দিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গেই মস্তক ভূমি-সংলগ্ন করিল।

"এইবারে পরিচয়ের পালা পড়িল। দেওয়ানজীর বৃদ্ধ পুত্র, প্রৌঢ় পৌত্র, যুবা প্রপৌত্র ও প্রপৌত্র-বধূর ক্রোড়স্থ শিশু-প্রপৌত্র-পুত্র আজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এ দিকে পুত্রবধূ, পৌত্রী, প্রপৌত্রী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বামী—যে যার আয়তি ও দীর্ঘায়ু লইয়া ব্রাহ্মণের পুণ্যের সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে।

"অপর দিকে নন্দরাণীর সংসার- তাহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, তাহার সংসারে প্রতিপালিত আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল, দেওয়ানজী আজ সকলকে ধরিয়া আনিয়াছেন।

"সেই সকল একত্র করিয়া ঠাকুরমার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—'মা এই সমস্ত তোমার। আজ সকলকে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে তোমার সংসারের অঙ্গীভূত করিয়া লও।'

ঠাকুরমা মূর্চ্ছিতপ্রায় ও পতনোন্মুখী হইলেন। নন্দরাণী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—'নাই কেবল তোমার পুত্রবধূ। ব্রাহ্মণী একটিমাত্র পুত্র আমাকে দান করিয়া প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছেন। পুত্রের বয়স তখন সবেমাত্র ছয় মাস। মা, আজ এই পূর্ণানন্দে কেবল তোমার পুত্রবধূর অভাব অনুভব করিয়া মলিন হইতেছি। তা' তোমার পুত্রবধূর ভাগ্য দুইদিকেই নাই। আমি কুলীন। বহু-বিবাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু করি নাই। গুরুদেবকে পুত্রের কোষ্ঠি দেখাইয়াছিলাম। দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এই এক পুত্রেই আমার বংশরক্ষা হইবে।'

"বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ। গুরুবাক্য আমি বেদ-বাক্য মনে করিতাম।, তাঁহার মুখে কোষ্ঠির ফল শুনিয়া আর বিবাহ করি নাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমি পাঁচ পুরুষ লইয়া জীবন উপভোগ করিতেছি। আমার নাতির নাতি হইয়াছে। স্বর্গে বাতী জ্বলিয়াছে।

"এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ নন্দরাণীকে সম্বোধন করিলেন—'রাণী, পুত্র-কন্যা-জামাতা লইয়া এইবারে একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও।'

"পিতামহী ইতিমধ্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। তিনি নন্দরাণীকে বলিলেন,—'যাও মা, নারায়ণের আদেশ পালন কর।'

"স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অল্পবয়স্কারা ভিতরের বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। সকলে থাকিলে সেখানে ব্রজমোহন ও হরেন্দ্রের দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান থাকিত না। হরেন্দ্রের হাত ধরিয়া ব্রজমোহন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"পুত্র কন্যা ও জামাতাকে সঙ্গে লইয়া নন্দরাণী সাষ্টাঙ্গে দেওয়ানজীর পাদমূলে প্রণতা হইল।

"তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্রাহ্মণ আবার বলিতে লাগিলেন—'হাঁ মা! যে দিন তিন বৎসরের ললিতাকে কোলে করিয়া তোমার স্বামী, আর ছয়মাসের হরেন্দ্রকে কোলে লইয়া আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে দিন কি তোমার মনে আছে?'

"নন্দরাণী অবনত-মস্তকে মৃদুস্বরে বলিল,—'সে দিন ইহজন্মে ভুলিব না।'

"তোমার স্বামী কি বলিয়াছিলেন, স্মরণ আছে?'

'আপনার ঋণ শোধ হইবে না।'

'তোমাদের এ ঐশ্বর্য্য-লোভে চারিদিক্ হইতে 'পরমাত্মীয়' এই নন্দীগ্রামে জড় হইয়াছিল। আমি সে সকল শকুনি-গৃধিনীর লালসা পূর্ণ হইতে দিই নাই। আমি জীবিত থাকিতে এ পুণ্যের সংসারে ভূতপ্রেতের নৃত্য হইবে? মা, আমি তাহা কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারি নাই। আমি নিজে ঘর-ঘর অনুসন্ধান করিয়া এ গৃহের লক্ষ্মী আনিয়াছি।'

"অশ্রুপূর্ণ নয়নে নন্দরাণী বলিল,—'আমি যে বাবা, আপনার কন্যা।'

'হাঁ! আমার কন্যার স্থান পূরণ করিতেই তোমাকে আনিয়াছিলাম। তা সে অভাব আমার পূর্ণ হইয়াছে। তোমাকে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি দৌহিত্র-দৌহিত্রী পাইয়াছি। আমার নিজের দেশ হইতে ব্রজমোহনকে ধরিয়া আনিয়াছি। তোমাকে ও তোমার পুত্রকন্যা জামাতাকে লইয়া আমার পূর্ণ সংসার। এই অভাব মোচন

করিতে আমাকে দেশবাসীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তবু আমি টলি নাই। কেন টলি নাই জান ?'

"নন্দরাণী এ কথার কোন উত্তর দিল না। আমরা সকলেই তাঁহার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

"দেওয়ানজী বলিতে লাগিলেন—'এইবারে বলিবার সময় আসিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে দ্রাবিড় হইতে বেদ-বেদান্ত সঙ্গে করিয়া আমার ব্যাসতুল্য গুরুপুত্র গৃহে ফিরিবার মুখে আমার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে আমি দেখি নাই। সুন্দর দেবমূর্ত্তি যুবাপুরুষ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমার অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনি উঠিয়াছিল যে, আমার ইষ্ট নবকলেবর ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।'

"'আমাকে পরিচয় দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচয় দিলেন। শেষে বলিলেন, 'পিতৃনির্দ্দেশে তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।'

"তাঁহার সেবান্তে রাজাবাবুর বংশরক্ষার্থ আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি তোমার স্বামীর ঠিকুজি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'তাঁহার পুত্র-যোগ আছে।'—এইবারে বুঝিতে পারিতেছ কি মা ?'

"নন্দরাণী বলিল,—'তাঁহার আশীর্ব্বাদেই বংশরক্ষা হইয়াছে।'

"হাঁ, আমি তাঁর চরণ দুটি জড়াইয়া ধরি। অনুনয়ে প্রীত নারায়ণ আমার কামনা-পূরণের আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন,—'লোকনাথ! তোমার এই অসামান্য প্রভুভক্তি হইতেই সুফল ফলিবে। রাজাবাবুর সন্তান হইবে। তুমি তাঁহার জন্য লক্ষণযুক্তা পাত্রীর অন্বেষণ করিতে পার।'

"এই আমার গূহ্য ইতিহাস।—মা! গুরু শুধু আশীর্ব্বাদ করেন নাই। আজ তোমার কাছে তোমার পুণ্যের সাক্ষী পাঠাইয়াছেন।'

"নন্দরাণী আবার একবার ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হইল।

"এইবারে ব্রাহ্মণ হরেন্দ্রনারায়ণকে সম্বোধন করিলেন। সে কি গুরুগম্ভীর স্বর। সমস্ত ঘরটা তিন চারিবার কাঁপিয়াও যেন নিরস্ত হইল না। আমরা সকলেই বুঝি সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিলাম। 'হরেন্দ্র নারায়ণ!' বালক করজোড়ে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বলিলেন—'রাজাবাবুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার তোমার সময় আসিয়াছে।'—'কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।' আমার গুরু দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া এক 'বাবু' তাঁহার বড়ই অপমান করিয়াছে। তিনি হাকিম। যেখানে পাও, যে অবস্থায় পাও, তাহার পুত্রকে যদি তুলিয়া আনিতে পার—'

"হরেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইতে দিল না, বলিল—'যথা আজ্ঞা। আনিতে চলিলাম।' বালক বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, চক্ষের নিমেষে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

৪৭

আমার বক্তব্য, এইবারে শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বারো বৎসরের আ।ম, এই আখ্যায়িকার নায়ক। দশ বৎসরের বালিকা নায়িকা। বৃদ্ধকালে, বাংলার এই নব সভ্যতার যুগের 'আমি' ইহার কথক। এ যুগের উপন্যাসের যাহা মজ্জা, সেই নায়ক-নায়িকার যৌবন সম্পদ ইহাতে নাই। নাই ইহাতে যুবজনসুলভ বিভ্রান্ত প্রেমের ব্যাকুলতার তরঙ্গ। নির্ব্বাত-প্রদেশের নবখনিতা সরসীবক্ষে সুনিদ্রিত বারিপ্রান্তরবৎ ইহা শান্ত—নিস্তব্ধ। ইহার উপরে জলজ কুসুমলতার পত্রচিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। সাধারণ দ্রষ্টার চোখে এ দৃশ্য ত প্রাণহীন! আজিও পর্য্যন্ত শারদ চন্দ্রমার—মধুর কৌমুদীর আবর্ত্ত লইয়া—ইহার বক্ষে লীলা করিবার অবসর হয় নাই। যে প্রেমের মাধুর্য্য আমি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তাহা অপরকে শুনাইয়া কি প্রীতিদান করিব? তথাপি কেন বলিতেছি? বিবাহে যৌননির্ব্বাচন-সমর্থনের যুগে একটা বাল্যবিবাহের কথা লইয়া এতটা বাগাড়ম্বর কেন? সে অন্ধকারময় যুগ ত বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে! সংস্কারকের উচ্চ চীৎকারেও যে কার্য্য সাধিত হয় নাই, বরকর্ত্তার কৃপায় তাহা ত অনেকদিন পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সমস্ত গৌরব এখন 'কিশোরী' কন্যার পিতৃদত্ত একটি থলিয়ার ভিতরে আবদ্ধ। অন্তনিবদ্ধ কুসুমরাশির সৌরভে এখন সমস্ত বঙ্গভূমি আমোদিত। কৈফিয়ত দিবার কিছুই নাই। তবে সুখের কথা, অনাদিকাল হইতে এইরূপ কতকগুলা 'কেন' যুগান্ত বহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। আজিও পর্য্যন্ত তাহাদের যোগ্য উত্তর মিলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজবাড়ীর তোরনমুখে যেই আমার শিবিকা প্রবেশ করিল, অমনি অগণ্য বাদ্যভাণ্ড গগনভেদী আরাবে আমাকে আহ্বান করিল। ইহার পরেই আমি বহু-ভৃত্য-কর্ম্মচারি-বেষ্টিত রাজপুত্রের অভ্যর্থনা পাইলাম। রাণীর কোলে উঠিলাম। তৎপরে বহু রমণীর হুলুধ্বনির আবরণে সধবা ব্রাহ্মণ-মহিলামণ্ডলীপরিবৃত হইয়া আমি পিতামহীর সমীপে নীত হইলাম।

যে বাড়ীতে আমরা প্রবেশ করিলাম, সেটা ব্রজমোহন বাবুর বাসের জন্য স্বল্প দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে।

এখনও তিনি এখানে পরিবার লইয়া প্রবেশ করেন নাই। দয়াদিদির অনুপস্থিতিতে পিতামহী ও দাক্ষায়ণীকে এই গৃহেই আনা হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অন্যের অব্যবহৃত এই সুন্দর অট্টালিকাতেই আমার পুনর্ব্বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনর্ব্বিবাহ বলিতেছি কেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হুগলীর বকুলতলের সেই বিবাহ-কথা আমার পিতামহীর কর্ণে বরাবরই কেমন একটা আষাঢ়ে গল্পের মত লাগিতেছিল। তিনি সমস্ত ঘটনা দয়াদিদির মুখে শুনিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের উপর তাঁহার বলবতী শ্রদ্ধা থাকিলেও, আমার বিবাহটাকে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া বুঝিতে তাঁহার মনে কেমন একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইত। শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিষয়ে স্ত্রী-আচার বলিয়া কতকগুলা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে। আমার বিবাহে সেগুলার একটারও ত অনুষ্ঠান হয় নাই। আলিপনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া, বরণডালা সাজাইয়া, সধবাদিগের বরবধূকে বরণ করা হয় নাই। তার পর এ বিবাহে না হইয়াছে বাসর-জাগরণ, না হইয়াছে শুভলগ্নে ফুলশয্যায় বরবধূর মিলন। এ সকল মাঙ্গল্য কর্ম্মের যখন একটাও হয় নাই, তখন মহিলাদিগের চোখে এ বিবাহ-সংস্কার যে পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত। এই জন্য নন্দীগ্রামে আমার উপস্থিতির পূর্ব্বে পিতামহীর ইচ্ছায়, রাণী এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার দ্বারপণ্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দানকার্য্য অশাস্ত্রীয় বলিতে সাহসী হন নাই। তবে স্ত্রী-আচারগুলি সম্পূর্ণ করিতে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না।

পিতামহীর সহিত সাক্ষাতের কথা বলিয়া আর সময় অতিবাহিত করিব না। সেই রাত্রিতেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার মিলন ঘটিল। ইহাকে পুনর্ম্মিলন বলিতে পারিলাম না। কেন না, ইহার পূর্ব্বে যে দুইবার তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা কোনও ক্রমে মিলনপদবাচ্য নহে। এই আমাদের প্রথম মিলন। বিবাহের উৎসাবান্তে এই আমরা সর্ব্বপ্রথম উভয়ে উভয়ের পার্শ্বে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। উভয়ে উভয়ের মুখ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু কই উভয়ের এই প্রকৃত প্রথম-দর্শনে আমাদের মধ্যে কেহই ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না! দাক্ষায়ণী আমার মুখের পানে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সে নীরব অশ্রুবর্ষণ আমি ভিন্ন আর কেহ কি দেখিতে পাইল না? তবে তাহারা আমাদিগকে পরস্পরের পার্শ্বগত দেখিয়া উল্লাসে এত শঙ্খধ্বনি করিল কেন? পিতামহীও কি দেখিতে পাইলেন না? তবে তিনি আমাদিগের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না করিয়া নন্দরাণীকে এত আশীর্ব্বাদ করিল কেন? বনভোজনের দিবসে যে ক্ষুদ্র বালিকাকে আমি সঙ্করণশীল পুষ্পগুচ্ছের মত দেখিয়াছি, এ দাক্ষায়ণী ত সে দাক্ষায়ণী নয়! দাক্ষায়ণীর অশ্রুসিক্ত চক্ষু হইতে কেমন একটা দীপ্তি বাহির হইতেছিল। প্রতি অশ্রুবিন্দুতে খণ্ডিত হইয়া সে দীপ্তি যেন এক-একটি সূচীর আকারে আমার চক্ষুতারকা বিদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল। হায়, তখন ত বুঝি নাই, ভূত-ভবিষ্যতের সঞ্চিত ও সঞ্চনীয় তীব্র অভিমান এক-একটি অশ্রুবিন্দুতে নিবদ্ধ হইয়া, আমাকে দেখিয়াই আত্মহত্যার জন্য যেন বালিকার গণ্ডে আছাড় খাইতেছে! সে মুখ কিছুক্ষণের জন্য দেখিলে বুঝি বালিকার মুখে হাসি আসিত। কিন্তু আমি শিহরিলাম। কি যেন একটা মর্ম্মজড়ানো ভয় আমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া দিল।

আমাকে দেখিবার জন্য সেখানে বহু স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা সকলে আগ্রহের সহিত বর-বধূর মিলন নিরীক্ষণ করিতেছিল। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে স্বাভাবিকী লজ্জাবশে বধূই সর্ব্বাগ্রে নয়ন নিমীলিত করে। এ ক্ষেত্রে কার্য্য বিপরীত হইল দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

৪৮

ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরিয়া আমার এই অভিনব বিবাহের উৎসব চলিল। মূল্যবান্ পট্টবস্ত্রে ও রত্নালঙ্কারে আমাদিগের উভয়কে সাজাইয়া—রামলীলায় বালক-বালিকার উপরে রামসীতার আরোপ করিয়া, ভক্তজন যেরূপ অর্চ্চনা করে,—লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বাসে ইহারা আমাদের সেইরূপ অর্চ্চনা করিল! দুই বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীকে যেরূপটি দেখিয়াছিলাম, এখন সে তাহা হইতে অনেক বড় হইয়াছে। আমি কিন্তু সেইরূপই আছি। বরং হুগলীতে অবস্থান-কালীন আমার অসুখের জন্য আমি এখন অপেক্ষাকৃত কৃশ হইয়াছি। দাক্ষায়ণী মাথায় আমার সমান দাঁড়াইয়াছে। উচ্চতার সম্বন্ধ লইয়া বাসরগৃহে মহিলামণ্ডলী অনেক কৌতুককথার অবতারণা করিয়াছিলেন। বর বড় না ক'নে বড়? তাঁহাদিগের বিচারে লক্ষ্মীই "নারায়ণ" অপেক্ষা উচ্চতার অধিকার লাভ করিয়াছিল।

শুধু আমাদের পূজা করিয়া রাণী ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র নারায়ণের পূজা-উপচারাদিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাকে যে

উপায়ে আনা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও উৎসাহের হানি হয় নাই। পিতামহী নিজে কতকটা নিরুৎসাহ হইলেও রাণীর উৎসাহে বাধা দেন নাই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্রোতে একরূপ গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। দয়াদিদির উল্লাস বিষাদ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মায়ের কোল হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; এই জন্য দিদি সর্ব্বক্ষণ আমাকে সুখী রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিল। কিসে আমার স্বাস্থ্য বজায় থাকে, এই জন্য মায়ের হৃদয় লইয়া দেবী সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়ের ব্যাকুল স্নেহ দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। রমণীগণের উৎসাহে, দিদির স্নেহে ও পিতামহীর অস্তিত্বে আমার মানসিক উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হইলেও, ভয়টা একেবারে বিদূরিত হয় নাই। এত উল্লাসের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া আমার গা'টা কেমন ছম্‌ছম্ করিত। দয়া-দিদি তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া দুই একবার নির্জ্জনে সে সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি উত্তর দিতে পারি নাই।

ভয়—কিসের ভয়? এ কয়দিনের মধ্যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাক্ষায়ণীর সহিত একান্তে বসিতে পারি নাই। ফুলশয্যার পূর্ব্বে নবোঢ়া বধূর সহিত স্বামীর একান্তে অবস্থান আচারবিরুদ্ধ। এ কয়দিন আমি রাত্রিকালে দিদির কাছেই শয়ন করিয়াছি। দাক্ষায়ণীর সহিত এ পর্য্যন্ত আমার একটিও কথা হয় নাই। দিবসের অধিকাংশ সময় সে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করে, আমি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বালকগণ-পরিবৃত হইয়া রাজবাড়ীর নানাস্থানে বিচরণ করি। পিতামহী কিংবা দিদি অথবা অন্য কেহ আমার কাছে দাক্ষায়ণী-সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করে নাই। উত্থাপন করিবার কথাই বা কি ছিল? বালক বর, বালিকা ক'নে—পুতুলখেলার মত একটা কৌতুককর ঘটনা। সকলে আমোদ লইয়াই ব্যস্ত। আমাদের তখনকার পরস্পরাশ্রয়ভাববন্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার তাহাদের কাহারও অবসর ছিল না!

তবে বাড়ীর ভিতরে যাতায়াতের সময়ে মাঝে মাঝে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রতিবারেই সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হইয়াছিল, নির্নিমেষনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া, আমার সমস্ত রূপটা যেন নিঙড়াইয়া, ছাঁকিয়া, পিপাসিতা দাক্ষায়ণী চক্ষু দিয়া আমাকে পান করিতেছে। দেখিবামাত্র একটা মৃদু শিহরণ আমার হৃদয়ের সঙ্গে কি যেন একটু ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া যাইত। বালিকার সঙ্গে আমার পরবর্ত্তী কালের জীবনের সম্বন্ধ কি সেই ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতেছিল?

এই তিন দিবসে বিবাহের যেগুলা লৌকিক অনুষ্ঠান, তাহা একরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বাকী ছিল শুধু 'ফুলশয্যা'। চতুর্থ রাত্রিতে তাহাও নিষ্পন্ন হইত, কেবল হরেন্দ্রনারায়ণের জন্য তাহা হইয়া উঠিল না।

এই কয়দিনে হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আমি সুপরিচিত হইয়াছি। নন্দীগ্রামে অনেক প্রিয় সঙ্গের মধ্যে তাহারই সঙ্গ আমার সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় হইয়াছে। এরূপ শিষ্ট ও প্রিয়দর্শন বালক আমি এ বয়স পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। যখন তাহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তাহার বয়স উনিশ বৎসর। এই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিমুখে কৈশোর এখনও তাহার অধিকার অল্পই পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ণ অনতি-উজ্জ্বল শ্যাম। দেখিতে অনেকটা ললিতারই মত। পুরুষের বেশ এবং গোঁফের ঈষৎ চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলে তাহাকে আমার ললিতা বলিয়াই ভ্রম হইত। কণ্ঠস্বর ললি-তারই মত, মুখের স্মিত-বিকাশ ললিতারই মত, উচ্চহাস্য ললিতার হাসির সঙ্গে একসুরে বিধাতা যেন বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বালকই সিংহবিক্রমে আমার শক্তিমান্ হাকিম পিতার কাছ হইতে আমাকে তুলিয়া আনিয়াছে। সে রাত্রিতে সে কিন্তু আমাকে দেখা দেয় নাই।

তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, প্রথম আলাপেই তাহার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে আমার অপেক্ষা সাত বৎসরের বড় হইলেও আমরা উভয়েই একশ্রেণীর পড়া পড়িতাম। সুতরাং অতি সহ-জেই আমাদের উভয়ের মধ্যে সখ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, রাণী যদি দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলনের জন্য আগ্রহ না দেখাইয়া, তাহার পুত্রের সহিত আমার ভালবাসার বন্ধন দৃঢ়তর করিতে সাহায্য করিত, তাহা হইলে আমি বোধহয়, অধিক সুখী হইতাম।

পূর্ব্বের কোনও ব্যবহৃত পালঙ্কে আমাকে শুইতে দিবে না বলিয়া, হরেন্দ্র আমার ফুলশয্যার জন্য একটি হস্তিদন্তখচিত পালঙ্ক নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও কারুকরেরা চারিদিনের ভিতরে তাহা তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রধানতঃ এই কারণ। এতদ্ভিন্ন আর একটা কারণ ফুলশয্যায় বরবধূ-মিলনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রজমোহন ও গণেশ-খুড়া পিতাকে আনিতে গিয়াছে, তাহারা আজিও ফিরে নাই। চতুর্থ দিবসের প্রারম্ভেই

ব্রজমোহন বাবুর নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে জানা গেল, তিনি আমার পিতা ও মাতাকে সঙ্গে লইয়া দুই-একদিনের মধ্যেই নন্দীগ্রামে আসিতেছেন। পিতার ছুটী ফুরাইয়াছে, সুতরাং আবার কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে ছুটী লইতে হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের আগমন অপেক্ষায় রাণী উৎসবের এই শেষাংশটুকু বাকি রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ দিবস আমি একরূপ হরেন্দ্রের সঙ্গেই অতিবাহিত করিলাম। সারা নন্দীগ্রাম ও তাহার উপকণ্ঠের নানাস্থান তাহার সঙ্গে পরিভ্রমণ করিলাম। পঞ্চম দিবসের প্রভাতে সংবাদ আসিল, পিতা ও মাতা 'জামাই' বাবুর সঙ্গে তমলুকে পৌঁছিয়াছেন। আহার ও কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণের পর সেইদিনেই তাঁহারা তমলুক পরিত্যাগ করিবেন। সেই দিনটি শুভকার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত জানিয়া, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেমন করিয়াই হউক, তাঁহারা গ্রামে পৌঁছিতে পারিবেন ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া, সেই দিনেই নন্দরাণী 'ফুলশয্যা' উৎসবের আদেশ দিলেন। সমস্ত দিনটা বেশ নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু সন্ধ্যা আসিতে-না-আসিতে ঝড়ের সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। মাস শ্রাবণ। কিন্তু বর্ষা এ বৎসর আসিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই সে যেন আমার ফুলশয্যা দেখার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। আজ উৎসবের দিনে সে দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলন দেখিতে আসিল।

যতক্ষণ পারিলেন, রাণী তাঁহার জামাতা ও আমার পিতামাতার আগমনের অপেক্ষা করিলেন। আটটা, নয়টা, দশটা বাজিয়া গেল; ইঁহারা কেহই আসিলেন না; কোনও একটা লোক দিয়াও সংবাদ পাঠাইলেন না। অগত্যা তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া রাণী আমাদের শয্যা-মিলনের ব্যবস্থা করিলেন।

যেমন বড় ঘর, তেমনি তাহা অপূর্ব্বরূপে সাজানো। নন্দীগ্রামে আসিয়া ইহার পূর্ব্বে যদি আমি রাজবাড়ীর নাচঘর ও হরেন্দ্রনারায়ণের শয়নঘর না দেখিতাম, তাহা হইলে বলিতাম, এমন ঘর ও তাহার ভিতরের এত বড় পালঙ্ক আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি কেন, আমার পূর্ব্বে আমাদের চাল-কলা-বাঁধা বামুনের ঘরের কেহ কখনও এরূপ ঘর দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘরের মেজে মার্ব্বেল-পাথর দিয়া বাঁধানো। দেওয়াল নানাবর্ণের চিত্রে শোভিত। ঘরের ভিতরে পাঁচটি ঝাড় ঝুলিতেছিল;—চারিটি চারি কোণে, একটি মধ্যে। মধ্যেরটি অপর চারিটি হইতে অনেক বড়। সকলগুলিতেই বাতির আলো দেওয়া হইয়াছিল। নানাবর্ণের লণ্ঠনের মধ্য দিয়া সেগুলি সমস্ত ঘরটিকে এক অপূর্ব্ব মিশ্রবর্ণের আলোকে পূর্ণ করিয়াছিল।

সেই সুন্দর সজ্জিত ঘর আজ আবার নানাবর্ণের ফুলে অপূর্ব্বরূপে সজ্জিত হইয়াছে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি ফুল—কেবল ফুল। ফুলের মালা, ফুলের গাছ, ফুলের লতা, ফুলের স্তবক, ফুলের আসন—ফুল ফুলকে মাথায় করিয়াছে, ফুল ফুলকে বাহুপাশে জড়াইয়াছে। পুষ্পরচিত নানাবিধ পশুপক্ষী আগ্রহের সহিত যেন আজ আমার এই পুষ্পনন্দনে প্রবেশের অপেক্ষা করিতেছিল। অসংখ্য মহিলাপরিবৃত হইয়া নানা রত্নালঙ্কারে ও পুষ্পহারে সজ্জিত আমি সেই গৃহমধ্যে নীত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পালঙ্কও প্রকাণ্ড। রাণী আমাকে কোলে লইয়া তিনটি বনাতে মোড়া কাঠের সিঁড়ি বহিয়া সেই পালঙ্কের উপর বসাইয়া দিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই ঠিক আমারই মত করিয়া, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া, কতকগুলি বালিকা ও কিশোরী দাক্ষায়ণীকে সেই ঘরে লইয়া আসিল। দয়াদিদি তাহাকে কোলে তুলিয়া, রাণীরই মত সিঁড়িতে উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসাইয়া দিল।

শয্যার উপর অতি সুন্দর মখমলের আস্তরণ। তাহার উপর মখমলের তাকিয়া ও বালিস। আতর-গোলাপে সেগুলা যেন ডুবানো হইয়াছে।

তাহার উপরে আমাদিগের দুই জনকে বসাইয়া নারীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে রাশি-রাশি পুষ্পনিক্ষেপে আমাদের যেন পুষ্পরাশিতে আবৃত করিয়া ফেলিল। সর্ব্বশেষে উভয়কে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া রমণীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিল।

পিতামহীও এ দৃশ্য দেখিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিতামাতার আগমনের সংবাদ পাইয়া আজ তাঁহার এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে উৎসাহ হইয়াছে।

প্রকাণ্ড ঘরের ভিতরে আমরা দুইটি বালক-বালিকা। বাহিরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার শুভাগমনে উল্লসিত অগণ্য ভেকের কলরবে সেই প্রান্তরময় সমস্ত দেশটা মুখরিত হইয়াছে।

পাছে আমরা ভয় পাই, এইজন্য গৃহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরমা আমাদিগকে অভয়-বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন। শেষে বলিলেন—"দয়াময়ী দালানের ঘরের দ্বারের পার্শ্বেই শুইয়া থাকিবে। যখন তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ হইবে, তখনি তাহাকে ডাকিও। ডাকিলেই সে তোমাদের কাছে উপস্থিত হইবে।"

৪৯

মনোভবের চোখে যাহারা পুত্তলিকার মত, ফুলবাণ যাহাদিগের কুসুমকোমল অঙ্গে সোৎসাহে পুলক তুলিতে আসিয়া রুদ্ধ অবসাদে প্রয়োগকর্ত্তার কাছে ফিরিয়া যায়, এমন দুইটি বালক-বালিকার প্রেমের কথা শুনিতে তোমাদের মধ্যে কেহ কি উৎকর্ণ হইয়া আছ? যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি এই দূরদেশ হইতে প্রণাম করি! শুনিতে যাঁহাদের অভিরুচি নাই, তাঁহাদের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে আমি বিদায় গ্রহণ করি। যে কামগন্ধহীন শয্যাবিলাসের কথা—জীবনের এই সীমান্তে অবস্থিত, আমারই পক্ষে স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে কি এমন বচনবিন্যাসে বুঝাইতে পারিব? কবি যে তুলিকায় কিশোরী স্বরূপ রজকিনীর কামগন্ধহীন রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, সংসারান্ধকারে পথশ্রান্ত ও অপহৃত-সর্ব্বস্ব হীন আমি সে তুলিকা কোথায় পাইব! কোথায় পাইব সেই তুলিকা, যাহার মুখে পিকতানরণবাস্তবস্তৃত রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবনশ্রী উথলিয়া উঠিয়াছে? সেই জরজরচন্দন বিপুলপুলক ফুলবাণ; সেই হুঁহমণি-কিঙ্কিণী, হুহু নূপুরধ্বনি, অঙ্গদবলয় নিশান; সেই দুহু ভুজপাশ বেড়ি দুইজন-বন্ধন-দর্শনক্ষম চক্ষু যাঁহার নাই, তিনি মুদ্রিতনয়নে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবসর গ্রহণ করুন। ইহা সেই বাঙ্গালার বাল্যবিবাহযুগের শিশুদম্পতির প্রথমমিলন-চিত্রের একাংশ। সেকালে ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। এখন ইহা শিক্ষিত-শিক্ষিতার হাস্যোদ্দীপক।

বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিলাম। অন্যদিন হইলে সে সময় আমি ঘোর নিদ্রায় অচেতন রহিতাম। সে দিনও ঘুম পাইলে শয়ন করিতাম। কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুম আসিতেছিল না। বধূ আমার পার্শ্বে ছিল বলিয়া যে জাগিয়া ছিলাম, সে কথা আমি বলিতে পারি না। কেন না, এ সময়ের মধ্যে দুই একবার তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম। কত রকমের কি যেন চিন্তা আসিয়া মাঝে মাঝে আমার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। রমণীগণ চলিয়া যাইবার পর বোধ হয়, একটিবারের জন্যও দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহি নাই। চাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন একটা বিষম লজ্জা আমার চক্ষু অবনত করিয়া রাখিয়াছিল। চোখ তুলিবার প্রাক্কালেই আমার মনে হইতেছিল, চোখ তুলিলেই দাক্ষায়ণী চক্ষুতারকা অবলম্বনে আমার ভিতরে প্রবেশ করিবে। আর সেখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া আমার সমস্ত রূপটা পান করিয়া লইবে।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইতেছিল। —ঝম্-ঝম্-ঝম্। এখন এই বৃদ্ধকালে মনে হইতেছে, বুঝি সে সময় তরুশিরে বস্তশিখণ্ডী রোল তুলিয়াছিল। সেই কেকা-রব-নিনাদিত কাননদেশে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাহুক ও কোকিল বুঝি তাহাদের স্বরলহরী কণ্ঠভাণ্ডারে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বুঝি 'কেকা'র সঙ্গে মত্ত দাদুরীবোলমিশ্রিত কোকিলকুহর ও ডাহুকীর গর্জ্জনও আমি সে রাত্রিতে শুনিতে পাইয়াছিলাম। 'পালঙ্কে শয়ন-রঙ্গে বিগলিত চীর-অঙ্গে' সুনিদ্রিতা ও সুনিদ্রিতের মধুময় স্বপ্ন দেখিবার এমন যোগ্য সময়ে আমরা দুইটিতে চুপ করিয়া পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। ঝম্-ঝম্-ঝম্—কোথায় উল্লাসে আমাদের অঙ্গ শিহরিবে, তাহা না হইয়া বোধ হয়, আজ গা ছম্‌ছম্ করিতেছে!

অনেকক্ষণ পরে দাক্ষায়ণী প্রথমে কথা কহিল। বলিল—"আর বসিয়া আছ কেন? রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

নীরবতার এইরূপ অভাবনীয় ভঙ্গে আমি প্রথমটা শিহরিয়া উঠিলাম। আমি অন্যমনস্কে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

দাক্ষায়ণী আবার বলিল—"রাত্রি জাগিলে অসুখ করিতে পারে। তুমি শোও।"

আমি বলিলাম—"তুমি শোও না কেন?"

"তুমি না শুইলে আমি কেমন করিয়া শুইব!"

"কেন, এত বড় খাটের উপর এত জায়গা, আমি কি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি?"

"নিষেধ করিয়াছ বই কি!"

"বাঃ! কখন নিষেধ করিলাম! আমি ত এর পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে একটিও কথা কহি নাই!"

"তাইতেই নিষেধ করিয়াছ। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, তোমার আগে আমার কি বিশ্রাম লইতে আছে!"

আছে কি না আছে, আর কে খোঁজ করে! বসিয়া বসিয়া আমার পা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। দাক্ষায়ণীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমার ভয় ভাঙ্গিয়াছে। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিলাম। তথাপি দাক্ষায়ণী বসিয়া রহিল। আগে বরং একটু গা-ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল, এখন আমার নিকট হইতে সরিয়া পদপ্রান্তে বসিল। আমি বলিলাম—"কই, শুইলে না!"

"তুমি ত কই আমাকে শু'তে বলিলে না!"—এই বলিয়া দাক্ষায়ণী মৃদুকরপল্লবে—থাক, এ 'সমানে সমানের' যুগে রমণীর এ বিপর্য্যয় অসম্মান লইয়া আর বাড়াবাড়ি করিব না। আমি কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। কি মধুর করস্পর্শ! আমি চোখ বুজিয়া দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ভাবিয়া দেখিলাম। স্বামী ও স্ত্রী! বারদুইচার কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে কি

এক অননুভূতপূর্ব্ব মধুর ভাব আমার হৃদয়মধ্যে সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অতি মৃদু করস্পর্শ চরণতল হইতে অতি মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া, ধীরে ধীরে রোমাঞ্চের বেষ্টনীমধ্যে সেই প্রদীপ্ত ভাব আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ক্ষণেকের মধ্যে আমার মনে হইল, দাক্ষায়ণীর মত আপনার জন জগতে বুঝি আমার আর নাই। মনে হইল, তার সঙ্গে যেন কত-কালের পরিচয়। পরিচয় যেন কোন স্বপ্নের দেশে লুকাইয়া ছিল; হুগলীর সেই তরুতলে ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত হইয়া তাহা বাস্তব জগতে ভাসিয়া উঠিয়াছে। পাছে আবার সে পরিচয় হারাইয়া যায়, তাই দাক্ষায়ণী সাত-পাকের বেড়ায় তাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছে। মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে, কিয়ৎক্ষণের জন্ম পিতামাতার মমতা আমার চোখে ক্ষীণরূপা হইয়া গেল। যদি সেই সময় তাঁহারা আসিয়া আমাকে একদিকে আকর্ষণ করিতেন, আর দাক্ষায়ণী অপরদিকে টানিত, আমি বোধ হয়, দাক্ষায়ণীর দিকে চলিয়া পড়িতাম।

এই বুঝি সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া! ক্ষণকালের জন্ম ক্ষুদ্র বালিকার আয়ত্তে পড়িয়া ক্ষুদ্র বালকের মনের যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তখন বহুদিনের একত্র সহবাসে মানুষ যখন সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণাবয়বার আয়ত্তে পতিত হয়, তখন তার কি অবস্থা, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি দাক্ষায়ণীকে শয়নের অনুরোধ করিলাম। দাক্ষায়ণী অনুরোধ রাখিল। আমার পার্শ্বে না আসিয়া সে আমার পায়ের কাছেই মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

আমি বলিলাম—"তুমি ওখানে শুইলে কেন, আমার পাশে এসো।"

দাক্ষায়ণী বলিল—"কেন, তোমার কি ভয় করিতেছে?" ঠিক এমনি সময়ে আমাদের রহস্যালাপ শুনিবার লোভে উনপঞ্চাশ বায়ু যেন একসঙ্গে বাতায়নপথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের উৎপীড়নে বাতায়ন-ছিদ্রগুলা সমস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শুনিয়া বাস্তবিকই আমার ভয় হইল। কিন্তু সে ভয় আমি দাক্ষায়ণীকে বুঝিতে দিলাম না। আমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার কি ভয় হইতেছে না?" বলিয়াই আমি তাহার হাত ধরিবার জন্ম উঠিয়া বসিলাম।

আমি উঠিতে দাক্ষায়ণীও উঠিল; আমার প্রসারিত হস্ত দেখিয়া আমার পার্শ্বে আসিল; আমার মুখের পানে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমি তোমার কাছে রহিয়াছি। আমার ভয় হইবে কেন?"

এই কয়বার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু একটিবারের জন্মও তাহার হাসিমুখ দেখি নাই। বকুল-তলে আধা-অন্ধকারে আধা-ঘুমজড়ানো চোখে তাহার মুখই ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। আমলকী-বৃক্ষ-তলে সংসারে একান্ত অনভিজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানলেশশূন্যা একটি শিশু-কুমারীর উদাসদৃষ্টি দেখিয়াছিলাম মাত্র। এ পাঁচ দিনের ভিতরে একদিন মাত্র তাহাকে কেবল কাঁদিতে দেখিয়াছি। আর কয়টা দিন ভয়ে ভয়ে,—ঠিক দেখি-য়াছি কি না বলিতে পারি না। আজ প্রথম দেখিলাম। দেখিবামাত্র কেমন যেন এক আবেশকর মোহে আবৃত হইলাম। কি মিষ্ট মধু হইতেও সুমধুর হাসি! সে লাবণ্যপূরসদৃশ বদনের সেই অতুল স্মিত মাধুর্য্যটুকু কুড়াইয়া লইবার জন্ম আমার হস্ত আপনা-আপনি উঠিয়া অতি ধীরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার মুখ আবার ম্লান হইয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে চক্ষু জলে ভরিল এবং তাহাদের একটি হইতে একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু আমার করতলে পতিত হইল। আমার হাত কি যেন এক চৌর্য্যবৃত্তি করিতে গিয়াছিল। উষ্ণ-অশ্রু-প্রহারে ভীত হইয়া সে আবার চোরেরই মত পলাইয়া আসিয়াছে!

দাক্ষায়ণী আমার সেই হাত ধরিল, করপল্লব দিয়া মৃদু পীড়িত করিল এবং বলিল—"তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমার উপর রাগ করিয়া কাঁদিলাম?"

"তুমি কাঁদিলে কেন?"

"একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল।"

"সেদিনও আমাকে দেখিয়াই তুমি কাঁদিয়াছিলে।"

"সেদিনও এই কথাটা মনে পড়িয়াছিল।"

"সেটা কি কথা?"

"শুনিবে?"

এই বলিয়া দাক্ষায়ণী যে দিকে দালান, সেই দিকের জানালার দিকে চাহিল। সেই দিকে চাহিয়া-চাহিয়াই বলিল—"থাক্, ইহার পরে বলিব।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই জানালার খড়-খড়ি সহসা সশব্দে নড়িয়া উঠিল!

দুষ্ট মেয়েগুলা যে আড়ি পাতিয়া খড়খড়ির ভিতর দিয়া আমাদের দেখিতেছিল, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই। দাক্ষায়ণীর সহিত কথায় আমি তন্ময় হইয়াছিলাম—স্থান কাল সমস্তই মুহূর্ত্তের জন্ম ভুলিয়া-ছিলাম। সেই জন্ম শব্দটা আমার কাণে বিষম বেগে আঘাত করিল। ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমি দুই বাহু দিয়া দাক্ষায়ণীকে আঁকাড়িয়া ধরিলাম। বালিকা আমার ভারে শয্যার উপর পড়িয়া গেল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে পড়িয়া গেলাম। শয্যায় নিক্ষিপ্ত ফুলরাশি আমাদিগের

তার সহিতে অক্ষম বলিয়াই যেন আপনা-আপনি শয্যার চারিপাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

আমাদের তদবস্থ দেখিয়া মেয়েগুলা খিলখিল করিয়া হাসিল। ঝিমিঝিমি বর্ষণ-শব্দ, সোঁ সোঁ ঝটিকার শব্দ, সেই সঙ্গে মেয়েগুলার সমবেত হাস্যরব, সবগুলা একত্র মিশিয়া প্রেতিনীর বিকট সানুনাসিক স্বরে পরিণত হইল। অতি ভয়ে সবলে আমি আমার বক্ষ দাক্ষায়ণীর বক্ষে আবদ্ধ করিলাম। অমনি তাহার বক্ষসংলগ্ন শিলাবৎ কি একটা কঠিন পদার্থে আমার বক্ষ বিষম আহত হইল। বেদনায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মৃদু আর্ত্তনাদে আমি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলাম। মর্ম্মাহতার মত বালিকা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। ঈষদুচ্চকণ্ঠে দয়াদিদিকে ডাকিল—"দিদি, বাহিরে আছ ?"

তাহার কথা শুনিবামাত্র দয়াদিদি দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দিদি মনে করিয়াছিল, আমরা বুঝি ভয় পাইয়াছি; তাই আমাদের উভয়কে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'ভয় কি! দুষ্ট মেয়েগুলা গোলমাল করিয়া তোমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত দিয়াছে। আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে ঘুমাও, আমি সারা-রাত্রি দ্বার আগুলিয়া বসিয়া রহিলাম।"

দাক্ষায়ণী বলিল—"ভয় নয়।"

দয়াদিদি সবিস্ময়ে বলিল—"তবে কি? কি জন্ত ডাকিলে, বল। আমি এখনি তাহা করিতেছি।"

"তুমি ইঁহার শুশ্রূষা কর।"

"কেন, ভাইয়ের কি হইয়াছে?"

"আঘাত লাগিয়াছে।"

"সে কি! এর মধ্যে আঘাত কেমন করিয়া লাগিল।"

এই বলিয়া দয়াদিদি সিঁড়ি বাহিয়া পালঙ্কের ধারে দাঁড়াইল এবং আমাকে শয্যা হইতে টানিয়া কোলে তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় কেমন করিয়া, কিসের আঘাত লাগিল?" তখনও বুকে বেদনা ছিল। তবে বেদনার অনেক উপশম হইয়াছে। কিন্তু কি যেন কিসের লজ্জা আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। আমি দিদির কথার উত্তর দিলাম না।

দাক্ষায়ণী আমার হইয়া উত্তর দিল। যেমন করিয়া আমি আঘাত পাইয়াছি, বালিকা সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক দয়াদিদির কাছে বর্ণনা করিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া দিদি আমার বক্ষে আঘাতের স্থান নির্ণয় করিবার জন্ত দুই-চারিটা প্রশ্ন করিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"আঘাত লাগিয়াছে, এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"আমিই বলিতেছি।" এই কথা বলিয়াই বালিকা তাহার বক্ষের বসন উন্মুক্ত করিল। তখন দেখিলাম, গলদেশ হইতে লম্বিত, মুক্তাহারবেষ্টিত একটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহার বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে।

দাক্ষায়ণী পুঁটুলিটি কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিল। বিছা-নায় সেটিকে রাখিয়া অধোমুখে আমাদের সম্মুখেই সেটিকে খুলিতে বসিল।

দয়াদিদি বলিল—"বুঝিয়াছি। আর উহাকে খুলিয়া দেখাইতে হইবে না। রাত্রি অধিক হইয়াছে—শয়ন কর।"

দাক্ষায়ণী কথা শুনিল না। পুঁটুলির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র সুগোল এক শিলাখণ্ড বাহির করিল। সেটিকে আমার চোখের কাছে ধরিয়া বলিল—"এটিকে চিনিতে পার?"

আমি শিলাখণ্ড দেখিয়াই তাহা কি এবং কেমন করিয়া তাহার হাতে গিয়াছে, বুঝিলাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর না করিয়া বলিলাম,—"আমার কিছুই লাগে নাই।"

"খুব লাগিয়াছে। সত্য বলিতে ভয় পাইতেছ কেন? যদি না লাগিল, তবে কাঁদিয়া উঠিলে কেন?"

আমি দিদির কোল হইতে মাথা তুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার মিথ্যা কহিতে আমার সাহস হইল না।

দাক্ষায়ণী শিলাখণ্ড আমার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল এবং বলিল—"ভাল করিয়া দেখ না! চিনিতে পারিতেছ না?"

আমি বলিলাম—"এ সেই নারায়ণ পাথর।"

"সেই পাথর। তোমারই হাত হইতে ইহাকে লইয়া-ছিলাম। বাবার আদেশে ইহাকে তোমার নামে পূজা করিয়াছিলাম। আজ এ তোমার বুকে ব্যথা দিয়াছে। এতদিনের সেবাতেও যখন ইহাকে আমি কোমল করিতে পারিলাম না, তখন তোমার সামগ্রী তুমিই ফিরাইয়া লও।"

"আমি ইহা লইয়া কি করিব?"

"পূজা করিতে হয় পূজা করিবে, না হয় যেখান হইতে ইহাকে পাইয়াছিলাম, সেই আমাদের গ্রামের 'কাশ্যপ' গঙ্গায় ইহাকে বিসর্জ্জন দিবে।"

"আমি লইব না। তোমার বাবা তোমাকে দিয়া-ছিলেন। ফিরাইয়া দিতে হয়, তাঁহাকেই দিয়ো।"

আর কোন কথা না কহিয়া বালিকা শিলাখণ্ডকে আবার পুঁটুলির ভিতর পুরিতে বসিল।

দয়াদিদি বলিল, "হাঁ ভাই, তা হইলে তোমারও ত বুকে লাগিয়াছে।"

দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না—মাথাও তুলিল না। কিন্তু বোধ হইল, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

পুঁটুলি বাঁধিয়া এবার সে আর তাকে গলায় তুলিল না। মাথার বালিসের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল।

দয়াদিদি দাক্ষায়ণীর হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পার্শ্বে শয়নের জন্য অনুরোধ করিল। বলিল—"পাগলিনি! রাত্রি শেষ হইতে চলিল। একটু ঘুমাও।"

এই বলিয়াই দিদি পালঙ্কের উপর উঠিল এবং দাক্ষায়ণীকে ধরিয়া আমার বাহু-উপাধানে তাহার মাথা রাখিয়া শোয়াইল। আমার অপর হস্তটি দিদি তাহার গলদেশে বিন্যস্ত করিল এবং তাহার বামহস্ত আমার গলদেশে জড়াইয়া দিল। তার পর পদপ্রান্তে বসিয়া আমাদের উভয়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষায়ণী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল। সেই নীলবর্ণ মেঘসদৃশ মখমলের বালিসে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত অর্দ্ধ প্রকাশিত মুখচন্দ্রমা দেখিতে দেখিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সে দিন ঘোর ঘুমে আমি আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম। রাত্রির ভিতরে কত কি কাণ্ড ঘটিয়াছে, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় ছয়টা। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। রৌদ্র উঠিয়াছিল। ঘরের একটা মুক্ত বাতায়নের পথ দিয়া রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার কতকগুলা রশ্মি মাঝের ঝাড়ের কলমের উপর পড়িয়াছিল। জাগিয়াই আমার মনে হইল, আমি দেশে আমার পিতামহীর ঘরে তাঁহার তক্তপোষের উপরেই শয়ন করিয়া আছি। কিন্তু ঘরটি যেন আজ কেমন কেমন দেখাইতেছে। শয্যার উপর ফুলগুলা তখনও পক্ষসম্ভার হৃদয়ে পুরিয়া আমার দৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের উপরে ঘূর্ণ্যমাণ ঝাড়ের কলম হইতে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতেছিল। দেখিয়া আমার মনে হইল, ফুলগুলা যেন নানাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া আমার শয্যার উপর খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম ও চারিধারে চাহিলাম। দেখি, ঘরের দেওয়ালেও বিচিত্র বর্ণরাজি লুকোচুরি খেলিতেছে। একবার কোথা হইতে যেন দেওয়ালের উপর ঝাঁপ খাইতেছিল, আবার দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া কোথায় যাইয়া মিলাইতেছিল। অর্দ্ধ-স্বপ্ন-সম বাল্যজীবন—তাহাকে দেখিয়া নৃত্যশীলা মুক্তকুন্তলা লীলাময়ী অনঙ্গমঞ্জরী! আঁখি তখনও স্বর্গের ছবি দেখার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই, সুতরাং সে সময়ের চিত্তের প্রতিকৃতি কল্পনার শত উপাদান দিয়াও আমি এখন অঙ্কিত করিতে অক্ষম। সেই মধুময় জীবনাংশের কোন মধুময় দিবসের কোন মধুময়ী চিত্রলেখা এখনও যদি তোমাদের কাহারও অপাঙ্গভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, সেইটিকে মনে জাগাইয়া আমার তদানীন্তন মনের অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া লও!

বাস্তবিক, কিছুক্ষণের জন্য আমি জাগিয়া ঘুমাইতে লাগিলাম। সকলই বিচিত্র দেখিতেছি, অথচ ঠাকুরমার ঘরের ভ্রম আমার মন হইতে দূর হইতেছে না। আমি ভাবিতেছি, ঠাকুরমার ঘরটা আজ এমন ধারা করিতেছে কেন? ঠাকুরমা কি ঘর লইয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে? তখন পল্লীবাসী গৃহস্থের প্রত্যেকেরই ঘরে কড়ি-দিয়া-বাঁধানো দুই একটা আসবাব থাকিত। পিতামহীর ঘরেও সেইরূপ দুই একটা ছিল। কড়ির আলনা, আলনার উভয় প্রান্তে দোদুল্যমান কড়ির ঝালর, কড়ির ঝাঁপি, নানাবর্ণের সুগ্রথিত কড়ির ধারি-বাঁধা ছবির আকারের 'শ্রী'—এইরূপ অনেক-প্রকারের বস্তু আমার পিতামহীর গৃহের শ্রীসম্পাদন করিত। বাঙ্গালার এই পয়সার যুগে সে কড়ির মাহাত্ম্য বুঝাইবার উপায় নাই। কড়ি কোথা হইতে আসে, আমি একবার পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, উহারা বরুণ-রাজার বাগান হইতে আসে। আজ তাহারা নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া নানাবিধ বর্ণরঞ্জনে, নাচিতে নাচিতে ঠাকুরমার ঘরখানিকে লীলাগৃহে পরিণত করিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যরশ্মি বাতায়ন পথ পরিত্যাগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বর্ণলীলা অদৃশ্য হইল। চমক ভাঙ্গার মত চারিদিক্ চাহিয়া আমি ডাকিলাম—"মা!"

ঘুম আমার আপনি ভাঙ্গে নাই; পিতামহীর ডাকে ভাঙ্গিয়াছে। তিনি পালঙ্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, একরূপ দ্বারের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমার কথা শুনিবামাত্র তিনি উত্তর দিলেন। তার পর পালঙ্কের ধারে আসিয়া আমাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে, উঠিয়া এস।"

আমি ত অনেকক্ষণ উঠিয়াছি! তবে তিনি আমাকে উঠাইতে আসিয়া, আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া, গৃহের এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন কেন? এ মরীচিকার সৌন্দর্য্য তাঁহাকেও কি মুগ্ধ করিয়াছিল?

পিতামহীর কোলে উঠিতে উঠিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা! আমাদের সে কড়ির ঝাঁপি?"

পিতামহী আমার মনের অবস্থা বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ঈষৎ রহস্যের ভাবে উত্তর করিলেন—"তোমার দয়া দিদি তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

"কেন লইয়া গেল?"

"দেওয়ানজীকে দেখাইবার জন্য।"

"দেওয়ানজী কে মা?"

"যিনি তোমার হারাণো ঝাঁপি কুড়াইয়া আনিয়াছেন। রত্নালঙ্কারে সাজানো ঝাঁপি কেমন দেখায়, একবারমাত্র দেখিয়া তিনি আমাদের সামগ্রী আবার আমাদের ফিরাই দিবেন।"

আমি সে কথা বুঝিলাম না—বুঝিবার প্রয়াসও পাইলাম না। পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা! আমাদের ঘরটা এমন হইয়া গেল কেন?"

এইবার তিনি আমার অবস্থা বুঝিলেন। পূর্ব্বেও দুই একবার আমার এইরূপ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আগে মুখে চোখে জল দাও, তারপর সব বলিতেছি।"

আমাকে কোলে তুলিয়া যেই পিতামহী বাহিরে আসিবার জন্য দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি দাক্ষায়ণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্র পিতামহী বলিয়া উঠিলেন—"এই যে ভাই তোমার কড়ির ঝাঁপি ফিরিয়া আসিতেছে।"

এতক্ষণ পরে আমার ঘুমের ঘোর কাটিল। পূর্ব্ব-রাত্রির সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তে স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

কিন্তু এ কি রকম দাক্ষায়ণী! তাহার রাত্রির সেই বেশপরিপাটা, দেহের সেই রত্নালঙ্কার, ঐশ্বর্য্য—কোথায় গেল? পরিধানে একখানি লালপেড়ে শাড়ী, হাতে দুগাছি শাঁখার বালা, কপালে রক্তধূসর টিপ, মাথায় ঝুঁটি—রাত্রি প্রভাত না হইতেই তাহাকে এমন করিয়া কে সাজাইল?

পিতামহী একটি কথা কহিয়াই চুপ করিয়াছিলেন। বালিকা অতর্কিতভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্য তিনি তার বেশান্তর গ্রহণ প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই। এখন বুঝিয়া বুঝি তিনি নীরব হইয়াছেন! কোন অনতিপ্রচ্ছন্ন বিপদ বুঝি তাঁহার চক্ষে পতিত হইয়াছে।

দাক্ষায়ণীকে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বালিকা ধীরে ধীরে নিকটে আসিল। পিতামহীকে ও বোধ হয়, সেই সঙ্গে আমাকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যেই বালিকা দাঁড়াইয়াছে, অমনি বাতায়নের কোন্ ছিদ্র দিয়া পুনঃ-প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মি ঝাড়ের কলমে পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত বর্ণরাশি তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। সেই সপ্তবর্ণরঞ্জিত সপ্তাশ্বের অন্তর্দ্দশা সাবিত্রী-মুখকান্তি আজিও আমার মনে পড়ে! আর মনে পড়ে, আমার মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি সেই দু'টি ডাগর চক্ষু হইতে সহসাবিনিঃসৃত গণ্ডে পতিত দুইটি অশ্রুবিন্দু।

দাক্ষায়ণী বলিল—"ঠাকুর-মা! বাবা ও মা আসিয়াছেন!"

পিতামহী মনে করিলেন, আমার পিতা ও মাতা আসিয়াছেন। আমরা সকলেই পূর্ব্বদিন হইতে তাঁহাদেরই আগমনের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। হিন্দু-কুলবধূ শ্বশুর-গৃহে আসিলে শ্বশুর-শাশুড়ীকেও পিতৃ-মাতৃসম্বোধনে অভিহিত করিয়া থাকে।

তথাপি, কেন জানি না, পিতামহী দাক্ষায়ণীকে প্রশ্ন করিলেন—"বাবা ও মা? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী কি আসিয়াছেন?"

দাক্ষায়ণীকে আর উত্তর করিতে হইল না। পিতা-মহীর প্রশ্নশেষে সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৫০

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নিদ্রার অবসরে সেই বাড়ীতে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদিগের ফুলশয্যার উৎসব-উপলক্ষে রাণী গ্রামস্থ মহিলাগণের জন্য ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। দেওয়ানজীর পরিবারবর্গও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে ভোজে বসিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী সহসা দারুণ পীড়িত হইয়াছেন। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহারা সকলেই যথাসম্ভব সত্বর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আহার শেষ করিতে তাঁহাদের কেহই অবসর পান নাই। ক্ষণপূর্ব্বের আনন্দপূর্ণ গৃহ সহসা বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, বিশেষতঃ রাণীর মনো-বেদনার সীমা রহিল না। তথাপি তিনি আমাদের দুইজনকে এ দুঃসংবাদের কথা জানিতে দেন নাই, উৎসবও রহিত করেন নাই। উৎসব শেষে তিনি ললিতাকে সঙ্গে লইয়া দেওয়ানজীকে দেখিতে চলিয়া গেলেন। এক এক করিয়া প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোক সে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

রাত্রির শেষযামে দেওয়ানজীর পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি গুরুপৌত্রী দাক্ষায়ণীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহারই ইচ্ছামত দয়াদিদি ঘুমন্ত দাক্ষায়ণীকে আমার পার্শ্ব হইতে তুলিয়া দেওয়ানজীর সেই দুই ক্রোশ দূরের হলদীনদী-তীরস্থ বাটীতে লইয়া গিয়াছে। ঘরে শুধু রহিলেন মর্ম্মাহতা পিতামহী, আর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আমি। পিতামহীরও তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি নিদ্রিত দেখিয়া, অথবা দেওয়ানজী আমাকে

দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, তিনি আমাকে আগুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণদম্পতি যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনও দেওয়ানজীর গৃহ হইতে কেহ ফিরে নাই। আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য রাণী যে দুই একজন ঝিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সারারাত্রির পরিশ্রমের পর বাড়ীর কোনও একস্থানে মৃতের মত ঘুমাইতেছিল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই অট্টালিকার ভিতরে সেই সময়ে আমরা পাঁচজন ভিন্ন আর কেহ ছিল না। দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত শিলাখণ্ডের যদি শ্রবণ-শক্তি থাকে, তাহা হইলে সেইটি ভিন্ন, আমাদের মধ্যে সেই সময় যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আর কাহারও তাহা শুনিবার ভাগ্য হয় নাই।

ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন,- "তাই ত মা, এ কোন্ গন্ধর্ব্ব-গৃহে আমার কন্যাকে লইয়া আসিয়াছ !"

পিতামহী এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া আমাকে কোল হইতে নামাইলেন এবং তাঁহাদের উভয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। তাঁহারাও আমার পিতামহীকে প্রণাম কারলেন!

পিতামহী বলিলেন—"তাই ত ঠাকুর, আপনাকে দেখিবার ত প্রত্যাশা করি নাই। কোথা হইতে কেমন করিয়া আপনারা এখানে আসিলেন? আর দাক্ষায়ণীর সঙ্গেই বা কেমন করিয়া আপনাদের সাক্ষাৎ হইল ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইহাদের দেওয়ানের মুখে সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি। ভাগ্যে আসিয়াছিলাম, নহিলে লোকনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইত না। তাঁর মৃত্যু-কালে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম। মধ্যের কতকগুলা সাংসারিক দুর্ঘটনায় আমি তাঁহাকে ভুলিয়াছিলাম। নারায়ণের কৃপায় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইয়াছে।"

পিতামহী। দেওয়ানজী কি তবে জীবিত নাই ?

ব্রাহ্মণ। না, তিনি শেষরাত্রে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

কথা শুনিবামাত্র পিতামহীর চক্ষে জল আসিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"তিনি জীবনে যথেষ্ট ভোগ করিয়া, তাঁহার গুরুর পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে দেখিতে-দেখিতে সজ্ঞানে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য শোক করিবেন না। আমি তাঁহার পরিবারবর্গকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছি।"

পিতামহী তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে দাক্ষায়ণীকে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"নাত্-বৌ! দেওয়ানজীকে দেখিবার জন্য এ বাড়ী একরূপ জনশূন্য হইয়াছে। তুমিই তাই এখন এ ঘরের গৃহিণী। আসন ও পা-ধুইবার জল দিয়া তুমিই তোমার পিতামাতার শুশ্রূষা কর। আমার দেওয়া জল ত তোমার বাবা লইবেন না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"না মা, জল দিবার প্রয়োজন নাই; আমরা বসিব না।"

পিতামহী ঈষৎ ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"বসিবেন না! তা কি হইতে পারে!"

হিন্দু, কন্যাদানের পর জামাতৃগৃহে অন্ন গ্রহণ করেন না। কেহ একেবারেই করেন না, কেহ দৌহিত্র হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত করেন না এখন শিক্ষিতের মধ্যে এ প্রথার অনেকটা বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু সেকালের প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞানে এ প্রথার পালন করিত। পিতামহী অবশ্যই জানিতেন। সেই জন্য তিনি বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্যও আপনাদের বসিতে হইবে। বহুদিন আপনাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি। একত্র বসিয়া আপনাদের সঙ্গে গোটাদুই কথা কহিয়া জীবন চরিতার্থ করি।"

এই কথা বলিয়াই পিতামহী দাক্ষায়ণীকে আসন আনিতে পুনরাদেশ করিলেন। বালিকা নড়িল না। সে কেমন এক রহস্যময় দৃষ্টিতে তাঁহার পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ যেন কি কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণী তাহা দেখিলেন। তিনি পিতামহীকে বলিলেন—"মা! আমরা দাক্ষায়ণীকে লইতে আসিয়াছি।"

ব্রাহ্মণীর কথার ভাবে পিতামহী তাঁহাদের আগমনের অর্থ কতকটা যেন বুঝিতে পারিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতির দর্শনজনিত তাঁহার প্রফুল্লতা, দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনি কি লইয়া যাইবেন?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন—"আপনাদের বস্তু আপনাদের ফিরাইয়া দিতে অনেক দিন হইতেই আমার সঙ্কল্প জন্মিয়াছিল। ধন্য আপনারা—আপনাদের হৃদয়বল স্মরণ করিতেই আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আপনাদিগের শিক্ষা-দানও ধন্য। দাক্ষায়ণীর অতুলনীয় ভক্তিভাবপূর্ণ সেবায় আমি পুত্র-পৌত্রকে ভুলিয়াছিলাম; পথে আমি সংসার কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। আপনার কন্যার আগমনে আমার কুলও ধন্য হইয়াছে। তথাপি ঠাকুর, পৌত্রবধূকে সঙ্গে আনিয়া পথে একটি দিনের জন্যও সুস্থ হইতে পারি নাই। এতদিন পাঠাইবার সুযোগ হয় নাই বলিয়া পাঠাই নাই

এতদিন পরে সুযোগ হইয়াছে। আমি আপনিই পাঠাইতাম। আপনাদের এখানে আসিতে হইত না।"

ব্রাহ্মণ এইবারে বলিলেন—"আপনার সেবার জন্যই কন্যাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আপনি যতদিন জীবিত রহিতেন, ততদিন ইহাকে পুনর্গ্রহণের আমাদের প্রয়োজন থাকিত না। আপনার সেবায় দাক্ষায়ণীর যদি জীবনাতিপাত হইত, তাহা হইলে আমাদের সুখের অবধি থাকিত না!"

"তবে লইতে আসিয়াছেন কেন? আমি ত এখনও মরি নাই!"

"কই মা, আপনি যে পৌত্রবধূর সেবায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না?"

"রাণী দয়াময়ীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হরিহরকে আনাইয়াছে। আনাইয়া এই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছে।"

"আপনার মত না থাকিলে তাঁহার আনাইতে সাহস হইত না।"

পিতামহী নিরুত্তর; মাথা হেঁট করিয়া তিনি কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"মা! যে দিন স্ত্রী, কন্যা, গণেশ ও আপনাকে সঙ্গে লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে দিনের কথা স্মরণ করুন। চোরের মত যে সময় আমি আপনার এই পৌত্রকে আনাইয়া ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করি, তখন উহাদের মধ্যে কায়-সম্বন্ধের আশা রাখি নাই। স্বধর্ম্মচ্যুত শ্বশুরের ঘর দাক্ষায়ণী করিবে, এ আশাকেও আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপদ্ধর্ম্মবশে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা অবস্থার অনুযায়ী যথাসাধ্য পালন করিয়া আমি কন্যাদান করিয়াছিলাম। বিধাতার ইচ্ছায়, এক নারায়ণ ও একটি সাধ্বী তন্তুবায়-কন্যা ভিন্ন আর কেহ সে বিবাহের সাক্ষী রহিল না। আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকিয়াও সে বিবাহোৎসব দেখিতে পাইলেন না। সমাজের অলক্ষ্যে এ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ কন্যাকে সমাজমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমি সমাজের উপর অত্যাচার করিব না।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"আপনার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া আমরা স্বামী ও স্ত্রীতে সুখী হইয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, সে সুখও আমাদের রহিল না।"

এতক্ষণ পরে পিতামহী বলিলেন—"আমিও গৃহে ফিরিব না। এখান হইতে কাশী যাইবার মনন করিয়াছি। তবে দাক্ষায়ণীকে আমার কাছে রাখুন না কেন? যে ক'টা দিন বাঁচিব, একমাত্র উহাকেই আমি সঙ্গে রাখিব। মৃত্যুকালে উহারই কোলে মাথা রাখিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! মমতাবশে আপনার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাব ভাঙ্গিয়াছে। আর ত কন্যাকে আপনার কাছে রাখিতে সাহস করি না।"

"এখনি লইয়া যাইবেন?"

"বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

"আমার পুত্র, পুত্রবধূ আসিতেছে। হতভাগোরা একবারের জন্যও কি এ মুখ দেখিতে পাইবে না?" এই বলিয়াই পিতামহী দাক্ষায়ণীর চিবুক ধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। কঠোর ব্রাহ্মণ কিন্তু অটলভাবে উত্তর করিলেন, "দেখার সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না। আমরা স্বামী ও স্ত্রীতে তীর্থভ্রমণ-সঙ্কল্পে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। অবশ্য ফিরিব না, এরূপ সঙ্কল্প করি নাই। তবে দেশে ফিরিতে আর বড় অভিরুচি নাই।"

"এই ক্ষুদ্র বালিকাকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ঘুরিবেন?"

"কি করিব মা—ইহাকে কার কাছে রাখিয়া যাইব? দেশের অবস্থার দিন দিন যেরূপ প্রবলবেগে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে বালিকাকে এখানে রাখিতে আমার সাহস হয় না। বরং অন্তদেশে ব্রহ্মচারিণীর মর্য্যাদা থাকিবে।"

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীকে বলিলেন—"দাক্ষায়ণি! শালগ্রামশিলা কোথায় রাখিয়াছ, লইয়া আইস।" পিতার আদেশমাত্রেই সে সিঁড়ি বাহিয়া পালঙ্কের উপর উঠিল এবং শয্যার উপর হামাগুড়ি দিয়া মাথার বালিসের নিম্নে যেখানে পুঁটুলিটি রাখিয়াছিল, সেখান হইতে সেটিকে লইয়া পিতার হস্তে অর্পণ করিল!

শান্ত পিতামহী এবারে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষুব্ধ কেন, ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন—"দেখুন ঠাকুর, আপনি পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক। তথাপি আমার মনে হয়, আপনি যেরূপ সত্য-রক্ষার জেদ দেখাইতেছেন, এতটা জেদ এ কলিকালের মানুষের শোভা পায় না।" ব্রাহ্মণ নিরুত্তর রহিলেন। পিতামহী বলিতে লাগিলেন—"অবশ্য, আমার হতভাগ্য পুত্রের কাজ, মানুষ যে, সে কখন ভাল বলিবে না। কিন্তু আপনাকেও লোকে নিন্দা করিবে। আমি ইহাকে কুলবধূ বলিয়া গ্রহণ করিলাম; আমার আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি সকলেই গ্রহণ করিল; পুত্র ও পুত্রবধূ বালিকাকে ঘরে আবাহন করিবার জন্য আসিতেছে, এমন সময়ে আপনি কন্যাকে লইয়া সকলের মর্ম্মে আঘাত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ! আপনার এ কাজকে কেহ ভাল বলিবে না।"

সস্মিত মুখে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তা জানি। নিন্দা করিবে কেন, এখনি দেশের লোক নিন্দা করিতেছে। অন্যের কথা কেন, জ্ঞাতিবর্গে করিতেছে। বিশেষতঃ বয়াতা

অবলম্বনে হরিহরকে আনিবার পর হইতে—" ব্রাহ্মণ কথা শেষ করিতে না করিতে পিতামহী বলিয়া উঠিলেন—"অঘোরনাথ কি সেজন্য আপনাকে কিছু বলিয়াছে?"

"যদি কিছু বলে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-রহস্যে একান্ত অনভিজ্ঞ বালকের কথায় আমি কাণ দিব কেন? আপনাদের সকলের নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কারণ হইব জানিয়াও আমি আমার কন্যাকে, এই অপূর্ব্ব উৎসব-মুখে লইতে আসিয়াছি। আমার এই পত্নী কোনও রকমে দেহে জীবন ধরিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তথাপি কন্যাকে লইয়া যাইব। মা! এ বয়স পর্য্যন্ত আমি সত্যভ্রষ্ট হই নাই। আপনার পুত্রের মনোগত ভাব যখন বুঝিতে পারিলাম, যখন বুঝিলাম, আমার কন্যাকে পুত্রবধূ করা এই বালকের মাতাপিতার অভিপ্রায় নয়, তখন সত্যরক্ষার জন্য নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম, ঠাকুর! রামসেবকের পৌত্রকে এই বালিকা-দানের অধিকার প্রদান কর। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দানান্তে কন্যাকে চিরব্রহ্মচারিণী-ব্রতে দীক্ষিতা করিব।"

পিতামহী। তাহা আমি জানিতাম না।

ব্রাহ্মণ। বালিকার ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার সাহায্য করিতে এখনও যদি আপনার সাহস থাকে, বলুন মা, আমি এ কন্যা আবার আপনার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া যাই।

এ কথার উত্তর পিতামহী সহজে দিতে পারিলেন না। তিনি একবার আমার পানে চাহিলেন। আমার মুখ দেখিয়া কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চোখের দিকে একবার চাহিলাম; তার পর দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিলাম। সেও আমার মুখের পানে স্থিরনেত্রে চাহিল। আমি কিন্তু তাহার চোখে চোখ রাখিতে পারিলাম না; মুখ ফিরাইলাম। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিলাম। তাঁহার দৃষ্টি চোখে পড়িবামাত্র আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল।

কে তাহাতে কি বুঝিল, জানি না। পিতামহী এই-বারে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যাকে লইয়া যান।"

"আপনার এ পৌত্রে ব্রাহ্মণযোগ্য বহু সুলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কন্যার মুখে রাত্রির ঘটনা শুনিয়া, আর এখন দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার হানি ঘটিয়াছে। অভয়, সত্ত্ব, সংশুদ্ধি ব্রাহ্মণের চিরন্তন সম্পত্তি। পিতা-মাতার কর্ম্মদোষে বালক সে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ভয় কারে বলে, ব্রাহ্মণ-বালক পূর্ব্বে জানিত না। সেই ভয় ভারে-ভারে এই বালককে অবলম্বন করিয়াছে।'

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর হাত ধরিলেন; এবং তাহাকে বিষম ব্যাকুলভাবে পিতামহীর পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। দাক্ষায়ণী পিতামহীর পায়ে মাথা লুটাইল, পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর আমার পায়ে মাথা রাখিয়া—বারংবার, বারংবার, বারংবার—পা দুটা মস্তক দ্বারা আঘাত করিল। তার পর তাহার মায়ের হাত হইতে একটি পুঁটুলিভরা রাণীর দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার আমার পায়ের কাছে রাখিয়া, আমাদের কাহাকেও কোনও কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া, কেহ না-আসিতে-আসিতে, চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, মায়ের হাত ধরিয়া ছায়ামূর্ত্তির মত দাক্ষায়ণী সেই 'গন্ধর্ব্ব-গৃহ' মধ্যেই যেন মিলাইয়া গেল।

৫১

আমি সেই বয়সে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ যতটুকু বুঝিবার, বুঝিয়া দাক্ষায়ণীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে পিতামহীকে ব্যাকুলভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছি। পিতা-মহী দুই হস্ত আমার মস্তকে স্থাপিত করিয়া, নিরাশ, নিস্পন্দ, প্রাণহীন মর্ম্মরমূর্ত্তির মত দ্বারের দিকে শুষ্ক চক্ষু দু'টি স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে বাহিরে নারীকণ্ঠ হইতে করুণ ক্রন্দন-শব্দ উত্থিত হইল।

শুনিবামাত্র পিতামহীর চোখের পলক পড়িল। তিনি মস্তক অবনত করিলেন। কল্যাণাশ্রয় দু'টি করপল্লব আমার মাথা হইতে যেন ঝরিয়া পড়িল। আমি ঊর্দ্ধনেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ছিলাম। আমার চোখে চোখ পড়িতেই তিনি বলিলেন—"আমাকে জড়াইয়া, আর মুখের পানে চাহিয়া লাভ কি হরিহর? তাহার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত অলঙ্কার উঠাইয়া লও। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু দিতে পারিবে না জানিয়া তোমার পিতামাতা তাহার কন্যাকে গ্রহণ করে নাই। অর্থই তোমাদের সর্ব্বস্ব বুঝিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা তোমাকে এই মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিয়াছে; দিয়া, তাহার মূল্যহীন প্রাণ আজ পথের ধূলায় মিশাইতে চলিয়াছে। তোমার আবার বউ হইবে, ভাবনা কি! তোমার মা আসিলে এই অলঙ্কার তাহার হাতে ধরিয়া দিয়ো। যখন তাহার মনোমত পুত্রবধূ ঘরে আনিবে, তখন সে এই অলঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়া দিবে।"

বলিতে বলিতে পিতামহী অলঙ্কারের পুঁটুলিটি তুলিয়া আমার হাতে দিলেন। পুঁটুলি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তথাপি তিনি নিরস্ত হইলেন না। সেটাকে আবার তুলিয়া তিনি আমার পরিধেয় বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে বাহির আবার নিস্তব্ধ

হইয়াছে। পিতামহী বন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া, উদ্দেশে দয়াদিদিকে সম্বোধন করিলেন—"দয়া আছিস্?"

দয়াদিদি আপনা-আপনিই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। চৌকাঠে পা দিয়াই দিদি বলিল—"আমি ত আছি এবং থাকিব। তুমিও আছ?"

"আমিই বা থাকিব না কেন?"

"না ঠাকুরমা, সে দিন তোমাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া তোমার মুখে জল দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আজ তোমার মরণ দেখিতে ব্যাকুল হইয়া আসিতেছি। ঠাকুরমা! পুত্র ও পুত্রবধূ আসিতে না আসিতে যদি মরিতে পার, তা হ'লে বুঝিব, এখনও তুমি ভাগ্যবতী।"

পিতামহী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"মরণকে ডাকিয়া আত্মহত্যা করিব কেন? ইচ্ছা করি আর নাই করি, সে ত একদিন আপনিই আসিবে।"

মৃত্যু আপনিই আসিল—সেই দিনেই পিতামহীকে লইতে আসিল, আঘাতের পর আঘাতে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দুর্ব্বল দেহ জীর্ণ হইয়াছিল। আজ দুর্য্যোধনের জয় হর্ষ-বিষাদে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সেই দিন বিকালে পিতা ও মাতা আসিলেন। তাঁহারা সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পারেন নাই কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, ভাগ্য—আমার ভাগ্য, পিতামহীর ভাগ্য, তাঁহাদেরও ভাগ্য। আমাদের পূর্ব্বজীবন ও পরজীবনের সন্ধিক্ষণে এই যে একটা অন্ধকার-প্রলিপ্ত কালান্তর শৈলপ্রাচীরের মত ব্যবধান রহিয়া গেল, যুগব্যাপী ঝঞ্ঝাও তাহাকে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবে না। পিতার তমলুকে উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া নন্দকুমার হাকিম সপরিবারে ব্রজবাবুর বাসায় আসিয়া তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পিতা সে অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। উপরোধে পড়িয়া নন্দীগ্রামে পৌছিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়া গেল। পৌছিয়া অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি একা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মা আসিতে সাহস করিলেন না। রাণী কর্ত্তৃক সম্যক্ অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজবাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মাতা ও পুত্র উভয়েরই দুর্ভাগ্য, এতকাল কেহ কাহারও কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পিতামহীর সহিত যখন পিতার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পিতামহীর কাছে বসিয়া। পিতা ও মাতাকে দেখিবার আকুল আগ্রহ সত্ত্বেও পিতামহী আমাকে ঘর ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই—ধরিয়া তাঁহার কাছেই আমাকে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দয়াদিদি প্রত্যুদ্গমন করিয়া পিতাকে পিতামহীর সমীপে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পিতা আসিলেন, পিতামহীকে প্রণাম করিলেন। তার পর ঈষৎ হাস্যের সহিত তাঁহাকে বলিলেন—সেকালের বামুনগুলো, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া শুধু শব্দার্থ লইয়াই পাগল। বহুদিনের বৃথা কঠোরতায় সার্ব্বভৌমের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে বুঝিয়াই আমি তাহার অসংযত উপরোধ রক্ষা করিতে চাহি নাই। তাঁহার কন্যার সহিত হরিহরের বিবাহ দিব না, এ অভিপ্রায় আমার আদৌ ছিল না। পাগলের ভাব বুঝিতে না পারিয়া মা নিজেও অপদস্থ হইলে, আমাকেও দেশে বিদেশে যার তার কাছে অপদস্থ করিলে।"

পিতামহী বলিলেন—"শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তুমিই বুঝি একায়ত্ত করিয়াছ? তুমি কি আমাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ, অঘোরনাথ?"

পিতা উত্তর করিলেন না। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পিতামহী বলিতে লাগিলেন—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার স্বর স্পন্দিত হইতে লাগিল—"ভিখারী ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে কিছু দিতে পারিবে না জানিয়া স্ত্রীর পরামর্শে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সত্যকে পদদলিত করিয়াছিস্। তোর কর্ত্তব্যজ্ঞানকেও ধিক্, তোর শাস্ত্রের মর্ম্মার্থবোধকেও ধিক্। বাল্যবিবাহে আপত্তি যদি তোর অছিলা ছিল, সে কথা বলিলে বালিকার মা জগদ্ধাত্রীর মত তার কন্যাকে বারো বৎসর তার নিজের কাছে ধরিয়া রাখিত। আমাকে বলিলে আমি ধরিয়া রাখিতাম। বাঁরো বৎসর পরে তোদের মত হাকিম-হাকিমনীর পরিবর্ত্তে আমার ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা হইত। যাক্—তোদের সমস্ত আপদ্ মিটিয়া গিয়াছে—এই তোদের পুত্র নে। আর—" এই বলিয়া পিতামহী দাক্ষায়ণীদত্ত গহনার পুঁটুলিটি বাহির করিলেন। সেটিকে রুদ্ধবাক্, নিস্পন্দ পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই নে। অর্থই তোদের একমাত্র সার-সম্পত্তি জানিয়া আমার কুললক্ষ্মী তোর পুত্রকে এই রত্ন-অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়া গিয়াছে। নে হতভাগ্য, তুলিয়া নে। তোদের বৈদিকের মধ্যে এখনও এমন ধনবান্ কেহ হয় নাই, যে এত মূল্যবান্ যৌতুক দিয়া তোর পুত্রকে কন্যাদান করিতে পারে। আর—আর—এরূপ পুত্রবধূ—" বলিতে বলিতে বার দুইতিন দাক্ষায়ণীর নাম করিয়া পিতামহী মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অনুতাপবিদগ্ধ পিতা তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা দিয়া পড়িলেন। গলদশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন—"মা! উঠ—নরাধমকে তিরস্কারের এখনও শেষ হয় নাই। আমায় মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ কর।"

পিতামহীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। আমিও পিতার সঙ্গে তাঁহার পা দু'টি জড়াইয়া 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিলাম, দয়াদিদি 'ঠাকুরমা' বলিয়া করুণকণ্ঠে তাঁহাকে কত সম্বোধন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। পিতামহী উত্তর দিলেন না।

রাত্রি প্রভাত না হইতেই পিতামহী দেহত্যাগ করিলেন। বহু সেবিকার উপস্থিত সত্ত্বেও মা সারারাত্রি পিতামহীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। চিকিৎসকে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। সমস্তই বৃথা হইল।

পিতামহীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর সেই দিবসেই আমরা নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিলাম।

* * * *

আপনাদিগকে যদি দাক্ষায়ণীর সহিত পুনঃ সাক্ষাতের কথা শুনাইতে পারিতাম! নন্দীগ্রাম হইতে আসিবার পর আজিও পর্য্যন্ত আর তাহাকে দেখি নাই। শুধু আমি কেন, আমাদের দেশের লোকও তাহাকে দেখে নাই। আমাদের বর্ত্তমান লালসা-মথিত ঘরে প্রতিষ্ঠা পাইবে না বলিয়াই, বুঝি ব্রহ্মচারিণী ফিরিল না!

আজিও পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণীর পিতৃগৃহের বনাকীর্ণ ভগ্নস্তূপ "সাভ্যোমের ভিটা", তাহার পুনরাগমন-প্রতীক্ষায় গুপ্তগঙ্গার সহিত মনোবেদনার আদান-প্রদান করিতেছে।

সম্পূর্ণ

গুহামধ্যে

উপন্যাস

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

উপহার

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু—

গুহামধ্যে

(সন্ন্যাসীর কথা)

১

প্রায় বৎসর ত্রিশ গৃহত্যাগ করিয়াও এই ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছি। হায়! মর্কট বৈরাগ্যের এই ফল! তবে যখন জড়াইয়াছি, তখন এ কাহিনী লেখার কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়া আমি সে মর্কট বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শুধুই প্রায়শ্চিত্ত নহে। সমাজের একটা বিষম পরিবর্ত্তনের যুগে এমন একটা কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বাহির হইলে, তাহাতে অবিশ্বাসের সমস্ত উপাদান থাকিলেও, লোক একেবারে অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। যদি করে, বড় জোর আমাকে ভণ্ড বলিবে।

আজকাল নিত্য যাহা ঘটা সম্ভব, সেই কাহিনীই তোমরা শুনিতে চাও। তাহাদের ভিতর হইতে একটা অসম্ভব কথা শুনিতে দোষ কি?

তখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি দশ বৎসর। সংসারটা অসার বলিয়া গৃহত্যাগ করি নাই—বিধাতা আমাকে সংসারে থাকিতে দিলেন না—উৎপীড়ন করিলেন। সে উৎপীড়ন একবার নয়—বার বার। কলেরার নৃশংসতায় আমার প্রথম সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মরিল স্ত্রী, দশমবর্ষীয় পুত্র, পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা। দুই দিন কাঁদিলাম, মাসখানেক হা হুতাশ করিলাম, আর মাসখানেক পরে আবার বিবাহ করিলাম। বংশরক্ষা না হইলে পিতৃপুরুষ কি বলিবেন? বছরখানেকের মধ্যে একটু বড় হইতে না হইতেই সেও মরিয়া গেল। তাই ত, হাত পুড়াইয়া কত দিন খাইব? বংশ থাক্ আর না থাক্, ক্রমে যে অশক্ত হইতেছি—বাড়ীতে আমাকে দেখে, বিশেষতঃ অসুখ হইলে, এমনটি যে কেহ নাই! আবার একটা। এবারে মনে হইল, বিধাতা সদয় হইয়াছেন। এমন গুণবতী নারী কম দেখিয়াছি। এমন স্বামি-সেবা—লিখিতে এ বৃদ্ধ বয়সেও হাতটা একটু নড়িয়া গেল! তার চেয়ে বয়স আমার ঢের বেশী। তার বয়স যখন দশ, তখন আমার ওঃ! আমি ত্রিশ বছরের বড়! তার বাপ মা'কে গাল দিও, আমাকে যত পার দিও; তাহাকে দিও না। তোমরা—পুরুষ, নারী—কেহ যেন তাহার জন্য দুঃখ করিও না। একদিনের জন্য তার মুখ বিমর্ষ দেখি নাই। আমি কোথাও যাইলে, আমার আসা-পথপানে সে চাহিয়া থাকিত। রোগে পড়িলে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শ আমার দেহের ব্যাধিটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিত। এক দিন আমার বয়স লইয়া রহস্য করিতে আনন্দময়ীকে কাঁদাইয়াছিলাম। তার ফলে ভুবনের মা'র কাছে আমার তিরস্কার-লাভ ঘটিয়াছিল। আমার প্রথম স্ত্রীর সময় হইতে সে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত। তার ছেলে ভুবন বহুকাল আগে মরিয়াছে, পুত্রের নামটি মাত্র তার অবশিষ্ট আছে। বহুকাল হইতেই আমার ঘর তার ঘর হইয়াছে। কায়স্থ-কন্যা, আমা হইতে দু'চারি বৎসরের বড়—আমি তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। তাহাকে ঝি বলিতে পারি নাই। সে আমার সংসারের একরূপ অভিভাবিকা। এক একবার স্ত্রী-বিয়োগে বৈরাগ্যের ভান দেখাইয়া তারই প্ররোচনায় আমি বিবাহ করিয়াছি। সে বলিয়াছিল, "বাবা, এরূপ তামাসা আর কখন যেন ক'র না। এ মেয়ে যার ঘরে থাকে, তার শিবের সংসার।"

আমি ভুবনের মা'র সুমুখে নাক-কান মলিয়াছিলাম।

তার বয়স পঁচিশ। আমার বয়স? হিসাব কর, আমার বলিতে সরম হইতেছে। তার রূপ? যত পার, ভাল কল্পনা কর। হইবে না, হইবে না করিয়া সবে মাত্র ছয় মাস একটি কন্যা হইয়াছে। তার রূপ? কল্পনা করিতে যাইও না—কল্পনা পরাস্ত হইবে।

এই সময়ে একদিন দয়া—তার নাম ছিল দয়াময়ী—তাহাকে পা দিয়া নাচাইতে নাচাইতে, আমার সেই পূর্ব্ব-কৃত রহস্যের উত্তর শুনাইতেই যেন বলিয়াছিল—"তালগাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী গো ঝি! তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করব কি? অক্তা দিলুম, কক্তা দিলুম, কানে মদন কড়ি; বে'র সময় দেখতে এল (কিনা) বুড়োটার ধাড়ী?"

এই তার প্রথম রহস্য, এই তার শেষ। বিধাতা আমার এমন স্ত্রীকেও কাড়িয়া লইলেন। শুধু সে গেল না, কন্যাটিকেও সঙ্গে লইয়া গেল। রোগে মরিল না—পুড়িয়া মরিল।

আমি আহারান্তে স্থানান্তরে পাশা খেলিতে গিয়াছি। ভুবনের মা নিকটস্থ নদী হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছে। পল্লীতে আগুন লাগিল।

অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হইল বটে, আমার সব গেল—সম্পত্তি, ঘর, স্ত্রী, কন্যা। আগুনের বেড়াজাল ঘিরিয়া কেহ তাহাদের উদ্ধার করিতে পারিল না। দেহ দেখিয়া দয়াময়ীকে চিনিতে পারিলাম না, তার কন্যাকে চিনিলাম। তার মা দুই হাতে আঁকড়িয়া তাকে যেন অস্থি-পঞ্জরের ভিতর লুকাইয়াছিল। তার বর্ণের বিলয় হয় নাই, শ্রীর এতটুকু হানি হয় নাই। শুধু সে মরিয়াছে।

আমি, ভুবনের মা—উভয়েরই এবার অশ্রু শুকাইয়াছে। প্রাণের ভিতর চক্ষু সিক্ত করিবার আর রস নাই। এ, শু, সে আমাদের উভয়কে স্থান দিতে কতই না আগ্রহ করিল। আমার মন ভিজিল, কিন্তু ভুবনের মা কঠোর হইল। আমাকে বলিল— "কি বাবা, আবার কি নরক ঘাঁটতে ইচ্ছা আছে?"

আমি বলিলাম —"তুমি কি করবে?"

"কাশী যাব।"

"আমিও যাব, ভুবনের মা!"

২

দশ বৎসর উভয়ে কাশীবাস করিতেছি। এ দশ বৎসর অনেকটা যেন শান্তি পাইয়াছি—সংসারটাকে এক রকম যেন ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখচ্ছবি চোখের সুমুখে এক একবার ভাসিয়া উঠে—আমি জোর করিয়া সরাইয়া দিই। মাস পাঁচ ছয় তাও আর উঠে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সিদ্ধ যোগীর আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমাকে গৈরিক দিয়াছেন মাত্র—সন্ন্যাস দেন নাই। লইবার আগ্রহ দেখাইলে বলিতেন—"তার জন্য ব্যস্ত হইও না। সময়ে সন্ন্যাস আপনিই আসিবে—অপক্ব সন্ন্যাসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর।"

তদবধি ব্রহ্মচারীর জীবনই যাপন করিতেছি। রাত তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করি, তার পর তীর্থস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ ঘোরাফেরা করি।

বাসায় ফিরিতে কোনও দিন নয়টার কম হয় না। ভুবনের মা পরিচর্য্যার যা কিছু সব করে, কেবল রন্ধন কার্য্যটি আমার। বৈকালে সাধু-সঙ্গ, ভাগবত-কথা শুনা, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দেখা—সত্য সত্যই দিনগুলি আনন্দে ও শান্তিতেই একরূপ অতিবাহিত হয়।

তবু সন্ন্যাসলাভ হইল না বলিয়া মনটা সময়ে সময়ে একটু কেমন সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। গুরুর উপদেশ মনে পড়িত। এখনও কি তবে অদৃষ্টে কর্ম্মভোগ আছে? সংসার আর করিব না, বিশ্বনাথের মাথায় বিল্বপত্র চাপাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। গুরুর সম্মুখেও সে কথা অনেকবার উচ্চারিত করিয়াছি।

আমার বয়স তখন প্রায় সত্তর। আমার অপেক্ষা কত অল্প বয়স্ককে, এমন কি, দুই চারি জন যুবককেও, গুরুকে সন্ন্যাস দিতে দেখিয়াছি। আর আমি চাহিলেই তিনি বলিতেন—"ব্যস্ত কেন, অম্বিকাচরণ? তুমি বেশ আছ।"

তবে বেশই আছি—সন্ন্যাসের কথা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমার সন্ন্যাসী গুরু-ভাইরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান। শুধু তাই নয়, গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অনেকে আমার পরিচর্য্যা করিতে ছুটিয়া আইসেন। গুরুদেবের যে দিন ইচ্ছা হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস লইব ভাবিয়া আবার নিত্যকৃত্যকর্ম্মে মন দিয়াছি।

সে দিন একে শীতকাল, তায় দুর্য্যোগ—বৃষ্টিও হইতেছে, ঝড়ও হইতেছে, শীতে শরীরের রক্তও বুঝি জমিবার উপক্রম করিয়াছে। রাত্রি তিনটা। এমনই সময় নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যাই। কাশীতে আসিবার পর হইতে এই দশ বৎসর একটি দিনের জন্য আমার এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ঘটিবে? নিত্যকার্য্যগুলা এত দিন ঘড়ীর কাঁটার মত করিয়া আসিয়াছি। আজই কি তার ব্যতিক্রম হইবে? কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া, দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া যেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, অমনিই আমার গন্তব্যপথের সম্মুখে আসিয়া ভুবনের মা বলিল—"আজ বড় দুর্য্যোগ।"

বুঝিলাম, যাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে সে কথা বলিল, পাছে পিছু ডাকা হয়, এই জন্য সম্মুখে আসিয়া বলিল; আমাকে সম্বোধন করিল না। আমি বলিলাম—"হ'ক্ ভুবনের মা, এ হ'তে বড় বড় দুর্য্যোগ ত মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে। আমি যাব।"

"তবে কমণ্ডলু রেখে যাও। কমণ্ডলুতে বৃষ্টি-জল পড়া রোধ করতে পারবে না।" ভাবিলাম ঠিক—কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে বৃষ্টির জল পড়িবেই। অথবা না পড়িলেও, পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। সে জলে দেবতার সেবা হইবে না। কমণ্ডলু রাখিয়া স্নানে গেলাম।

চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট। তখনও ঘোর অন্ধকার।

বিশেষতঃ চাঁদনীতে ঘনতম অন্ধকার। বিদ্যুতের সাহায্যে কতকটা পথ চলিতেছি, কতকটা অন্ধের মত হাতড়াইতেছি। ঘনতম অন্ধকার-গর্ভে প্রবেশ করিলাম। চাঁদনী পার হইয়া সোপানে পা দিব; শুনিতে পাইলাম, এক মৃদু আর্ত্তনাদ। কি মৃদু! তবু ঝড়ের হুঙ্কারকেও দলিত করিয়া শব্দ আমার কানে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিয়া মুখ ফিরাইলাম, চাঁদনীর ভিতরে আসিলাম। আবার স্বর—বোধ হইল যেন সদ্যোজাত শিশুর।

বিদ্যুৎ চমকিতেই দেখিলাম, কোণের এক পাশে কাপড়ের পুঁটুলির মত একটা কি। নিকটে উপস্থিত হইতেই আবার অন্ধকার। কান পাতিয়া আর একটা কান্নার প্রতীক্ষা করিলাম। কই শব্দ? বুঝি মরিয়াছে—এ দারুণ শীতে আমিই মরমর হইতেছি, সে সদ্যোজাত শিশু কি বাঁচিতে পারে? ভাবিলাম, কোন অভাগিনীর অবৈধ-লালসার ফল। প্রসবের পর এখানে ফেলিয়া গিয়াছে, যদি কোন মমতাময়ের দৃষ্টিতে পড়িয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়! প্রথম আলোকে যতটুকু অনুভূতি আমার হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, ত্যাগের ভিতরেও ব্যাকুলতাভরা জননী-স্নেহ। সুশুভ্র বস্ত্রে, প্রকৃতির আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য শিশুটিকে অভাগী মা ঘেরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চেষ্টা তার নিষ্ফল, শিশু বাঁচিল না। আবার বিদ্যুতালোক। শিশুর মুখ দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকা, কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানির কাছে মুখ লইয়া আর একটা তড়িদ্বিকাশের প্রতীক্ষা করিলাম। বজ্রনিনাদে প্রচণ্ড আলোক লইয়া এবারে তড়িৎ যেন সে সুবর্ণ-শিশুর মুখের উপর উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিল। দেখিলাম, সে পদ্মচক্ষু কড়ির দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতেছে। বুক কাঁপিয়া উঠিল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—দশ বৎসরের লুক্কায়িত যাতনা লইয়া—দয়াময়ীর বুকে জড়ানো তার সকল মমতার সার। তার চক্ষু মুদ্রিত ছিল—এ চোখ মেলিয়াছে। মৃত্যু লুকাইয়া ছিল তার পলকের ভিতরে, এর মুক্ত পলকে তারার উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার অভাগিনী মা'কে শত ধিক্কার দিলাম। সামান্য একটু অশ্রু বুঝি চোখের কোণে আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিয়া, মুখটি ফিরাইয়াছি! না, না—এখনও ত বাঁচিয়া আছে! শিশুর কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

ভাবিবার আর অবকাশ পাইলাম না। বাঁচা মরার বিচার পরে। সেই অন্ধকারে পুঁটুলি বুকে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

৩

"ভুবনের মা!"

"এস বাবা, আমি ভাবছিলুম—বড় দুর্য্যোগ।" বাড়ীর দোর খুলিয়াই আবার সে বলিল—"তুমি আজ এমন সময় গঙ্গা স্নানে যাও, আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"দেখ দেখি, ভুবনের মা!"

ভুবনের মা পুঁটুলির দিকে চাহিয়াই বলিল—"কি ও?"

"দেখ দেখি বেঁচে আছে কি না?"

পুঁটুলির যত সন্নিকটে পারে চোখ দিয়াই ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! এ খুনের দায় কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

"যদি ম'রে থাকে, গঙ্গায় ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে আসি।"

ভুবনের মা আমার হাত হইতে শিশুটিকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। আলো জ্বালিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশু মরিয়াছে ভাবিয়া আমি বাহির হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"নিয়ে এস, ভুবনের মা।"

ভুবনের মা উত্তর দিল না—আসিলও না।

আমি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলাম—"দেরি ক'র না, ভুবনের মা! এর পর ফেলে দেওয়া কঠিন হবে।" এই সময় দুই একজন লোক বাড়ীর সুমুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছে। সুতরাং এবারে বেশ রুক্ষস্বরেই আমাকে বলিতে হইল—"করছিস্ কি বুড়ি, আমাকে বিপদে ফেলবি?"

"তুমি ঘরে এসো।"

গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—"আ পোড়ামুখী, সেই তুমি! কোন্ চুলো থেকে ফিরে এলে?"

বুঝিলাম মেয়ে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেঁচে আছে?"

"এসে দেখ—ভাল ক'রে দেখ—বুঝতে পারছ?"

"তাই ত, ভুবনের মা, এমন সাদৃশ্য ত দেখিনি!"

ভুবনের মা আলোর অতি সন্নিকটে শিশুর মুখখানি ধরিয়া বলিল—"সেই মুখ—সেই চোখ।"

"তার পর?"

"এখনও কর্ম্মভোগ আছে—আর পর কি! শীগ্‌গির গয়লা-বাড়ী থেকে দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে এস।"

দশ বছরের পর সেই প্রথম আমার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া গেল। সে দিন স্নান করিতে বাজিল নয়টা। জলে জলে আহ্নিক সারিয়া, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ—এই তিনটিকে মাত্র দেখার একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখনও দেখি,

ভুবনের মা মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ তৈল-ভূষিত করিয়া আগুন দিয়া তাতিতেছে।

"ভেজে মেরে ফেল্‌বি—বুড়ী?"

"না গো, তুমি আপনার কাজ কর। মেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হবে কেন? তাপ দিয়ে একটু কাহিল ক'রে দি।"

"বাঁচ্‌বে কি, ভুবনের মা?"

"বালাই! বেঁচেছে; আবার বাঁচ্‌বে কি!"

যেন একটা প্রচণ্ড আশ্বাসে, তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—সব বয়সের ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইলাম। ছবির পর ছবি আমার মানসদৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে আসিল। সন্ন্যাস লইবার সাধ তাহাদের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে!

ভাগ্যে গুরুদেব সে সময় কাশীতে ছিলেন না! থাকিলে বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত না।

দয়াময়ী আমাকেও লুকানো আমার মর্ম্মকথা বুঝি শুনিয়াছে। সতী বুঝি শুনিয়া স্বর্গেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তার বুকের ধন আমাকে দিবার জন্ত চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে নিক্ষেপ করিয়াছে!

সীতা, শকুন্তলাও ত এইরূপেই সংসারে আসিয়াছিলেন। এক জন পশিয়াছিলেন রাজর্ষি জনকের ঘরে, এক জন ঋষি কণ্বের। তবে আমার ঘরে ইহাকে রাখিতে দোষ কি?

কিন্তু ইঁহাদের অদৃষ্ট? মনে মনে প্রশ্ন করিতেও শিহরিলাম! না—না—এ কলিকাল! সকলের অদৃষ্টই কি একরূপ হইবে? না—না সুখী হ' শিশু, সুখী হ'।

৪

মেয়েটা ছয় মাসের হইয়াছে। ভুবনের মা সমস্ত মাতৃ-স্নেহ মেয়েটাতে ঢালিয়া তাহাকে ছয় মাসের করিয়া তুলিল। আর আমি? সত্য সত্যই এই অজ্ঞাত-কুলশীল—এই মায়ার ডেলাটাকে লইয়া আবার আমি কি সংসারী হইতে চলিলাম? বুড়ী সব কাজ ফেলিয়া তাহাকে লইয়াই একরূপ দিন কাটাইয়া দেয়। পালে-পার্ব্বণে এক আধ দিন সে ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহাকে এ, ও, তার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া। তাও যাওয়া নামমাত্র—যাইয়া একটু পরেই ফিরিয়া আইসে।

আর আমি? মনটাকে যথাশক্তি টানিয়া এখানে ওখানে লইয়া যাইতেছি—পূর্ব্বেরই মত নিত্যকর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু কর্ম্ম আমার ক্রমেই প্রাণশূন্ত হইতেছে। ভুবনের মা তাকে লালন করে, সর্ব্বদাই বুকে করিয়া রাখে, কিন্তু আমাকে দেখিলে শিশু যেন কি এক আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে; তা'র বুক হইতে আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। যেখানেই থাক, আমাকে দেখিতে পাইলে, সেইখান হইতেই হুড়হুড় করিয়া ছুটিয়া আইসে। কাঁদিতে একরূপ জানেই না—যদি কখন কাঁদে, আমাকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়।

দেখিতে দেখিতে শিশু ছয় মাসের হইল। যদি কন্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তা হইলে তার ত সংস্কার করিতে হইবে।

আমি ঠাকুর দেখা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া সবে মাত্র বসিয়াছি। ভুবনের মা অন্তদিন যেখানেই থাক, শিশুকে আমার কোলে দেবার জন্ত লইয়া আইসে। আজ সে নিজেই আসিল।

"খুকী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"না।"

"তাকে কোথায় রেখে এলে?"

"আছে গো ঠাকুর, তামাক খাও। তুমি যে আজ গিয়েই ফিরে আসবে, তা কেমন ক'রে জান্‌ব?"

সত্য সত্যই আমি কর্ত্তব্য ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঠাকুর দেখা আমার ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

ভুবনের মা'র কাছে মুখ রক্ষার জন্ত বলিলাম—"আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হয়—মেয়েটার ত একটা সংস্কার কর্‌তে হ'বে?"

"তা হবে বই কি, বাবা।"

"বড় সমস্তায় পড়েছি, ভুবনের মা। এই সময় ওর মুখে ত দুটি অন্ন দিতে হয়।"

"খুকীর অন্নপ্রাশনের কথা বল্‌ছ? তা ত দিতেই হবে।"

"তা তো হবে—কিন্তু—"

ভুবনের মা আমার মনের কথা ধরিয়া ফেলিল—"আবার 'কিন্তু' কিসের, বাবা, তুমিই ত ওর বাপ—তুমিই ত ওর মা।"

"আর তুমি?"

"আমি ওর যে দিদি ছিলুন, সেই দিদি।"

"বেশ জড়াবার ব্যবস্থা কর্‌ছিস ত বুড়ি! তা হ'লে জগতে এসে আর মা বাক্য উচ্চারণ কর্‌তে পেলে না?"

ঠিক এমনই সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে অতি মিষ্ট কণ্ঠে কে ডাকিল, "ভুবনের মা!"

"কেন, মা?"

"খুকী ঘুমিয়েছে।"

"বাবা, তুমি একবার ঘরের ভিতর যাও ত" বলিয়াই ভুবনের মা চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে দেখিব

না দেখিব না করিয়া দেখিলাম—এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী। ভুবনের মার অন্তরাল দিয়া সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিলাম মাত্র তার দুইটি চরণ—কি অপূর্ব্ব সুন্দর পা দুখানি! বর্ণ—কে যেন দুটি পায়ে দুধ-আলতা মাখাইয়া দিয়াছে। চরণের অনুপাতে মুখ যদি সুন্দর হয়, তা হ'লে এ তো অপূর্ব্ব সুন্দর রমণী।

ভুবনের মা ফিরিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে উনি গা?"

"তোমার এ মেয়েকে কি বাঁচাতে পারতুম বাবা, ওই মেয়েটি যদি না থাকত। ও প্রতিদিন এমনি সময় এসে খুকীকে মাই খাইয়ে যায়।"

উল্লাস-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ রকম খাওয়াচ্ছে কত দিন?"

"তুমি আন্‌বার চার পাঁচ দিন পর থেকে।"

"তবে ত আজ সকালে ফিরে বড়ই অন্যায় করেছি। তুমি এ কথা আমায় বলনি কেন?"

"তাতে কি হয়েছে—ও তোমার কন্যাই মনে কর।"

"তা হ'লে ত খুকীর মা আছে ভুবনের মা?"

"তা, স্তন্য দিয়ে যে বাঁচায়—সে মা বই আর কি? তুমি এখন খুকীর মুখে ভাত দেবার ব্যবস্থা কর।"

যথারীতি শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়া দিলাম। নিজেই তার পিতৃত্বের অধিকার লইলাম। নাম দিতে গিয়া দয়াময়ীর রহস্যের কথাটা মনে পড়িল। প্রথম সাগ্রহে তাকে বুকে তুলিয়া ডাকিলাম—"গৌরী!"

আরও পাঁচ মাস—গৌরীর বয়সের বছর পূরণ হইতে মাত্র একমাস বাকী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গুরু কাশীতে ফিরিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে গেলাম। ছোট গৈবী কূপের নিকটে একটি বাগানের ভিতর তিনি আসন করিয়াছেন। কাশীতে তাঁহার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিল না; যেখানে যখন সুবিধা হইত, সেইখানেই আসন পাতিতেন—এবারে পাতিয়াছেন গৈবীতে।

যাইয়া দেখিলাম, বহু লোক আসনের সম্মুখে বসিয়াছে। সকলেই আমার অপরিচিত। সকলে নীরবে বসিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত উপদেশ শুনিতেছিল। সকলের মধ্য দিয়া গুরুর সম্মুখে প্রণত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উপদেশ স্থগিত রাখিয়া তিনি আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। স্থান দেখিয়া যাহার পার্শ্বে বসিলাম, পরে পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার নাম ব্রজমাধব চক্রবর্ত্তী—পাবনার এক জন বিশিষ্ট জমীদার।

উপদেশ 'অস্তেয়' কথার অর্থ লইয়া হইতেছিল। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের ভিতরে 'যম' সাধনের ভিতর কথাটা আছে। সাধন-মুখে সাধককে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করিতে হয়—উহা তাহাদের মধ্যে একটি। উহার অর্থ অচৌর্য্য। তিনি বলিতেছেন, যোগ-সিদ্ধ হইতে হইলে চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিতে হইবে কায়-মনোবাক্যে। চোর কোনও কালে আত্মলাভ করিতে পারে না।

আগে ত জানিতাম, না বলিয়া পরের ধন গ্রহণ করার নাম চুরী। আর ধন অর্থে তুমি আমি চিরকাল যাহা বুঝিয়া আসিতেছি, তাহাই বুঝিতাম।

চুরীর এত অর্থ! আমার আসিবার পূর্ব্বে গুরু চুরীর কত উদাহরণ দিয়াছেন—আমি শুনি নাই। যাহা শুনিলাম, সে উদাহরণগুলা একত্র করিলেও যে একখানা মহাভারত রচনা হইয়া যায়! কাজের চুরী, মনের চুরী, বাক্যের চুরী—ভাবের ঘরে চুরী। এ কাহিনীর ভিতরে এত চুরীর কথা কহিবার স্থান নাই।

তাহাদের মধ্যে একটি অর্থ—শুধু সেইটিই তোমাদের শুনাইব। শুনিয়া আমি ও আমার পার্শ্বের উপবিষ্ট জমীদারপুত্র উভয়েই যুগপৎ শিহরিয়া উঠিয়াছি।

চৌর্য্যের নানা উদাহরণ দিতে দিতে হঠাৎ তিনি, আমি ও ব্রজমাধব উভয়েরই মুখের দিকে একটু দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এই মনে কর, লালসার চরিতার্থতার জন্য মানুষ কতই না চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কায়, মন, বাক্য, ভাব—যত প্রকারের চুরী আছে, এ হতভাগারা তার একটিও বাদ দেয় না।" বলিয়াই কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিয়া আবার বলিলেন—"অবৈধ সংসর্গের ফল।"

ব্রজমাধব, আমার মনে হইল, কথাটা শুনিতেই শিহরিয়া উঠিল।

গুরু বলিতে লাগিলেন—"নষ্ট করিল ত সেই হতভাগ্য জীবের জন্মের সমস্ত সার্থকতাটা চুরী করিল। শিশু মরিলেও তার পিতামাতা চোর, বাঁচিলেও চোর। রাখিল ত তার সমাজের আসন চুরী করিল; পথে নিক্ষেপ করিল ত তার প্রাপ্য, মাতৃস্তন্য, তার একমাত্র আশ্রয় মাতৃ-অঙ্ক—সেই সঙ্গে সঙ্গে আর কত বলিব—তার সব চুরী করিল।"

ব্রজমাধব একটু যেন চঞ্চল হইল।

"শেষকালে সেই হতভাগা হতভাগিনীর সমস্ত জীবন কেবল ভাবের ঘরে চুরী করিতে করিতেই কাটিয়া যায়। তার পর তারা হয় ত কত দান করিল, কত জলাশয়, কত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিল—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত জয়ধ্বনি শুনিল। কিন্তু শান্তি? সেই সমস্ত জয়ধ্বনির শিরে সেই পরিত্যক্ত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিতেছে!

সেই সুপ্ত স্বর তাহাদের সমস্ত শান্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"গুরুদেব! সে হতভাগা হতভাগিনীর কি মুক্তি নাই?"

"ভাবের ঘরে চুরী পরিত্যাগ না করিলে নাই।"

"সে কি করিবে?"

"সে চুরীর কথা প্রকাশ করিবে।"

"জগতের কাছে?"

"তা' করিতে পারিলে ত' তন্মুহূর্ত্তেই মুক্তি। না পারে, কোনও সাধুর কাছে, তাঁর শরণাগত হইয়া পাপ স্বীকার; তিনি তার মুক্তির উপায় বলিয়া দেন।"

ব্রজমাধব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"শুনিয়াছি, খৃষ্টানদের এইরূপ পাপ-স্বীকারের প্রথা আছে।"

এক জন ইংরাজীনবীশ শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তার নাম 'কনফেসন'। কোনও পাদরীর কাছে, পাপ-কথা বলিয়া আসিতে হয়। তিনি তার পাপমুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন —"যে সেই পরিত্যক্ত পুত্র কিংবা কন্যা কুড়াইয়া লয়—সেও চোর।"

সর্ব্বশরীরের রক্ত মুহূর্ত্তের ভিতরে মাথার দিকে ছুটিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম—"সেও চোর?"

"তুমিই বল না, অম্বিকাচরণ।"

"কেন প্রভু, এইরূপ বহু পরিত্যক্ত পুত্রকন্যাকে সাধুরা যে অনাথ-আশ্রমে স্থান দিতেছে।"

শুনিবামাত্র এমন তিরস্কারের সহিত আমার কথার তিনি উত্তর দিলেন যে, সকলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিতের মত হইয়া গেল।

"হতভাগ্য সন্ন্যাস লইবার জন্য আমাকে অস্থির করিছিলে, অথচ মায়ায় ও দয়ায় প্রভেদ বুঝিতে তোমার সামর্থ্য নাই! মনে কর, স্ত্রী-পুত্রকন্যার বিয়োগে মনস্তাপে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াই সেই অবস্থায় একটি শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়াছ। দয়া অথবা মায়া যে কোন একটার সাহায্যে তাহাকে তুমি পালন করিতে পার। যদি তৎপ্রতি মমতা হয়, অম্বিকাচরণ, তখন দয়ায় তাহাকে পালন করিতেছি, এ কথা বলিলেই তোমার ভাবের ঘরে চুরী হইবে। সেই শিশু যখন 'বাবা' বলিয়া তোমার গলাটা জড়াইয়া ধরিবে, তখন তোমার কি একবারও মনে উঠিবে না, আমি এই শিশুর পিতৃ-স্নেহ চুরী করিতেছি?"

আমারও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

"কি রাজমোহন, শুনছ?"

"ও চিরকালই শুনে আসছি প্রভু, কুলীনের ঘরে যখন জন্মেছি। কত চুরী নিজেই করলুম! করলুম কেন, এখনও করছি। কত দিন করব, তারই বা ঠিক কি!"

ফিরিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়সী সুকান্তদেহ পুরুষ সকলের একরূপ পশ্চাতে, সেই স্থানের এক প্রান্তদেশে বসিয়া আছে।

"তুমি ত সাধু হে—তুমি চুরী করতে যাবে কেন?"

"পাঁচ সাতটা বিয়ে করেছি, আমি সাধু?"

"কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন ত যেখানে যাইতেন, সেই স্থানেই একটা বিবাহ করিতেন! রাজমোহন, সংযমী যে, তার শত বিবাহেও ক্ষতি হয় না। অসংযমী একটা বিবাহেই শত অনিষ্টের সৃষ্টি করে।"

এইখানেই একরূপ কথার শেষ হইল। ব্রজমাধব গুরুজীকে প্রণাম করিয়া উঠিল। আমিও উঠিলাম। সহসা আমার দেহে যেন শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা ধরিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না।

আমি উঠিতেই গুরুদেব বলিলেন—"কি অম্বিকাচরণ, আমার সঙ্গে দিন কয়েক ঘুরে আসবে?

"এসে বলব, প্রভু!

"বেশ।" একটু করুণার হাসি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া দিল। দন্তের শুভ্রতার ভিতর দিয়া মনে হইল, আমাকে শান্ত করিতে তাঁর আশ্বাসের বাণী আসিতেছে।

পথে চলিতে ব্রজমাধবের সঙ্গে একটু পরিচিত হইয়া লইলাম। একবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই সাধুটির সঙ্গে যে কোনও সময়ে নির্জ্জনে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন?"

আমি বলিলাম—"চেষ্টা করিব।"

সুতরাং পরস্পরকে আমাদের বাসার পরিচয় দিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দ্বার খুলিতে ভুবনের মা'কে ডাকিলাম। যেমন দ্বারটি খোলা হইয়াছে, অমনিই মেয়েটা ভুবনের মা'র কোল হইতে ঝুঁকিয়া আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল।

"বা-বা-বা!

"ছাড়্, গৌরী ছাড়্!"

"বা-বা-বা!" যথাশক্তিতে দুইটি বাহুলতা দিয়া সে আমাকে বাঁধিয়াছে।

"ও মা ছাড়্!" তখন আমার চক্ষু জলে অন্ধপ্রায় হইয়াছে।

"একবার বুকে না নিলে কি ও ছাড়বে! এতক্ষণ ফেল্-ফেল্ ক'রে কেবল পথের পানে চাচ্ছিল।" বলিয়াই

ভুবনের মা সত্য সত্যই গৌরীকে আমার বুকের উপর তুলিয়া দিল।

হায়! এই বুকে আশ্রয় লওয়া ননীর পুতুলটি আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে? এরই নাম কি বৈরাগ্য?

৫

ক্ষুদ্র শিশু যেন কি বুঝিতে পারিয়াছে; বুঝিয়া শঙ্কিত হইয়াছে। নহিলে আজ আমাকে সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না কেন? আহ্নিক কার্য্য করিব, সে ঘাড়ে পিঠে কোলে উঠিয়া আমার জপ, তপ, সব গোলমাল করিয়া দিতে লাগিল। কোলে রাখিলে কাঁধে উঠিতে চায়, কাঁধে করিলে পিঠে ঝুলিবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়, পিঠে রাখিলে আবার কোলে শুইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখায়।

ভুবনের মা'র এত স্নেহ—এমন বুকে করিয়া-মানুষ-করা সে যেন ভুলিয়াছে—অকৃতজ্ঞার মত তার সমস্ত মমতা আমাকে ঢালিয়া দিবার জন্যই যেন সে আজ সঙ্কল্প করিয়াছে। "বা—বা—বা!" কতবার ভুবনের মা'র কোলে দিতে গেলাম, সে দু'টি কচি বাহু দিয়া আমাকে জড়াইয়া রহিল; কোলে দিলে আবার ঝাঁপাইয়া আমার কোলে আসিল।

"বা—বা—বা!" ভুবনের মা কাছে দাঁড়াইয়া আমার এ দুর্দ্দশা দেখিতেছিল, দেখিয়া যেন বিপুল সুখানুভব করিতেছিল।

"আমি কি আজ আহ্নিক পর্য্যন্ত করতে পাব না, ভুবনের মা?"

"তা আমি কি করব বাবা?"

"একটু নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এস।"

"অপর ঘরে নিয়ে যাও" বলাই আমার উচিত ছিল। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কতকটা আমি আত্মহারারই মত হইয়াছিলাম, কি বলিতে কি বলিলাম।

ভুবনের মা শুনিয়াই চমকিতার মত উত্তর করিল—"রাস্তায়?"

"ও ঘরে বলতে রাস্তায় বলেছি।"

অন্য ঘরে উপস্থিত হইতে না হইতেই গৌরী যাইবার পথেই কাঁদিয়া উঠিল। ভুবনের মা তাহাকে ভুলাইবার কত চেষ্টা করিল—তাহাতেও যখন তার রোদনের নিবৃত্তি হইল না, তখন বৃদ্ধা সত্য সত্যই তাহাকে পথে লইয়া গেল। ধার্ম্মিকা বৃদ্ধা আমার দুরবস্থাটা বুঝিয়াছিল। সে দেখিল, গৌরীর অত্যাচারে আমার সন্ধ্যা আহ্নিক কিছুই ত করা হইল না!

পথে লোকজনের যাতায়াত দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে শান্ত হইতে পারে। অনুমানে নির্ভর করিয়া ভুবনের মা তাহাকে বাড়ীর সম্মুখের পথে ভুলাইতে লইয়া গেল। শিশু ভুলিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

এই সময় যথাসম্ভব সত্বর জপকার্য্য সারিতে গিয়া দেখিলাম, আমি অশক্ত। মালার দুইটা বীজ ঘুরাইতে গিয়াই বুঝিলাম, গৌরীই আমার ধ্যান, আমার জপ, আমার তপস্যা! ওই ক্ষুদ্র শিশুই আমার মনের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ইষ্টচিন্তা করিতে গিয়া আমি কেবল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ গৌরীর সঙ্গে জড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না। কখন্ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের আমার ভস্মীভূত সংসার—আমার বাড়ী, ঘর, স্ত্রী সমস্ত যেন নূতন জীবনে জাগিয়া আমার পলক-বদ্ধ দৃষ্টিকে আক্রমণ করিল। সর্ব্বশেষে আসিল, গৌরীর মূর্ত্তি ধরিয়া—"বা—বা—বা" মুখ হইতে নূতন উচ্চারিত পিতৃ-সম্বোধনের চেষ্টায় চঞ্চল অধর দুটি লইয়া তাহার সেই মায়ের বুকের স্পন্দন-রহিত প্রাণশূন্য কন্যা। সেই উচ্চারণের ভিতর হইতে সে যেন আমাকে শুনাইতে লাগিল,—"বা—বা—বা—আমার মা ম'রে গেছে, কেবল বাবা তুমি আছ—তুমি আমাকে ফেলে দিও না।"

জপ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। "এ কি মায়া, না দয়া? গৌরি গৌরি, মা আমার, এই মালা হাতে ইষ্টমন্ত্র জপিতে গিয়া একবার যে বলিতে পারিতেছি না, তুমি আমার নও। পৃথিবীর যেখান হইতে যেখানেই যাই না কেন, তোমার স্মৃতি-পুত্তলী বুকে করিয়াই যদি আমাকে পথ চলিতে হয়, তা হইলে কেমন করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব?"

"বা—বা—বা"—আয় গৌরী আয়।

"জপ সাঙ্গ হ'ল কি, বাবা?"

"হয়েছেই মনে ক'রে নাও।"

"আজ এ এমনটা কেন করছে, বুঝতে ত পারছি না।"

"আমি বুঝেছি।"

"কি বল দেখি, বাবা—এখানে সেখানে নিয়ে কোথাও আমি একে শান্ত করতে পারলুম না!"

কোশা, কুশি, মালা—সমস্ত উঠাইয়া গৌরীকে কোলে লইলাম। কোলে আসিয়াই আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া অতি অবসাদে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তার ঘন-কম্পিত অভিমানের নিশ্বাস, তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির অজস্র স্পন্দন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

"জপ বুঝি শেষ করা হয়নি?"

"না।"

"তা আমি তোমার কথাতেই বুঝেছি। হাজার

কাঁদলেও আমি আর একটু পরে আসতুম। একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন বলেই ত আমাকে আসতে হ'ল।"

"কে তিনি ?"

"তাঁকে ত আর কখন দেখিনি।"

"কোথায় তিনি ?"

"পথেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করেই আন্‌ছিলুম। তুমি আহ্নিক কর্‌ছ শুনে তিনি আমাকে বল্‌লেন, তাঁর আহ্নিক শেষ হ'ল কি না, আগে দেখে এস।

গৌরীকে কাঁধে লইয়াই আগন্তুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। অন্য অন্য দিন গৌরী সে সময় ঘুমাইয়া থাকে—আজ সে আমার কাঁধে—এখনও ঘুমায় নাই। কিংবা যদিই সে ঘুমাইয়া থাকে, কাঁধ হইতে তাহাকে নামাইতে আমার সাহস নাই, পাছে কাঁচা ঘুমে জাগিয়া আবার সে গোলমাল করে।

বাহিরের দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখি—"এ কি আপনি ? ব্রজমাধব বাবু ?"

"আপনার আহ্নিক সারা হয়েছে ?"

"আপনার কি বিশেষ কোন দরকার আছে ?"

"কিছু প্রয়োজন আছে। অবশ্য সেটার জন্য কাল এলেও একেবারে যে চল্‌তো না, এমন নয়।"

একজন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রয়োজন আমার কাছে! সঙ্গে আলো লইয়া মাত্র একটি চাকর। ভাবে বোধ হইল, অনেকটা গুপ্তভাবেই তাঁর আসা। কারণ জানিবার আমার কৌতূহল হইল। আমি তাঁহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

৬

আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া এবার গৌরী ঘুমাইয়াছে। ভুবনের মাও একটু অবকাশ পাইয়া ভগবানের নাম লইতে বসিয়াছে। পাছে নাড়া-চাড়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার শিশু কাঁদিয়া উঠে, এই জন্য আমারই আসনের এক প্রান্তে সাবধানে তাহাকে শোয়াইয়া, নিজেই আর একটা আসন পাতিয়া ব্রজমাধব বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন না—বলিলেন, "খুকী আপনার স্থান দখল করেছে, আপনিই ওই আসনে বসুন।"

প্রদত্ত আসনে বসিবার বৈধতা যত প্রকারে বুঝান যায়, বুঝাইতেও যখন তিনি বসিতে চাহিলেন না, তখন অগত্যা আমাকেই সেই আসন গ্রহণ করিতে হইল। আমার সম্মুখে মেঝের উপরেই ব্রজবাবু বসিলেন। তাঁরই বামে আমার পূর্ব্বাসনে নিদ্রামগ্না গৌরী এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঘনঘুম ভেদ করিয়া তার অভিমানের আবেগ নিশ্বাস-কম্পনে উথলিয়া উঠিতেছে।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহার অত্যন্ত দীনতায় আমার মনে আধ্যাত্মিকতার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাত্তিরে বাসা খুঁজে এসেছেন। পথের পরিচয় কে দিলে ?"

"আপনারই গুরুদেব—সাধুবাবা।"

"আপনি ত সেইখানেই আমাকে দেখেছেন !"

"তখন পরিচয় পাই নাই। আপনি চলিয়া আসিবার পর আমি আবার সেখানে গিয়াছিলাম। তিনিই আমাকে ব'লে দিলেন।"

"কি প্রয়োজনে আগমন, বলুন।"

"আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য সাধুবাবাকে অনুরোধ কর্‌তে হবে !"

"আমাকে ?"

"আপনাকে।" বলিয়া ব্রজমাধ বাবু দীনতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

"আমি যে বাবু, আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না !"

"আমি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রস্তাব করেছিলুম। তিনি আপনার নাম করে বল্‌লেন, তার কাছে যাও, সে যদি আমাকে অনুরোধ করে, তা হ'লে তোমাকে দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি থাক্‌বে না।"

"এ যে আরও বড় হেঁয়ালি হ'ল, বাবু! আমি অনু-রোধ কর্‌ব, তবে তিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন !"

"এই ত তিনি বল্‌লেন।"

"কিছুক্ষণ নীরবে, কাঠের পুতুলের মত ব্রজবাবুর সম্মুখে বসিয়া এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহাকে বলিলাম "বেশ দুই জনে এক সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।"

"কাল কখন্ আপনার সময় হবে বলুন ?"

"গৌরী এই সময় ধীরে ক্রন্দনের একটি সুর ধরিয়াই যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"বল্‌ছি" বলিয়াই গৌরীকে ঘনঘুমে আচ্ছন্ন করিতে আমি তার মাথায় ধীরে চাপড় দিতে আরম্ভ করিলাম। ব্রজবাবুও একবার স্থিরনেত্রে সেই বালিকার মুখের পানে চাহিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম—"এখনও আপনার কথা আমার হেঁয়ালির মত ঠেকছে। আমি আপনার জন্য কি অনুরোধ কর্‌ব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবে আপনি যখন মিথ্যা বল্‌ছেন না—তখন আমি যাব। সকাল-বেলায় পার্‌বো না—বিকালে।"

"বিকালে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমি চাই কিছুক্ষণের জন্য নির্জ্জনতা।"

"দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় জানাবেন, তাতে নির্জ্জন হবার এত কি প্রয়োজন ?"

ব্রজবাবু কি যেন উত্তর দিতে গিয়া নিবৃত্ত হইলেন, কহিতে কহিতে কথাগুলা যেন তাঁর ঠোঁট দু'টায় আবদ্ধ হইয়া গেল।

"বুঝ্‌তে পেরেছি, গুরুদেবকে বল্‌বার এমন কতকগুলি আপনার কথা আছে, যা লোকের কাছে বল্‌তে আপনার সঙ্কোচ হবে। কোনও কিছু বিষম ভুলের কাজ।"

"আছে" বলিয়াই ব্রজবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

আমি তাঁর অবনত মুখের পানে একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, কি যেন একটা প্রচণ্ড অনুতাপের জ্বালা তাঁর মুখের উপর লীলা করিতেছে। বলিলাম—"বুঝেছি। তবে মহাপুরুষের চরণাশ্রয় নেবার সদ্‌বুদ্ধি সত্যই যদি আপনার জেগে থাকে, তা হ'লে সংসারীর দুর্ব্বল চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে চল্‌বে না। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সত্যপথ অবলম্বনের তিনটি প্রচণ্ড বাধা। আমার বোধ হয়, আপনি আজ একটা শুভ সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। জোর ক'রে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে অন্তরটা উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই আপনার উচিতছিল।"

ব্রজমাধব মুখ তুলিয়া একটা যেন বিপুল হতাশার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি তাঁর মনের অবস্থাটা তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম। তবু আমাকে বলিতে হইল—"সাধুসঙ্গ জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন বটে, কিন্তু তাঁর কৃপালাভ জীবনের এক সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় মুহূর্ত্তেই ঘ'টে থাকে। সে মুহূর্ত্ত একবার চ'লে গেলে হয় ত সারা জীবনের মধ্যে আর ফিরে আস্‌বে না।"

"তবে কি তাঁর কৃপা আমার ভাগ্যে হবে না ?"

"আমি এর উত্তর দিতে পার্‌লুম না।"

"পারেন, দিলেন না।"

"না বাবু, আমি আপনাকে প্রতারণার বাক্য বলি নি। সাধু মহাপুরুষদের ক্রিয়া-রহস্য আমাদের মত সংসারীর পক্ষে বুঝা বড় কঠিন। কঠিন বল্‌ছি কেন, অনেক সময় বুঝা অসম্ভব।"

"তবে তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন কেন ?"

ব্রজবাবুর কথায় একটু উত্তেজনার ভাব দেখিলাম। সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম—"এ পাঠানর রহস্য, আপনাকে সত্য বলছি, আমি এক বিন্দু বুঝ্‌তে পারছি না।"

"আপনি তা হ'লে অনুরোধ করছেন না ?"

ঠিক এমনই সময়ে গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার অনেক বিবেচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিবার মত তাঁর প্রশ্ন নয়! ব্রজমাধব বাবুকে সেই বিকালের পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। তাঁর বাড়ী পাবনায়, আমার বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামে। কাশীতে উভয়েই উপস্থিত না থাকিলে কখনও কোনও কালে আমাদের পরস্পরের দেখারই সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এরূপ লোকের জন্য গুরুর কাছে আমি কি অনুরোধ করিব ? ব্যাপার বৈষয়িক নয়, আধ্যাত্মিক। বিষয়ীর চক্ষুতে ব্যাপারটা তুচ্ছ হইলেও, যে ধর্ম্মপথে চলিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহার কাছে দীক্ষার ব্যাপার ত তুচ্ছ নয়! এ পথে চলিবার একটা ভুলে কখন কখন সারাজীবনের চলা নিষ্ফল হইয়া যায়।

গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ কি তবে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ-যোগ্যতার পরীক্ষা ?

খুঁৎ খুঁৎ করিয়া গৌরী উত্তর দেওয়ার দায় হইতে আপাততঃ আমাকে রক্ষা করিল। "বল্‌ছি" বলিয়াই আমি গৌরীকে কোলে উঠাইলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার জাগরণের ভাব দেখাইল। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"তোর আজ মতলবটা কি বল্ দেখি ? ধ্যান, জপ ত পণ্ড ক'রে দিলি, বাবুর সঙ্গে কথা কব, তাও কি কর্‌তে দিবি না ?"

"মেয়েটি আপনার কে ?"

"কাশীস্থান, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দেব কেমন ক'রে, বাবু!"

"এমন সুন্দর শিশু আমি অল্পই দেখেছি।"

"এটি আমার কেউ, এ কথাও বল্‌তে পারি না; কেউ নয়, এ কথাও বল্‌তে পারি না।"

"আমি মনে করেছিলুম, আপনার কন্যা।"

"কন্যা; আমিও ত মনে কর্‌তে চাই। সীতা যদি জনকের কন্যা হন, তা হ'লে গৌরীই বা আমার কন্যা হবে না কেন ? কুড়িয়ে পাওয়া কন্যার বাপ হয়েও জনক জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। কিন্তু এ রাক্ষসী যে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খেয়ে দিলে। কন্যা বল্‌তে যে আমার ভয় হয়!"

"আপনি একে কুড়িয়ে পেয়েছেন ?" বলিতে বলিতে ব্রজনাথ, সতৃষ্ণ ভাবে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম, দেখিতে গিয়া তাঁর শরীর যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। এ বালিকার

হৃদয়ের সঙ্গে এ স্পন্দনের কিছু সম্পর্ক আছে নাকি? আমি বলিলাম—"কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ব্রজমাধবের মুখের উপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কতকগুলা কালিম তরঙ্গ খেলা করিয়া গেল।

উভয়েই আমরা কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—গৌরীকে লাভ করিবার অবস্থা হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিয়াছে!

ব্রজমাধব বলিলেন,—"কাল তা হ'লে আস্‌ব কি?"

কথা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না। গৌরীকে পরিত্যাগের কথা মনে আনিতেই আমার হৃদয় ভার হইয়া উঠিতেছে। আমি পূর্ব্বপ্রসঙ্গের অনুসরণে বলিলাম—"ব্রজমাধব বাবু, সে এক ইতিহাসের কথা। সদ্যোজাত শিশু কোলে বসুদেব যখন নন্দগৃহে চলেছিলেন, তখন কি প্রকৃতি তার চেয়েও ভীষণ অবস্থা ধরেছিল?"

প্রাণ যেন বুকের কোন্ নিভৃত দেশে লুকাইয়া দারুমূর্ত্তির মত আমার পানে ব্রজমাধব চাহিয়া রহিলেন।

দেখিয়া, জোর করিয়া হৃদয়ের আবেগ স্থগিত করিলাম। "আর বল্‌ব না, বাবু! ব'লে অনর্থক আপনার প্রাণে কষ্ট দেব না। শুনে দেখ্‌ছি আপনারও করুণার প্রাণ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বল্‌তে গেলে এর মা-বাপের উপর আমার রাগ হয়—তাদের শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয়। আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি। না না চুরী করেছি। আপনি ত শুনেছেন, ওই যে গুরু বল্‌লেন চুরী! তার ফলে এই আমার অবস্থা।" বলিতে গিয়া অবশ্য শিশুর গোলাপ-বর্ণ পা দু'খানি হইতে মুখখানি পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। আমার চোখেরই ভ্রম, না দুষ্ট মেয়েটার দেয়ালা—তার ঘুমন্ত মুখখানা একবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তারা দু'টা একবার দীপ্ত হইয়া আবার ঘুমের লহরে ডুবিয়া গেল।

"ব্রজমাধব বাবু, এ আমার দয়া না মায়া?"

অর্দ্ধ-নিরুদ্ধকণ্ঠে ব্রজমাধব উত্তর করিলেন—"দয়া।"

আমি মাথা নাড়িলাম। "তবে ছাড়্‌বার কথা মনে উঠ্‌তেই আমি পাগলের মত হয়ে যাচ্ছি কেন?"

"ছাড়্‌বেন কি?"

"ছাড়্‌বো না?"

"না—না! দয়া ক'রে যখন এটিকে একবার বুকে তুলে নিয়েছেন।" বলিয়াই ব্রজমাধব একটি অঙ্গুলি দিয়া অতি সন্তর্পণে গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"ছাড়্‌বো না?"

"কিছুতেই না। এই কন্যার ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব—ভালরূপ ব্যবস্থা—আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি।"

"না ছাড়্‌লে যে আমি চোর হব!"

"চোর? পৃথিবীতে এমন পাষণ্ড কেউ নেই, যে আপনাকে ওই হীন কথা বল্‌বে।"

আমি হাসিলাম—"গুরু যে বললেন, ব্রজমাধব বাবু! আপনি ত শুনেছেন! শুনে বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আজ প্রথম এ আমাকে বাবা বলবার চেষ্টা করেছে, হয় কাল, না হয় পরশু বল্‌বে; বল্‌বেই। বলবার এমন চেষ্টা আর কোনও শিশুতে দেখেছি ব'লে আমার মনে হয় না। একবার যখন সে সুস্পষ্ট আমাকে বাবা ব'লে ডাক্‌বে, সে পিতৃ-সম্বোধনে আমি কেমন ক'রে উত্তর দেব?"

"কেন দেবেন না? স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে আপনাকে উত্তর দিতে নিষেধ কর্‌লেও আপনি শুন্‌বেন না। আপনি এ শিশুর বাপ, মা, শরণ—ভগবান্।"

"উত্তর দিলেই ত চোর হব, ব্রজমাধব বাবু! গুরুর বাক্য ত মিথ্যা হ'তে পারে না!"

ব্রজমাধব স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। তাঁর আর একটা কথার প্রতীক্ষা—আর একবার—কেবলমাত্র একটিবারের মত এখন যদি ব্রজমাধব আমাকে বলেন, আপনিই এর পিতা, তা হ'লেই বুঝি চোর হওয়া থেকে আমি রক্ষা পাই। ব্রজমাধব কিন্তু একটা নিশ্বাসের শব্দ দিয়াও আমার সাহায্য করিলেন না।

"বাবা! রাত ঢের হয়েছে, খুকীকে আমার কাছে দিয়ে যাও।"

"তুমি এসে নিয়ে যাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা কইছি।"

ভুবনের মা গৌরীকে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইতেই ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কে?"

"তিনিই ঐ শিশুর মা, বাপ, শরণ ও ভগবান্। গৌরী যে এই এগারো মাস বেঁচে আছে, সে কেবল ওই মমতাময়ীর কৃপায়।"

"আপনার কি স্ত্রী নাই?"

"এক সংসার—স্ত্রী, পুত্র-কন্যা—রোগ উদরস্থ করেছে, আর এক সংসার গ্রাস করেছে অগ্নি। সন্ন্যাসী হব ব'লে দেশত্যাগ করেছিলুম—বিশ্বনাথের আশ্রয়ে এসে লাভ কর্‌লুম ওই কন্যা।"

"আপনাকে কিছুতেই ওটিকে ত্যাগ কর্‌তে দেব না।" ব্রজমাধব উঠিলেন।

"কাল বিকালে কোথায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব?"

"আমিই আপনার কাছে আস্‌ব।"

দ্বার পর্য্যন্ত আমি তাঁর অনুগমন করিলাম। বিদায় গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন—

"আমি ইচ্ছা কর্‌ছি আপনার ওই কন্যাকে—"

"থাক কাশীতে প্রতিশ্রুতি কর্‌বেন না। মনের ইচ্ছা এখন মনেই রাখুন।"

৭

ভুবনের মা'কে ত অন্তরের কথা গোপন করিলে চলিবে না! কিন্তু কেমন করিয়া তার কাছে গৌরী-ত্যাগের কথা তুলিব? কি প্রকারেই বা ত্যাগ করিব? এক জনকে ত সমর্পণ করিতে হইবে! শিশুর বাপ-মা? এই এগারো মাস পরে কেমন করিয়া তাদের খুঁজিয়া বাহির করিব? সন্ধানের সুযোগ যদিও কিছু থাকিত তা বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। যদি কিছু থাকিত—সুযোগ ছিল, সেই এগারো মাস পূর্ব্বে—যে সময় এই শিশুকে আমি লাভ করি। এখন যেন বোধ হইতেছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিই সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছি। সমাজ-শাসন—কেহই ত এখন আমার গৌরীর মা-বাপ হইবার অপরাধ স্বীকার করিবে না! তবে কার হাতে আমি বা—বা বলা এগারো মাসের গৌরীকে তুলিয়া দিব?

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। গভীর অন্তর্য্যাতনায় আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া ছাতে উঠিলাম। চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না—গঙ্গার একরূপ উপরেই আমার বাসা—পূর্ব্বপারে, কাঞ্চন-কান্তি নদীসৈকত—চাহিতেই মনে হইল, যেন চঞ্চল বায়ু-তরঙ্গ গৌরীর রূপোল্লাস তীরভূমি হইতে গঙ্গার বুকে ছড়াছড়ি করিতেছে। দূর ছাই, গুরুর কাছে না গিয়া দেখিতেছি আমার নিস্তার নাই।

"বাবা!"

নীচে নামিয়া উত্তর করিলাম—"কেন ভুবনের মা? গৌরী কি আবার জেগেছে?"

"না।"

"তার কি কোন অসুখ করেছে?"

"বালাই!"

"কি জন্য আমাকে ডাক্‌লে?"

"তুমি আজ ঘুমুতে পার্‌ছ না কেন?"

"কেন পার্‌ছি না, বল্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"বাবাজীর কাছ থেকে এসে অবধি তুমি কেমন ছট্‌ফট্ কর্‌ছ!"

"তুমি মিছে বল নি—আমার মনটা হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।"

"কেন হয়েছে বুঝ্‌তে পেরেছি। মেয়েটা দিন দিন তোমাতে বড় ন্যাওটো হয়ে পড়ছে।"

"তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ।"

"আজ তাকে শান্ত কর্‌তে আমি হার মেনে গেলুম।"

"কি করি, ভুবনের মা, ছুটো সংসার পেটে পূরে আমি যে কাশীতে এসেছি!"

"আজ তুমি ঘুমোও।"

"গুরু বল্‌লেন, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এসেছে।"

"এ ত ভাগ্যের কথা, বাবা। এসে থাকে, নেবে।"

"কেমন ক'রে নেবো?"

"সে আমি কি ক'রে বল্‌ব, বাবা?"

"গৌরী?"

"তার ভাবনা যে জন্মকাল থেকে ভেবে আসছে, সেই ভাববে।"

ভুবনের মা'র উত্তরে আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মা, বাপ, আশ্রয়—সমস্তই বলিতে একমাত্র যার অধিকার, তার মুখ হইতে হঠাৎ এরূপ নির্ম্মমতার কথা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। তবু তার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"পারি না পারি, এক দিন ছাড়তেই ত হবে, বাবা!"

আরে ম'ল, বুড়ী বলে কি! আমি ত মনে করিয়াছিলাম, কোন গতিকে আমিও যদি মেয়েটাকে ছাড়িতে পারি, এ বুড়ী পারিবে না। আমি ত শুধু নিজের জন্য অস্থির হই নাই, ভুবনের মা'র জন্যও হইয়াছি। এত স্নেহ সন্তানের প্রতি কোন মায়েরও যে আমি কোন কালে দেখি নাই!

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"তোমার এক ছেলে এক মেয়েকে একবার ছেড়েছি—তার পর সেই সর্ব্বনাশীটাকে ছেড়েছি—তার মা কে—" আর ভুবনের মা বলিতে পারিল না।

"তুমি তাদের ছেড়েছো কই, ভুবনের মা, তারাই তোমাকে ছেড়েছে। এ-ও যদি সেই রকম ক'রে তোমাকে ছাড়ে, তবেই ত তুমি ছাড়্ পাবে।"

"বালাই, ওকে এবারে ছাড়্‌তে দেব কেন—আমি ছাড়বো—আমাকে ছাড়ার শোধ নেব।"

"বেঁচে থাক্‌তে?"

"আমি আর ক'দিন বাঁচব?"

যে যার মনের ভাব বুঝিয়া লইলাম; বুঝিয়া কিছু ক্ষণের জন্য চুপ করিলাম। ভুবনের মাও কিছুক্ষণ নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর বলিল—"আজ ঘুমোও—রাত্রি অনেক হয়েছে।"

তার কথায় বোধ হইল, বৃদ্ধা আমার পূর্ব্বেই গৌরীর

ভবিষ্যতের আশ্রয় খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছে, বুঝি সে সন্ধান পাইয়াছে। "আজ ঘুমোও, মানে কি ভুবনের মা ?"

"আজ আর ও কথা কেন, বাবা ? যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার কাল ক'র।"

"বল্‌তে কি বাধা আছে ?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না। দিল না বলিতেছি কেন, দিতে পারিল না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, কালই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছি, ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"তোমার কাছে গোপন কর্‌বার কি আছে, বাবা! তবে সমস্ত না জেনে বল্‌তে যাব, কাশীস্থান, কি বল্‌তে কি ব'লে অপরাধী হব, তাই তোমাকে আজ আর কিছু বল্‌ছি না। আজ সে আসে নি, কালও যদি সে না আসে ?"

এ "সে" যে কে, আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিন তার চরণ ছু'টিমাত্র দেখিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজও পর্য্যন্ত মেয়েটি কি গৌরীকে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে ?"

"শুধু আজ সকালে আসে নি, বাবা! এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিনের জন্যও তার আসার কামাই ছিল না।"

"বুঝেছি, ভুবনের মা, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌বার ব্যবস্থা কর!"

"নিশ্চিন্ত বিশ্বনাথই কর্‌বেন।"

বাস্তবিক তার পর শুইতে গিয়া এমন ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, জাগিয়া দেখি, গৌরী আমার আগে জাগিয়াছে।

৮

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি, গৌরী হামাগুড়ি দিয়া সমস্ত বারান্দাটায় ছুটাছুটি করিতেছে; এক একবার যে ঘরে ভুবনের মা থাকে, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভিতরের দিকে চাহিতেছে। তাহার দৃষ্টি উপরে উঠিতেছিল। মনে হইল, ঘরের ভিতরে কাহারও মুখের পানে সে চাহিতেছে।

আমি ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

আমার কণ্ঠস্বরে বালিকা আমার কাছে ছুটিয়া আসিল, এবং পিতৃসম্বোধনের প্রয়াস করিল। ঘরের ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

বালিকাকে কোলে উঠাইয়া আবার ডাকিলাম "ভুবনের মা! ভুবনের মা, ঘরে আছ ?"

"তিনি স্নানে গিয়েছেন।"

সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বে দেখা নারীর মধুর কণ্ঠ! আজ তাহার সঙ্গে আমার কথা কহিতে হইবে। কহিতেই হইবে। আমার অনুমান সত্য কি না বুঝিবার প্রয়োজন। আমি বলিলাম—"মা! আমাকেও যে স্নানে যেতে হবে। আজ আমার উঠ্‌তে অসম্ভব বেলা হয়েছে।"

"ওকে রেখে যান।"

গৌরীকে কোল হইতে ভূমিতে রাখিতে গেলাম। বালিকা তাহার চিরপ্রথামত আমার গলা জড়াইয়া ধরিল; হাত ছাড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম, "মা!" উত্তর পাইলাম না। "আমাকে এ বিপদ্ থেকে মুক্ত কর। আমি তোমার সন্তান—সন্ন্যাসী। সন্তানের কাছে তার মা আস্‌বে—সঙ্কোচ কেন ?"

মা যেন তাহার সঙ্গে আমার সন্তান সম্বন্ধ আগে স্থির করিয়া লইলেন, তাহার পর বাহিরে আসিলেন; নহিলে এ কি দেখিলাম! এই কি কবি-কল্পিত রূপ—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী ? মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা প্রবল শক্তিতে দ্রুত স্পন্দন আমার সর্ব্বশরীরকে এক মুহূর্ত্তে অবশ করিয়া দিল। গৌরী নিজের হাত দুটি দিয়া আমার গলা ধরিয়া আত্মরক্ষা না করিলে, বোধ হয় বারান্দায় পড়িয়া যাইত।

মা বুঝি আমার অবস্থা বুঝিলেন, যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকটে আসিয়া গৌরীকে আমার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন।

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়াই যথাশক্তি আত্মগোপন করিয়া আমি বলিলাম - "মা! ভুবনের মা'র ফিরে আসা পর্য্যন্ত তোমাকে যে অপেক্ষা কর্‌তে হবে।"

"আপনি কখন্ ফির্‌বেন ?"

"ঠিক বলা অসম্ভব।"

"ভুবনের মা আমাকে ব'লে গেল, আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।"

"জিজ্ঞাসা কর্‌ব অনেক কথা। তুমি কি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে ?"

মা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। পা হইতে মাথা—কাঞ্চন-গৌরীর সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বের দেখা চরণ—অঙ্গুলিগুলাই যেন বিশ্ব-শিল্পীর রচনার কথা শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পা হইতে মাথা—যেমন দেখা, সর্ব্বশরীরের অমনই আবার শিহরণ আসিল। গৌরী এই সময়ে স্তন্যপানের ব্যাকুলতায় তাঁহার বক্ষের বসন লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

ভাগ্যে মর্য্যাদাবোধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। মনে মনে বারংবার মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"বিকালে আস্‌তে পার্‌বে কি ?"

"আপনি আসুন।"

* * * *

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কমণ্ডলু-হাতে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, উপর হইতে আমাকে দেখিয়াই বুঝি গৌরী ডাকিয়া উঠিল—"বা-বা-বা।"

"চুপ, পিছু ডাকিস্‌নি, হতভাগী!"

দেখিব না দেখিব না করিয়া উপরদিকে চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই কনক-চম্পকদাম-গৌরী—কোলে কনক-চম্পক-কোরক গৌরী!

৯

মা, মা, মা! গঙ্গাগর্ভে বার বার ডুব দিলাম। প্রতি নিমজ্জনে মাতৃ-নাম উচ্চারণ করিলাম। কই, রূপ-মোহ ত ধৌত হইল না! অন্নপূর্ণার মন্দিরে—কই মা, তোমার রূপের সঙ্গে সে-রূপ মিলাইতে যাই—মিলিতে মিলিতে সে আবার মাথায় মোহ ঢালিয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসে কেন?

এ দেবতা সে দেবতার মন্দিরে ঘুরিয়া বেলা দশটা অতীত করিয়াও যখন চিত্ত শান্ত করিতে পারিলাম না, তখন অনন্যোপায়—ঘরেই ফিরিলাম। সেরূপ চঞ্চল-চিত্ত লইয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমার সাহস হইল না। বাড়ীর দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই দেখি, ভুবনের মা বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে।

"বাড়ীর দোর খুলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে, ভুবনের মা?"

"মেয়েটিকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।"

"এতক্ষণ সে ছিল?"

"তোমারই ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল।"

"আমি যে তাকে বিকালে আসতে বলেছিলুম।"

"বিকালে তার ঘর থেকে বেরুনো বড় কঠিন।"

"সকালে তবে কেমন ক'রে আসে সে?"

"স্নান কর্‌তে আসে, সেই সময় এ বাড়ী একবার হয়ে যায়।"

"কতক্ষণ সে গেছে?"

"এই যাচ্ছে।"

"তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল মাত্র।

"যদি বেশী দূর না গিয়ে থাকে, তাকে আর একবার আন্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।"

ভুবনের মা নড়িল না। কতকগুলা লোক এই সময় আমার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। ভুবনের মা আমার মুখ দেখিয়া আমার ভাবান্তর কি লক্ষ্য করিয়াছে? লোকগুলা চলিয়া গেলে সেই সুন্দরীকে ফিরাইয়া আনিবার কথা আবার যেই আমি তুলিয়াছি, অমনই ভুবনের মা আমাকে তিরস্কার করিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল—"ছি বাবা!"

"ছি মানে কি, ভুবনের মা?" তাহার ওই ক্ষুদ্র কথাটিতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে।

"আর পথে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে চল।

"তা তো যাবই, কিন্তু তোমার ও কথা বল্‌বার অর্থ কি?"

"সে ত রোজই আস্‌ছে। যদি কিছু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, কাল কর্‌লে চল্‌বে না?"

আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভুবনের মা আমার অনুসরণ করিল। প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী?"

"অনেকক্ষণ ধ'রে মাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হাত পা ধুইয়া একটি হুঁকা হাতে বারান্দায় বসিয়াছি, গৌরী কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইতে আমি ভুবনের মা'কেই আদেশ করিলাম। সে নীচে আমার রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল। বলিল—"আমার হাত জোড়া।"

সুতরাং আমাকেই গৌরীকে তুলিয়া আনিতে হইল। কিন্তু তাহাকে বুকে তুলিয়া আজ তেমন তৃপ্তি পাইতেছি না কেন? গৌরীরও যেন আমার কোলে উঠিতে তেমন আগ্রহ নাই। কোলে বসিয়া ব্যাকুলার মত এক এক-বার সে চারিধারে চাহিতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বৃদ্ধাকে ডাকিলাম—"হাত খালি হ'ল, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা উপরে আসিয়া উত্তর করিল—"কি বল। আমি এইবারে একবার বিশ্বনাথ দর্শনে যাব মনে কর্‌ছি।"

"তা হ'লে একেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে না?"

"আমি পার্‌ব না কেন—এ যে সেই মেয়েটিকে খুঁজছে?"

"রোজই খোঁজে, আজ একটু সে বেশী নাড়া-চাড়া ক'রে গেছে কি না!"

"এটি কি তারই, ভুবনের মা?"

"এ কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে বাবা!"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছ?"

"না।"

"এই এতকালের ভিতর একদিনও কি জান্‌বার চেষ্টা করনি ?"

"কি জন্ত কর্‌ব ? জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে যদি স্বীকার না করে ? কাশীতে আমি তার পাপের কারণ হব ? এক পাপ ঢাক্‌তে আর এক পাপ—আমার দরকার কি, বাবা !"

"কিন্তু এবার যে জান্‌তেই হবে, ভুবেনর মা !"

"বেশ, কাল ত সে আস্‌বে, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'র।"

"কাল সে আস্‌বে ?"

"বরাবরই ত আস্‌ছে—একদিন মাত্র আস্‌তে পারে নি।"

"কেন আসে নি, জিজ্ঞাসা করেছিলে ?"

"এই যে বল্‌লুম, যদি ঠিক উত্তর না দেয় ?"

"ভুল হয়েছে, ভুবনের মা, এখন দেখ্‌ছি তোমারই কাশীবাস সার্থক। আমি এখানে বিশ্বনাথকে তামাসা কর্‌তে এসেছি।"

বৃদ্ধা কোনও কথা কহিল না। ভাবে বোধ হইল, আমার সুখ্যাতি করা তাহার ভাল লাগিল না।

"তা হ'লে আমি কি কর্‌ব ?"

"জানবার ?"

"আমাকে যে জান্‌তেই হবে।"

"কাল এলে জিজ্ঞাসা ক'র।"

"তুমি যে কি বল্‌লে !"

"সে কথা এখনও ধ'রে রেখেছে, বাবা ! এ শিবস্থান বটে—এক দিকে যেমন এ স্থানের তুলনা নেই, অন্তদিকেও সেইরূপ—তুলনা নেই। তোমার সম্বন্ধে, যতদূর জানি, আজও পর্য্যন্ত কেউ কিছু অন্তায় বল্‌তে পারে নি। যাতে কথা উঠতে পারে, এমন কাজ কর্‌বার দরকার কি, বাবা !

"কিন্তু ভুবনের মা, আমার বয়স ষাট বৎসর।"

ভুবনের মা শুধু হাসিল।

"এখনও কি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় ?"

"আমার না হ'তে পারে, লোক কিন্তু হিসেব ক'রে নিন্দা করে না। কত সাধু সন্ন্যাসী এখানে অপবাদের হাত এড়াতে পারেন নি।

"থাক্, আর তোমার সুখ্যাতি কর্‌ব না, ভুবনের মা, তুমি চ'টে যাবে। গৌরী থাক্, তুমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরে এস।"

গঙ্গাস্নান করিয়া- অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে গিয়াও চিত্তের যে শান্তি পাইলাম না, ভুবনের মা'র এক কথাতেই আমার তাহা লাভ হইয়া গেল—আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শান্তচিত্তে গৌরীকে খানিকটা আদর করিলাম। সে তাহার শুশ্রূষাকারিণীর উদ্দেশে এদিক্ ওদিক্ দেখা ভুলিয়া গেল।

১০

এক হাতে একটি মিষ্টান্ন, অন্ত হাতে একটি খেলনা দিয়া, নিত্য যেমন করিয়া থাকি, গৌরীকে বসাইয়া সবে মাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছি, বাহিরে সেই কণ্ঠ উঠিল —"কই গো মা !"

বুকটা আবার গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। এ কি বিপদে পড়িলাম ! আমার বয়স যে ষাট বৎসর ! আর আমার প্রথমা কন্তা জীবিত থাকিলে বয়সে ওই মেয়েটিরই মত যে হইত ! উত্তর দিবার বৃথা চেষ্টা, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, গৌরী পাঁড়া, ঝুম-ঝুমি ফেলিয়া একটা উল্লাস সূচক ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবার গৌরীকে কোলে লইয়া আকাঙ্ক্ষার দৃশ্য আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"এসো।" আমি "মা" বলিতে ভুলিলাম।

"মা এখনও ফিরে আসেন নি ?"

"তার সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে ?"

গৌরী আবার স্তন্তপানের জন্ত ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিল।

"বাবা, একটু অপেক্ষা করুন; আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি"—বলিয়াই গৌরীর হাত ধরিয়া তাহার স্তন্ত-পানের ব্যাকুল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে সুন্দরী উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি, কোন কথা না বলিয়া, বসিয়া, কেবল তাহার সেই চেষ্টাজনিত দৈহিক-চাঞ্চল্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

তাহার সঙ্কোচাধিক্যে আমার মনে বিরক্তির উদয় হইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, সে-ই গৌরীর গর্ভধারিণী। বালিকার উপর এত স্নেহ, তাহার জননী ব্যতীত আর কাহাতে সম্ভব হইতে পারে ? এই নষ্টচরিত্রা আমার মত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেই এতটা সঙ্কোচ কেন দেখাইবে ? কথার কৌশলে সে কথাটা রহস্য করিয়া শুনাইতে আপত্তি কি ? আসুক ঐ গৌরীর মা ফিরিয়া।

তখন আমি আপনার মনের ভাব তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। রূপের বহ্নি যে জরা-শুষ্ক মানুষকেও দাহ করিতে পারে, অভিজ্ঞতার অভাবে—আর বোধ হয়, আপনার

বৈরাগ্যগর্ব্বেই তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। হায় মানুষ! কিন্তু তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

একটু পরেই শান্ত গৌরীকে বুকে করিয়া তিনি যখন আবার ফিরিলেন—আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার সমস্ত মনটা স্কন্ধন্যস্তমস্তক বালিকার উপর—নিরর্থক দৃষ্টি সে যেন আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছে।

তখন যেন অন্ধকারে বিদ্যুদালোকে আমি আমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিলাম—এ কি বন্দিদশা!

গুরু আজ আমাকে ঘনান্ধকারে প্রচণ্ড পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। নহিলে কোথায় থাকিত আমার সন্ন্যাস, কোথায় থাকিত আমার মনুষ্যত্ব? সম্মুখে কবি-কল্পিত রূপরাশি লইয়া আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা দৈহিক-বলহীনা নারী! আমি তাহাকে, কথায়, সাহসিকতায় চরিত্র-হীনা নিশ্চয় বুঝিয়া, আমার অসৎ চিন্তাগুলিকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমার মনুষ্যত্ব? কোন্ চুলোয় পড়িয়া ভস্ম হইত, তোমরাই আমার হইয়া কল্পনা কর। কল্পনা করিতে এ অতি বার্দ্ধক্যেও আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।

আমাকে বাক্‌শক্তিহীন বুঝিয়াই বুঝি গৌরীকে কাঁধ হইতে কোলে নামাইয়া তিনি কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি, তখন বুঝিতে পারি নাই, গৌরীর মুখের উপর যশোদার মমতায় সংবদ্ধ হইয়াছে।

"আপনি আমাকে কি বল্‌বেন?"

"সে কি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন্‌বার। শুন্‌তে গেলে কিছুক্ষণ বসতে হবে।"

"কায়েত মেয়ে যে এখনও এলো না!"

"সে যদি আর নাই আসে?"

"আপনি কি বল্‌বেন, আমি বুঝেছি?"

এই সময়ে একটা অযোগ্য কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। আমার সৌভাগ্য ছিল, মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে রমণী আবার বলিয়া উঠিলেন,—"এ মেয়েটাকে আপনি আর রাখতে চান না?

চিত্তের বর্ব্বরতায় একটা আঘাত পড়িল, সে আঘাতের গুরুত্ব তখন ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও আপনা হইতেই আমার কথার গতি ফিরিয়া গেল—"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"কায়েত মেয়ের মুখে শুনেছি।"

"মুক্তিলাভের জন্ম কাশীতে এসেছিলুম—"

"আবাগী কোত্থেকে এসে আপনাকে বাঁধনে জড়িয়েছে।"

"আবাগীর দোষ কেন দিচ্ছ?"

"তবে আপনার অদৃষ্টকেই দোষ দিতে হয়।"

"ও কথার কোনও অর্থ নেই, অদৃষ্টকেও তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি যখন—তোমার? মুখ নীচু ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

সুন্দরী মুখ তুলিলেন, মাথার কাপড়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন, অপসারিত করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার সীমন্তের সিন্দূর অগণ্য কর্কশ ইঙ্গিতে আমাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল।

"তুমি এর মা নও?"

"এগারো মাস মাই-দুধ খাওয়ালুম"—টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু বক্ষস্থ গৌরীর মাথার উপর পতিত হইল।

তবু মনের সন্দেহ! আমি বলিলাম—"তা তো আমিও জানি! তুমি কি একে গর্ভে ধর নাই?"

"না, বাবা!"

আর এক শিহরণ। তবুও আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিলাম।

"আপনিই এর বাপ মা।"

"কথায় আমাকে মুগ্ধ কর্‌তে এসো না, বাছা!"

"মুগ্ধ কর্‌তে বলিনি, বাবা, মন যা বল্‌ছে, তাই বল্‌ছি!

"বাপ না হয় হলুম, যখন মেয়েটা 'বাবা' বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন দুদিন পরে বল্‌বেই। মা'টাও কি আমাকে সেই অপরাধে হ'তে হ'বে?"

ঈষৎ বিরক্তির ভাবে রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বল্‌তে চান কি?"

"কি বল্‌তে চাই, তুমি কি বুঝতে পার্‌ছ না?"

"বুঝতে পার্‌ছি না যে বাবা!"

আমার মনের দুষ্টামী যেন প্রচণ্ড আঘাতে পিশিয়া গেল! এই এক কথাতেই আমার মাথা ঠাণ্ডা হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি কি মা, আমার কথায় আর কোন কথার আভাস পেয়েছ?"

"কি বল্‌তে আপনার ইচ্ছে, স্পষ্ট ক'রে বলুন। সন্ন্যাসী আপনি, ঘুরিয়ে কথা বল্‌ছেন কেন?"

"আমি মনে করেছিলুম, তুমিই ওর মা।"

"না।"

"এখনও মনে কর্‌ছি।"

"আর মনে কর্‌বেন না। স্থান কাশী, আপনি সাধু, কথায় অবিশ্বাস করেন কেন?"

"তবে কি আমাকে বুঝতে হবে, ওই অভাগিনীর উপর দয়ায় তুমি এই দীর্ঘকাল তাকে স্তন্যপান করাচ্ছ?"

"তা বল্‌তে পারি না। আগে যদিও বল্‌তে পারতুম, এখন একেবারেই পারি না।"

"মেয়েটা কি, মা, এতই মায়াতে তোমাকে জড়িয়েছে?"

"নইলে চোরের মত এখানে আসবো কেন, আর এমন কথাই বা শুন্‌ব কেন?"

মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিলাম।

রমণী বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ ন' মাস আগে হ'তে আমার এখানে না আসা উচিত ছিল। দয়া আর কেমন ক'রে বলব, বাবা! সকালের প্রতীক্ষায় সারা-রাত ছট্‌ফট্‌ করি, ছেলেকে মাই দুধ থেকে বঞ্চিত ক'রে, সূর্য্য উঠতে না উঠতে ছুটে আসি। কেন আসি?"

"এ হেঁয়ালির উত্তর আমি কেমন করে' দেব, মা! তবে, আর মিথ্যা কইব কেন, আমি অপরাধ, করেছি। যদিও করেছি তোমাকে না বুঝে, তবু অপরাধ, গুরু অপরাধ। অপরাধ শুধু তোমার কাছে নয়, করেছি আমার ইষ্টের কাছে।

"না, বাবা, আপনি মহাত্মা।"

"আর রহস্য ক'র না মা! তুমি যেই হও, সন্ন্যাসী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, তোমার মনে আঘাত—ইহপরলোকে এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।"

"আমি আপনার কন্যা—আমি কিছু মনে করি নি, বাবা।"

"তোমাকে কন্যা বলবার অধিকার আমি কোথায় রাখলুম মা!" আমার চোখে জল আসিল।

আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েটা দিন দিন বড়ই দুরন্ত হয়েছে। এই দেখুন, এক মাই খেয়েছে, আর এক মাইয়ের কি দুর্দ্দশা করেছে।" বলিয়াই, এখন জোর করিয়াই বলি না, আমার মা তাঁহার বক্ষে গৌরীর নখ-চিহ্ন দেখাইলেন। গৌরী তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়াছে।

"তুমি অদ্ভুত মেয়ে, মা, তুমি প্রহেলিকা। গৌরীকে ঘরে শুইয়ে এখন যাও। ক্ষমা আমার চাইতে সাহস নেই, যদি তোমার অহেতুক দয়াতে তোমার এ বুড়ো মতিচ্ছন্ন ছেলেকে ক্ষমা ক'রেই থাক, অন্য যে কোনও সময় আসতে ইচ্ছা কর, এস। একা এস না। তোমার এ পাগ্‌লামী সংসারের লোক বুঝবে না। সত্য বল্‌ছি মা, আমিও এখনো বুঝতে পারি নি।"

"না, আর থাকব না বাবা।"

ঘুমন্ত গৌরীকে উপরে শোয়াইয়া, আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া প্রস্থানের পূর্ব্বে মা বলিলেন,—"এখন আসি, বাবা! বোধ হয়, কাল আর আমি আসতে পারব না।"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

১১

ভাবিলাম, প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আজ উপবাসে করিব। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া সন্ন্যাস লইব। এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে ভিতরে যে অপবিত্রতার সঞ্চয় করিয়াছি, যুগব্যাপী সাধনার ফল দিয়া পূর্ণ করিলেও বুঝি এ জীবনের আর মূল্য হইবে না। এখানে ত আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, ভুবনের মা এখনও ত আসে নাই—উঃ! নিজের কাছেই নিজের এত লাঞ্ছনা! বসিয়া বসিয়া অসংখ্য কাশী-বাসীর রূপ কল্পনায় আঁকিলাম, কিন্তু তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেই আমার চক্ষু নত হইল। তাহাতেই কি ছাই লাঞ্ছনার নিবৃত্তি আছে? হেঁটমাথাতেই বুঝিতে পারিলাম, চারিদিক্‌ হইতে তাহারা আমার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কেমন করিয়া পথে বাহির হইব? গুরুকে দেখিতে যাইবার কথা মনে উঠিতেই সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

অথচ এ রমণী এখনও পর্য্যন্ত আমার কাছে প্রহে-লিকা। এই এতদিন সে গৌরীকে স্তন্যপান করাইতেছে, অথচ সে গৌরীর মা নয়। তাহার সীমন্তে সিন্দুর, সদ্যোজাত শিশুকে সেই বিষম দুর্য্যোগে পরিত্যাগ—তেমন পিশাচীর নিষ্ঠুর কার্য্য সে করিতে যাইবে কেন?

তবে কোথা হইতে সে গৌরীর অস্তিত্ব জানিতে পারিল? কেন, এমন নিত্য নিয়ম-সেবার মত এই শিশুকে সে মাতৃ-স্নেহ ঢালিয়া দিতে আসিল? এ কি দয়া? মা যে বলিলেন, না! মায়া? যদি তাই হয়, এ মায়া কাহার উপরে? শিশুর, মা যে অভাগী এই অভাগীকে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহার উপর?

জানিতে বিপুল কৌতূহল জাগিতেছে। কিন্তু জানিতে আমার অধিকার নাই। জানিবার উপায়—অনুসন্ধান করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

উনুনটাকে পিছনে রাখিয়া যোগস্থের মত বসিয়া আছি, ভুবনের মা আসিল। আমাকে নিশ্চিন্তের মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এরই মধ্যে রান্না শেষ ক'রে ফেলেছ বাবা?"

"আজ রাঁধবো না ভুবনের মা।"

"কেন?"

"তোমার অন্ন তুমিই আজ পাক ক'রে নাও।"

"খাবে না কেন? শরীর কি ভাল নয়?"

"তুমি আসতে এত দেরি কর্‌লে কেন?"

"সে কথা পরে বল্‌ছি। তুমি খাবে না কেন?"

"প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।"

"কিসের?"

"প্রায়শ্চিত্ত আর কিসের? পাপের।"

"তোমার কথা কিছুই ত বুঝতে পারছি না!"

"বোঝাবার দরকার নেই—রাঁধো, খাও।"

"সে মেয়েটি কি আবার এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"হুঁ। আমারই মরণ। আবাগী সঙ্গে আসতে চেয়েছিল গো! আমি তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে কেদারনাথ দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এত ভিড়—কে এক কোন্ দেশের রাজা এসেছিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখতেও পেলুম না, মাঝখান থেকে কোথা হ'তে কি হয়ে গেল।"

"তাকে আবাগী বল্‌লে কেন, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে গৌরীর তত্ত্ব লইল। আমিও সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কি তাকে গৌরীর মা-ই ঠিক করেছ?"

"মা নয়?"

"আমি না দেখি, তুমিও কি তার সিঁথের সিঁদুর দেখ নি?"

"তাই দেখে তুমি মনে করেছ? ও রকম সিঁদুর মাথায় এখানে অনেক আছে, বাবা!"

"এতকাল তার মাথার সিঁদুর দেখেছ, অথচ তাকে অভাগিনী সন্দেহ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ?"

"তা যা বলেছ, এমন শান্ত মেয়ে আমি কমই দেখেছি, বাবা। এক দেখেছিলুম আমার ছোট মা। ভাব্‌তুম, হা বিশ্বনাথ, এমন মেয়ের এমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন?"

"তবে? তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা? এ সন্দেহ করার চেয়ে তাতে কি বেশী পাপ হ'ত?"

ভুবনের মা'র মুখ চূণ হইয়া গেল। উপর হইতে গৌরী কাঁদিয়া উঠিল।

"তুমি খাবার উদ্যোগ কর, আমি যাচ্ছি।"

"তুমি খাবে না, আমি পোড়ামুখে অন্ন দেব!"

"আমাকে উপলক্ষ ক'র না—আমি তার অমর্য্যাদা করেছি, অসৎ কথা শুনিয়েছি।"

"এইবারে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, বাবা!"

"আর কি তার দেখা পাবি, বুড়ী!"

"তুমি কি তার এমন অমর্য্যাদা করেছ?"

"করি নি বল্‌লে মিছে হয়—তবে ক্ষমা পেয়েছি, ভুবনের মা! কিন্তু বোধ হচ্ছে, মা আর এখানে আসবেন না।"

গৌরী উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। উভয়েই আজ তার মুখে সর্ব্বপ্রথম মাতৃনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। উভয়েই যে যার মুখের পানে একবার চাহিলাম মাত্র।

১২

ভুবনের মাও সে দিন আমারই মত উপবাসী রহিল। আমার বহু অনুরোধেও সে আহার করিল না। বলিল,—"বাবা! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার নেই।"

"সে দিন কেহই আমরা ঘর হইতে বাহির হইলাম না। গৌরী আজ অস্থির হইয়াছে।"

পরদিন মা আসিবেন না বলিয়াছেন, আসিলেন না। আমি আর কয় দিন প্রায়শ্চিত্ত করিব? সে দিন আহার করিয়া, যদিই মেয়েটার মমতায় মা চলিয়া আসে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলাম। আজ গৌরী সমস্ত দিনটাই সময়ে অসময়ে কাঁদিয়াছে। ভুবনের মা সে দিনও আহার করিল না। বারংবার আমার সাগ্রহ অনুরোধে সামান্য একটু ফল-জল মুখে দিয়া রহিল। সে আগে গৌরীর মা'র সঙ্গে দেখা না করিয়া মুখে অন্ন তুলিবে না। যদি সে আর না আসে? এ প্রশ্নের বৃদ্ধা উত্তর দেয় নাই।

পরদিন—কই, আজিও ত মা আসিলেন না। মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাই কি বাস্তবিক হইল!

ভুবনের মা'র আজিও ফল-জল। তবে কি বুড়ী মরিবে? তাহার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। সে যদি মরে, গৌরীকে আমি কেমন করিয়া বাঁচাইব!

তাহার পর উপরি উপরি দুই দিন—মা যখন আসিলেন না, বৃদ্ধাও দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মায়ের তত্ত্ব আমাকে লইতেই হইবে। গৌরী যদিও অনেকটা শান্ত হইয়াছে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমার মন বলে, বাক্‌শক্তিহীন শিশু সকরুণ রোদনে তার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশে আবেদন প্রেরণ করিতেছে।

ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাগা, একবার সন্ধান ক'রে দেখ্‌লে হয় না?"

"কোথায় তাঁকে খুঁজবে, বাবা! এই সরু-গলি-ভরা সহর,—তার ওপর পৃথিবীর লোক আসা-যাওয়া করছে।"

"এগারো মাস তার সঙ্গে আলাপ করলে পরিচয় না

নিয়েছ, কোথায় থাকে, এটা জান্‌লেও কি দোষ হ'ত ভুবনের মা ?"

ভুবনের মা চুপ করিয়া রহিল—তাহার কথা কহিবার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পাইতেছে। মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। বাস্তবিকই ত! এই জনপূর্ণ কাশী এই অসংখ্য অসূর্য্যম্পশ্য গলিভরা বিশ্বনাথের নগর—ইহার ভিতরে এক জন পরিচয়হীনা কুলাঙ্গনাকে খুঁজিয়া বাহির করা যে অসম্ভবের অসম্ভব!

তবু একবার খুঁজিব। মর্ম্মবেদনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। "ভুবনের মা! গৌরীকে রাখ্‌তে পার্‌বে?"

গৌরীকে সারাটা বছর সে-ই ত রাখিয়া আসিতেছে! এই কয় দিন দুর্ব্বল অবস্থাতেও গৌরীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে সে ক্লান্তি বোধ করিতেছে না। তবে এরূপ প্রশ্ন তাহাকে করিলাম কেন?

বুড়ী বুঝিল, এ প্রশ্ন কেন করিতেছি। সে বলিল,—"মা'কে খুঁজে না পেলে তুমি ঘরে ফির্‌বে না?"

"তাই মনে কর্‌ছি।"

"ও রকম মনে কর্‌তে নেই, বাবা।"

"তুমি যে ম'লে! আমার মনে হয়, আমার অনুরোধে তুমি ফল-জল মুখে দাও, গলাধঃকরণ কর না।"

"পোড়া পেট আছে, খাই বই কি।"

"তবে মর্‌তে বসেছ কেন?"

"আর কত দিন বাঁচতে বল?"

"তুমি মর আর বাঁচ, আমাকে বেরুতেই হবে, যদি তার সন্ধান না পাই, আর আমি এ বাড়ীতে—"

"কর কি, কর কি, বাবা, কাশী—যা রাখ্‌তে পার্‌বে না, সে সঙ্কল্প ক'র না।"

"আমার যে কাশীতে বাস অসম্ভব হয়েছে, ভুবনের মা! বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, চারদিন আমি চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে পার্‌লুম না। তুমি বুড়ো মানুষ, তাতে কদিন না খেয়ে মরমর, আমার আহারের জন্য হাটবাজার ক'রে আন্‌ছ, আমি বেহায়ার মত ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি।"

"বেশ, সকাল হ'লে মা-গঙ্গার ঘাটগুলো একবার দেখে এসো দেখি।"

কথাটা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়াই সে অপরিচিতা আমার বাসায় আসিয়া থাকে, এইটাই আমার তখন মনে ধারণা হইল। যদি দেখিতে পাই, স্নানবেলায় গঙ্গার কোন না কোনও ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এক দিন না পাই, দুই দিন, দশ দিন—এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান করিব। কাশীতে যদি তাঁহাকে থাকিতে হয়, আমার জন্য মা কি স্নান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন?

"প্রতিদিন তিনি কোন্ সময় আসতেন ভুবনের মা?"

"প্রায়ই পৃথিবী না উঠ্‌তে উঠ্‌তে। কোন কোন দিন একটু বেলা যে হ'ত না, এমন নয়, কিন্তু সে কদিচ।"

"বেশ তাই কর্‌ব।—ঘাটে ঘাটেই খুঁজ্‌ব।"

ক্ষণেক নীরব রহিয়া বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার জন্যই কি তাঁকে খুঁজবে?"

"না বললে মিছে হয়, তবে গৌরীর জন্যও বটে। তাঁর কথার ভাবে বুঝেছিলুম, গৌরীকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। আমার কথা ক'বার দোষে তিনি স কেথা পাড়তে পার্‌লেন না।"

"তুমি কি গৌরীকে ছাড়তে পার্‌বে?"

"পার্‌ব কি, ভুবনের মা? ছাড়তেই হবে।"

নিরুত্তর বৃদ্ধার চক্ষু এতদিন পরে সিক্ত দেখিলাম।

সারারাত্রি চোখের পলক ফেলিতে পরিলাম না। যে সময় নিত্য উঠি, সেই সময়েই শয্যাত্যাগ করিলাম এবং গৌরী উঠিবার পূর্ব্বেই মায়ের অন্বেষণে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

১৩

প্রথমেই, যে স্থান হইতে গৌরীকে লাভ করিয়াছিলাম, সেই চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

বহু লোক স্নান করিতেছিল—স্ত্রী ও পুরুষ। আমার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, 'মা'। সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল না। আমি তীরে দাঁড়াইয়া চোখের নিমিষে তাঁহার অনাগমন বুঝিয়া লইলাম। শত লোকের মধ্যে থাকিলেও মায়ের সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্বরূপ লুকাইতে পারিত না। জাহ্নবীজলে ডুবিলেও মা বুঝি রূপ ডুবাইতে পারিতেন না।

অন্য ঘাটে যাইবার জন্য তীর-ভূমি হইতেই ফিরিতেছি, নদীগর্ভ হইতে কথা উঠিল—"অম্বিকাচরণ!"

স্বর-মাধুর্য্যেই বুঝিলাম, গুরুদেব। মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তিনি জল হইতে উঠিতেছেন।

"স্নান না ক'রে চলে যাচ্ছ যে?"

উত্তর না দিয়া তাঁহার অভয় চরণে মস্তক সমর্পণ করিলাম।

"স্নান সেরে এস, আমি চাঁদনীতে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে গুরুর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।

ডুব দিতে গিয়া,—এখনও 'মা'কে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করিতে পারি নাই—চুরী করিয়া মেয়েদের দিকে চাহিলাম। দৃষ্টি পড়িল, একটি মেয়ের উপর। মা'কে

পূর্ব্বে না দেখিলে এই মা'কেই যে বলিতে হইত, "তোমার মত সুন্দর আর কখন দেখি নাই!"

সঙ্গে আর একটি রমণী, মধ্যবয়সী। তাঁহাকে সাধিকা বলিয়াই বোধ হইল, তাঁহার বসন গৈরিক-রঞ্জিত।

এই পর্য্যন্ত। চক্ষু মুদিয়া প্রায় একশ'বার ডুব দিলাম। আর কোনও দিকে না চাহিয়া, গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সেই দুইটি মহিলাই বিদায় লইতেছে।

"অনুমতি করুন আসি বাবা!" গৈরিক-ধারিণীই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

"এসো, মা।"

চলিবার মুখে সুন্দরী ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী, অনুচ্চস্বরে তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—"মা, বাবা কবে আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন জিজ্ঞাসা কর।"

গুরুদেব নিজেই সে কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন—"হবে রে বেটি হবে, যে দিন বিশ্বনাথের ইচ্ছা হবে।—একবার দাঁড়া—অম্বিকাচরণ, এগিয়ে এস!—এঁকে প্রণাম কর্। তোর স্বামীর গুরু-ভাই।"

উভয় মহিলাই আমাকে প্রণাম করিলেন—আমিও হাত তুলিয়া উভয়কেই প্রতি-প্রণাম করিলাম।

"মায়ের রূপ দেখ্‌লে অম্বিকাচরণ?"

মহিলা দুই জন তখনও পর্য্যন্ত অধিক দূরে যান নাই। —কথা কহিলে পাছে শুনিতে পান, তাই আমি শুধু মৃদু হাসিলাম।

"হাসলে শুধু হবে না হে, বলতে হবে।"

"দেখেছি প্রভু!"

"এরূপ কদাচ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা।"

"না প্রভু, অন্নপূর্ণার সখী—আমি অন্নপূর্ণাকে দেখেছি।"

"বল কি হে!"

"মিথ্যা বলি নি, প্রভু।"

"তা হতে পারে। মিথ্যা কইবে কেন? অনন্তরূপিণী মা। যাক্, তার পর? এসে বল্‌ব ব'লে যে চ'লে এলে,—"

"এখনো বলতে পার্‌ছি না, বাবা!"

"বলি, যাবার ইচ্ছা আছে ত?"

"আমার ইচ্ছা হ'লে কি হবে, আমার গুরুরই নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই।"

"বাঃ! আমিই ত তোমাকে যাবার অনুরোধ কর্‌লুম।"

"ও তোমার মুখের কথা, বাবা, বোধ হয় অন্তরের কথা নয়।"

"এ অদ্ভুত রহস্য তুমি কি ক'রে অধিকার করলে?"

"নইলে পুঁটুলি পাঁটলা বেঁধেও আমি যেতে পার্‌ছি না কেন? বোধ হয়, এ জন্মেই যেতে পার্‌ব না।"

ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুদেব বলিলেন—"ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি। কোনও কিছু বন্ধনে পড়েছ?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"এক ভুবনের মাকে যদি বন্ধন মনে কর, বুড়ীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।"

তথাপি আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঈষৎ কোপের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বল্‌বার কিছু থাকে বল; আমার কাছে গোপন কেন, মূর্খ।"

"বল্‌বার ঢের আছে, বাবা; আর বল্‌তেও অনেক সময় লাগবে। এখানে দাঁড়িয়ে ত হয় না।"

"বেশ, তোমার ঘরেই আজ আমার ভিক্ষা রইল।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, একবারের জন্যও আর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর্বেদনা বহির্ব্বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেল।

১৪

আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, ভুবনের মা'র বাঁচিবার উপায় হইয়াছে। গুরুদেবের প্রসাদ, সে আর গ্রহণ করিব না বলিতে পারিবে না। গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রম বঙ্গদেশে ছিল। বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখন একরূপ পশ্চিমাই হইয়া গিয়াছেন। তণ্ডুলান্ন তিনি কদাচ গ্রহণ করেন। স্থির করিলাম, লুচি-পুরির সঙ্গে তাঁহার জন্য যথেষ্ট তণ্ডুলান্ন প্রস্তুত করিয়া দিব। ভুবনের মা কয়দিন পরে অন্নাহার করিবে, লুচি-পুরি খাইলে মরিয়া যাইবে। যদি প্রসাদের মত বৃদ্ধা অন্নের কণা মুখে দিতে চাহে, গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইব।

গুরুর আহারের ব্যবস্থা করিতে আমি ঘরে ফিরিতেছিলাম, পথে সেই গৈরিক-ধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার পর হইতে তাঁহাকে 'যোগিনী মা' বলিব। পরিচয়ে জানিয়াছি, তিনি একনিষ্ঠা তপস্বিনী—চিরকুমারী; লোকের কল্যাণরূপিণী হইয়া বহুকাল এই কাশীতেই অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বাশ্রমের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না। সর্ব্বদা হিন্দীতেই কথা কহেন, তবে বাঙ্গালাও মাতৃভাষার মত বলিতে পারেন। সাধারণের চক্ষুতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তপস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁহার মুখখানিতে এমন সৌন্দর্য্য-বৈভব

চালিয়াছিল, যাহা শ্রেষ্ঠ রূপসীর মুখেও কদাচ দেখা যাইত। তাহার উপর তিনি সঙ্গীতজ্ঞা, অতি সুকণ্ঠা, ভজনকালে নিজের সুরেই তিনি মগ্ন হইয়া যাইতেন।

এ সমস্ত পরিচয় আমি পরে পাইয়াছি। গুরুদেবের কাছে আমি অনেকবার গিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। অথচ তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাকে গুরুদেবের পরিচিতা বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল।

আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"আপনার বাসায় আমার যাবার যে একবার প্রয়োজন আছে, বাবা!"

"কবে যেতে পারবেন বলুন, মা।"

যোগিনী অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ আপনার সুবিধা হবে?"

"সুবিধা অসুবিধা আপনার।"

"তা হ'লে আজই চলুন না কেন, মা!"

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন—"আজই?"

"আজ কেন, এখনি—আমার বাসায় আজ আপনাকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।"

"আপত্তি নেই, তবে অন্য এক স্থানে আগেই যে প্রতিশ্রুত হয়েছি, বাবা।"

"গুরুদেব নিজে উপযাচক হয়ে আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিতে চেয়েছেন। সেই সাহসেই আপনাকেও বল্লুম, মা!"

"তবে, আমার শুধু নয়, বাবা, যার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ, তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"এ আরও সুখের কথা, মা!"

"কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে!"

"এ কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে হ'ল মা!"

"তবে আপনি আসুন, আমরা যথাসময়ে যাব।"

যোগিনী প্রস্থানোন্মুখী হইলেন, আমিও চলিলাম। কাহার ঘরে তাঁহার নিমন্ত্রণ, আমি অনুমানে বেশ বুঝিয়া লইলাম। সে আর কেহ নহে, সেই যুবতী। আসে সে আসুক, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না, যোগিনী মায়ী আসিলে আমার আর একটু বল হইবে। ভুবনের মা'কে অন্ন গ্রহণ করাইতে তাঁহারও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করি।

বাসার দ্বারে—এ কি, এক পশ্চিমা দরোয়ান বসিয়া আছে কেন? হিন্দীতেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—কে সে, কোথা হইতে, কেন আসিয়াছে! উত্তর যাহা পাইলাম, তাহাতে তাহার অবস্থান-রহস্য—আমার সম্যক্ বোধগম্য হইল না। কে এক রাণীমা আসিয়াছে, তার গুরুজী দর্শন করিতে। সে বাঙ্গালা মুলুকের রাণী—রাজাসাহেব, রাণী—উভয়েই মুলুকে ফিরিয়া যাইবে, সেই জন্য রাণী গুরুজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

কতকগুলা এই প্রকার কি সে দ্রুতবাক্য-বিন্যাসে বলিয়া গেল, আমি বুঝিতেই পারিলাম না। শেষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এইটেই রাণীমা'র গুরুর বাড়ী?"

"হাঁ, ঠাকুরজী!"

"তোমাকে কে বললে?"

"সো হামি জানে।"

"আচ্ছা গে বেটা, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

"ইধির কাঁহা যাবে ঠাকুরজী?"

"এ আমারই বাসা, সেপাইজী।"

সন্দেহ-সঙ্কুচিত-নেত্রে সে কেবল আমার পানে চাহিল। আমার আকৃতি ও বেশে গুরুজীর কোনও লক্ষণ ছিল না।

আমার রাঁধিবার ঘর প্রবেশ-পথের অপর পার্শ্বে, যাইতে হইলে বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়—হিন্দু-গৃহস্থের রীতি, যে-সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে না পায়।

রান্নাঘর হইতে আমি ধূম নির্গত হইতে দেখিলাম। দেখিয়া বিস্ময় আসিল। পেটের জ্বালায় কাতর হইয়া ভুবনের মা-ই কি রাঁধিতে বসিয়াছে? যাক্, যদি সে-ই হয়, এখন দেখা দিয়া তাহার আহার-চেষ্টায় ব্যাঘাত দিব না। কিন্তু 'রাণীমায়ী'কে যে দেখিতে পাইতেছি না! বোধ হয় উপরে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা বসাইয়া বুড়ী কি পেটের জ্বালা-নিবারণের জন্য এত ব্যস্ত হইল!

বরাবর উপরে চলিয়া গেলাম। বারান্দায়, কই, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ভুবনের মার ঘরেও যে কেহ আছে, সেটাও কোন চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি রাণীও ভুবনের মা'র রান্নাঘরে বসিয়া আছে?

আমার ঘরের দুয়ার হাট করিয়া খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বুঝিলাম, আর কিছু নয়, এ সমস্তই গৌরীর কাজ। সে দিন দিন অধিকতর দুষ্ট হইতেছে। ভুবনের মা দুর্ব্বল, আমার ঘরে তাহার এই অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে নাই। তবু একবার ডাকিলাম, "ভুবনের মা!"

"এসেছ, বাবা!"

"তুমি ঘরেই আছ?"

বুড়ী বাহিরে আসিল। আসিয়া, বড়ই দুর্ব্বল, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

রাণীর আসার নিদর্শন ত এখনও পাইলাম না। আমি

আবার বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি উনুনে আগুন দিয়ে এসেছ ?"

ভুবনের মা ঈষৎ প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল—"আমাকে আর দিতে দিলে কই ?"

"কে আগুন দিয়েছে ?"

"আমার কি ছাই মরণ আছে ? বিশ্বনাথ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ লিখে রেখেছেন, তার ঠিক কি !"

"মা এসেছেন ?"

"শুধু এসেছেন, এসেই গৌরীর জন্য দুধ গরম করতে গেছেন।"

"হুঁ !—গৌরী ?"

"গৌরী তাঁরই কাছে।"

"আমি কি আমার ঘরের দোর বন্ধ করতে ভুলে গিছলুম ?"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"সমস্ত জিনিস-পত্র গৌরী ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়েছে। আসনে জল ঢেলেছে।"

"গৌরী নয়।"

"তবে কে ?" প্রশ্ন করিবার পরই মনে পড়িল, গৌরীর মায়ের যে আর একটি ছেলে আছে। মনে পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কি তাঁর পুত্রটিকে আজ সঙ্গে করে' এনেছেন ?"

"বাপ্ রে বাপ্, এমন দুরন্ত !"

"ছেলেটি কোথায় ?"

"সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে, বোধ হয়, সে তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। আমার কাছে তার মা রেখে গিছলো কিন্তু আমার কি ক্ষমতা তাকে আগ্‌লাতে পারি !"

"ভুবনের মা, আমাদের বাড়ীতে এক রাণী এসেছেন।"

"রাণী ?"

"আমাদের বাঙ্গালা দেশের এক রাণী।"

"কোথায় তিনি ?"

"এসে বাড়ীর কোন্‌খানে তিনি লুকিয়ে আছেন।"

"সে কি ? কেন ? কি জন্য ?"

"সে সব আমি জানি নে। তুমি তাঁকে খুঁজে বার কর। আমার অবকাশ নেই, এখনি আমাকে বাজারে যেতে হবে।" বলিয়াই, ভুবনের মা'কে ধাঁধাঁয় ফেলিয়া আমি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"তাই ত মা, আর দু'দিন যদি না আস্‌তুম, তোমাকে ত আর দেখ্‌তে পেতুম না !"

আমি পেঁটরা হইতে টাকা বাহির করিতেছিলাম। হাত তুলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভুবনের মা'র এইবারে উত্তর শুনিব। বৃদ্ধা যে উত্তর দিল, শত আগ্রহেও তাহা শুনিতে পাইলাম না।

রাণী ? ঐ পথে নিক্ষিপ্তা বালিকা কি তবে এতদিন এক রাণীর করুণানির্ঝরে স্নাত হইয়া আসিতেছে ?

মায়ের উত্তরেই আমার শুনিবার আগ্রহের মীমাংসা হইয়া গেল।

"কথা পর্য্যন্ত কইবার ক্ষমতা নেই !—টলে পড়্‌ছ ! নাও আমার হাত ধর।"

বুঝিলাম, সিঁড়ির মাথার উপরে দাঁড়াইয়া মা কথা কহিতেছেন। ভুবনের মা বোধ হয় নীচে যাইতেছিল। এইখানেই বোধ হয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে তাঁহাকে আমার আগমনবার্ত্তা শুনাইয়া দিল। কেন না, পেঁটারায় হাত দিয়া, কান পাতিয়া কিছুক্ষণ আর কাহারও কথা শুনিতে পাইলাম না। গৌরীর মুখের একটা অস্ফুট বাক্যও আমার কর্ণগোচর হইল না। অগত্যা টাকা লইয়া পেঁটরা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গুরু আসিবেন আর তাহাদের কথায় কান দিবার সময় আমার নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখি, উভয়েই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। ঘরের যদি বার বার এইরূপ অবস্থা হয়। মনে করিলাম,—কবাটে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিয়া যাই।

আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোথায় কুলুপ ? কি আপদ, যেখানে রাখিয়াছিলাম সেখানে ত নাই, ঘরের চারিধার খুঁজিয়া কোথাও সেটা দেখিতে পাইলাম না। দুরন্ত ছেলেটা সেটা বারান্দা হইতে ফেলিয়া দিল না কি ? ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া যে জানিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই, নীচে হইতে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ আমার কর্ণেও প্রবেশ করিবে না। সেই এখনো-না দেখা ছেলেটার উপর বিরক্ত হইয়াই আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম। দ্বারের বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখি, এক চন্দ্রকান্তি বালক !

ক্ষুদ্র দস্যু, আমার ঘরের যেখানে যা অবশিষ্ট আছে লুটিবার জন্য কাহারও দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আমি পথের মাঝেই তাহাকে বুকে তুলিয়া দুই বাহুপাশে বন্দী করিলাম। ক্রোধে ক্ষুদ্রকরপত্রে সে আমার শ্মশ্রু ধরিয়া টান দিল। কিছুতেই যখন আমি পরাভব স্বীকার করিলাম না, তখন ক্ষুদ্র হুঙ্কারে সে আমাকে ভয় দেখাইল।

"এর দিকে একবার ফিরে চান, বাবা !"

যশোদা, দেবকী—যেন উভয়েরই প্রতিরূপ সেই রহস্যময়ী নারী ! কোলে গৌরী !

"এর মুখের অবস্থাটা একবার দেখুন !"

জীবনদায়িনীর কোলে রহিয়াছে, তবু আমার কোলে

তাহার নবাগত দুরন্ত স্নেহাংশভাগীকে দেখিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মুখ অভিমানে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

তাহার মাতৃক্রোড়ে বালিকা স্থায়ী নিজস্বের ভাগ লইতে উঠিয়াছে, বালকের ভ্রূক্ষেপও নাই, সে অপরিস্ফুট আনন্দের ভাষায় দুই হাত দিয়া আমার শ্মশ্রু, মুখ, নাসিকা বিপন্ন করিতে নিযুক্ত ছিল।

আসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি আমার চোখে জল আসিল।

"এর মায়া কি আপনি ত্যাগ করতে পারবেন?"

"বালক-বালিকার এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য, মা! অন্যে দেখলে যমজ না ব'লে থাকতে পারবে না।"

"খোকা এক মাসের বড়।" বলিয়া মা গৌরীকে কোল হইতে নামাইলেন। আমিও বালককে ভূমিতে রক্ষা করিলাম। গৌরী আমার দিকে আসিতেছিল। বালক পথের মাঝে, চোখের পলকটি পড়িতে না পড়িতে, তাহাকে যেন লুটিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চীৎকার।

অগত্যা আমি গৌরীকে কোলে লইলাম। বালক একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আপনার মনে কিছু দূর বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া ছুটিল।

এইবারে কথা ফিরাইতে মা বলিলেন—"মায়ের এত অসুখ হয়েছে, জানতুম না।"

"তুমি কি তার অসুখের খবর পেয়ে এসেছ?"

"না, বাবা, খবর নিতেই ত এসেছি।"

"ভুবনের মা তোমাকে কি অসুখের কথা বলেছে?"

"বলতে হবে কেন, দেখতেই ত পাচ্ছি,—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই। মুখ দে কথা বা'র হচ্ছে না।"

"তুমি কি এখনি যাবে, না কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?"

"আপনি কি আবার কোথাও যাচ্ছেন?"

"একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কি আনতে হবে, ব'লে দিন, আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়াই তিনি ডাকিলেন, "পার্ব্বতি!"

"অন্যের দ্বারা হবে না, আমাকেই যেতে হবে। আমার গুরুদেব এখানে পদধূলি দেবার ইচ্ছা করেছেন।"

"হবে আমিও একবার ঘুরে আসি না কেন!"

"পার ত ঘুরে এস। না পার, ভুবনের মা'কে কিছু আহার করিয়ে যাও। তোমারই জন্য সে আজ ক'দিন অন্ন ত্যাগ করেছে।"

"বলেন কি, বাবা! আমার জন্য?"

"আমার শত অনুরোধে, কেবল আমাকে তুষ্ট করতে, এক আধটা ফলের কণা সে মুখে দেয়।"

ভীতি-বিহ্বল চোখে মা আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"বুড়ী গেল কোথায়?"

'আমি তাকে নীচে বসিয়ে এসেছি।"

"বসতে সে নীচে যায় নি, কোথা থেকে এক রাণী গুরুর বাড়ী ভুল ক'রে এখানে এসেছে, বুড়ী তাকে খুঁজতে গেছে।"

পার্ব্বতী এই সময় উপরে আসিয়া মা'কে উত্তরের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিল।

"পার্ব্বতীকে দিয়ে আনালে হবে না?"

"হবে না কেন, কিন্তু আমার তৃপ্তি হবে না, মা। আজও পর্য্যন্ত তিনি আমার এ গৃহে পদার্পণ করেন নি।"

"তবে ঘুরে আসুন।"

গৌরী এতক্ষণ চুপটি করিয়া আমার কাঁধে মাথা দিয়া ছিল।

"গৌরীকে আমার কোলে দিন।"

দিতে যাইতেছি, ঘরের ভিতরে শব্দ হইল। আমাদের কথার অবসরে কখন্ যে তাঁহার শিষ্ট ছেলেটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

"দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? কি ভাঙলে দেখ্।" পার্ব্বতীকে আদেশ করিয়া মা, গৌরীকে কোলে লইলেন।

"যাই ভাঙ্গুক, মা, ছেলেকে যেন কিছু ব'ল না।"

পার্ব্বতী দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়াই বলিল—"কলসী ভেঙে বাবার বিছানা পত্তর সব জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।"

বাহির হইতে কৌতূহল-পরবশ হইয়া একবার দেখিলাম। ঘর জলপ্লাবিত, বালক তাহার উপরে পড়িয়া মহানন্দে যেন সাঁতার কাটিতেছে।

"উপর থেকে চাদর নিয়ে বেশ ক'রে মুছিয়ে দাও—যেন মারধর্ করো না, মা! আর যা বললুম, ফিরে আসা যদি অসম্ভব মনে কর, ভুবনের মা'র জীবনরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে যাও। নইলে তোমার গৌরীর জীবন রাখা ভার হবে।

"আমি এখন যাব না, বাবা।"

১৫

গুরুর অহেতুকী কৃপা! কখন, কি অবস্থায়, কেমন করিয়া কাহার ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে, ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়,। নহিলে, যে জীবনে ভুলের উপর ভুল করিয়া একান্ত হেয় হইয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব অবস্থার সংযোগে, এক মুহূর্ত্তেই এক অপূর্ব্ব বস্তুর অধিকারী হইল কেন?

শুনিয়াছি, ভগবান বালক-স্বভাব! রত্নের পুঁটুলি

লইয়া বালক পথের ধারে বসিয়া আছে। এক জন তাঁহার কাছে দুটি হাত পাতিয়া বারংবার রত্ন ভিক্ষা করিল,—পাইল না। আর এক জন তাহার দিকে দৃষ্টি পর্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, বালক ছুটিয়া পিছন হইতে ধরিয়া তাহাকে রত্ন দান করিল।

আমার ঘরে আজ তাই দেখিলাম।

বাজার করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম, পথে আসিতে দেখি, দশাশ্বমেধের বড় পথ ধরিয়া দুইদিক্ বন্ধ একটি পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কী অমন ত অনেক যায়, সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার আমার কিছুই ছিল না, যদি না ঠিক সেই সেপাইজীর মত এক জন লাঠি হাতে তার পিছন পিছন ছুটিত। আমি অনুমান করিলাম, পাল্কীর ভিতর আর কেহ নয়, মা আছেন।

তথ্য লইবার আমার ইচ্ছা হইল; কিন্তু অনেক লোকের গতায়াত, লওয়াটা উচিত বোধ করিলাম না! মুখ ফিরাইতেই দেখি, পার্ব্বতী। আর আমার সন্দেহ রহিল না। সে-ও নিশ্চয় পাল্কীর অনুসরণ করিতেছিল, ছুটিতে অসক্ত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

বুঝিলাম, মা আমার সাধারণ মহিলা নহেন—রাণীই বটেন। কিন্তু এরূপভাবে এত শীঘ্র তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় আমার মনে সংশয় জাগিল। মা যে বলিয়াছিলেন, থাকিব!

পার্ব্বতী অন্যদিকে মুখ করিয়া পথ চলিতেছিল। গোটা দুই প্রশ্ন করিয়াই বুঝিলাম, আমাকে দেখিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে।

আমি ডাকিলাম,—"পার্ব্বতী!" সে উত্তর দিল না। আবার বলিলাম,—"ওগো মা! তোরা চ'লে যাচ্ছিস্ যে।" উত্তর ত সে দিলই না, একবার মাত্র আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেন চির-অপরিচিত কে আমি, সে অধিকতর দ্রুতগতিতে আমা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল। আমার সংশয় দ্বিগুণিত হইল। ভুবনের মা তবে কি মায়েরও অনুরোধ রক্ষা করিল না? মরিতেই কি সে সঙ্কল্প করিল? কিংবা এমন কোন কথা আবার সে মা'কে শুনাইয়াছে যে, অভিমানাহত কুলাঙ্গনা মুহূর্ত্তমাত্রও আর আমার বাড়ী তিষ্ঠিতে পারেন নাই!

ব্যাকুলভাবেই আমি বাসায় ফিরিলাম। প্রবেশ করিতেই দেখি, ভুবনের মা উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখেই বসিয়া আছে। তাহার মুখ কিন্তু অপ্রফুল্ল দেখিলাম না।

"থাক্‌ব ব'লে মা চ'লে গেল কেন, ভুবনের মা?"

উত্তর শুনিতে ভুবনের মা'র কাছে উপস্থিত হইলাম। আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল,—"বাবা এসেছেন।"

"তিনি আস্‌বেন আমি জান্‌তুম; মা চ'লে গেলেন কেন?"

"হঠাৎ তাঁর কি একটা প্রয়োজন পড়েছে।"

"রাগ ক'রে গেলেন না ত?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল।

"তাঁর ঝিকে ডাকলুম, সে শুন্‌তে পেয়েও উত্তর দিলে না, একবার ফিরে চেয়ে চ'লে গেল।"

"রাগের কারণ ত কিছুই হয় নি। তুমি বলেছ, আমি না কি অনাহারে মর্‌ব সঙ্কল্প করেছি, তাই শুনে কত দুঃখ কর্‌লেন তিনি। দু'হাতে ধরে আমাকে খেতে কত অনুরোধ কর্‌লেন।"

"যাক্, আজ আহার হবে ত?"

"নিজেই রেঁধে দিতে প্রস্তুত।"

"খাবে ত?"

"ও বাবা! আর না খেয়ে পারি। যাবার সময় মা, সেই ননীর পুতুলকে দেখিয়ে আমাকে অনুরোধ ক'রে গেছে।"

"বাঁচা গেছে।"

"ও বাবা, সে পাগল মেয়ে—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আমাকে দিব্যি গাল্‌তে বলে। আমি যদি মর্‌ব ত দুঃখ ভোগ কর্‌বে কে?"

"বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে? তোমার মাথা নাড়ায় বুঝতে পার্‌লুম না,—হয়েছে, না হয়নি?"

"আমি বল্‌তে পারলুম না, বাবা?"

"যাক্, এখানে ব'সে আছ কেন?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না।

তাহার এরূপ আচরণ আমার কাছে কেমন একটা রহস্যের মত বোধ হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি যেন আমার কাছে কথা গোপন কর্‌ছ?"

"এক সাধু মা এসে আমাকে বল্‌লে 'মা এইখানে বস। কেউ যদি আসে, তাকে উপরে উঠ্‌তে নিষেধ ক'র! বাবার সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে'।"

"আমাকেও উঠ্‌তে নিষেধ করেছে?"

"তোমার কথা ত স্বতন্ত্র ক'রে বলে নি, বাবা!"

"বেশ। গৌরী?"

"সাধু মা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে গেছেন।"

অবশ্য আমি বিস্মিত হইলাম,—একটা যেন রহস্যের জাল চারিধার হইতে আমার বাসাটাকে ঘেরাও করিতেছে। তবে ভুবনের মা'কে আর প্রশ্নে উৎপীড়িত

করা সঙ্গত মনে করিলাম না। এই কটা কথা কহিতেই বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত হইয়াছে। সাধু মা'র সঙ্গে আর এক জন আসিয়াছে কি না, জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা দমিত করিয়া জিনিসগুলা রাখিতে আমি রন্ধন-শালায় চলিয়া গেলাম।

কি আপদ, নিজের ঘরে কি চোর হইলাম! গুরুর সঙ্গে তার এমন কি কথা যে, আমার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হইবার অধিকার নাই! অভিমান রাইবে কোথায়? রন্ধন-শালায় বসিয়া, দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া, আমি নিমীলিতনেত্রে যোগিনীর মুণ্ডপাত করিতেছিলাম।

"তাই ত, বাবা, একটা যে বড় অন্যায় হয়ে গেছে!"

আমি চোখ মেলিলাম মাত্র।

"যে-সে পাছে উপরে যায়, মাকে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলুম, মা আমার কথা বুঝতে পারে নি। 'যে সে'র মধ্যে কি আপনি!"

"আপনাদের কথা হয়ে গেছে?"

"আপনাকে গোপন ক'রে কইতে হবে, এমন কোনও কথা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না—উঠে আসুন।"

"আমার উপরে যাবার প্রয়োজন আছে, মা? এখনো দু'চারটে জিনিস আমার কিনতে বাকি আছে।"

"উঠে আসুন, উঠে আসুন। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, তাঁরই সম্বন্ধে কথা বাবাকে যা বলেছি, সমস্তই তাঁর মুখে আপনি শুনতে পাবেন। আপনারও শোন্‌বার প্রয়োজন।"

অভিমান করিয়া বসিয়া থাকার কোনও মূল্য নাই বুঝিয়া আমি আসন ত্যাগ করিলাম।

"ভুবনের মা কি সেইখানেই ব'সে আছে?"

"না বাবা, তাকে উপরে তুলে নিয়ে এসেছি।"

"বালিকা?"

তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন,—"উপরে যান, সকলকেই দেখ্‌তে পাবেন?"

"আপনি?"

"আমি সেই মেয়েটিকে আন্‌তে চল্‌লুম।"

১৬

"এস অম্বিকাচরণ!"

সিঁড়ি ছাড়িয়া উপরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি, গৌরীকে বুকে ধরিয়া গুরুদেব পাদচারণ করিতেছেন। ভুবনের মা নিজের ঘরের দ্বারে বসিয়া, নির্নিমেষ-নেত্রে বুঝি তাঁহার লীলা দেখিতেছে।

"এই দেখ, তোমার মায়া আমাকেও দু'হাত দিয়ে কেমন জড়িয়ে ধরেছে।"

দেখিবার মত বটে! গুরুদেব হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড জটাভার—গৌরী দুই হাতে সেই জটা আঁকড়িয়া যেন নিশ্চিন্তভাবেই তাঁরি বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

"এই দেখ, আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার মায়া আমাকে ছাড়ে না। কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা হায়। জটা মুড়ুবো নাকি, অম্বিকাচরণ?"

হাসিতে হাসিতে তিনি কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু তীব্র শলার মত সেগুলি আমার বুকে বিঁধিয়া গেল।

"ঘরের ভিতরে বসুন।"

গৌরীকে আবার বাহুপাশে বাঁধিয়া ঈষৎ স্নেহের সহিতই তিনি বলিলেন,—"ঘরে কি বস্‌বার স্থান রেখেছ! নিজের সাধনাসন পর্য্যন্ত এই মোহ-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছ।"

"এ কাজ ও করেনি প্রভু!"

"তবে কে তোমার সেই অন্নপূর্ণার সেই ছেলেটি?"

বুঝিলাম, গুরুর সঙ্গে মায়ের দেখা হইয়াছে। আমি কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলাম। বাস্তবিক, দুষ্ট বালক আমার ঘরের মেঝের কোনও সামগ্রী শুদ্ধ রাখে নাই। উপরের কোণা আল্‌নায় বসিবার মত যে যে বিছানা ছিল, তাহা লইয়া গুরুদেবের আসন করিলাম।

উপবিষ্ট হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যেই করুক, অম্বিকাচরণ, কারণ এই। এই জীবটি এখানে না থাকিলে তোমার অন্নপূর্ণাও এখানে আসত না, তার পুত্রও আসত না! বল্মীর দল, একটাকে টেনেছ, সব এসেছে।" বলিয়া তিনি গৌরীকে বুক হইতে নামাইয়া কোলে শয়ন করাইলেন।

আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বসিতে না বলিলে কখন তাঁহার সম্মুখে আমি উপবেশন করিতাম না।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স।"

"আমাকে এখনি আবার বাইরে যেতে হবে।"

"সে হবে এখন হে, ব'স।"

বসিতে বসিতে গৌরীর এক অদ্ভুত শান্ত-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"কি আশ্চর্য্য, প্রভু, এক দৃষ্টিতে মেয়েটা আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে না!"

আমার কথার উত্তর না দিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বালিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নমুখেই তার পর বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া গেল, কিছুক্ষণ কাঠের পুতুলের মত আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

"এতদিন ধরে' একটা পরমা সুন্দরী কুলবধূ লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে আসছে, তা'কে একদিনও নিষেধ করতে তোমার সাহস হ'ল না, অথচ তুমি সন্ন্যাসী হ'তে চলেছ! ছি ব্রহ্মচারী, ছি!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নির্ব্বাক্।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—"ষাটের উপর বয়স, এখনো তোমার বুদ্ধি এলো না, তিন তিনটে সংসার ভেঙ্গে গেল, তবু তোমার চৈতন্য হ'ল না! আবার এটাকে নিয়ে আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি হে?'

"না প্রভু!"

"না কেন হে! জামাই হবে, নাতি হবে। সেই মোহেই না মা অন্নপূর্ণাকে নিষেধ করতে পারনি। বেশ সকালে একবার ক'রে এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—না এলে পাছে গৌরী আবার কৈলাসে ফিরে যায়—কেমন, এই ত মনের কথা হে?"

"ছ'মাস আমি তার আসার খবর জানতুম না।"

"তা হ'তে পারে।"

"তিনি যে আসতেন, ভুবনের মা আমাকে একদিনও জানায় নি।"

"জিজ্ঞাসা কর না বুড়ীকে তার ফল। এমন তিরস্কার আমার কাছে খেয়েছে বুড়ী, বাপের জন্মে সে এরূপ কঠোর বাক্য শোনেনি। সে বেটীকেও যা ইচ্ছা তাই শুনিয়ে দিয়েছি।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

"সে বেটীও এখানে আর আসছে না, অম্বিকাচরণ, এক তাড়াতেই তার গৌরীর মোহ কেটে গেছে।"

"আমারই অপরাধে তাঁকে শুনতে হ'ল, প্রভু!"

"তাতে আর সন্দেহই নেই, এত বড় নির্ব্বোধের কাজ করেছিলে তুমি। এতে তোমার জীবন সংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। তা না হ'লেও, সাধু ব্রহ্মচারী ব'লে তোমার যে নামের একটা মর্য্যাদা হয়েছিল, সেটি একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। কাশীতে তোমার আর বাস করা চল্‌তো না।"

"তিনি যে গুপ্তভাবে আসছেন, ছ'মাস আমি জানতে পারি নি। ভুবনের মা জানতো, আমাকে বলে নি।"

"বুড়ীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সেজন্য তার আজ কি লাঞ্ছনা হ'য়েছে। বেটী হতভম্ব হয়ে কেমন ব'সে আছে, একবার দেখে এস না। যাক্, বিশ্বনাথ তোমাদের সহায়, সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে।"

এই বলিয়া, গৌরীকে একটা পরমাত্মীয়তার গালিতে যেন আপ্যায়িত করিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন —"এইটাই হয়েছে যত অনর্থের মূল! এইটার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে তোমরা দুজনেই গোলমাল ক'রে ফেলেছ। রোজ রোজ এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—আর কি? কে সে, কোথা থেকে আসছে,—কেন আসছে, আর জানবার দরকার কি?"

"আমরা দু'জনেই তাঁকে এর গর্ভধারিণী মনে করে-ছিলুম।"

"তাইতেই ত বিশেষ অনর্থ ঘটিয়েছিলে, অম্বিকাচরণ। যে শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁকে দেখা উচিত ছিল, তা তোমরা কেউ দেখ নি।"

"না, বাবা, দেখিনি। শুধু দেখিনি নয়—"

"থাক্, আর বলতে হবে না। তবে আর অনর্থের কথা বলছিলুম কেন বাবা, তুমি বৈরাগ্য নিয়ে গৃহ থেকে বেরিয়েছ—অত বড় বিঘ্ন ইচ্ছা ক'রে সম্মুখে রেখেছিলে! মা তাঁর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে যেতেন, কিন্তু তোমার সমস্ত সাধন পণ্ড হয়ে যেত! যাক্, তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে, এইবারে যা বল্‌ব, শোন।"

"একটা কথা, বাবা?"

"কে তিনি, জানতে চাচ্ছ?"

করযোড়ে বলিলাম, "গৌরীর মায়া, বোধ হয়, আপ-নার তিরস্কারেও ছাড়তে পারতুম না—"

হাসিয়া গুরুদেব আমার বক্তব্য বলিয়া দিলেন, 'মা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন?"

"নইলে এ জন্মে বুঝি আর আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারতুম না!"

মৃদুহাসি মুখে মাখিয়া তিনি বলিলেন—"তা ও বেটীরা সবই করতে পারে। যিনি অঘটন সংঘটন করেন, সে বেটী ত তাঁরই একটি প্রতিমূর্ত্তি। যে বাবুটি সে দিন তোমার কাছে বসেছিল, ওটি তারই স্ত্রী। হতভাগা পাষণ্ড স্বামীকে মহাপাপের কবল থেকে মুক্ত করতে তিনি এই অসম-সাহসিকের কাজ করেছেন। এই কাশী সহর,—এর পথে ঘাটে দুর্ব্বৃত্তেরা সর্ব্বদা যাতায়াত করছে—ওই রূপ—সে সমস্ত ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কি ক'রে যে মা এক বছর ধ'রে তোমার ঘরে যাতায়াত করেছেন, ভেবে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। হতভাগা স্বামী, চরিত্রহীন। ওই অমন পত্নীর উপর অসদ্ব্যবহার করে! নরাধমটা আমার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। কত প্রলোভন! আমাকে আশ্রম করতে তালুক দেবে, টাকা দেবে! যেমন দেখে আসছে, পয়সা দিয়ে গুরু কেনা। মনে করেছিল, এখানেও বুঝি তাই! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে-ছিলুম।"

"তিনি এসেছিলেন" বলিয়া ব্রজমাধব বাবুর সঙ্গে

আমার যে যে কথা হইয়াছিল, গুরুদেবকে শুনাইয়া দিলাম।

"পাঠিয়েছিলুম কেন জান? -এই কাকন-কুসুমটিকে দেখাতে।"

"এইটিই তার?"

"এ আর বুঝতে পারছ না? হতভাগা আর এসেছিল?"

"না প্রভু। সেই এক দিনই দেখেছিলুম, আর দেখি নি।"

"আর সে আসছে না। দেশে সে একটা মস্ত লোক হে! কোম্পানীর কাছে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছে—ভারি প্রতিষ্ঠা! হাঁসপাতাল করেছে, ইস্কুল করেছে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দিয়েছে, বাপের শ্রাদ্ধে বছর বছর অগাধ টাকা খরচ করে, এই কাশীতেই সেদিন বামুন-পণ্ডিত গরীব-দুঃখীদের কতই না দান করলে। রাজা হে রাজা। কিন্তু অম্বিকাচরণ, সে রাজ্যের রাজা, এ রাজ্যের কে? একবার পা দিয়ে, দেখ্‌লে, দু'দণ্ড দাঁড়াতে পার্‌লে না—চোরের মত পালিয়ে গেল।" বলিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেব চিন্তিতের মত চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। গৌরী এই সময়ে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন এইবার আমার কোলে আসিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু গুরুর কোল হইতে লইতে, এমন কি, তাহার চাঞ্চল্যের কথা পর্য্যন্ত বলিতে আমার সাহসে কুলাইল না।

গুরুদেব উঠিলেন, গৌরীকে কোলে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইয়াই তিনি ভুবনের মা'কে বলিলেন—"কি রে বুড়ী, কিছুক্ষণের জন্ত এটাকে রাখতে পারবি?"

ভুবনের মা বোধ হয় উঠিতেছিল। নিষেধ করিয়া গুরুদেব তাহার কাছে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল, তিনি বুঝি আমাকে গৌরীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবেন না। আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছিল, গুরুদেবের ভয়ে পলকের মধ্যেই সে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহণান্তে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"সন্ন্যাসী আমরা, সংসারীদের কথায় থাকা আমাদের একেবারেই উচিত নয়, থাকা ভালও লাগে না, কেবল তোমার জন্তই আমাকে এই জঞ্জালে পড়্‌তে হয়েছে।

"দাসকে জঞ্জাল থেকে মুক্ত করুন।"

"ঠিক কথা?"

সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তথাপি প্রবল চেষ্টায় বুকে বল বাঁধিয়া উত্তর করিলাম—অন্তর্য্যামিন্, আর দাসকে পরীক্ষায় ফেলবেন না।

প্রথম যে দিন তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি, মস্তকে আমার করস্পর্শ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—কি মধুর গম্ভীর আশ্বাস বাণী!—"অম্বিকাচরণ, আজ হ'তে আমি তোমার ভার গ্রহণ করলুম।" সেই বাণী মায়া-মনুষ্য মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

"আর মায়া কেন অম্বিকাচরণ? এই মেয়েটাকে চিন্তা করবার পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব-সংসারটাকে একবার চিন্তা ক'রে নাও। চিন্তা ক'রে নাও তোমার সেই সাধ্বী পত্নী দয়াময়ীকে, তার বুকে ধরা সেই কন্তাটিকে।"

"আমি নিজে অশক্ত, করুণা ক'রে আমাকে মুক্তি দান করুন।"

"মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না, বাবা, নিজের পুরুষকারে উপার্জ্জন করতে হয়।"

এর উত্তর দিতে একান্ত অশক্ত, শুধু গুরুদেবের মুখ-পানে চাহিয়া, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"যিনি তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি তোমারই ভিতরে।"

মনে মনে বলিলাম—"তুমিই গুরুরূপে বাহিরে, অন্তর্য্যামি-রূপে ভিতরে। তোমার এ ভয়-দেখানো কথায় আমি ভুলিব না।"

"কোথায় যেতে চাচ্ছ, যাও।"

প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, তিনি আবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন। আবার যেন কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বেশ, যাও। ফির্‌তে কত বিলম্ব হবে?"

"যত শীগ্‌গির পার্‌ব, প্রভু, বাজার করবার্ এখনও কিছু বাকী আছে।"

"যজ্ঞের আয়োজন করছ নাকি হে?"

আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া, তিনি আবার বলিলেন—"তাই ত, অম্বিকাচরণ, মনটা কেমন কেমন করছে।"

কি জন্ত তাঁহার মন কেমন করিতেছে, অনুমানে বুঝিয়া আমি বলিলাম—"মাকে কড়া কথা ব'লে?"

"বিশেষ কড়া কথাই বলেছি। বলেছি, রোজ রোজ এখানে মরতে এস কেন? আমার ছেলেটির সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না?"

উত্তর দিব কি, ছেলে বলাতেই আমি অন্তরের হাসি চাপিতে পারিলাম না। ভুবনের মা'কে বয়স বলিয়াছিলাম বটে, এখন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পঁইষট্টি পার হইতে চলিয়াছে, আমি হইলাম তাঁর ছেলে? সত্যই কি তিনি আমাকে বালকবৎ দেখিয়া আসিতেছেন?

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কথাটা শোনামাত্র

তাহার মুখখানা রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল। আমি তা দেখে ভয় পাব কেন? আবার বল্লুম; 'মা না বিউলো, বিউলো মাসী; ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী।' গর্ভে ধর্‌লে যে, তার মমতা হ'ল না, ফেলে দিলে—দুর্য্যোগ রাত্তির—ফেলে দিলে মর্‌তে, ওঁর মমতা উথলে উঠলো! এক বৎসর ধ'রে—কুলবধূ—ফের যদি এ বাড়ীতে তোমাকে দেখ্‌তে পাই, ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। সঙ্গে যেটা ছিল, সেটা বুঝি ঝি, সে ব'লে উঠলো, 'কাকে কি বল্‌ছেন, ঠাকুর!' কে তার কথায় কান দেয়, আমি বল্‌তে লাগলুম, তোর নরাধম স্বামীর চেয়ে আমার সে বালকটির মর্য্যাদা অনেক বেশী, তা জানিস্? ঝি বেটী ব'লে উঠলো, 'সাম্‌লে কথা কও ঠাকুর, কাকে কি বল্‌ছ, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।' আমি বল্লুম, কেন, তার মনিব রাজা ব'লে নাকি?' আর একবার সে পাষণ্ড বেটাকে আমার কাছে যেতে বলিস্, চিমটে পিটে আমি তাকে কাশী ছাড়া ক'রে দেবো। বেটী বুঝি রাগে দরোয়ানটাকে ডাক্‌তে যাচ্ছিল, তোমার অন্নপূর্ণা নিষেধ করলেন।"

"মা কিছু বল্‌লেন না?"

"অন্নপূর্ণা আবার কি বলবে! সে একটু হেসে বল্‌লে, 'না বাবা, আর আমি আস্‌ব না।' বালিকার মোহ? যেই এ প্রশ্ন করা, অম্বিকাচরণ, অমনি দুটো ডাগর চোখ থেকে ঝর ঝর ক'রে জল! সেই অবস্থায় মেয়েটা, তখনও তার কোলে ছিল, আমাকে দিয়ে মা চ'লে গেল। আমার কোলে তার স্নেহের পুতুলটির কি অবস্থা হ'ল, দেখতে একবার ফিরেও চাইলে না।"

"গৌরীর মোহ কেটে গেছে বল্‌লেন যে?"

"কাটেনি?"

"আমার যেন মনে হচ্ছে—"

"তোমার মনের মূল্য কি। তোমার মত পুরুষবেশী মেয়ে নয় সে, তাতে জগদম্বার সত্তা আছে।"

কঠোরতর তিরস্কারের ভয়ে আমি নীরব রহিলাম।

"বেশ তোমার যদি মনে তাই হয়ে থাকে, একবার পরীক্ষা ক'রে আস্‌তে পার।"

"কেমন ক'রে করব?"

"তাঁর বাড়ীতে গিয়ে, আমার নাম ক'রে তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।"

গুরু রহস্য করিলেন, কি সত্যই বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন—"প্রয়োজন নেই, মা আমার এখানে আস্‌বেন না।"

গুরুদেবের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আমি দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্য, তিনিও কতকটা আজ অন্যমনস্কের মত হইয়াছেন। আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি এক নূতন কথা আমাকে শুনাইয়া দিলেন—"তাই ত অম্বিকাচরণ, এতকালের সাধন ভজন, এত কালের সন্ন্যাস, কত মহাপুরুষের সঙ্গ, কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ—আত্মজ্ঞানলাভের জীবন-পণ চেষ্টা—সমস্ত ক'রেও যে বোকা সেই বোকা রয়ে গেলুম। একটা ছোট মেয়ে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেল!"

"আর কি কোন কথা হয়েছিল, প্রভু?"

"আমার হয়নি, হয়েছিল তার। গৌরীকে আমাকে কোলে দেবার সময় চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে—মুখে কিন্তু মৃদু মধুর হাসির কথা! ঝি শুন্‌তে পেলে না, আমি মাত্র শুন্‌তে পেলুম—আকাশবাণীর মত আমার কানে ঠেক্‌লো, 'আপনাকে কে গর্ভে ধরেছিল আপনি জানেন?' আমাকে বলতে হ'ল, 'না মা, আমি জানি না।' শুনে আরও একটু হেসে তিনি বল্‌লেন, 'দেবকী বল্‌তেন, আমি কৃষ্ণকে গর্ভে ধরেছি, যশোদা বল্‌তেন আমি। একমাত্র কৃষ্ণ জান্‌তেন, কে তাঁকে গর্ভে ধরেছে। ঠাকুর! এ তত্ত্ব জান্‌লে আপনি আমাকে তিরস্কার কর্‌তেন না'।" বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অম্বিকাচরণ, মাতৃ-চরিত্র-মাহাত্ম্য দেবতারও দুর্ব্বোধ্য।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, মা'কে আর একবার দেখিব।

১৭

গুরুদেবের মুখে যে বিস্ময়কর কথা শুনিলাম, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিয়াছি। উদ্দেশ্য গুরুর সেবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিব। চলিতে চলিতে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি। যে দোকান হইতে আমি মিষ্টান্ন লইতাম, তাহা ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। মনে মনে মায়ের কথার কত অর্থ করিলাম। টীকার উপর টীকা, অর্থও আমার সঙ্গে সঙ্গে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে। "আপনাকে কে গর্ভে ধরিয়াছে জানেন?" মা প্রশ্ন করিলেন। গুরু উত্তর দিলেন "জানি না।"

গুরু জানেন না কে তাঁহার মা। তবে কি তিনি গৌরীরই মত পরিত্যক্ত সন্তান? এক জন তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছে, আর এক জন পালন করিয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই সেই দ্বিতীয় মায়ের কোল আশ্রয় করিয়াছে। যখন তার বোধশক্তি আসিয়াছে, তখনও দেখে, সে সেই স্নেহময়ীর কোলে। সেই মায়ের সমস্ত ভালবাসা সেই ত একায়ত্ত করিয়া আসিয়াছে! তার

স্তনেকের অদর্শনে শিশু যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে!

সেই ত বালকের মা। কেহ যদি তার জন্মতত্ত্ব জানে, আর জানিয়া বালকের মনে সংশয় উৎপাদনের চেষ্টা করে, সে ত কখন তার অন্য মা স্বীকার করিবে না! তবে জননী যদি তার মানুষ করা মায়ের কোল হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে যায়, বালক ত কখনই আকুল-আগ্রহে মা ছাড়িয়া তার কোলে উঠিতে যাইবে না!

কে আমার মা? আমিও কি নিঃসংশয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারি? গুরুদেবের কথা ছাড়িয়া মায়ের প্রশ্নটা একবার নিজেকে করিয়া লইলাম। মনে মনে নানা বিচার বিতর্ক করিয়া আমিও ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না! কে পারে?

কে পারে? পৃথিবীর লোকের মধ্যে কয়জনেরই বা মাতৃস্তন্যপানেরই স্মৃতি আছে? মা—মা। এইটুকু বুঝিয়াই জগতের লোক নিশ্চিন্ত।

তখন মায়ের সেই প্রশ্ন আর ত আমার কাছে সহজ বোধ হইল না। গুরু উত্তর দিতে পারিলেন না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমন অবস্থায় আজিও বুঝি তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গুরু বালক-শিষ্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতা কে?" বালক তার মা'কে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসায় যাহা জানিল, গুরুকে তাহা নিবেদন করিল। বালক জানে না, কে তার পিতা। কেন না, তার মা সেটা বলিতে পারিল না।

কিন্তু সত্যকাম সেই সঙ্গে ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, আমার মা কে? সত্যকামের মনেও সে প্রশ্ন উঠে নাই। উঠিলে, বালক জিজ্ঞাসা করিত। বালক জানিত, মা—মা। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। জানিতে হইলে ওই মায়েরই কথার সত্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। "সূতিকা-গৃহে যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়াছে, বৎস, ধাত্রীর কোলে তখন আমি তোমাকেই দেখিয়াছি এবং আমারই বস্তু জানিয়া সেই অবধি তোমাকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতেছি।"

"আপনি জানেন না, কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন কে তাঁর মা।" তাই ত! সেই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, আকাশের সেই আঁধার-কঠিন-করা মেঘের ভার, ঝড়ের সেই বনে বনে পাগলের অট্টহাসি-ভরা গানছুটানো উল্লাস! আর যমুনার-চিরোল্লাসময়ী তটিনীর সেই মত্ত চঞ্চল তরঙ্গরাশি মাথায় ধরিয়া তৃণচ্ছেদী রহস্যপ্রবাহে কৃষ্ণকোলে বসুদেবকে আবাহন!

সমস্ত ব্রজপুরী ঘন ঘুমে ডুবিয়া গিয়াছে! পশু-পাখী ত আর না জাগিবার মত যে যার আশ্রয় অবলম্বনে অন্ধকারের কঠিনাবরণে চোখ ঢাকিয়াছে। এক বসুদেব ভিন্ন আর কে জানিত ব্রজগোপালের জন্মরহস্য! ক্ষুদ্র শিশুকে সে রহস্যের কথা কে শুনাইল? যশোদা বলিলেন, আমি তার মা, দেবকী বলিলেন, আমি।

এ মাতৃত্বের অধিকার লইয়া যশোদা-দেবকীর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল হইতেই যে চলিয়া না আসিতেছে, তাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

গোপালের মা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়ায় যশোদার বরং অধিকার ছিল। কিন্তু দেবকীর? চির-পরিচিতকেও যদি দশটা বছর দেখিতে না পাই, চিনিতে পারি না। আর সেই সদ্যোজাত শিশু দীর্ঘ ষোড়শ বৎসরের পরিবর্ত্তন দেহে ধরিয়া দেবকীর সম্মুখে দাঁড়াইল! দেখামাত্র সেই কিশোর কৃষ্ণকে সন্তানজ্ঞানে গ্রহণ, দেবকী রাণী কেমন করিয়া করিলেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। না জানিলে দেবকীর বিপুল আগ্রহেও বাৎসল্যের আদর্শ-রূপিণী যশোদার কোল ছাড়িয়া দেবকীর কোল তিনি আশ্রয় করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিতেন, তাঁর গর্ভধারিণী দেবকী।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

"আমার তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি তা জানি অর্জ্জুন, তুমি তা জান না।"

আমি যখন আমার জন্ম জানি, তখন মা'কেও জানি। কেন জানি শুনিবে?

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

যশোদাও নয়, দেবকীও নয়, মায়া আমার মা। নন্দও নয়, বসুদেবও নয়, মায়াধীশ আমিই আমার পিতা।

কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। চির-আত্মজ্ঞ পুরুষ, জননী তাঁহার কাছে আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। গৌরীরও কি সেই অবস্থা? ওই অন্ধকারে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশু—গৌরীকে পাইবার সমস্ত ঘটনাটা নব-প্রস্ফুটিত মূর্ত্তিতে আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। প্রথমে বুক, পরে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—সে কি জানে, কে তার মা? যদি জানে? আমার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

"এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন, বাবা?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, নদীজলে তপস্বিনীর সঙ্গে যাহাকে

দেখিয়াছিলাম, সেই মেয়েটি। একখানি লালপাড় কাপড় পরিয়া একটি বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

কোথায় যাইতেছি বলা অসম্ভব—আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম—"এই কি, মা, তোমার বাড়ী?"

"আমার বাবা এখানে থাকেন।"

"তুমি?"

কি যেন কেমন একটি কোমল সঙ্কোচ কোমলতর হাসির আবরণে ঢাকিয়া মেয়েটি বলিল "আগে থাকতুম না, এখন থাকি।" বলিয়াই কথাটা যেন ফিরাইবার জন্য সে বলিতে লাগিল—"ওপর থেকে দেখতে পেলুম, আপনি যাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। কোথাও যাবার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে—"

"বিশেষ এমন প্রয়োজন—"

আমি যেমন ভাবে কথা শেষ করিতে দিলাম না, সেও সেইরূপ করিয়া বলিল—"তা হ'লে একবার বাড়ী-টাতে পায়ের ধূলো দিন না।"

"বেশ চল।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। মেয়েটি পথ দেখাইয়া আমাকে উপরে লইয়া চলিল। কিন্তু সিঁড়ির পথটা এমন অন্ধকার, উপরে উঠিতে আমার কেমন উৎসাহ হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাবা কি উপরেই আছেন?"

"আছেন—তিনি পূজা করছেন।"

"তবে—এক জনের বাড়ী যাবার ইচ্ছা করেছিলুম।"

"কার বাড়ী।"

"কিন্তু তার ঠিকানাটা আমার ভাল জানা নেই।"

"কার বাড়ী?"

"ব্রজমাধব বাবুর।"

দেখিলাম, মেয়েটির মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা কহিল না।

আমি বলিলাম—"জানতে পারলে প্রয়োজনটা সেরে যেতুম।"

"এখনি সেখানে যাবেন?"

"তুমি তাঁর ঠিকানা জানো?"

আমার কথার উত্তর না দিয়া, দোতলার দিকে মুখ করিয়া সে ডাকিল—"লছ্‌মী!" উপর হইতে একটি মধ্যবয়সী পশ্চিমা ঝি নামিয়া আসিল। মেয়েটি তাহাকে বলিল—"বাবাজীকে রাজা বাবুর বাসাটা দেখিয়ে দে।"

ঠিকানাটা এত সহজে পাইয়া আমার আহ্লাদ হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও হইল। একটু সন্দেহও আসিল। সে সন্দেহটা আনিল মেয়েটির বাপ।

যাক্, বিস্ময়, সন্দেহকে তাহাদের ক্রিয়া করিবার অবসর না দিয়া আমি একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"আগে প্রয়োজনটা সেরে তোমার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রে যাব।"

মেয়েটি কি যেন আমাকে বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে বলিতে আবার সঙ্কোচে বলা হইল না। আমি চলিলাম। লছ্‌মী পথ দেখাইয়া চলিল। আমি পূর্ব্বেই জঙ্গমবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সামান্য দূর যাইতেই অন্ধকারময় পথ ছাড়িয়া জঙ্গমবাড়ীর প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইলাম। আর একটু চলিতেই লছ্‌মী দূর হইতে রাজাবাবুর বাড়ী দেখাইল। সেখানে পথ আরও প্রশস্ত এবং তাহারই পার্শ্বে নূতন রকমে প্রস্তুত একরূপ "সাহেবি" ধরণেরই অট্টালিকা।

বাড়ী দেখাইয়াই লছ্‌মী দাঁড়াইল। বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত চলিবার অনুরোধ করিতে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বলিল—"হামি হুঁয়া নেহি যাব বাবা।" বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার রাজাবাবুকা পাশ কি দরকার আছে?"

"রাজাবাবুকা পাশ নয়, রাণীমায়ীকা পাশ।"

সে অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে একবার চাহিল, তার পর ফিরিয়া চলিল,—আমার কাছে বিদায় লইবারও অপেক্ষা রাখিল না।

১৮

ব্রজমাধব বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অনেক লোক পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং সেখানে দাঁড়াইতে আমার সঙ্কোচ নাই। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে কেমন আমার সাহস হইতেছে না।

এই ধনী, তার এত বড় বাড়ী, তার স্ত্রীকে কেমন করিয়া আমার সেই নগণ্য, এ বাড়ীর তুলনায় কুটীরের মত গৃহে নিমন্ত্রণ করিব? দেউড়ীতে বন্দুক-ঘাড়ে সিপাহী পায়চারি করিতেছে। দেউড়ীর ওপাশে লোক-কোলাহল—বুঝি রাজার ভৃত্য, কর্ম্মচারী অসংখ্য—বাড়ীতে প্রবেশই বা কেমন করিয়া করিব?

রাণীমা'কে নিমন্ত্রণ করার গুরুর তেমন ইচ্ছা দেখি নাই। ইচ্ছা, আগ্রহ যা কিছু সব আমার। ব্রজমাধবের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমারও ইচ্ছা দমিত হইয়া গেল।

কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে আমার ত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছে। আলাপে তাহাকে শিষ্ট, শান্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াই বুঝিয়াছি। রাণীকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, তখন নিষ্ফল প্রয়াসে ফিরিয়া

যাইব ? আমি ব্রহ্মচারী—কোন অর্থ-ভিক্ষায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি না—আমার ভয় কি ?" ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া আমি ব্রজমাধবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

দ্বারমুখেই বাধা পাইলাম, দরোয়ান আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমার মত পরিচ্ছদধারী অনেকেই, বোধ হয়, পয়সার জন্য বাবুর উপর উৎপাত করে। দরোয়ানের বাধায় আমার ক্রোধ হইল না। আমার আসার উদ্দেশ্য দরোয়ানকে বুঝাইব, পার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই কি রকম এক তীব্র দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"কি ঠাকুর, এখানে কি মনে ক'রে ?"

"রাণীমা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

"রাণীমা'র সঙ্গে! বল কি বামুন, তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়।"

বেটীর দাম্ভিকতায় বাস্তবিকই আমার ক্রোধ হইল। তবু আমি শান্তভাবে তাহাকে বলিলাম—"কেন গো বাছা, এটা এমন দোষের কথা কি হ'ল! আমি ব্রহ্মচারী মানুষ--"

দরোয়ান আর আমাকে কথা কহিতে দিল না। সে একরূপ ধাক্কা দিয়াই আমাকে দেউড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

বাহিরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতই দাঁড়াইলাম। কি উৎপাত! এ কোথায় আমি কাকে খুঁজিতে আসিয়াছি? আমার সে কুটীরের দিক্ দিয়া, রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি যে সহজ মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, সেটা আমার মস্ত ভুল। এটা মনে করিতে যাওয়াই আমার পাগলামী হইয়াছে।

পথে পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এক যুড়ী আসিয়া অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে ব্রজমাধব বাবুকেই দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে আরও তিনটি। দুইটির বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ, একটি "সাহেব" বেশধারী।

ব্রজমাধব আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমিও তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া অবনত মস্তকে পাশ কাটিয়া যাইব মনে করিলাম। দুই দরোয়ান আমাকে তাও করিতে দিল না, রূঢ় হস্তে আমাকে টানিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড় করাইল। তার হুজুরের আসিবার পথে আমি বুঝি বাধা হইয়াছি।

প্রথমে ব্রজমাধব, তার পর একে একে তিন জন গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিল। পথের পার্শ্বে বন্দুক খাড়া করিয়া সিপাহী, তার পশ্চাতে আমি।

আমি ত মনে করিলাম, ব্রজমাধব আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিল না, কিন্তু যেই ফটক ছাড়িয়া আবার আমি রাস্তায় পড়িয়াছি, অমনি একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"ও ঠাকুর, হুজুর তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

কি করিব? ইহাদের কথাবার্ত্তাগুলা আমার ভাল লাগিতেছে না, ব্যবহার বিরক্তিকর হইয়াছে; যাইব কি না? আর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? পার্ব্বতীর কথার ভাবে বুঝিয়াছি, রাণীকে নিমন্ত্রণ করা বৃথা। সে কথা দ্বিতীয়বার তুলিতেও আমার সাহস নাই। ব্রজমাধবের সঙ্গে কথা কহিবার কি আছে? ওদিকে অতিথি হইয়া গুরু ঘরে বসিয়া আছেন।

"তোমার হুজুরকে বল, আর আমি যেতে পারব না।"

ভৃত্য বলিল—"পারব না কি, যেতেই হবে।"

লোকটা ব্রজবাবুরই দেশের। কথা এমন কর্কশ যে, সহস্র চেষ্টায় ক্রোধ সংবরণ করিতে গিয়াও আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। বিশেষ চেষ্টায় প্রকৃতিকে স্থির করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তুমি রাজা বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো, কি জন্য তিনি আমাকে ডাকছেন!"

হতভাগাটা এর উত্তরে বলিল—"যাবি কি না যাবি বল?"

"যদি না যাই?"

অমনি সে ডাকিয়া উঠিল—"সিপাহী!"

দেখি, পথের মাঝেই লাঞ্ছিত হই। সিপাহী আসিতেছে, দুই চারি জন পথিকও সিপাহীর নাম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলাম—"বেশ, চল।"

হতভাগাটা আমাকে যেন আগুলিয়া উপরে লইয়া গেল! পথে কোনও দিকে না চাইতেও বুঝিলাম, অনেক-গুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই হতভাগী পার্ব্বতীটা আছে কি না বুঝিতে পারিলাম না।

যে এক দিন দীনভাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া-ছিল, তার বাড়ীতে এরূপ ব্যবহার পাইব, আমি যে স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই! আর তার এরূপ আচরণের অর্থই বা কি? রাণী কি সেদিন আমার দোষ গ্রহণ করিয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন? তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা আজিকার তৎপ্রতি গুরুর আচরণের সমস্ত ক্রোধটা আমার উপর পড়িয়াছে? বুঝিতে পারিলাম না, রাজাবাবুর বাড়ী আমার এ লাঞ্ছনার অর্থ কি।

উপরে উঠিতেই দেখিলাম, এক অতি সুন্দর, সজ্জিত প্রশস্ত ঘর। ঘর রাজারই যোগ্য বটে! ঘরের তিন চারিটা দ্বার, তাতে রং-বার্ণিস করা অতি সুন্দর কবাট। তার একটা দিয়া বুঝি ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। কেন না, সেই দোরটার পাশেই একটা টুলের উপর দেখিলাম,

সাজগোজ পরিয়া যে দরোয়ানটা আমারই বাড়ীর দোরে বসিয়াছিল, বসিয়া আছে।

চাকরটা আমাকে দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া ভিতরে গেল। ঘর লোকে পূর্ণ—বাঙ্গালী, পশ্চিমা, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, হিন্দু, মুসলমান—দুই-ই দেখিলাম। কাশীর পণ্ডিতদের ভিতরও দুই এক জন দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা আসিয়াছে—কেহ জিনিস বেচিতে, কেহ বেচা জিনিসের দাম লইতে; কেহ বা শুধুই সাক্ষাৎ করিতে। আর এই পণ্ডিতগুলা আসিয়াছে, এই বিপুল বিলাসী ধনীর নিকট হইতে যা যৎকিঞ্চিৎ কৃপাপ্রাপ্তির লোভে, নানাবিধ স্তুতির শ্লোকে সেই অতুলনীয় দেবভাষার শ্রাদ্ধ করিতে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু যাঁহাকে লইয়া স্তুতি, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বুঝিলাম, বাবু ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। তাঁর সহচরগুলিকেও দেখা গেল না। উঁকি দিয়া যে দেখিব, তারও উপায় নাই। কতক্ষণ দরোয়ানের পার্শ্বে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিব? যে হতভাগা চাকর আমাকে দাঁড় করাইয়া ভিতরে গিয়াছে, সে বেটাও ত ফিরে না! কি আপদ্! এক এক মুহূর্ত্ত যে এখন আমার কাছে বৎসর বোধ হইতেছে!

"দরোয়ানজি!"

সে আমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিলাম, তার তকমা, পাগড়ী, পোষাক, টুল সমস্ত এক সঙ্গে জড়াইয়া এক অপূর্ব্ব অহঙ্কারের মূর্ত্তি ধরিয়া, তার চোখ দু'টার ভিতর হইতে আমাকে ধমক্ দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, দরোয়ানজিকে সম্বোধন করাই আমার ধৃষ্টতা হইয়াছে। হঠাৎ ঘরের ভিতর একটা বিষম হাসির রোল উঠিল। ইহার একটু পরেই সেই সাহেব-বেশী যুবক—সে আসিয়াই আমাকে বলিল—"তুমিই কি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছ?"

"ভুল ক'রেছিলুম বাবা! আমার বলা উচিত ছিল, রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

যুবক মুখটা বিশেষ রকমই বিকৃত করিয়া বলিল—"ভুল হয়েছিল! ভীমরতি হয়েছে না কি? সিধুবিবির বাড়ীতে কি করতে গিয়েছিলে? সেটাও কি এই রকমই ভুল?"

"সিধুবিবি কে, আমি ত জানি না বাবা!"

"জান না?" বলিয়াই সে একটা কঠোর গালি দিয়া আমার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন। দুই চারি জন লোক চপেটাঘাতের শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলেই দাঁড়াইয়া নীরবে আমার লাঞ্ছনা দেখিল। দরোয়ান টুল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আগে হইতেই প্রাণহীনের মত আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"শাস্তির যদি শেষ হয়ে থাকে, আমাকে যেতে অনুমতি দাও, বাবা!"

আর এক চপেটাঘাত। "বেটা, চিম্‌টেপেটা ক'রে রাজাবাবুকে কাশী-ছাড়া কর্‌বি না?"

"সে ও বলেনি, পিসে বাবু!"

দেখিলাম, বারান্দায় একটু দূরে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীও আমার লাঞ্ছনা দেখিতেছে।

আমি বলিলাম—"সে আমারই বলা পার্ব্বতি!"

ভিতর বাহির নিস্তব্ধ। সিঁড়ির মুখেও লোক দাঁড়াইয়াছে। কাহারও মুখে কোনও সহানুভূতির কথা ফুটিল না।

শেষে এক জনের মুখ হইতে উপদেশের কথা বাহির হইল। তার সর্ব্বদেহেই বৈষ্ণবোচিত চিহ্ন, হাতে মালার ঝুলি। ঝুলি নাড়িতে নাড়িতে সে আমাকে বলিল—"ভগবানের নামে ভণ্ডামীর ঠিক শাস্তি পেয়েছ। তোমার ভাগ্য ভাল। হরি করুন, এখন থেকে যেন তোমার সুমতি হয়। আর যেন ধর্ম্মের গ্লানি ক'র না।"

কেবলমাত্র এক জন আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কথা কহিল। সে মুসলমান। আমার বার বার লাঞ্ছনা দেখা সহ্য করিতে না পারিয়া, বুঝি, সে বলিয়া উঠিল—"বুঢ্‌ঢা আদমি ভুল কিয়া, মাফ কিজিয়ে হুজুর!"

যুবক প্রহার করিতে নিরস্ত হইল। কিন্তু সে সেই মুসলমান ভদ্রলোকটির কথায় হইল কি না, বলিতে পারি না। নিরস্ত হইয়াছে সে পার্ব্বতীর কথায়। হতভাগা ভুল করিয়াছে তার মুখে আমি অপ্রতিভের ভাব দেখিলাম।

"এইবারে যেতে পারি, বাবু?"

কোনও উত্তর না দিয়া যুবক চলিয়া গেল।

"কি গো, মা, যেতে পারি?"

"যাও বাবা, কিছু মনে ক'র না। পিসেবাবু লোক ভুল করেছে।"

বাড়ীর বাহিরে যাইতে আর বাধা পাইব না বুঝিয়া পার্ব্বতীর সান্ত্বনাবাক্যে শুধু হাসির উত্তর দিয়া আমি ব্রজমাধবের গৃহত্যাগ করিতে চলিলাম।

সত্য বলিতেছি, এই অহেতুক অপমানে হতভাগা যুবকটার উপর আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। কেন হইল না, ইহার উত্তর কি দিব? উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি আমার কেমন দয়া হইল। ভদ্রঘরের এরূপ অনেক আকাটমূর্খ আমি দেখিয়াছি। তাহারা কি করে, কি বলে,

কেন করে, কেন বলে, নিজেরাই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি যখন মদাঢ্য, অসৎপ্রকৃতি ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আশ্রয়দাতার মনস্তুষ্টির জন্ত এমন ঘৃণিত কাজ নাই, যাহা সে করিতে পারে না। তাহার প্রভু যা নিজে করিতে অথবা বলিতে পারে না, সে তা অনায়াসে করিতেও পারে, বলিতেও পারে। প্রভুর কৃপা হারাইয়া এই প্রকার লোকদিগের অনেকের প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি। হতভাগ্যের উপর ক্রোধ না হইয়া সত্যই তাহার উপর আমার কেমন দয়া হইল। তার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, এখনও সে মনুষ্যত্বের সমস্তটা হারায় নাই। সদাশ্রয় পাইলে বুঝি হতভাগাটা আবার ভাল হইতে পারে। আর তাহাকে পশু করিয়াছে, তার এই বিজাতীয় পরিচ্ছদটা। ব্রাহ্মণ-সন্তান "সাহেবের" অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। অনুকরণে লইতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তার দোষটুকু। তার এই বিলাতী পোষাকের আবরণে কত তম যে আশ্রয় করিয়াছে, প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া ওই আবরণের ভিতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

যুবকটার উপর আমার দয়া হইল। দয়াই বা বলিতেছি কেন, কেমন একটা মমতা আসিল। এ মমতার কারণ আমি আমার মনের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াও নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ক্রোধ আসিতে লাগিল সেই পাষণ্ড, সেই বকধার্ম্মিক "রাজাবাবু"টার উপরে। যাহার ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে ওই বুদ্ধিমান্ যুবক যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছে। এমন কাপুরুষ সে, যে কার্য্যটা নিজে করিতে সাহস করিল না, তাহাই তার এক জন অন্নদাস নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়া করাইল! আমাকে দিয়া গুরুদেবকে দীক্ষা দিবার অনুরোধ করাইতে এই ব্যক্তিই কি আমার কাছে গিয়াছিল—সেই শান্ত মিষ্টভাষী বিনয়ী? গৌরীকে দেখিয়া সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য না ব্যাকুল হইয়াছিল!

সেই হতভাগা জমীদারের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইতে আমার অধিকার ছিল। সহসা মায়ের মুখস্মৃতি! সে যেন হাসিয়া বলিল—"কর কি ঠাকুর! তুমি না সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ, তোমার প্রাণের গৌরীকে ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছ? অথচ একটা তুচ্ছ অপমান সহ্য করিবার তোমার ক্ষমতা নাই!"

যাও ব্রজমাধব, বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করুন।

১৯

"কি গো মা, বাড়ী আছ?"

"আসুন আসুন।"

আমি, মেয়েটির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠান হইতে ডাকিলাম। সে, ঘর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া আমাকে উত্তর দিল। দেখিয়া বোধ হইল সে রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

আমি বলিলাম—"এখন আসি না কেন, মা।"

"না—না।"

"আর এক সময়ে আস্‌বো।"

"তা হবে না।"

"বাসায় শীগ্‌গির ফের্‌বার আমার প্রয়োজন হয়েছে।"

"তা হ'ক, একবার আপনাকে উপরে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। বাবা আপনার অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

আমার উত্তর দিবার আর কথা রহিল না। আমার সম্মতি বুঝিয়াই আবার সে বলিল, "একটু দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি হাতটা ধুয়েই যাচ্ছি। সিঁড়িটা অন্ধকার, একা উঠতে আপনার কষ্ট হবে।" বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অন্তর্হিত হইল।

আমি, সিঁড়ির দিকটা পিছনে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার জীর্ণতা ও লোকশূন্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে মেয়েটি আমাকে ডাকিল—"বাবা, আসুন।"

কখন্ কেমন করিয়া কোন দিক্ দিয়া হঠাৎ সে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল!

পিঠে একরাশ ছড়ানো চুল, কোমল হাসি-মাখা সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করিতে নীল তারা দুটির ভিতর হইতে গভীর বিষাদের ইঙ্গিতভরা যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রু-মুছা, দুটা পটল-চেরা চোখ, দীনবসনের সরলাবরণে অকুণ্ঠিত সুস্থ সৌন্দর্য্য বহন করা দেহযষ্টি! তাই ত, গুরুর কথাই কি ঠিক? এই মেয়েটাকেই যে দু'টার মধ্যে বেশী সুন্দর মনে হইতেছে! "হাঁ মা, এ বাড়ীতে আর কোন মেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?"

"নেই কেউ, কেমন ক'রে দেখবেন? বাবা আছেন আর আমি আছি। সেই ঝিটি পাট ক'রে দিয়ে যায়। এখন চলে গেছে, বাসন-কোসন মাজ্‌তে, সেই বিকালে আবার আস্‌বে।"

"তোমার মা?"

"বছরখানেক আগে মারা পড়েছেন।

"এ বাড়ীতে অন্ত লোক বাস করবারও ত ঢের জায়গা আছে।"

"এটা বাবার কেনা বাড়ী। তিনি দেশ থেকে এখানে কাশীবাস করতে এসেছেন। ভাড়াটে রাখেন না।"

"এমন অনেক গরীব বিধবা আছে, যারা অমনি বাস করবার ঘর পেলে ধন্ত হয়ে যায়।"

মেয়েটি এ কথার কোনও উত্তর দিল না, আমাকে কেবল উপরে চলিতে অনুরোধ করিল। আমার কথাটা সে যেন শুনিতেই পাইল না।

"তা হ'লে পিতার সেবা করতে একমাত্র তুমি?"

"আমি দিন পাঁচ সাত এখানে এসেছি।"

"এতদিন?"

"এতদিন কে সেবা করেছে, জানি না।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম। এ যাহা বলিল, তার অর্থ কি?

"আমার এখানে আসবার আগে শুনেছি আমাদের দেশের এক কাশীবাসিনী বুড়ী বাবার পরিচর্য্যা করত। আমি এখানে এসে কিন্তু তাকে দেখিনি।"

"তুমি কি স্বামীর ঘরে থাকতে?"

বিদ্যুৎ-বিলাসের মত মেয়েটা কেবল একরাশ হাসি মুখে মাখিল।

"এতে হাসির কথা কি আছে, মা?"

"আপনি কি বাবা, গুরুদেবের মুখে শুনেন নি?"

"কই না তো!"

"সবে মাত্র পাঁচ দিন আমার বিয়ে হয়েছে। আমি কুলীনকন্তা!"

সবিস্ময়ে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতকাল তবে তুমি কুমারী ছিলে?"

প্রশ্নটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা তার লাল হইয়া উঠিল।

উত্তরটা তাহার মুখ হইতে যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল না।

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "না থাকলে আর কি থাকবো?"

"আমার স্বামীকে আপনি জানেন।"

"আমি জানি!"

"তিনিও আপনার গুরুদেবের ভক্ত।"

একবারেই বুঝিয়া ফেলিলাম, তিনি রাজমোহন। আর এটাও বুঝিলাম, গুরুদেবেরই ইঙ্গিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই যুবতীর পিতার জাতিধর্ম রক্ষা করিয়াছেন।

"হুঁ—বুঝেছি,—চল।"

ফুলের মত কোমল হাতখানিতে আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সন্তর্পণে উপরে তুলিতে লাগিল। সে উপরের ধাপে, আমি নিম্নে। সিঁড়ির খানিকটা অংশ নিশীথের অন্ধকার কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সেই স্থানটায় পা দিতেই মেয়েটা যেন তার স্পর্শটুকু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রূপটা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল।

দুষ্ট শিহরণ কিন্তু এবারে আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে চোখ দুটা আমার সহসা সিক্ত হইল। হাসার না বুঝার ভিতর হইতে আমি কি যেন একটা বুঝিতে পারিয়াছি। দিবসের নিবিড় আঁধার আমার দৃষ্টি-হীন চোখে কি এক তত্ত্বের আলোক ঢালিয়া দিয়াছে।

"হাঁ, মা, তোমার নাম কি সিধু?"

"কে আপনাকে বললে?"

"আরে মর্ রাঁধতে রাঁধতে আবার কোন চুলোয় গেলি সিধী?" উপরের কোনও একটা ঘর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর বাহির হইল।

"তাড়াতাড়ি করবেন না, আস্তে আস্তে পা দিয়ে আসুন। আর অন্ধকার নেই।"

"ও সিধী, সিধী!" এমন একটা কঠোর ভাষা ঘরের সেই এখনো না দেখা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল যে, শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিশেষতঃ যখন মনে হইল, কি কথাটা পিতা তাহার কন্তার প্রতি প্রয়োগ করিল, তখন সেরূপ জ্ঞানহীন ক্রোধীর সহিত আমার সাক্ষাতের আর প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত রহিল না।

উপরে উঠিতে একটিমাত্র ধাপ বাকি। না উঠিবার সঙ্কল্পে যেই আমি দাঁড়াইয়াছি, মেয়েটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—"দাঁড়াইলেন কেন? আর যেতে কি আপনার ইচ্ছা নেই?"

"উনিই তোমার বাবা?"

"উনিই।"

"তোমার বাবা আমার অপেক্ষা করছেন বলছিলে যে?"

"ওঁর এ কথা শুনে দেখা করতে কি আপনার ভয় হচ্ছে?"

"আর দেখা করবারই বা দরকার কি?"

মেয়েটি আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে ক্ষুণ্ণ বুঝিয়া আমি বলিলাম—"আর এক সময় দেখা করলে কি চলবে না? গুরুদেব বাড়ীতে এসেছেন। আমার ওখানেই আজ তাঁর সেবা।"

"তবে—ক্ষোভটা তাহার এতই বেশী বোধ হইল, বিদায়ের কথা সে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না। শেষে বলিল—"অন্ধকারে আপনি নামতে পারবেন?"

"খুব পারব, মা।"

"না হয় আমি সঙ্গে যাই।"

"প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা রাগ করছেন।"

"করুক্‌গে?" বলিয়া আবার যেমনই সে এক পৈঠায় পদ দিয়াছে, দ্বিগুণ কঠোর স্বরে আবার তার পিতা তাহাকে ডাকিল।

"আর তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

"তবে আসুন। সাবধানে সিঁড়িতে পা দেবেন।"

"তোমার নাম—"

"সিদ্ধেশ্বরী।"

নীচে নামিতেই শুনিতে পাইলাম, সিদ্ধেশ্বরী তাহার পিতাকে তিরস্কার ছলে বলিতেছে—"অমন ক'রে চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"আমার পিণ্ডি চট্‌কাবার জন্তে।"

"সাধু মানুষ দেখা করতে এসে ফিরে গেলেন।"

"কেন?"

"যে কথা মুখ দে বার করলেন, ওরূপ কথা শুনলে যার মর্য্যাদাবোধ আছে, সে কি আর দেখা করতে সাহস করে?"

"কড়া কথা শুনে যে ভয়ে পালিয়ে যায়, সে আবার সাধু কি? তুই যেমন সতী, সেও তেমনি সাধু।"

ঠিক বলিয়াছ বৃদ্ধ, আমি এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

২০

কর্ম্মের খেলা—আমি যেন আজ কি করিতে কি করিতেছি। ব্রহ্মচারীর যা একান্ত অকর্ত্তব্য, বাধ্য হইয়া যেন, আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে।

যে ঘরে পিতা-পুত্রীর কথোপকথন হইতেছিল, উপরে উঠিয়া সেখানে পৌঁছিতে অনেকটা বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়। আমি তাই করিলাম। ভাবিলাম, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ দুই একটা কথা কহিয়াই আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিব। বাসায় গুরুদেব আমার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছেন, ঘরে আমার অনেক কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে।

সিঁড়িতে উঠিবার সময় পিতা-পুত্রীর কি কথোপকথন হইতেছিল, আমি শুনি নাই। কিন্তু প্রতি সিঁড়ি হাত দিয়া ধরিয়া অন্ধকার ভেদিয়া যেই আমি উপরে উঠিলাম, অমনিই সিদ্ধেশ্বরীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, এখনো ইহারা আমার কথাই কহিতেছে। কন্যা বলিতেছিল—"বাক্যির দোষে দু'দিন একটা মানুষ বাড়ীতে তিষ্টিতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম পিতার কর্কশকণ্ঠের উত্তর :—"মানুষ হ'লেই থাকতে পারে।"

"এত বড় বাড়ীর ভিতরে মাত্র এক জন বুড়োমানুষ বাস করে, যে শোনে সে-ই অবাক্ হয়ে যায়।"

"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

"পৃথিবীশুদ্ধ লোক দুষ্ট, তার মধ্যে উনি একা।"

"তা তুই বুঝ্‌বি কি পাপিষ্ঠা।"

"কাশীতে ব'সে—সাধুর নিন্দা!"

"তুই বেটী যেমন সতী, সে বেটাও তেমনি সাধু।"

"দেখুন বাবা, দেখলেন না শুনলেন না, এমন ক'রে এক জনকে গাল দিচ্ছেন কেন?"

"সে না দেখেই আমার দেখা হয়েছে। ও রকম সাধু কাশীর গলিতে গলিতে গাদা হয়ে জমে আছে। সাধু এসেছেন ধর্ম্ম করতে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে! সঙ্গ করবার আর তিনি লোক পেলেন না! তোর কাছে চতুর্ব্বর্গ আছে, সেই লোভে এসেছিল—না?" এই বলিয়া অস্ফুট অস্পষ্ট স্বরে পিতা পুত্রীকে আরও দুই একটা কি কথা শুনাইল। বোধ হইল কথা অতি তীব্র—অশ্রাব্য। ইহার পরে আবার উচ্চ কর্কশকণ্ঠ। সম্বোধনের কথাটা আপনাদের শুনাইতে পারিলাম না।

বৃদ্ধের মুখ হইতে—স্বর শুনিয়া আমি তাহাকে বৃদ্ধই অনুমান করিয়াছি—পাছে আমার সম্বন্ধে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শুনিতে হয়, আমি একবারে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

ব্রাহ্মণ একখানা নামাবলী কাঁধে দিয়া একখানি আসনে বসিয়া আছেন। মুখ তাঁর বিপরীত দিকে। বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁর কন্যা। বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ এখনো পূজায় বসিয়া। পূজার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সকল কথা লইয়া তাঁহার আলাপ হইতেছে।

মুখ এখনও দেখি নাই। দেখা যাইতেছে শুধু তাঁর পৃষ্ঠের কিয়দংশ। বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ। কিন্তু পৃষ্ঠের লোলচর্ম্মের মধ্য দিয়া যৌবনের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখনও যেন লুকাইয়া লুকাইয়া এক একবার দেখা দিতেছে।

ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে বার দুই চার জপ সারিয়া লইলেন। তার পর আবার যেই কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, অমনি আমি দ্বার হইতে ডাকিলাম—"মা!"

"আসুন—আসুন।"

বৃদ্ধ বোধ হয় কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি মুখ

না ফিরাইয়াই, ধ্যান করিতে করিতে, বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত হতভাগী, অমন মহাত্মার কৃপা পেয়েও—'

"চুপ করুন।"

"তোর চৈতন্ত হ'ল না!"

পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া একটু জোর গলায় সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"ঠাকুর মশাই এসেছেন।"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইলেন। আমি দেখিলাম, যেন বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, কালস্রোতে প্রায় সমস্ত মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়াছে—কিন্তু আজিও মরে নাই। যা দুই একটি শিকড় অবশিষ্ট আছে, তাহাদেরই সাহায্যে ক্ষীণ জীবন লইয়া মাটী আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

বয়োবৃদ্ধ—মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার চশমার ভিতর দিয়া, বোধ হইল, আমার যেন আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার কন্তার ইচ্ছা ছিল, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

সিদ্ধেশ্বরী ব্যগ্রতার সহিত একখানা আসন আনিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

"থাক্ মা, এখন আমি বস্‌তে পারব না।"

বৃদ্ধ তখনও নীরবে চশমার ভিতর দিয়া বাণ-নিক্ষেপের মত আমার পানে চাহিয়া।

আমি বলিতে লাগিলাম—"কিন্তু দেখার এ যোগ্য সময় নয়, বাসাতেও শীগ্‌গির্ ফেরবার আমার প্রয়োজন, এই ভেবে, অন্ত এক সময়ে দেখা করব মনে ক'রে চলে যাচ্ছি-লুম। আপনার কথা শুনে ফির্‌লুম।"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ মলিন হইয়া গেল।

দেখিয়া আমি বলিলাম—"মুখ মলিন কর্‌বার এতে কিছু নেই মা। তোমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, আমার পিতার তুল্য। ওঁর কথা শুনে বাস্তবিকই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

আপাদ-মস্তক দেখা শেষ করিয়া বৃদ্ধ এইবার মুখ খুলিলেন—"নাম কি তোমার?"

"অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।"

"উপাধি ব্রহ্মচারী?"

"আজ্ঞে না—আশ্রম। আসল নাম ব্রহ্মচারী অম্বিকা-চৈতন্ত।

"আকুমার?"

"আজ্ঞে না বাবা, সংসার ছিল।"

"তার কি হ'ল?"

"গুরু-কৃপায় ভেঙ্গে গেছে।"

"কত দিন?"

"প্রায় দশ বৎসর।"

"কুল্লে দশ বৎসর? তা হ'লে এখনও সংসারের নেশা আছে?"

"মনে হচ্ছে ত নেই।"

মাথাটা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ দন্তশূন্য মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মর্কট-বৈরাগ্য! বুঝেছি। যাও বাবা, এদিক ওদিকে লোভ না ক'রে আবার গিয়ে সংসার কর।"

"তিন বার করেছিলাম, বাবা, তিনবারই ভগবান তা ভেঙ্গে দিয়েছেন—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—আর সংসারের ইচ্ছা নেই।"

"তা তো নেই—তবে এ সব দিকে তীব্রদৃষ্টি কেন—পরের সংসারে?"

"আপনি এ কি বলছেন!"

"আর বলাবলি কি, এই যে সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখ না।"

কন্যা এই সময় পিতাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—"ছি বাবা, ছি—মর্‌তে চলেছেন, এখনও পর্য্যন্ত আপনার এত নীচ অন্তঃকরণ!"

বৃদ্ধ সে কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখছ ব্রহ্মচারী?"

"দোহাই বাবা, সাধুর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন না—" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বৃদ্ধের পা দু'টা জড়াইয়া ধরিল।

"চুপ কেন হে তিন-সংসার-ভাঙ্গা ব্রহ্মচারী?"

আমি উত্তর দেবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। একান্ত না বলিলে চলে না, তাই বলিলাম—"আপনি কি বলিতে চান বলুন।"

"আগে আমার কথার উত্তরটাই দাও না।"

"দোহাই বাবা, ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র না।"

এইবারে আমাকে বলিতে হইল—"দেখেছি।"

বৃদ্ধ পদতলে পতিতা কন্তার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া ঈষৎ উন্নমিত করিয়া আমার চোখের দিকে ধরিলেন। ধরিয়াই আমাকে আর একবার কন্তার মুখের দিকে চাহিতে আদেশ করিলেন। অতি বার্দ্ধক্যের জড়তা-বিজড়িত গম্ভীর স্বর—আমি আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশে সিদ্ধেশ্বরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে—আবদ্ধ নীলাভ তার তারা দুটা হঠাৎ বন্ধনে যেন বিরক্ত হইয়া মুক্ত হইবার জন্ত পলক দুইটাকে কাঁপাইতেছে।

রূপের বর্ণনা করিতে বসি নাই, কিন্তু দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আমার চাঞ্চল্য আসে নাই, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিব না।

"দেখেছ সাধু?"

"দেখছি বাবা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

উত্তরে বৃদ্ধ যেন কিছু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িলেন—সহসা আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া গলাটা কিছু সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—'ভগবতী—সে কথা আমিও জানি, প্রত্যেক নারী ভগবতীর এক এক মূর্ত্তি।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

আমিও তা জানি ব্রহ্মচারী, কিন্তু—"

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আমি বলিলাম—"আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিত থাকিলে এই মায়ের চেয়ে আট দশ বৎসরের বড় হইত।"

সেই দন্তহীন মুখ আবার রহস্যের হাসিতে ভাসিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরীর মুখও তাঁহার হাত হইতে এইবার মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু সে উঠিল না, পিতার আসনের পাশে বসিয়া বিস্মিতার মত যেন সে এ বিচিত্র কথোপকথন শুনিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, বামহাতে ভর দিয়া, বসিল সে স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া। দেখিয়া মনে হইল, আমার মুখ হইতে সে তার বাপের হাসির উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে!

"আমি মিছে কইনি প্রভু, আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি।"

এবারে হো হো হাসি। সে হাসি, কি জানি কেন, আমাকে এমন অপ্রতিভ করিয়া তুলিল যে, সেই অতিবৃদ্ধের কোটর-গত দৃষ্টির সম্মুখেও আমি মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ হাসি রাখিয়া আবার গম্ভীর হইলেন। সেই গম্ভীরভাব-মণ্ডিত স্বরে—এইবারে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বাক্য প্রয়োগ করিব—তাঁর সুন্দর-সুস্পষ্ট উচ্চারিত শ্লোক, তাঁর রহস্য-গর্ভ কথা আমাকে ক্রমে তাঁর আয়ত্তে আনিতেছে—গম্ভীর, ওঁকারনিনাদের মত বড়জ-সংবাদিস্বরে তিনি বলিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত, তার বয়স তোমার চেয়ে বেশী—পূর্ব্ববঙ্গের বড় পণ্ডিত তারাদাস বাচস্পতির নাম শুনেছ?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "তিনিই আপনার পুত্র?"

"তার বয়স তোমারই মতন। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আমার এই মায়ের চেয়ে—ক' বছরের বড়, বল্ না রে হতভাগা মেয়ে!"

"দশ বারো বছরের বড়।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"তোমারই বয়সে—অনেক শাস্ত্র প'ড়ে—বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে আমি কাশীতে আসি। দেখতে পাচ্ছ"—আবার ব্রাহ্মণ কন্যার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন—"এই আমার বানপ্রস্থের ফল। আমি বড় কুলীন। এখানে আমার আসার কথা শুনেই, আমারই মত এক কাশীবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ—তাঁর এক পঁচিশ বৎসরের কুমারী কন্যা আমাকে গছিয়ে দিলে। কৌলিন্যের অভিমান—আমি 'না' বলতে পারলুম না। বুঝতে পারছ ব্রহ্মচারী, আমার অবস্থা?"

"আপনার ভাল অবস্থা।"

"কি, টাকার?"

"না প্রভু, মনের।"

আমি যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপই বলিয়াছি, চাটুবাক্যে তাঁকে তুষ্ট করিতে বলি নাই। কিন্তু কথাটা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ যেন সন্তুষ্ট হইলেন। এক মুহূর্ত্তে আমার প্রতি তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ব'স।"

আমি হাতযোড় করিয়া বলিলাম;—"ক্ষমা করুন, আজ বসতে পারব না।"

কিন্তু পিতার মুখ হইতে বসিবার কথা বাহির হইতে না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী আসন আনিতে অন্য ঘরে ছুটিয়া গেল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ কহিলেন—"অনেককাল পরে আলাপ করবার এক জন লোক পেয়েছি।"

"এর পরে আসব- মাঝে মাঝে আসব।"

"এসো- যে কটা দিন বাঁচি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে বেশী দিন থাকতে পারব না প্রভু!"

"কেন?"

"গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে তাঁর তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী করতে চেয়েছেন।"

"কবে যাবার ইচ্ছা করেছ?"

"ইচ্ছা তাঁর। তবে বোধ হয়, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। কতকগুলো আমার কাজ আছে, এই সময়ের মধ্যে মিটিয়ে ফেলবো।"

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরেই একটি গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তিনি মাথা তুলিলেন। মর্ম্মে যেন তাঁর লুকানো তীব্রবেদনা—আমাকে জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশে তাঁর সাহস হইতেছে না।

"হুঁ! কবে ফিরবে?"

সিদ্ধেশ্বরী এই সময় আসন লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার আসনের পার্শ্বে পাতিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম—"বসবার যে আর উপায় নেই, মা!"

"একটুখানি বসতে পারবেন না?"

"কেন পারব না, তুমি ত জান সিদ্ধেশ্বরী! এর অনেক পূর্ব্বে আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল।"

সিদ্ধেশ্বরী আর অনুরোধ করিল না।

বৃদ্ধও বসিতে অনুরোধ না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমিই বল গো, মা!"

সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আজ!"

"আজ!" প্রজ্বলিত দৃষ্টি দিয়া বৃদ্ধ উভয়েরই মুখ দেখিয়া লইলেন।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"গঙ্গাস্নান ক'রে ফেরবার সময় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। তখন আমি স্বামীর গুরু-দেবের কাছে দাঁড়ায়েছিলুম। তিনিই এ বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমার স্বামীর গুরুভাই!" শুনিয়াই বৃদ্ধ একটু মৃদু-তীব্রকণ্ঠে কন্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! এ কথা আগে বল্‌লে ত তোকে কতকগুলো গাল খেতে হ'ত না!"

কন্যাও যেন সুযোগ পাইয়া অভিমানভরে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি বল্‌বার সময় দিলেন!" চক্ষু এইবারে তার জলভারাক্রান্ত' হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ হইতে সে চোখে অঞ্চল দিল।

আর এ সব লক্ষ্য করিলে আমার চলে না। করযোড়ে এইবারে আবার আমি বৃদ্ধের কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা, করিলাম। বলিলাম—"গুরুদেব আজ কৃপা ক'রে আমার ঘরে অতিথি।"

"তা হ'লে আর তোমাকে থাক্‌বার অনুরোধ কর্‌তে পারি না। দে সিদ্ধেশ্বরী বাবাজীকে হাত ধ'রে নীচে নামিয়ে দে—সিঁড়িটায় বড় অন্ধকার।"

২৬

সিদ্ধেশ্বরী দোরের কাছে আসিল।

আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম—"তোমারও ত আজ প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ আছে, মা!"

"যাব বাবা?" কন্যা পিতার অনুমতি চাহিল।

"নিশ্চয় যাবি।"—এমন উত্তর এত শীঘ্র পিতার কাছে পাইবে সে, আমি বুঝিতে পারি নাই।

অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী স্মিত-বিগলিত কথায় আমাকে বলিল—"আর দণ্ডখানেক সময়ের জন্য আপনি দাঁড়াতে পার্‌বেন না?"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব। যাব ব'লে সকাল সকাল রান্না সেরেছি, বাবাকে দিয়ে যাই।"

"কেন, যোগিনী মা?"

"আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে ব'লে সেই যে তিনি চ'লে গেছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নাই।"

"আপনার কি মত বাবা?" আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যই মনে করিলাম।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"তুমি ওর স্বামীর গুরুভাই—তার অনুপস্থিতিতে তুমিই ওর অভি-ভাবক।" শুনিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না সিদ্ধেশ্বরী।"

"এই ঘরেই এনে দিই বাবা?"

"নিয়ে আয়, এইখানেই ঠাকুরকে নিবেদন কির।"

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পিতার আসন ও জলপাত্র রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহিরে যাইতেছিল। দোরের চৌকাটে সে পা'টি দিয়াছে, এমন সময় আমি বলিলাম—হায়! কুক্ষণে আমি সে প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম—তার পর এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের সন্ন্যাস—এখনও পর্য্যন্ত সে দিনের স্মৃতি মাঝে মাঝে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মানলে আহুতি দিয়াছি, তথাপি সে স্মৃতির অগ্নি-রেখা আজিও পর্য্যন্ত মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, গৃহত্যাগমুখী সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া—"অনেকক্ষণ আগেই আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল। তোমার রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়েই আমার সব কাজ পণ্ড হয়ে গেল।"

বলিতেই দেখি, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ শুকাইয়া গেল। আমার দিকে না চাহিয়া, চাহিল সে পিতার মুখের দিকে। আমিও বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইলাম। উঃ! কি ক্রোধ-বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি!

"উনি আমাকে তাঁর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন বাবা! আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যাও ঠাকুরের অন্ন নিয়ে এস। আর ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

সিদ্ধেশ্বরী তবু দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় আমার মুখের উত্তর শুনিবার জন্য। আমি কিন্তু নিরুত্তর। মেয়েটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সংশয় গাঢ় হইয়া উঠিতে-ছিল। তথাপি, যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী, নিশ্চিত না জানিয়া কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে যখন মনেও আলোচনা করিবার আমার অধিকার নাই, দাঁড়াইয়া গুরুস্মরণে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুদেব বলিয়াছেন, কে কোথায় পড়িয়া আছে, কি করিতেছে, ভগবান্ তা দেখেন না, তিনি কেবল মন দেখেন। যদি ভগবানের কৃপা পাইতে চাও, তুমিও দেখিয়ো না। আমি ত ইহাদের কাহারও মন দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইহাদের উপর সংশয় জাগাইয়া আমার তপস্যার হানি করি?

তবু ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না, আমি সিদ্ধেশ্বরীর মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সে হাস্যময়ী—পিতার ক্রোধ তাকে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ করে নাই।

"বলুন না আপনি, কি হয়েছিল ?"

"আর বল্‌তে হবে না মা, তুমি যাও।"

বৃদ্ধ এইবারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয় ?"

"তুমি যাও সিদ্ধেশ্বরী"—বলিয়া আমি একটু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই সিদ্ধেশ্বরী আর দাঁড়াইতে পারিল না।

সে চলিয়া গেলে আমি বৃদ্ধকে প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন ?"

"তুমি আগে বলই না, তার পর আমার যা বল্‌বার বলব।"

বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিলাম, বৃদ্ধের এখনও ক্রোধের নিবৃত্তি হয় নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এ অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। এতক্ষণ ব্রজমাধবের স্মৃতি মন হইতে একরূপ বিলুপ্তই হইয়াছিল। এই প্রশ্নে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডে আমি বেদনা অনুভব করিলাম। বলিলাম—"তিনবার মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—এই কাশীতে। একবার গুরুদেবের সুমুখে, একবার আমার বাসায়, আর তৃতীয়বার আজ, একটু আগে তাঁরই বাড়ীতে। পূর্ব্বে তাঁর পরিচয় জেনেছিলুম, তাঁর নাম ব্রজমাধব বাবু, পাবনার জমীদার। 'রাজাবাবু' নাম আপনার কন্যার মুখেই আমার প্রথম শোনা।"

"মেয়ের কাছে তার নাম ওঠবার কখন্ আবশ্যক হ'ল ?"

"তার বাড়ীতে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।" এই বলিয়া রাজাবাবুর বাড়ীতে যাবার ইতিবৃত্তটা আমি বৃদ্ধকে শুনাইয়া দিলাম।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন। বোধ হইল, আমার কথায় তাঁর বিশ্বাস হইল না। আমি দেখিলাম, তার সংশয় দূর করা আমার প্রয়োজন, নতুবা আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই ক্রোধী বৃদ্ধ কন্যাকে তিরস্কার করিবে। যাহা কাহাকেও জানাইব না স্থির করিয়াছিলাম, সেই কথা আমাকে বলিতে হইল—"পূর্ব্বের দু'বারের দেখায় তার ঠিক পরিচয় পাইনি প্রভু, আজ পেয়েছি।"

"কি রকম ?"

আমি গণ্ড দেখাইলাম।

"কি ও ?"

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?"

"সিদ্ধেশ্বরী !"

দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী আমাদের কথা শুনিবার কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে।

"থালা রেখে দেখ দেখি মা, বাবাজীর গালটা।"

২২

"ও বাবা, এ কি !" আমার গণ্ড দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী শিহরিয়া উঠিল।

"কি রে ?"

"এঁর গালে চড় মার্‌লে কে—আপনি বাবা, আপনি ?"

"ব্যাপার কি অধিকাচৈতন্য, ব্যাপার কি বাবা ?"

বৃদ্ধের কাকুতাপূর্ণ প্রশ্নকথায় আমি ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কেন মার্‌লে ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। এ কথা আমি কাউকেও বল্‌ব না সঙ্কল্প করেছিলুম।"

"বুঝেছি। আমার এই হতভাগা কন্যাই হচ্ছে তোমার এই লাঞ্ছনার কারণ।"

কন্যা কোনও উত্তর দিল না। সে ম্লানমুখে আমার দিকে কেবল চাহিল। দেখিলাম, তার চোখের কোণে জল জড় হইয়াছে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিতে আমি বলিলাম—"সম্পূর্ণ কারণ নয়, কতক বটে। প্রথমবারে আপনার বাড়ী থেকে যখন আমি বা'র হই, তখন বোধ হয়, তাদের কোন লোক কোন আড়াল থেকে আমাকে দেখেছিল। মা'র সম্বন্ধে একটা কথায় আমি সেটা অনুমান করেছিলুম।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলেছিল ?"

"সে কথা আর শোনবার দরকার কি বাবা !"

"বল না।" তীব্রস্বরে বৃদ্ধ আমাকে আদেশ করিলেন।

কর দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া আমি বলিলাম—"দোহাই বাবা, আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না, আমি বলব না।"

"বুঝছিস্ পাপিষ্ঠা !"

"তবে, আগেই আপনাকে ত বলেছি, সম্পূর্ণ কারণ আপনার কন্যা নয়, আমাকে প্রহার করবার তাদের অন্য কারণও আছে।"

আমার গণ্ডে দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে তৈল আনিতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম—"প্রয়োজন নাই। আমাকে আর একবার গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে।

কি অবস্থায় সে মূর্ত্তিটা আমাকে ছুঁয়েছে, আমার ত জানা নেই।"

"সে পাষণ্ডের কাছে কি কর্‌তে গিয়েছিলে বাবা?"

হায়, আর যদি কিছু না বলিতাম। আর কিছু না বলাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কি এক সংযমের অভাব—বলিতে আমার প্রবৃত্তি আসিল। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীকে সম্বোধন করিলাম—"মা! যদি কাউকে না বলতে প্রতিশ্রুত হও, তা হ'লে বলি।"

"কাউকে বলব না।"

পিতা কন্যাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক তুই, বুঝে বল,—ভাবে বোধ হচ্ছে, কোন গুহ্য কথা।"

আমি বলিলাম—"কথা প্রকাশ পায়, আমার ইচ্ছা নয়।"

সিদ্ধেশ্বরী আমার এ কথার পরও শুনিতে আগ্রহ দেখাইল—কিছুতেই প্রকাশ পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি বলিতে লাগিলাম—"সে দিন ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে রাত্রিকালে আমি একটি সদ্যো-জাত শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—একটি মেয়ে—"

বলিয়া, সিদ্ধেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, সেই রাত্রির অন্ধকারটা তার মুখটি আচ্ছন্ন করিবার জন্য যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

"আপনি বলুন।"

"সেই কন্যাকে ঘরে আনি। আজ প্রায় এক বৎসর সেই কন্যাকে পালন করেছি।"

উত্তেজিতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"সে বেঁচে আছে?"

"শোন্ হতভাগী, কি বলে, আগে শোন্।" বৃদ্ধের সেই রূপই উত্তেজিত কণ্ঠ।

আমি বলিলাম—"বেঁচে আছে।"

"বাঁচিয়েছেন?" সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠে সহসা কি যেন এক জড়তা প্রবেশ করিল।

আমি বুঝিয়াও কেন বুঝিলাম না! বলিতে আরম্ভ করিলাম—"আমি বাঁচাইনি মা, বাঁচিয়েছেন ওই রাজা-বাবুর স্ত্রী। তিনিই এক বৎসর ধ'রে স্তন্য দিয়ে শিশুকে রক্ষা করেছেন। এমন ছদ্মবেশে তিনি আসতেন—"

আর আমাকে বলিতে হইল না। হঠাৎ দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতে কাঁপিতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধের মুখ হইতেও বাহির হইল এক কিম্ভূত শব্দ।

একবারে পড়িলে বোধ হয়, সেই সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যু হইত। প্রথমে সে বসিবার মত পড়িয়া গেল। তার পর টাল খাইয়া মেঝের উপর তার দেহ পতিত হইল।

পতনের সঙ্গে কপাল হইতে ছুটিল ফিন্‌কি দিয়া রক্ত। অন্নপাত্র, ব্রাহ্মণের বস্ত্র, আমারও বস্ত্রের দু' এক স্থান রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গেল। সাহায্যের জন্য মন আমার অস্থির হইলেও সম্মুখস্থ নিস্পন্দবৎ উপবিষ্ট বৃদ্ধের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে আমি তাঁর অনাবৃত দেহ স্পর্শে সাহসী হইলাম না। কিন্তু রক্ষা—রক্ষা—চাই মেয়েটার রক্ষা—বৃদ্ধ নিস্পন্দ, প্রাণহীনবৎ—পরকোলার ভিতর দিয়া দু'টি যেন ভৌতিক চক্ষু পতিতা সংজ্ঞাহীনা কন্যার পানে চাহিয়া আছে!

আমি বলিলাম—"সিদ্ধেশ্বরীর মুখে একটু জল দিন।" উত্তর ত পাইলামই না, চোখ পর্য্যন্ত তাঁর আমার দিকে ফিরিল না।

"আদেশ করুন, আমি সাহায্য করি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা, আমি সুস্থ হয়েছি" বলিয়াই সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া বসিল। নিজের আঘাত ভুলিয়া তার সরম-রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়া, আমি দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে আমি এখন কি করব মা?"

"আপনি আসুন, যোগী মা এলে, পারি যদি তাঁর সঙ্গে যাব।"

"মা, তোমাকে সুস্থ না দেখে, যেতে যে আমার মন সরছে না। এখনও রক্ত—"

"পড়ুক। কোন আশঙ্কা করবেন না বাবা, আমার মৃত্যু হবে না।" বলিয়া সে ক্ষতস্থানে একবার হাত দিল। দেখিলাম, সমস্ত হাতের পাতা তার রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

"যোগী মা কোথায় থাকেন বল, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা!"

"তবে আসি মা!"

ঘর হইতে বাহির হইবার মুখে ব্রাহ্মণের দিকে একবার চাহিলাম। বৃদ্ধ সেইরূপই জড়বৎ দেহ লইয়া বসিয়া আছেন।

"বাবা! বাবা—বাবা!" সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তিনবার মাত্র সিদ্ধেশ্বরীর কথা শুনিতে পাইলাম। বৃদ্ধ দেখিয়া আমিও জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। আর কিছু সে বলিয়াছে কি না, শুনি নাই, অথবা আমার কানে প্রবেশ করে নাই।

সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেই পা দিয়াছি, অমনি শুনিলাম—"আপনি গেলেন কি?" উঠানে নামিয়া উপর

দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনাকে আর একবার উপরে আসতে হবে।"

তার কথার ভাবে বুঝিলাম, আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

"যাচ্ছি মা!"

*   *   *   *   *

দোরের মধ্যে মাথা প্রবেশ না করাতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"বাবাকে একবার দেখুন দেখি।"

দেখিলাম, ব্রাহ্মণ সেইরূপই উপবিষ্ট। কিন্তু আমাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাঁর দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু চলিয়া গিয়াছে।

২৩

প্রথমে আমি কিছুক্ষণের জন্ম অবাক, নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের পানে চাহিয়া আছি। বৃদ্ধ যেন সমাধিতে লীন, চসমার ভিতরে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত, দেহে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এরূপ আকস্মিক মৃত্যু দেখা আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। বুঝিলাম, আমার গল্প, কন্যার পতন, দুইটা ব্যাপার একত্র হইয়া এই অতি বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ করিয়া দিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতেও এ পর্য্যন্ত একটি কথা বাহির হয় নাই। মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখি, পিতার মুখের পানে সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

"দাঁড়িয়ে কাঁদবার ত সময় নয়, মা, বৃদ্ধ বাপের কাশী-প্রাপ্তি, কন্যার কর্ত্তব্য করবার সময়।"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, সেইরূপ নীরবেই কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে আর কিছুক্ষণ কাঁদিবার অবসর দিয়া আমি বলিলাম—মা, আমার কথা শুনলে?"

এইবারে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"শুনেছি।"

"সৎকারের একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে!"

সিদ্ধেশ্বরী আবার চুপ করিল। উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ানো আর ত আমার চলে না; আমি বলিলাম—"আমি এখন কি করব মা?"

"আপনি যান।"

"আমার অবস্থা ত তুমি সব জান।"

"আপনি আর দাঁড়াবেন না।"

"আর দাঁড়ানো অসম্ভব, কিন্তু এ রকম অবস্থায়—"

"আপনাকে ত আর থাকতে বলতে পারি না।"

"এখানে তোমাদের কে কোথায় আছে বল, আমি খবর দিয়ে যাই।—চুপ ক'রে থাকবার যে আর সময় নেই, মা!—আমাকে বলতেও কি তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে? আমাকে আত্মীয় জেনে বল।

"এখন ত কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না।"

"সে কি!"

"ওঁর ছেলে আছেন দেশে।"

"সে ত তোমার বাবার মুখেই শুনেছি।"

"এখানে ওঁর কোনও আত্মীয় নেই। আর থাকলেও উনি রাখেন নি।"

"তোমার মাতামহ ত এখানে থাকতেন।"

"আমার এক মামা আছেন। তিনিও এখানে নেই। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে তিনি কলকেতায় চ'লে গেছেন।"

মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তা হইলে এই কাশী সহরে, দেখছি, আমি ভিন্ন ত আর কেহ তার দ্বিতীয় আত্মীয় নাই!

বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে জালের মত চারিদিক হইতে চিন্তা আমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পীড়নে অস্থির হইয়া বেশ একটু উত্তেজিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেউ নেই?"

"আপনি আছেন।"

"আমার থাকার মূল্য কি?"

সিদ্ধেশ্বরী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ! আমাকে এ কি সমস্যায় ফেলিলে! মেয়েটার মুখের দিকে একবার চাহিলাম। বস্ত্রাঞ্চলে মুখখানাকে মুছিলেও এখনও মুখের অনেক স্থানে রক্ত লাগিয়া আছে। রক্তচিহ্নের পার্শ্ব দিয়া এখনও অশ্রুর প্রবাহ। মুখের এক দিক, বিশেষতঃ কপালটা বেশ ফুলিয়াছে। ক্ষত হইতেও তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছিল। আঘাতের কারণ নির্ণয় করিতে মেঝের উপর দৃষ্টি দিতেই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পড়িবার কালে বাপের একটা পূজাপাত্রে মাথা লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

ক্ষত যখন বক্ত, তখন আঘাত সামান্য না হইবারই সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি মৃত পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"এ ত যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তুমি তোমার জীবনটা রক্ষা কর।"

"ভয় নেই, বাবা, আমি মরব না।"

"ও কথা ত আগেও শুনলুম, ও কথার কোনও মূল্য নেই—আঘাত নিতান্ত কম ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিল।

"চুপ ক'রে থেকে সময় কাটালে ত চলবে না;

বাপের দেহের যদি গতি কর্‌তে হয়, তা হ'লেও ত এ অবস্থায় তোমার থাকা চল্‌বে না!"

"আপনি যান।"

"যেতে পার্‌লে, এতক্ষণ কি তোমার বল্‌বার অপেক্ষা রাখ্‌তুম, সিদ্ধেশ্বরী! তবে একবার আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে তাও যে কর্‌তে পারছি না, মা।"

ঠিক এমনই সময়ে মৃতদেহটা পড়িয়া গেল। সেখানে দুই তিনখানা পিতলের বাসন ছিল। দেহটা সেগুলার উপর পড়িয়া একটা শব্দ তুলিল। শব্দ বেশী না হইলেও, অবস্থার গুণে আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। দেহটা পড়িয়াই গড়াইল। পা-দুটো সেইরূপই পরস্পরে বাঁধা।

সে বীভৎস দৃশ্য আমার দাঁড়াইয়া দেখা চলিল না। আমি সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়া উঠিলাম—"ঘর থেকে বেরিয়ে এস আপাততঃ।"

সিদ্ধেশ্বরীও বুঝি ভয় পাইয়াছে, সে বলিবার অপেক্ষা রাখিল না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। ঘরে শিকল দিতে দিতে বলিলাম—"এখন দোর বন্ধ থাক্‌, আমি একবার বাসা থেকে ফিরে আসি, এর মধ্যে তুমি গা, হাত, মুখ ধুয়ে ফেল। তোমার দিকেও চাইতে পার্‌ছি না মা!"

কিন্তু ফিরিয়া দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতেছে। আমি তাহাকে ধরিতে না ধরিতে সে বারান্দার রেলিং-ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

আর তাহার বাধা মানিতে পারিলাম না, শত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাহার শুশ্রূষার সঙ্কল্প করিলাম।

২৪

মানুষ অনন্ত ভাবের অধিকারী। গুরু-কৃপায় সিদ্ধেশ্বরীকে বক্ষে ধরিয়াও আজ যে ভাব আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। এই বুঝি প্রকৃত বাৎসল্য! ইহার সমক্ষে স্নেহাস্পদ বুঝি কোনও কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না! মেনকার চোখে গিরিকুমারী বুঝি চিরদিনই অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী! আঘাতে, শোকে, ভয়ে, নিরাশয়—সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন সিদ্ধেশ্বরীকে যখন ধোয়াইয়া, মুছাইয়া, ক্ষতস্থান কাপড়ে বাঁধিয়া, বক্ষে ধরিয়া, উপরে তুলিয়া, তাহার ঘরে শয্যায় শয়ন করাইলাম, তখন সত্য সত্যই আমি গৌরী-সেবার সুখই অনুভব করিলাম। এ সেবায় আমি গুরুদেবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। যখন তাঁহার কথা স্মরণে আসিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

এখনও পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে আমি ও সিদ্ধেশ্বরী, আর ঘরের ভিতরে আবদ্ধ তাহার পিতার মৃতদেহ।

"একটু দুধ খেতে হবে যে, মা।"

মুদ্রিত চক্ষু শুধু হাত নাড়িয়া সে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

"না বল্‌লে চল্‌বে না, কিছু মুখে দিতেই হবে, নইলে যে, মা, জীবন থাক্‌বে না!"

সে সেইরূপই ইঙ্গিতে বুঝাইল, তাহার বাঁচিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার এত অধিক দুর্ব্বলতা আমাকে বিশেষ চিন্তিত করিল। তাঁহার ক্ষতের গভীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্ষতের অবস্থা ত আমি বুঝি নাই! বুঝিতে হইলে এক জন ডাক্তারকে দেখানো প্রয়োজন।

কিন্তু একা আমি কি করিব? যোগিনীর আসিবার কথা ছিল, তিনিও ত এখনও পর্য্যন্ত আসিলেন না! ইহাকে এই অবস্থায় কাহার কাছেই বা রাখিয়া যাই! হাঁ, মা, লছ্‌মী কখন্ আসিবে?"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না। একটু কিছু খাওয়াইয়া ইহাকে সবল করিতেই হইবে। আমি দুগ্ধের অন্বেষণে পার্শ্বের রান্নাঘরে চলিয়া গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে দুগ্ধ পাইলাম।

কিন্তু আনিয়া তাহা সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কাছে ধরিতে সে পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। খাওয়াইবার জেদ করিলে চোখ মুদিয়াই সে হাত জোড় করিল।

"আমার অনুরোধ, মা, জীবন রক্ষা কর।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী এবারে কথা কহিল—"আমার বাঁচার কোনও মূল্য নেই, বাবা, মরাই আমার বাঁচা।"

এইবারে আমি গোটাকতক শাস্ত্রের বচন বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিলাম; বুঝাইলাম, জীবন রাখার মূল্য আছে, তাহাকে অবসন্ন করিতে নাই। মৃত্যুর কামনা করাও পাপ, সুখে দুঃখে তাহাকে বহন করাই ধর্ম্ম।

কথা বোধ হয় তাহার কানে প্রবেশ করিল না, অথবা সে তুলিল না। দুধ মুখে ধরিতে দেখিলাম, সে দাঁতে দাঁত দিয়া রহিয়াছে। তখন আমাকে ঈষৎ উষ্মার সহিতই বলিতে হইল—"অন্ততঃ আমার পরিশ্রমটা নিষ্ফল ক'রো না, মর্‌তে হয় এর পরে ম'রো। আমি গুরুর সেবার জন্য মিষ্টান্ন নিতে এসে এই বিপদে পড়েছি।"

সিদ্ধেশ্বরী হাঁ করিল, আমিও তাহাকে দুগ্ধ পান করাইলাম।

পানের অল্পক্ষণ পরেই সত্য সত্যই তাহার দেহে বল

আসিল। সে আমার নিষেধ সত্ত্বেও উঠিয়া বসিল। বলিল—"আপনি একবার বাসায় যান।"

"যেতে পার্‌লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখতুম না।"

"একবার গুরুবাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন।"

"তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে ?"

"আমি সুস্থ হয়েছি, বাবা!" বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল। আমি ব্যাকুলতার সহিত বাধা দিলাম। সে বাধা না মানিয়া শয্যা ছাড়িয়াই আমার দু'টা পায়ের উপর মাথা দিয়া পড়িল।

"হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি, মাথায় আবার আঘাত লাগবে, সিদ্ধেশ্বরী।"

কাকে বলি, কে শোনে! এ কি উষ্ণ অশ্রু!—দুই হাত দিয়া সন্তর্পণে তাহাকে শয্যায় বসাইয়া বলিলাম—"যোগিনী মা কই ত এলেন না!"

কপালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আমার অদৃষ্ট।"

"লছমী কখন্ আসে ?"

"তার আসতে এখনো বিলম্ব আছে!"

"তার বাসা ?"

"এখান থেকে অনেকটা পথ। আমার পূর্ব্বের বাড়ীর কাছে।"

"সে বাড়ী কোথায় ছিল ?"

"লছমী-কুণ্ডায়।"

অনেক দূরই ত বটে। সেখানে পৌঁছিতে যে সময় লাগিবে, সে সময়ের মধ্যে আমার বাসায় যাতায়াত করা যায়।

এই সময় একবার রাজাবাবুর নামটা আমার মনে উঠিল। ভাবিলাম, তার কথাটা একবার সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তুলি। সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-রহস্য অনেকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছি। যেন কেন, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতে প্রতিবাদ না পাইলে ঠিকই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, সেই চরিত্রহীন ধনী হইতে এ বালিকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। আমার গৌরী সেই অবৈধমিলনের ফল।

এতক্ষণই যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর একটু অপেক্ষা করিয়া সমস্ত মনের সন্দেহটা মিটাইয়া লই না কেন! ইহার পর আর কি এমন সুযোগ ঘটিবে!

কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও রাজাবাবুর নাম যখন মুখে আনিতে পারিলাম না, তখন বিদায় গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলাম—"মনে কর্‌ছি, আমার বাসাতেই তোমাকে নিয়ে যাই!"

সেই দারুণ বিপদের মধ্যেও সিদ্ধেশ্বরীর মুখে হাসি দেখা দিল।

"হাসলে কেন, মা ?"

সমস্ত বিষাদরাশি মন্থন করিয়া হাসির বিজলী তাহার মুখের উপর স্থিরসৌন্দর্য্যে লীলা করিতে লাগিল।

"হাস্‌ছ কেন সিদ্ধেশ্বরী ? সেখানে গেলে তোমার সেবা হবে।

"তা হবে।"

"তবে তোমার বাপের দেহ-সৎকারের কথা ভাবছ ?"

"না।"

"তোমাকে বাসায় রেখে আমি সে সমস্ত ব্যবস্থা কর্‌ব!"

"আপনি ভিন্ন কর্‌বার আমার আর কে আছে!"

"তা হ'লে পাল্‌কী আনাই ?"

সিদ্ধেশ্বরী আবার হাসিল।

"যাবে না ?"

চক্ষু দু'টি আনত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বার কি উপায় রেখেছি!" বলিয়া সে একটি গভীর শ্বাসত্যাগ করিল।

"কেন উপায় নেই, মা! আমি ত তোমার উত্তরের অর্থ বুঝতে পারলুম না।"

"আপনি আমাকে কি মনে ক'রেছেন ?"

আমি বিস্মিত নেত্রে কেবল তাহার মুখের পানে চাহিলাম। বুঝিয়াও যেন আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"আমার মরণের অবস্থা, বাবার মৃত্যু – এ সব দেখেও কি বুঝ্‌তে পারলেন না ?"

"তুমিই কি গৌরীর—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"তার নাম রেখেছেন গৌরী ?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিষাদমাখা হাসিতে তাহার মুখখানি আচ্ছন্ন হইল যে, দেখিবামাত্র আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শূন্য, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী আমার মানসিক অবস্থা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিল—"এই সমস্ত জেনে, আপনি আমাকে ঘরে স্থান দিতে সাহস করেন ? বুঝতে পেরেছেন, আমি পতিতা ?"

তোমার যে পাঁচ ছ' দিন আগে বিবাহ হয়েছে বল্‌ছিলে!"

"বিবাহ ? তিনি দয়া ক'রে বিবাহের নামে আমাকে আবার সমাজে স্থান দিয়ে গেছেন।"

"তোমার অবস্থা জেনেও ?"

"জেনেই নিয়েছেন।"

"তোমার স্বামী এখন কোথায় ?"

"তিনি দেশে চ'লে গেছেন!"

"আস্‌বেন কবে ?"

"আর কি তিনি আস্‌বেন!"

"একেবারেই আসবেন না?"

"আসবেন?"

"কাশীতেও আর আসবেন না?"

"তা বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, কাশীতে এলেও আমার কাছে তিনি আসবেন না। তাঁর গুরুর ইচ্ছায়, এ কেবল তিনি আমার কুমারী নাম খণ্ডন ক'রে গেছেন।

"তাঁর বোধ হয়, দৃঢ় ধারণা, তুমি তাঁর এ মহত্ত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারবে না।"

"পারব না?"

"সে আমি কেমন ক'রে বলব, সিদ্ধেশ্বরী! এর উত্তর দিতে পার একমাত্র তুমি।"

সিদ্ধেশ্বরী মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি অনুমান করিলাম, সে মনে মনে পূর্ব্বজীবন বিস্মৃতির কোলে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। ভাল হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিতেছে। আমি তাহাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ দিলাম।

যখন দেখিলাম, তার চিন্তার শেষ নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বিদায় গ্রহণের আভাস দিতে হইল।

"এখন আমি কি কবর, সিদ্ধেশ্বরী?"

সিদ্ধেশ্বরী এখনও পর্য্যন্ত চিন্তার সূত্র ধরিয়াছিল। আমি কি বলিলাম, বোধ হয়, সে শুনিতে পাইল না। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল—"পারব না, বাবা?"

তাহার কথার সুরে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"মনকে যদি দৃঢ় করতে পার, তা হ'লে করতে না পার কি? আজ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় আছ, দু'দিন পরে সেই সমাজ তোমাকে আদর্শ ভাবিয়া আবার মাথায় তুলিতে পারে।"

"আপনি আসুন।"

"একবার আমার না গেলে আর চলছে না।"

"আপনি যান।"

"তুমিও চল।"

"আমি যাব না।"

"আমার কথায় কি ক্ষুণ্ণ হ'লে, মা?"

জিভ কাটিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"না দয়াময়, আপনাকে পেয়ে আমি বাবার জন্ত দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবার অবকাশ পাইনি। বাপের অভাব আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমি যাব না।"

"তোমারও যে আজ গুরুর প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

কপালে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সে বলিল—ভাগ্যে নেই।"

"তোমার গৌরীকে দেখ্‌বারও কি ইচ্ছা হচ্ছে না?"

সেই ফোলা মুখ ভিতর হইতে রক্ত-প্রবাহ-পীড়নে যেন আরও ফুলিয়া উঠিল—"আমার গৌরী! আমার বলবার সম্পর্ক আমি তার সঙ্গে কি রেখেছি, বাবা?"

"যদি বাবাই আমি তোর, তা হ'লে আমি অনুরোধ করছি চল্ মা।"

"তার বেঁচে থাকার কথা শুনেই দেখ্‌বার জন্ত আমি পাগলের মত হয়েছিলুম। তোমার গৌরী, তোমারই কাছে থাক্। তাকে দেখ্‌তে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।"

বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শয়ন করিল। বুঝিলাম, অনেক কথা কহিয়া আবার তাহার ক্লান্তি আসিয়াছে। আর কোনও কথায় তাহাকে উত্যক্ত করিতে আমার সাহস হইল না। আমি কেবল বলিলাম—"একবার তা হ'লে আমি ঘুরে আসি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে চোখ না মেলিয়াই বলিয়া উঠিল—"তবে কি জানেন দয়াময়, আপনার গৌরীকে যদি গর্ভেই নষ্ট করতে পারতুম, তা হ'লে আমার বুঝি এ দুর্দ্দশা হ'ত না? আপনাদের সমাজে আমি কুল-লক্ষ্মীরই আদর পেতুম। নারায়ণ পর্য্যন্ত আমার হাতের রান্না খেতে দ্বিধা করতেন না। আপনি যান, আমি কোথাও যাব না।"

সত্য কথা বলিবার যদি আমি অভিমান রাখি, তাহা হইলে এ কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়, ঋষিকুল-প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্মের একাশ্রয় হিন্দু-সমাজ! তুমি কোন্ যুগের মধুরতা হইতে কোন্ যুগের তীব্রতা আশ্রয় করিয়াছ?

ক্ষুণ্ণমনে সিদ্ধেশ্বরীকে সেই মরণের বাড়ীতে একা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

২৫

সঙ্কোচের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ী যেন জনশূন্য। উপরে, নীচে কোথাও যেন একটিও প্রাণীর অস্তিত্বের নিদর্শন পাইলাম না। বাহিরের দ্বার হাট করিয়া খোলা। একবার উপর-নীচে চাহিলাম। তাহার পর ধীরে কবাট বন্ধ করিয়া ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

প্রথম ডাকে কোনও উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম, গুরুদেব গৃহে নাই। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। বেলা তখন অনুমান তিনটা। কৃপা করিয়া গুরু আজ সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে অতিথি হইলেন, আমি হতভাগ্য তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম

না! অনাহারে আমার ঘর হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইল! ব্যাকুলভাবে একটু জোর-গলায় এইবারে ডাকিলাম—"ভুবনের মা! এ কি, আপনি?"

দেখি, যোগিনী চোখ মুছিতে মুছিতে রান্না ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন।

"আপনি এখানে!"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বাবা আপনার আসা জানতে পারে নি। কখন্ আস্‌বেন বুঝ্‌তে না পেরে দোর খুলে রেখেছিলুম। এই অবস্থায়, আমার মরণ, ঘুমিয়ে প'ড়েছি।"

"তা বেশ করেছেন, তাতে দোষ হয়েছে কি!"

"দোষ বিলক্ষণই হয়েছে, বাবা। যদি চোর ঢুকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব চুরী ক'রে নিয়ে যেতো, আমি ত কিছু জান্‌তে পারতুম না!"

"বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

"কেউ নেই—গুরুদেব নেই, ভুবনের মা বুড়ী নেই, আপনার গৌরী পর্য্যন্ত।"

"গুরুদেব নিজের ইচ্ছায় আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এসে অনাহারে চ'লে গেলেন!"

"না বাবা, আপনার সেই কৃপাসিন্ধু গুরু অনাহারে ফিরে আপনার কি অকল্যাণ কর্‌তে পারেন! আপনার ফেরার বিলম্ব দেখে, তিনি স্বহস্তে পাক ক'রে আহার ক'রে ভুবনের মা'কে প্রসাদ খাইয়ে, আপনার জন্ত প্রসাদ রেখে চ'লে গেছেন। আমি আপনার প্রসাদ আগ্‌লে বসে আছি।"

"এঁরা কোথায় গেলেন?"

"আগে প্রসাদ গ্রহণ করুন, তারপর শুন্‌বেন।"

"আগে শুন্‌তে কি দোষ আছে?" আমি হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম।

সেইরূপ হাসির সঙ্গে যোগিনী উত্তর দিলেন—"একটু আছে বৈ কি!" তাঁহার মধুর হাসিতে উন্মুক্ত শুভ্র মুক্তার মত দাঁতগুলি আমাকে যেন ঈষৎ রহস্য করিবার জন্ত আমার চোখ দু'টাতে জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিল।

"শুন্‌লে আপনার হয় ত খাওয়া হবে না!"

আতঙ্কিত ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমন কথা যে, শুন্‌লে গুরুর প্রসাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বনা?"

"তা পার্‌বেন না কেন, তবে পেটপোরা আহারে আপনার প্রবৃত্তি না হ'তে পারে। আপনার গুরুই আপনাকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে গেছেন।"

"কিন্তু শোন্‌বার জন্ত আমার যে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে, যোগি-মা!"

"আপনার পক্ষে ওরূপ আগ্রহ ভাল নয়।"

"সেটা খুবই বুঝতে পার্‌ছি। তবু—"

"বাবাজি মহারাজের কাছে শুন্‌লাম, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেছেন।"

বলিয়াই মৃদুহাস্যের সঙ্গে মুখটি তুলিয়া বেশ একটু রহস্যেরই ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন—"সন্ন্যাসী মানুষের কৌতূহল কেন?"

"চলুন, বাবার প্রসাদ গ্রহণ করি।"

"হাত পা ধুয়ে আসুন, আমি ঠাঁই করিগে।"

বলিয়াই তপস্বিনী মুখ ফিরাইলেন।

তিনি দু'পা যাইতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার?"

"আমার হবে এখন।"

"আপনি এখনো আহার করেন নি?"

মুখ ফিরাইয়া আবার শুভ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া যোগি-মা বলিলেন—"এক জনকেও কি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে নেই?"

মাথাটা ঝনঝনিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি? এ কি সরলতার চাহনি? বলিতে পারিলাম না। কেমন কেমন কি ঠেকিল? বলিতে পারিলাম না।

"তুমি আগে আহার কর, মা।"

"বেশ, এক সঙ্গেই খাবো, বাবা।"

* * * * *

হাত পা ধুইতে, মুখ ধুইতে মনে মনে বিশ্বনাথের নাম লইয়া সঙ্কল্প করিলাম, সন্ন্যাসাশ্রম আমাকে লইতেই হইবে। না পারি, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।

২৬

"কি গো ঠাকুর, বেলা যে বয়ে গেল!"

আমি নিজের ঘরে বসিয়া এতক্ষণ নিজের সঙ্গেই লড়াই করিতেছিলাম। চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলাম, মন যদি আমার উপর কথায় কথায় এইরূপ অত্যাচার করে, আমি কেমন করিয়া সন্ন্যাস লইব? লইয়া সে চরমাশ্রমের মর্য্যাদা যদি না রাখিতে পারি? যদি দৈব-দুর্বিপাকে আমার পতন হয়, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল সব কি নষ্ট করিব? ভাবিতেছি, আর প্রাণপণ চেষ্টায় গুরুচরণ স্মরণ করিতেছি। এমন সময় তপস্বিনী ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া আমাকে উক্ত কথা শুনাইলেন। কথা তাঁহার কি মিষ্ট! আমি চোখ মেলিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তিনি আবার বলিলেন—"ঠাঁই ক'রে প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে যখন আপনার আসার কোনও লক্ষণ দেখ্‌লুম না তখন অগত্যা আমাকে আসতে হ'ল। কি কর্‌ছিলেন?"

"জপাদি আজ কিছুই হয় নি, মা, তাই সেগুলো সেরে নিচ্ছি।"

যোগী-মা হাসিয়া ফেলিলেন।

এ কি বিদ্রূপাত্মক হাসি! বিদ্রূপ-স্বরূপ হইয়াও হৃদয়ে সে এমন তরঙ্গ তুলে কেন? নারীমুখের অনেক মধুর হাসি ত শুনিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখন শুনি নাই!

"হাস্‌লে কেন গা?"

"উঠে আসুন—আর জপ কর্‌তে হবে না।"

"এ কথা বলার অর্থ?"

"সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, অর্থ আমাকে বল্‌তে হবে? যে উদ্দেশ্যে জপ, সেই অভীষ্টদেবকে দর্শন করেছেন—আজ আর আপনার জপ কি!"

"জপ কর্‌ব না?"

"আপনি বুঝুন। কিন্তু আমি ত আর থাক্‌তে পারি না।"

"আপনি আহার করুন না।"

"কর্‌বার হ'লে আপনার অনুরোধের অপেক্ষা রাখ্‌তুম না।"

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেন- "আমি ত আর অপেক্ষা কর্‌তে পারি না। সেই মেয়েটি, বোধ হয়, আমার অপেক্ষায় এখনো অনাহারে ব'সে আছে। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমি এখানে আবদ্ধ হয়েছি। বাবাজি-মহারাজের প্রসাদ নিয়ে আমাকে তা'র কাছে যেতে হবে।"

আমি একবারে দাঁড়াইয়া বলিলাম—"চলুন।"

"আসুন, আবার যেন ডাক্‌তে আস্‌তে না হয়" বলিয়া তপস্বিনী চলিয়া গেলেন।

আমাকেও উঠিতে হইল। কিন্তু উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বেদ—এতক্ষণ নিজের কাছেই আমি চোর হইয়াছি। সে চৌর্য্যের কথা ত আমি যোগি-মাকে বলিতে পারিলাম না! জপের একটা মন্ত্রও এতক্ষণ মনেও উচ্চারণ করি নাই। কি করিতেছিলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিতে ত আমার সাহস হইল না। ভিতরের এই মিথ্যা লইয়া কি কেহ কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে? যদি হয়, সে সন্ন্যাসের মূল্য কি?

আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই আমি তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছি— বলিয়াছি, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে, এমন কথা আমি শুনাইব না। কৌশলে সেরূপ ঘটনা তোমাদের মনোজ্ঞ হইতে পারে; আধা-গোপন আধা প্রকাশের মাঝখান দিয়া তুলি ধরিয়া অতি কুৎসিতকেও সুন্দর করা সম্ভব, কিন্তু সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর চোখে তাহা চিরদিনই কুৎসিত। সমস্ত মধুরাবরণ ভেদ করিয়া সত্য তাহার দৃষ্টির সমক্ষে উগ্রমূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র চিরদিনই তাহাকে নিন্দনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আমার যাহা ভাল লাগিবে, সব সময়েই তাহা ভাল নয়। যাহা ভাল নয়, তাহা পরিহার করিতেই শাস্ত্র কেবল উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

তখন আমি সন্ন্যাস-সঙ্কল্পী, বর্ত্তমান যুগের বয়সের হিসাবে বৃদ্ধ। আমার এই সমস্ত মনের কথা তোমাদের না শুনাইতেও পারিতাম। তবু শুনাইলাম। কেন? সত্যই তপস্যা, সত্যাশ্রয়ই সন্ন্যাস, তা তুমি ঘরেই থাক, কি গভীর অরণ্যেই আত্মগোপন কর। যদি শান্তি চাও, এই সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথা, স্থির জানিও, শান্তি নাই। তোমরা যাহাকে শান্তি বল, আমরা তাহাকে তোমাদের সুখ বলি। সে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাহার পশ্চাতে, তোমার অলক্ষ্যে, বিরাট দুঃখ তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বসিয়া আছে। শাস্ত্রকার অষ্টবিধ ক্লেশের মধ্যে সুখকেও এক ক্লেশের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই, সত্য কহিতে, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মনের কথা শুনাইলাম। শুনাইলাম বুঝাইতে, সন্ন্যাস লইতে কৃতসঙ্কল্প বৃদ্ধের মনের যদি এই তাড়না, হে সংসারাগ্রহী যুবক, সে তোমাকে জানা না-জানার ভিতর দিয়া নিত্য কত তাড়না করিতেছে। মনের সেই মলিনতার ভিতর দিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আমরা মন্দকে ভাল দেখি। আর যাহা ভাল—অমল-কুন্দবৎ শুভ্র, তাহা ওই দৃষ্টির দোষেই রঞ্জিত দেখিয়া থাকি।

আমারও তাহাই হইয়াছিল। দৃষ্টির দোষে এই অদ্ভুত চরিত্রা নারীকে দেখিতে আমি ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার সৌভাগ্য, সে অতি অল্প সময়ের জন্য। তাঁহার এক কথাতেই আমার চৈতন্য হইল। সত্যই ত, জপের উদ্দেশ্য ত আজ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাকে দশ বৎসরের সাধ্যসাধনাতেও গৃহে আনিতে পারি নাই, আনিবার অত্যধিক আগ্রহে অনেক সময় যিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অভীষ্টদেব স্বেচ্ছায় আজ এখানে অতিথি! তিনি আসেন নাই কেন, এত দিন পরে যেন বুঝিয়াছি। গৌরীর বন্ধন আমার কর্ম্মভোগের অবশিষ্ট ছিল। দিব্য-দৃষ্টিবান্ তাহা বুঝিয়া এখানে আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন কেন, তাহাও যেন বুঝিতে পারিতেছি। আজ আমার অষ্টপাশ হইতে মুক্তি। তাই, এই কয়টা দিন ধরিয়া হৃদয়ের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর

দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

জ্ঞান-রূপিণী তাপসী-মূর্ত্তি মা! গুরুদেবের ইচ্ছায় তুমি বুঝি শেষ আঘাত দিতে আসিয়াছ! এ আঘাতের ভিতরে কোথায় তুই আমার গৌরী? জঞ্জালের ভিতর হইতে কুড়িয়ে আনা, এত দিন ব্যাকুল-স্নেহে বুকে ধরা, স্বর্গ হইতে ঝরা ফুলটির মত কোমল হইতেও কোমল, সুন্দর হইতেও সুন্দর ওরে আমার শিশু! কোথায় তুই? আর যে তোকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না মা! অন্ধের মত বাহু-বিস্তার করিতেছি, তুই কোথায় লুকাইলি? আর যে তোকে আমি ধরিতে পারিতেছি না!

এরই নাম কি 'নেতি নেতি'? এই খুঁজিয়া না পাওয়াই কি আমার চৈতন্য?

২৭

উপর হইতে নামিতেই দেখি, যোগিনী বাহিরের দ্বারের কবাট দুইটা আধাবন্ধ করিয়া অল্প ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়া সন্তর্পণে কি যেন, কাহাকে যেন দেখিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত, তাহার উপর একরাশ কোঁকড়ানো চুল, প্রান্তভাগ যেন হাজার ফণা তুলিয়া সাপের মত ঝুলিতেছে।

কৌতূহল জাগিল। তিনি কি করিতেছেন, আর কেন করিতেছেন, দেখিবার জন্য, মুখ ফিরাইলেই দেখিতে না পান, আমি এমন একটু অন্তরালে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে বুকটা অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে তপস্বিনী কবাটে খিল দিতেছেন!

অশুদ্ধ মন, সন্ন্যাস লইবার বিরুদ্ধে যে বিষম শত্রু, তাঁহার সেই বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, এত কথা এক মুহূর্ত্তে আমাকে শুনাইয়া দিল যে, আমি চিত্ত-চাঞ্চল্য কিছুতেই রোধ করিতে পারিলাম না। বাড়ীর মধ্যে পুরুষের মধ্যে আমি—সম্মুখে কত লুকানো অন্তরের কথা লইয়া ওই আর একটি অসামান্য সুন্দরী—যাহার আদি অন্ত কিছুই জানি না। কোথায় তাহার ঘর, কি তাহার অবস্থা, কেমন ভাবে তাহার জীবন-যাপন—সমস্তই আমার অজ্ঞাত। দেখা তাহার সঙ্গে সবে মাত্র আজ। নিঃসন্দেহ হইবার অনুকূলে, আছে মাত্র তাহার ওই গৈরিকের আবরণ। ওই একটিমাত্র সাক্ষী তাহার এই বিচিত্র আচরণের সদর্থ বুঝাইতে আমাকে সাহায্য করিল না। নানা ভাবের বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া আমি ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, এতক্ষণ আমি সিদ্ধেশ্বরীকে একেবারেই ভুলিয়া আছি। শুধু তাহাই নয়, তাহার সঙ্গে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা ভুলিবার নয়, সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর সেই দুর্ঘটনা। রাজাবাবুর বাড়ীর কথা? সে ত স্মৃতির সমস্ত সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে!

চক্ষু মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে একবারে তিনটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। ভাসিল এক সঙ্গেও বটে, আবার সূক্ষ্ম হিসাব করিলে পরে পরেও বটে! সেই হিসাবেই বলি—পরে পরে পরে। প্রথমে ভাসিল রাণী, তাহার পর সিদ্ধেশ্বরী, সকলের পশ্চাতে তপস্বিনী। তিন জনেই আমার পানে চাহিল। রাণীর সেই ডাগর্ চোখ দু'টি সকল কোমলতার ভিতর দিয়া, একটা অপূর্ব্ব-গর্ব্বভরা দৃষ্টি আমার মুদ্রণোন্মুখ চোখ দু'টার উপর নিক্ষেপ করিল। বিলোল চাহনিতে স্নেহের লালসা পূরিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার সে দু'টাকে তুলিয়া ধরিল।

সকলের পশ্চাতে যোগিনীর সেই রহস্যময়ী দৃষ্টি! তারা দু'টা যেন হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওগো ব্রহ্মচারি, আমরা কথা কহিতে জানি! তোমার মনটার দিকেই চাহিয়া দেখ না! সে মাঝে মাঝে কি কথা তোমাকে শুনাইতে ব্যাকুল হয়, তাহা না জানিয়া, না শুনিয়া, আমাদের মন দেখিতে এত ব্যস্ত হও কেন? দেখিতে আসিয়া, আমাদিগকে কেবল লজ্জা দাও। সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ যখন, তখন আমাদের লজ্জাটা তুমিই গ্রহণ কর না কেন? তোমার মনটা মুখে ফুটিয়া উঠুক, আমাদের মুখ মনের ঘরে চলিয়া যাক্।"

সত্য সত্যই এইবারে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হইলাম। স্থির হইলাম, চোখ মেলিলাম। মেলিতেই দেখি, তপস্বিনী আবার কবাট উন্মুক্ত করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ জানিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। বিশেষে চেষ্টায় ইচ্ছার দমন করিলাম।

তিনি মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িলাম।

"আর বিলম্ব করবেন না, বাবা!"

"না, মা, আর বিলম্ব ক'রব না। বিলম্ব করা আর আমারই চলবে না, বেলা শেষ হ'তে চলেছে।"

"আমারও আর থাকা চল্‌ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরীর কথাটা এই সময়ে আমার মনে পড়িয়া গেল। 'ফিরিয়া আসিতেছি' বলিয়া আমি যে তাহার কাছ হইতে চলিয়া আসিয়াছি! অনেক আগেই তাহার কাছে আমার উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল! সে যে বলিয়াছে, আমি ভিন্ন এ কাশীতে তাহার আর কেহই নাই!

আপনা আপনি যোগিনী হাসিয়া উঠিল।

"ও কি মা, হঠাৎ হেসে উঠলে যে!"

"কিছু নয়, বাবা, একটা কথা মনে উদয় হ'ল।"

দুই জনেই এবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছি। যোগিনী-মা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। তিনি ভূমির দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার তাঁহার সেই বিচিত্র হাসি।

কি বিপদ, এ মেয়েটা এমন ক'রে হাসে কেন? কারণ জানিতে গিয়া, বিশেষ চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলাম!

২৮

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, যে সমস্ত সামগ্রী রাঁধিবার জন্য আমি সযত্নে বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জনের আকারে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দধি, দুগ্ধ, পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন।

দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। এই সকল সামগ্রীর কতক আমি আনিয়াছি বটে, সব ত আনি নাই। আমার আয়োজন ছিল, পাঁচ ছয় জনের জন্য। এ ত দেখিতেছি, পোনেরো ষোল জনের উপযোগী সামগ্রী। এত আড়ম্বর কিসের জন্য ও খাইবে কে? আর, এত ব্যঞ্জন, এমন করিয়া রাঁধিল কে? গুরুদেব নিজেই কি এই সমস্ত পাক করিয়াছেন?

"হাঁ গো, মা!"

"কি, বাবা?"

"এত রান্না—"

"কে রেঁধেছেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

"কেন, বাবা, আগেই ত বলেছি।"

"গুরুদেব কি এই সমস্ত—"

"আমি রাঁধলে কি আপনি খেতেন?"

বুঝিলাম গুরুদেবই স্বহস্তে পাক করিয়াছেন। তপস্বিনীর পূর্ব্বের কথা, আমার মনস্তুষ্টির জন্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু ইঁহার কথার একটা উত্তর না দেওয়া অন্যায় হয়। আমি বলিলাম—"গুরুদেব কি গ্রহণ করতেন?"

"তিনি আচণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করতে পারেন! তাঁ'র এ কন্যার কুটীরে যখনই তিনি পদার্পণ ক'রেছেন, তখনই তাঁ'কে রেঁধে খাইয়েছি।" বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি বলিলেন—"আপনি যে ব্রহ্মচারী।"

"তাঁকে হাত পোড়াবার কষ্টটা না দিয়ে আপনি রেঁধেছেন জান্‌লে, আমি সুখী হতুম।"

"আপনি ওই ঢাকা তুলে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

দেখিলাম, ঘরের এক স্থানে একখানি আসন পাতা তাহার পার্শ্বে একটি জলপূর্ণ পান-পাত্র। দূরে শালপাতা-ঢাকা পাত্রে গুরুদেবের প্রসাদান্ন।

"এ আসন পেতেছ কি, মা, তুমি?"

তপস্বিনী উত্তর দিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র।

আমি সে আসনখানা হাতে তুলিয়া, আবার পাতিলাম। উপবিষ্ট হইয়াই বলিলাম—"মা! তুমি ওই প্রসাদ-পাত্র এনে দাও।"

মৃদু হাসিয়া তপস্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

"আমি চাচ্ছি, মা, তোমার দিতে আপত্তি কেন?"

তথাপি তপস্বিনী নড়িলেন না।

আমি জেদ ধরিলাম। ফল হইল না। লাভের মধ্যে, তাঁহার মাথাটি আনত হইল। মনে হইল, মুখ যেন সহসা মলিন হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে—না, না—সত্যই যে একবিন্দু জল!

আমি আসন ছাড়িয়া উঠিলাম। যেখানে গুরুর প্রসাদান্ন, সেখানে যাইয়াই পাত্রের উপর হইতে পাতা উঠাইলাম। তাঁহার ভুক্তাবশেষের সঙ্গে এক জনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য রাখিয়া গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন।

পাত্র হইতে গুরুর ভুক্তাবশেষের সামান্যমাত্র অংশ লইয়া মুখে দিলাম। তপস্বিনী সেই ভাবেই নীরবে দাঁড়াইয়া।

আমি বলিলাম—"মা! একটা কথা আমার মনে প'ড়ে আমাকে হঠাৎ ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আমি একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কায অসম্পূর্ণ রেখে এসেছি। সেটা অসম্পূর্ণ রাখা আমার এখন এমন অন্যায় ব'লে বোধ হচ্ছে যে, এই প্রসাদান্নের কণামাত্র ছাড়া আর বেশী এখন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"কোথাও কি আপনাকে যেতে হবে?"

"এখনি—আমি কালবিলম্ব কর্‌তে পারব না।"

"আমাকেও যে যেতে হবে এখনি।"

"আপনি ত সিদ্ধেশ্বরীর কাছে যাবেন?"

"আপনি তা'র নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে?"

"এ সমস্ত কথা ফিরে এসে যদি বলি?"

"ফিরে এলে আপনার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে?"

"আপনাকে থাক্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি।"

"আমিও যে অন্যায় করেছি, সে এখনো উপবাসী রইল কি না, বুঝ্‌তে যে পারলুম না।"

একবার মনে করিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর অবস্থার কথা বলি, কিন্তু বলিতে কি জানি কেন, আমার সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"তা'র জন্য প্রসাদ আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে ওইটাই আপনি নিয়ে যান।"

"বেশ" বলিয়াই আমারই জন্য ঢুকিত সেই খাদ্যপাত্র উঠাইয়া লইলাম।

"ওই থেকে একটু কণা আমাকেও দিন।"

"কেন, মা, তোমার আহারে আপত্তি কি?"

"আপত্তি কিছু নেই, বাবা, সামগ্রীর ত অভাব নেই। প্রয়োজন বোধ করি, এর পরেই আহার কর্‌ব।"

"তা' হ'লে ত আমার খাওয়া হয় না, মা!"

"আমি এখন খেতে চাইলুম না ব'লে?" তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"এক জনকে অনাহারে রেখে আমি আর এক জনকে আহার করাতে যাব!"

"আমি ত নিয়ে যেতে চাচ্ছিলুম। সেখানে আপনার যাবার কি প্রয়োজন, আমি ত জানি না।"

"এই যে বললুম, ফিরে না এলে বলতে পার্‌ব না।"

"আপনার ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?"

"সেটা ত ঠিক বলতে পারছি না!"

"একটা আন্দাজ?"

"অল্প সময়ও হ'তে পারে, অধিক সময়ও হ'তে পারে।"

"সারারাত্রিও হ'তে পারে!"

আমি তাঁহার মুখের দিকে ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই চাহিলাম। এটা কি তাঁহার রহস্য? কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কর্‌ব বল, মা!"

"এর উত্তর আমি কি দেবো, আপনার ইচ্ছা!"

"তুমি আহার করবে না?"

তপস্বিনী আবার নীরব। আবার তাঁহার মাথা অবনত হইল।

বুঝিলাম তিনি আহার করিবেন না—অন্ততঃ আমি না করিলে। কিন্তু আর আমার ভোজনে বসা অসম্ভব। আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে বাইরের দোরটা—"

"বাবার প্রসাদের—"

আমার বলা তিনি যেমন শেষ করিতে দিলেন না, আমিও তেমনি তাঁহার বলা শেষ করিতে দিলাম না; পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনী তাহা মুখে পুরিলেন। তার পর করতল মস্তকে স্থাপন করিলেন। হাত নামাইয়া, চোখ মেলিয়াই বলিলেন—"চলুন, দরজার কবাট বন্ধ ক'রে আসি।"

২৯

বাহির দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই আমার মনে হইল, কিছু টাকা যে আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে!

"দাঁড়ালেন, কেন বাবা?"

তপস্বিনী ছিলেন আমার পশ্চাতে। আমি মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, আমাকে কিছু টাকা নিতে হবে যে!"

"আমারও ভুল হয়েছিল বলতে আপনাকে, উপরটা এক বার দেখে যান।"

"কেন চুরির কি আশঙ্কা কর?"

"অনেকক্ষণ আমরা ওই ঘরে ছিলুম। উপরে কেউ ওঠা-নামা করলে ওখান থেকে ত দেখা যায় না।"

পাত্র হাতে করিয়াই আমি উপরে উঠিলাম। ঘরের দোরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই বুঝিলাম, চুরি হইয়াছে। বারান্দায় যে ঘটিটা রাখিয়াছিলাম সেটা নাই। ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, যে ছোট বাক্সটির ভিতরে আমি হাত-খরচের টাকা রাখিতাম, সেটিও নাই।

আর মুহূর্ত মাত্রও না দাঁড়াইয়া আমি নীচে আসিলাম। কোনও কথা মুখ হইতে আমার বাহির না হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরই মধ্যে টাকা নেওয়া হয়ে গেল?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "হ'ল না।" প্রত্যাশা করিলাম তাঁহার একটা প্রশ্ন। প্রত্যাশায় দাঁড়াইলাম। কিন্তু সে প্রশ্নের পরিবর্তে শুনিলাম "আপনি কি কিছু বলতে চান?"

আমার মুখের কি ভাব দেখিয়া তিনি এ প্রশ্ন করিলেন, বুঝিতে না পারিলেও আমাকে বলিতে হইল—"চাই।"

"বলুন।"

"কবাটে খিল দিয়ে আবার খুলে রাখলে কেন?"

"আপনি দেখেছেন?"

"উপর থেকে নামবার সময়ে।" তাঁহার আবার হাসি জড়ানো প্রশ্নে সব সত্যটা আমি বলিতে পারিলাম না।

"কিছু কি চুরি গেছে নাকি?"

"কিছু গেছে।"

"বলেন কি, এরই মধ্যে?"

"কিছু কেন, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট। একটা ঘটি গেছে, আর একটি হাতবাক্স, তাতে গোটা পঁচিশেক টাকা ছিল।"

"তা হ'লে ত খুব ক্ষতি ক'রেই গেছে। আমার মরণ, যে ভয় ক'রে কবাট বন্ধ করতে গেলুম, তাই হ'ল!"

"বন্ধ ক'রে আবার খুললে কেন মা?"

"আপনার রসুই ঘরের দিকে গেলে এ দিক্‌টে কিছুই দেখা যায় না। সেটা প্রথম যাওয়াতেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কাশীতে ত চোরের অভাব নেই। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় একবার রক্ষা হয়ে গেছে। এ বারেও রান্নাঘরে আমাদের কত দেরী হবে বুঝতে ত পারিনি, তাই কবাট বন্ধ করতে গিয়েছিলুম।"

"বন্ধ ক'রে আবার খুললে কেন?"

মুখটি একটু তুলিয়া, শুভ্র দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া যোগিনী বলিলেন—"তাই ত ঠাকুর, আপনার ত খুব ক্ষতি ক'রে দিলুম!"

"আমার সঙ্গে আর রহস্য করছ কেন, মা? বল না এটাও বিশ্বনাথের কৃপা।"

"তা বটে। যাচ্ছেন যখন সন্ন্যাস নিতে, তখন এগুলো ত ফেলে যেতেই হবে।"

"আমি কি সন্ন্যাস পাব, মা?"

"বা! আপনি ত সন্ন্যাসীই। লোক দেখানো একটা আশ্রম নেন নি ব'লে?"

এত বড় একটা প্রশংসা—কিন্তু ভিতরে অহঙ্কার না আসিয়া প্রচণ্ড লজ্জা আসিল। কই, এখনো ত সাহস করিয়া ইঁহার কাছে মনের নীচতাটা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না!

"তা হ'লে কি হবে বাবা।"

"কিসের কি হবে, মা!"

"টাকার?"

"অভাব হবে না, দরকার হয় পথেই পাব।"

"তবে আর বিলম্ব করবেন না।"

"কিন্তু আর একটা কথা জানবার ইচ্ছা কিছুতেই যে দমন করতে পারছি না।"

"দরজা কেন বন্ধ করলুম?—আপনিই একটা অনুমান ক'রে বলুন না।"

"অনুমানে আমি কত কি বলব, কিন্তু ঠিক যে বলতে পারব, সেটা ত সাহস ক'রে বলতে পারছি না। একটা মিথ্যা ব'লে তোমার কাছে অপরাধী হব?"

পূর্ণ সরল দেহ-যষ্টিখানি আমার মুগ্ধ নেত্রের উপর যেন তুলিয়া তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে কি রকম দেখছ, বাবা?"

"সাক্ষাৎ মা-সরস্বতীকে সম্মুখে দেখছি।"

"সরস্বতী হই আর নাই হই, তবে আমি বুদ্ধা ভুবনের মা নই।"

আমি অবাক্, শুধু সেই মৃদুহাস্যময়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

"বুঝতে পেরেছেন বাবা?"

"এ কথাতেও যদি বুঝতে না পারি, তা' হলে আমার সন্ন্যাসী হ'তে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

"এই বিশ্বনাথের পুরীতে এমন সব লোক আছে, যারা তাঁরও মসৃণ পাষাণ-দেহের ভিতর থেকে ছিদ্র খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে।"

শুনিবামাত্র আমার চোখ জলে ভরিয়া গেল, সেই অবস্থাতেই আমি বলিয়া উঠিলাম—"সেই চোর-নারায়ণকে দেখতে পেলে আমি প্রণাম করতুম, মা। সে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল না কেন? তা হ'লে বুঝি আমার পূর্ণ-চৈতন্য হ'ত।"

"আর বিলম্ব করবেন না, সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

"তার পরিবর্ত্তে তোমাকে একটা প্রণাম করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কি করব, হাতে গুরুর প্রসাদ।"

আমার কথা শেষ করিতে না করিতে তপস্বিনী ভূমিষ্ট হইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন।

আর একটা কৌতূহল—এই সময়েই মিটাইয়া লই। তপস্বিনী প্রণাম করিয়া যেই আবার দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম—"মা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।" বলিয়াই, তাঁহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি চলতে চলতে দু' দু'বার ডুকরে কেঁদে উঠলে কেন, আমাকে বলতে হবে, বলতেই হবে।"

"এতক্ষণ যে আপনার আহার শেষ হয়ে যেতো, বাবা।"

"দরজা বন্ধ কর।" বলিয়াই বাহির-পথে পদনিক্ষেপ করিলাম।

বিশ্বনাথ! আমার সমস্ত ভিতরটাকে এইবারে গৈরিক-বসনে ঢাকিয়া দাও।

৩০

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাশীর গলি, অন্ধকার বেশ ঘনভাবে সে স্থানটা আক্রমণ করিয়াছে।

আসিবার বিলম্ব, আসিবার সময় পথ হইতে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর পিতৃদেবের সৎকার করিতে হইবে।

দ্বারটা ঠিক লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি খানিক দূর চলিয়া গিয়াছি। হাতে আমার প্রসাদ-পাত্র। পাছে কারও গায়ে লাগে, অতি সাবধানে সেটিকে লইয়া চলিয়াছি।

মোড়ের মাথায় মাথায় তখন তেলের আলো দেও-য়ার ব্যবস্থা ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইতেই বুঝিলাম,

আমি বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ফিরিতেছি, এমন সময়, একটু অন্ধকারের দিক্ হইতেই, কে এক জন বলিয়া উঠিল, "বুড়োর পা সোজা কর্‌তে চারজনকে হিম্‌সিম্ খেতে হয়েছে।"

সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই আর এক জন বলিয়া উঠিল—"পা সোজা হ'ল ?"

"যতটা সোজা হবার, সেই অবস্থাতেই নিয়ে গেছে।"

"যাক্, বুড়োর এতকাল পরে কাশীপ্রাপ্তি হ'ল ?"

বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেল। আরও দুই একটা কথা তাহাদের মুখ হইতে শুনিবার ইচ্ছা ছিল। সৎকারের সাহায্য করিল কে? মৃত-দেহের অন্তিম-সংস্কারই বা কে করিল ? ইচ্ছার পূরণ হইল না। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ডাকিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী !" উত্তর পাইলাম না। দুইবার, তিনবার। কবাটে বার দুই আঘাত করিলাম। বাড়ীর ভিতরটা সেইরূপই নিস্তব্ধ। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ, তবুও এমন নিদর্শন পাইলাম না, যাহাতে বুঝিব, ভিতরে মানুষ আছে।

একটু আশঙ্কা হইল। আঘাতের ফলে যদি মেয়েটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে! বেশ উচ্চকণ্ঠে, কবাটে আঘাত দিতে দিতে বলিলাম—"বাড়ীতে কে আছ ? মা !"

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও কোন উত্তর না পাইয়া আমি ফিরিতেছিলাম। লোকজন—মেয়ে, পুরুষ—আমার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। কেহ কেহ আমার পানে চাহিতেছিল, একটি স্ত্রীলোক কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিল। আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইয়া থাকা আমার নিজেরই কাছে লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম।

দুই চারি পা যাইতে না যাইতেই আমি কবাট খোলার শব্দ পাইলাম।

"কে ডাক্‌ছিলে গা ?"

দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক, বোধ হইল বর্ষীয়সী, মুখ দ্বার হইতে বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে সে আমাকে দেখিল। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—"আমি, মা !"

"কোথা থেকে তুমি আস্‌ছ ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী উপরে আছে ?"

"তাকে তোমার কি দরকার ?"

"আছে কি না আছে, আগে বল, তার পর ত দরকারের কথা।"

"কি দরকার, আগে বল।"

আমাকেই বুড়ীর কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম—"তার জন্ত তার গুরুদেবের প্রসাদ নিয়ে এসেছি।"

বুড়ীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। তাহার সাহায্যে সে আমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। লণ্ঠন নামাইতে নামাইতে সে বলিল—"প্রসাদ খাবে কে ?"

বিশেষ ব্যাকুলভাবে আমি প্রশ্ন করিলাম—"বেঁচে আছে না মারা গেছে ?"

উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা আমার মুখের পানে বেশ একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই চাহিল। গ্রাহ্য না করিয়া আমি আবার বলিলাম—"বেঁচে আছে এখনও ? মুখের দিকে কি দেখ্‌ছ, বাছা ? এই কথাটা বল্‌লেই, আমি কি তোমার সর্ব্বনাশ করব ?"

"এখনও আছে।"

"তা হ'লে এক কায কর, এই থেকে একটু কণা নিয়ে তার মুখে দিয়ে এস।"

বলিয়া আমি তাহার বিস্ময়ে বিপুল-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে পাত্র উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম।

"ওতে কি আছে ?"

"চেয়ে ত্যাখো—কৃপা ক'রে; আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে বুঝবে কেমন ক'রে ?"

থালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বৃদ্ধা বলিল—"তুমি একটু দাঁড়াও।"

বলিয়াই বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় কবাটটি বন্ধ করিতে সে ভুলিল না। অগত্যা আমাকে আরও কিছুক্ষণের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

আবার কবাটের খিল খোলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কণ্ঠের উল্লাসভরা অস্ফুট স্বর। এ কি গৌরী, গৌরী ? আমার গৌরী কি এতদিন পরে তাহার মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়াছে ? তাই কি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বৃদ্ধার এত সঙ্কোচ হইতেছিল ?

অনুমানের নিশ্চয়তা তাহার স্পন্দন-প্রহারে আমার হাতটাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। হাত হইতে পাত্র পড় পড় হইল। বাস্তবিকই রক্ষার জন্ত দুই হাতে সেটিকে ধরা ভিন্ন আমার গতি রহিল না।

কিন্তু দ্বার খুলিতেই—এ কি ! ওরে দুষ্টু, তুমি ?

একটা অহেতুক আতঙ্কের ভিতর দিয়া তাহার দুষ্টামিটা ডাগর চোখ দুইটিতে বেশ ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধার আহ্বান কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মুখের পানে চাহিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরী করুণাময়ীর আশ্রয় পাইয়াছে।

"ভিতরে আসুন।"

"আর আমি যাব না মা। তুমি নিয়ে যাও, কিংবা-"

"আপনি নিয়ে আসুন।"

"তুমি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে নও?"

"দিদিমা, বাবাকে একটুখানি আসতে বল।" মিষ্টস্বর শুনিবামাত্র বুঝিলাম, ভিতর হইতে কথা কহিল কে।

"না রাণী মা, আমি ভিতরে যাব না। আমি দোরের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

কোনও উত্তর পাইলাম না। না পাইলেও দ্বারের কাছে তাঁহার আসারই প্রত্যাশা করিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধাকে রাণীর সম্বোধনের কথা শুনিয়াই বুঝিলাম, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার একটা ভুল হইয়াছিল। গুরুদেবের প্রসাদ আমার কাছেই পবিত্র হইতে পারে, সিদ্ধেশ্বরীও তাহা পবিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ নিষ্ঠামাত্র-সার ব্রাহ্মণ-বিধবার কাছে তাহা কি?—উচ্ছিষ্ট মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নিষ্ঠাসম্ভাবনাও আমার মনে উঠিল। যদি তিনিও মনে করেন, উচ্ছিষ্ট?

অতি মৃদুস্বরে কবাটের অন্তরাল হইতে কথা উঠিল, কথা যেমন মৃদু, তেমনই মধুর—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"যাওয়াটা যে, মা, কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে কর্‌ছি না।"

"আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

চিন্তার কারণ যে একটুও হয় নাই, এ কথা একেবারে বলিতে পারি না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের নামেই প্রাতঃকালের সেই দুরবস্থার কথা মনে হইল। তথাপি, বারবারের অনুরোধে, ভিতরে প্রবেশ না করাটা অন্যায় মনে করিলাম। সিদ্ধেশ্বরী একা থাকিলে ত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার কুণ্ঠা হইত না! সে একা আছে জানিয়াই ত আমি আসিয়াছি।

তবু একবার বলিলাম—"তুমিও কি, মা, ইহাকে উচ্ছিষ্ট মনে করিতেছ?"

"তবে আমাকে দিন।"

"হাত বার কর্‌তে হবে না, মা, আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। ভিতরে যাই-বার পথ দিতে গিয়া বুড়ী বলিল—"না বাবা, উচ্ছিষ্ট মনে কর্‌ব কেন?"

বুঝিলাম, বুড়ী মিথ্যা বলিতেছে। নহিলে আমাকে, রাণীকে এই কষ্টটা দিবার তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

৩১

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশপথের পার্শ্বেই রাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে একরূপ পশ্চাৎ করিয়া বালক-কোলে বৃদ্ধা। সঙ্কীর্ণ পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার ত উপায় নাই। বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছায় আমাকে আরও একটু দূরে উঠানের দিকে যাইতে হইল।

ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখি, বৃদ্ধা কবাট আবার বন্ধ করিতেছে। আমি নিষেধ করিলাম, আমার নিষেধে রাণীও তাহাকে নিষেধ করিলেন—"কবাট দিতে হবে না দিদিমা।"

বৃদ্ধা বেশ রাগের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"দোর দেবো না ত কি, শাস্ত্রী পাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব না কি?"

আমার কথা, রাণীর কথা, বৃদ্ধা শুনিল না, কবাট বন্ধ করিল।

মরুক গে, তার যা খুসী তাই করুক, রাণী তাঁহার ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোল হইতে লইয়া আমার নিকটে আসিতেই আমি তাহাকে প্রসাদপাত্র লইতে অনুরোধ করিলাম।

রাণী বলিলেন—"আপনিই উপরে নিয়ে চলুন, বাবা।"

উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে নিষ্ঠার আতিশয্যে বৃদ্ধা যে পাত্র হাতে করিতে চাহে নাই, এটা আমি ঠিক বুঝিয়াছি। রাণীর কথায় মনে হইল, তাঁহারও পাত্র হাতে করিতে আপত্তি আছে।

মনের সন্দেহটা মনে না রাখিবার জন্যই বলিলাম—"তোমারও কি, মা, পাত্র হাতে কর্‌তে আপত্তি আছে?"

একবারেই পাত্র হাতে ধরিয়া রাণী স্মিতমুখে বলি-লেন—"তা হ'লে দুষ্টটাকে আপনি নিন্। ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠলে থালা সাম্‌লাতে পারব না। এই দেখুন, এখনি হাত বাড়াচ্ছে।"

বালক বলিয়া উঠিল—"আউ।"

"তবে র'স মা, ওকে একটু শিষ্ট হবার ওষুধ দিই।" এই বলিয়া বালককে কোলে না লইয়াই পাত্র হইতে একটা মিষ্টান্ন লইয়া তাহার মুখে দিলাম। "ছেলের নাম রেখেছ কি, মা?"

"ললিতমাধব।"

"এই দেখ, ললিত বাবু, কেমন শিষ্ট হইয়াছে।"

"উপরে যাবেন না?"

"যে জন্য যাওয়া, তা তো হয়ে গেছে, আমি থাকলে তোমার চেয়ে বেশী আর কি করবো মা?"

"গিয়েও এখন কোন লাভ নেই।"

"সিদ্ধেশ্বরী কি ঘুমুচ্ছে?"

"মাথার যাতনায় অস্থির হয়েছিল ব'লে, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।"

"বাঁচবে ত?"

"আপনিই বাঁচিয়ে গেছেন! ডাক্তার বলেছে, তাড়াতাড়ি বাঁধা না হ'লে রক্ত ছুটে মারা যেতো। পূজার ঘণ্টা মাথাটায় ঢুকে গিয়েছিল, আর একটুখানি বেশী ঢুকলে তখনি মারা যেতো।"

"শুধু তা হ'লে ওকে নয়, মা; বিশ্বনাথ আমাকেও বাঁচিয়েছেন। ওটাও ম'লে আমাকে দু'জনের খুনের দায়ে পড়তে হ'ত।"

"আপনার সেই গুরুর কৃপা। একটা লাঞ্ছনার পর আবার একটা লাঞ্ছনা - বিশ্বনাথ আর করতে পারলেন না।"

বলিতে বলিতে—"এ কি? ও মা, এ কি করছ!" আমি তাঁহার হাতের পতনোন্মুখ থালা ধরিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণের বহু চেষ্টায় রুদ্ধ অশ্রু সহসা অবকাশ পাইয়া, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শুভ্র জাহ্নবী-ধারার মতই বুঝি ছুটিয়াছে।

"বিশ্বনাথের দোহাই, আমি কিছু মনে করি নি মা!" বলিয়াই দুইটি হাত তাঁহার পুত্রের মাথায় দিয়া, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"বিশ্বনাথের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার ললিতমাধব দীর্ঘজীবী হ'ক।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—"আজই দীর্ঘজীবী হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

"পাগ্‌লী বারান্দা থেকে ছেলেটাকে নীচে ফেলে দিয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া কোথায় কথা পাইব আমি? স্থির নেত্রে, পাগলিনীর মুখের পানে চাহিলাম।

রাণী বলিল—"ম'ল কই? তুমি যে অভিসম্পাত দাও নি বাবা? বিনাপরাধে সাধুর অপমান—এ বংশ লোপ পাওয়াই উচিত ছিল।"

এখনও আমি বক্ষের স্পন্দন নিবৃত্ত করতে পারি নাই, —এখনও আমার মুখে কথা ফুটে নাই।

বৃদ্ধা সহসা বলিয়া উঠিল "হতভাগা লক্ষ্মীছাড়াটা তা হ'লে তোমাকেই মেরেছিল, বাবা?"

"দেখ্ বুড়ী, ফের যদি তার দোষ দিবি, তা হ'লে আর তোর মুখ দেখব না। সে কে? কুকুর বই ত নয়, মনিব যার দিকে লেলিয়ে দেবে, তাকেই গিয়ে কাম্‌ড়াবে।"

আর আমি কোন কথা বলিতে, কিংবা জানিতে সাহস করিলাম না। উপর হইতে সিদ্ধেশ্বরীর মৃদু আর্তনাদ আমাকে বিদায়-গ্রহণের সাহায্য করিল! "সিদ্ধেশ্বরী বোধ হয় জেগেছে। উপরে যাও, মা, আমি এইবারে আসি।"

হাত হইতে থালা লইতে লইতে, যখন রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৌরী আমার কেমন আছে" আর প্রশ্ন করিতে না করিতে সেইরূপ ভাবেই কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন আমিও কোন ক্রমে চোখের জল আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

"যেখানে থাক্, যেমনই থাক্ না, মা, তোমার গৌরী তোমারই আছে।" বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলাম।

"দে, দিদিমা, আলো ধ'রে বাবাকে পথ দেখিয়ে দে।"

কিছুতেই বলিতে পারিলাম না, সেই যে সকালে গৌরীকে দেখিয়া বাহির হইয়াছি, তাহার পর এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে দেখি নাই, আর বুঝি তাহাকে দেখিতে পাইবও না।

আর বুঝি দেখিতে পাইব না। গৌরী! আমার সেই আগুনে-পোড়া দয়াময়ীর বাহুবন্ধন-মুক্ত, সেই মধুর রূপেই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া গৌরী! আর বুঝি তোকে দেখিতে পাইব না! দেখিতে চাহিলেও গুরু বুঝি—না না, গুরু যে আমাকে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন!

যাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আমার বাসার কাছে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি দশটার কাছাকাছি। কাশীর সেই জন বিরল গলিপথ নিস্তব্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে।

সারা পথটা চিন্তার পর চিন্তা, একটার পর আর একটা, আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তাকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভুবনের মা'র চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি, গৌরীর চিন্তায় হস্তের আবরণ দিয়া চোখের জল নিজের নিকট হইতেই লুকাইয়াছি। কিন্তু আমার রাণী মা'র চিন্তা? দুই করপত্রের মরণ-চাপও অশ্রুর বাহিরে আসা রোধ করিতে পারে নাই।

চিন্তাশেষে গৌরীর জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তখন একবার রাণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে আজ না দেখিতে পাইলে বোধ হয় গৌরীর মোহ আমার কোনও কালে ঘুচিত না, আমার সন্ন্যাসী হওয়া হইত না।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—কেমন যেন একটা সভয় অবসাদে কেমন যেন নিজেকে লুকানো চৌরভাব—দ্বারে ধীরে আঘাত করিলাম। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। কবাট যেন ওই কোমল আঘাতও সহ্য করিতে পারিল না।

"এ কি গো, মা, তুমি যে একেবারে দোরের কাছেই ব'সে আছ!"

"তুমি কি মনে করেছিলে, বাবা?"

"ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"তাই কি অত আস্তে দোরে ঘা দিচ্ছিলে ?"

"মনে কর্‌ছিলুম, যদি ঘুমোও, তোমাকে আর জাগাবো না।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় যেতে ?" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি আবার বলিলেন—"দোরটি আগলে ব'সে থাক্‌তে ?"

আমার মনের অবস্থা তখন একেবারেই ভাল ছিল না। তবে এরূপ ভাবের কথায় আমার মনে মনে বেশ রাগ হইল। হউক্ না কেন সে সন্ন্যাসিনী—অথবা তাহার সন্ন্যাসিনীর বেশ কাশীতে অনেক সন্ন্যাসিনী আমি দেখিয়াছি। আজ প্রথম তাহার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার সঙ্গে গুরুপভাবে কথা কহিবার তাহার অধিকার কি ?

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, দোর বন্ধ ক'রে ভিতরে আসুন। আমার হাত সক্‌ড়ি, আমি এ হাতে কবাট ছুঁতে পারব না।"

"তুমি কি বাসন মাজ্‌ছিলে ?"

"সেই জন্যই ত কবাট খুলে রেখেছি। বর্তনে হাত দিলে ত টপ ক'রে দোর খুলতে পারব না।"

"সে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ?"

"বাবাজী মহারাজের প্রসাদ—সে কি প'ড়ে থাক্‌বার বাবা—কাশীতে গ্রহণ কর্‌বার অনেক ভাগ্যবান আছে।"

আমি কবাট বন্ধ করিলাম। দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"উপরে চ'লে যান, পা ধোবার জল ঠিক করা আছে।"

"তোমার দেওয়া জল আমি পায়ে দেব ?"

"সে কি বাবা, ওই এক বছরের গৌরী মেয়েটিই কি তোমার একমাত্র কন্যা ?"

"বেশ মা, তোমার যখন তাতে আনন্দ।" আমি উপরে চলিলাম।

"আর নানা ঝঞ্ঝাটে আপনার এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হ'ল না। আমি জলখাবার আপনার ঘরে সাজিয়ে রেখেছি।"

আমি উপরে উঠিয়াই দেখি, শুধু পা ধুইবার জল এ বেটী আমার সেবার জন্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। জল, গামছা, পরিধানের জন্য একখান বস্ত্র, সমস্ত সযত্নে সে রাখিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে তেমনি করিয়াই সযত্নে রক্ষিত ফল, মূল, মিষ্টান্ন।

একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, দয়াময়ীর মুখখানি যেন জাগিয়া বায়ুতে আবার মিলাইয়া গেল।

এরা কি সকলেই দয়াময়ী ? মাতৃত্ব ইহাদেরই নিজস্ব, দয়াও কি ইহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে মানুষের হৃদয় আশ্রয় করে ? বহুকাল পরে, ত্যাগের মুখে এই এক অভিনব দিনের অভিনব রাত্রিতে, গৌরীকে দেখিতে চারিদিক-চাওয়া দৃষ্টির উপরে হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মুহূর্তের জন্য সোনার সংসার যেন ভাসিয়া উঠিল।

জলযোগ করিতে করিতে কি যেন কি চাহিতে—হয় জল, নয় দুই একটা ফল, নয় বহুকাল পরে নিঃস্ব সংসারীর সর্ব্বস্ব একটু আদরভরা মমতা—কি যেন কি চাহিতে যেমন ডাকিলাম, "মা" অমনই বাহির হইতে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"অম্বিকাচরণ !"

সঙ্গে সঙ্গে তপস্বিনীর কণ্ঠস্বর "আপনাকে উঠতে হবে না, বাবা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।"

৩২

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া উঠিব মনে করিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার সহিত আহার শেষ করিতে গিয়াও আবার শুনিলাম, "অম্বিকাচরণ !"

গুরুদেব একেবারে আমার ঘরের দুয়ারে হাজির !

"উঠো না বাবা, আহার শেষ ক'রে নাও। মায়ের কাছে শুন্‌লুম, সমস্ত দিন তোমার পেটে অন্ন পড়েনি। খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা কর্‌ছি।"

তাঁর আদেশসত্ত্বেও আর আমার পেটে কিছুই প্রবেশ করিতে চাহিল না।

দুই একটা মিষ্টান্ন নাকে-মুখে গুঁজিবার মত করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আরও যেন দুই চারিটা পায়ের শব্দ আমার কানে গেল। তবে বুঝি, আমার গৌরী মাকে কোলে করিয়া ভুবনের মা ফিরিয়া আসিয়াছে !

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি—কোথায় গৌরী ! গুরুদেবের পশ্চাতে বারান্দার একটা থাম ধরিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়াইয়া যোগিনী-মা। কেমন যেন তাঁহার একটা পাগলের মত ভাব। মাথার সেই কেশরাশির অর্দ্ধেকের উপর যেন, তাঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছে।

আমি নির্ব্বাক্, গুরুদেবের মুখেও, কি জানি কেন, কথা নাই। তপস্বিনীর মুখে কোনও কালে যে কথা ছিল, দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বিষাদ এমন গভীরভাবে হঠাৎ আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া গুরুকে যে প্রণাম করিব, তাহাও পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি।

যোগিনী-মাই প্রথমে কথা কহিলেন—"এইবারে আমাকে যেতে অনুমতি কর, বাবা !"

"কেন গো মা, ছেলে ডাগর হয়েছে ব'লে, তার ভার নিতে কি তোর বিরক্তি বোধ হচ্ছে ?"

"তুমি ত সব জানো বাবা! ফিরে আসছি ব'লে, সেই সকালবেলায় সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে চ'লে এসেছি, এখনো ফির্‌তে পারলুম না। তাঁর যে ব্যাকুল হ'বার কথা!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, বেশ একটু বিরক্তির ভাবেই গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি মাকে রাজমোহনের স্ত্রীর কথা কিছুই বলনি অম্বিকাচরণ?"

অপরাধীর মত আমি মাথা হেঁট করিলাম।

"হাত ধুয়ে ফেল।"

একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই, যোগিনী ব্যস্ততার সহিত কমণ্ডলু ও এক খানা গামছা লইয়া আমার সেবা করিতে আসিলেন।

হেঁটমুণ্ডেই আমি তাঁহাকে পাত্র রাখিতে অনুরোধ করিলাম।

"দোষ নেই বাবা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে ফেলন।"

গুরুদেব পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "সঙ্কোচ কেন, মা জল দিচ্ছেন, নাও না। তোমার এই অনর্থক সঙ্কোচের জন্ত আমাকে কি দু'ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে?"

শিষ্ট বালকটির মত আমি যোগিনী-মা-দত্ত জলে হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলাম।

হাত-মুখ মুছিয়া, যেই গামছাখানি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি, অমনি আমার দুইটি পায়ে কমণ্ডলুর অবশিষ্ট জল ঢালিয়া গামছার ভিতরে যেন কতকালের স্নেহ পুরিয়া —কি কোমল করপল্লব—অতি ধীরে, পাছে যেন আমার পায়ে লাগে, মুছাইতে লাগিলেন!

গুরু নিকটে, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতিবাদ করিতেও আমার সাহস হইল না। দয়াময়ীকে মনে পড়িল। কোনও দূরস্থান হইতে ফিরিলে সেও অতি আগ্রহে এইরূপই আমার সেবা করিত।

দয়াময়ীর কথা মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল! তাঁহার দুই এক ফোঁটা কি মায়ীজীর মাথায় পড়িল? যদিই পড়ে, তাহার কি এতই ভার যে, মায়ের মাথা আমার পায়ের নিকট পর্য্যন্ত নত হইয়া গেল।

কিছু হউক আর না হউক, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মাতৃ-মূর্ত্তি, আর সেই কতকালের না-দেখা সেই স্নেহের প্রতিমা পত্নী দুইটিতে পরস্পরে বাহু-পাশে জড়াইয়া আমার সরস চোখের উপরই যেন এক হইয়া গেল। মিলিয়া যে কি হইল, দোহাই ভাই, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না।

"তোমারও যে পা মোছা শেষ হয় না গো!"

"কি করি বাবা, তোমার অম্বিকাচরণের পায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ না।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পা দুইটা আপনা হইতেই যেন পিছাইয়া আসিতে চাহিল। তাহার হাতে বুঝি টান পড়িল! মায়ীজী বেশ জোরেই আমার একটা পা ধরিয়া রাখিলেন। কি আপদ, তাঁহার মাথার কেশ যে আমার পায়ের উপর লুটাইতেছে!

"কত বছরের ধুলো কাদা যে তোমার বাবাজীর শ্রীচরণে জমে আছে!"

গুরু আর কোনও কথা ইহার উত্তরে কহিলেন না। মাও আপনার ইচ্ছামত সেবার পর, আমাকে নিস্তার দিলেন। গামছাটি কাঁধে লইয়া, কমণ্ডলু আবার তিনি হাতে করিতেই, আমি গুরুর সমীপে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনি গুরু মায়ীজীকে উদ্দেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার এ ছেলেটি কস্মিন্‌কালেও যে সাবালক হবে, এ আমার বোধ হচ্ছে না।"

বাস্তবিকই নাবালকের মত কিছু না বুঝিয়া হাঁ-করা আমার মুখের পানে চাহিয়া গুরু আমাকে বলিলেন—"হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে দেখছ কি, মাকে প্রণাম কর।"

মায়ীজী কমণ্ডলু গামছা যথাস্থানে রাখিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, না।"

তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে গেলে গুরুকে অতিক্রম করিতে হয়। আমি দূর হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"ও রকম নয়, আমার বেলা যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে—সত্যই যদি বিবেক-বৈরাগ্য চাও।"

"না বাবা, না।"

আর, 'বাবা না', আমি একেবারে মায়ের চরণ দুইটির উপর মাথা স্পর্শ করাইয়া দিলাম।

"না, বললে চল্‌বে কেন মা? ওর কল্যাণ যাতে হয়, তা আমাকে ত দেখ্‌তে হবে! বামনাই অহঙ্কার থাক্‌লে ত আর বিবেক-বৈরাগ্য আসবে না!"

উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, গুরুদেব আমাকে বলিলেন—"ও মেয়েটা কি, জান কি অম্বিকাচরণ? মুচির মেয়ে।"

রহস্যই হউক, কি যাহাই হউক, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনটা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জন্মগত সংস্কার—ত্যাগের শক্তি, ভগবানের পূর্ণ কৃপা না হইলে, কদাচ হইয়া থাকে। সত্যই কি আমি সমাজের একটা অস্পর্শীয়া নারীর পায়ে ব্রাহ্মণের চির-উন্নত মাথাটা অবনত করিলাম?

"দেখ্‌ছ কি অম্বিকাচরণ, মাকে ধর।"

আমি ত এতক্ষণ দেখি নাই! সত্যই ত, এ কি দেখিতেছি? গুরুদেবের সঙ্গেও ত অনেককাল কাটাইয়াছি, তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধন-রাত্রি ত অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কই, তাঁহারও ত অমন অদ্ভুত ভাবান্তর আমি কখন দেখি নাই!

চিত্রার্পিতার মত—সমস্ত প্রাণ প্রবাহ কমনীয় দেহ-মন্দিরের কোন্ গোপন-প্রকোষ্ঠে যেন লুকাইয়াছে! পলক-যুগল নিরুদ্ধ হইতে গিয়া, বিশাল চক্ষু দুইটির কাছে পরাস্ত মানিয়াই যেন তারা দুইটিকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত করিয়া স্থির হইয়াছে! কাপড়খানা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। আঁচলখানা কাঁধের একাংশে শুধু সংলগ্ন।

"ধ'রে ফেল, অম্বিকাচরণ!"

অন্ন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে না করিতে একটি দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে মায়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

শশব্যস্তে সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে করিতে তিনি গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তাই ত বাবা, থাকে থাকে আমাকে কি ভূতে পায়?"

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন—"যেখানে এতক্ষণ ছিলে মা, সে স্থান থেকে তোমার এ ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওর চৈতন্য হয়।"

৩৩

চৈতন্য কি হইবে? এখনও—এই বিশ বৎসরের লোক-দেখান বৈরাগ্য চৈতন্য কি এখনও আমার হইয়াছে?

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের দিন- দূর অতীতের স্মৃতি, যতটা আছে বলিতেছি- এই অপূর্ব্ব রমণীর নীরব আশীর্ব্বাদে এক মুহূর্ত্তেই আমার যেন চৈতন্য আসিল।

নিজের ভাঙ্গা-সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, ধার-করা মাল-মশলা দিয়া আবার যে একটা সংসার-রচনার চেষ্টা, নিজের কাছেও সযত্নে লুকাইয়া করিয়াছিলাম, সেটা দেখিতে দেখিতে যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। মানস চক্ষুর সম্মুখ হইতে আমার এই গৃহবাসের আকাঙ্ক্ষা, আর তাহার ভিতরে শান্তি দিবার ছল দেখানো সৌন্দর্য্য—আমার গৌরী—যেন দূর হইতে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে! এই শুভ-মুহূর্ত্ত বুঝি গুরুদেবের অবিদিত রহিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওবেটীর সেবায় দয়াময়ীকে কি মনে প'ড়েছিল?"

বেশ একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

আমার দুর্দ্দশাকে লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিলেন—"কি হে, আমার সঙ্গে তোমার কি যেতে ইচ্ছা আছে?"

"আছে প্রভু!"

মায়ীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাবে, বাবা?"

"যদি আজই যাই?"

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম—আজই যাই, মানে কি? যেমন দাঁড়াইয়া আছি, এই অবস্থাতেই আমাকে কি গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে?

"বুঝে দেখ অম্বিকাচরণ।"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত চিন্তাকে প্রাণপণ শক্তিতে স্থির করিয়া উত্তর দিলাম—"যদি আজই যান, আজই যাব।"

"প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।"

আর, আমার কি যোগিনী-মা'র- কাহারও মুখের পানে না চাহিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। মায়ীজীও নীরব। যে যাহার নিজের স্থানে আমরা নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া।

গুরুর গন্তব্যপথের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনিও বুঝি সেই দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন।

চাহিতেই তাঁহার মুখে হাসি আসিল। আবার সেই মুক্তার মত দাঁতগুলি বাহির হইল। আমি কিন্তু গম্ভীর—মুখে হাসি আনিব কি, ভিতরে পুঞ্জ পুঞ্জ অশ্রু সঞ্চিত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। বিন্দুগুলার মধ্যে কে আগে আসিবে, স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পরে কলহ করিতেছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

"তাই ত গো, মিলন হ'তে না হ'তেই বিচ্ছেদ!"

"আর রহস্য ক'র না মা, তোমার এই রকম কথাতেই মনে মনে আগে থাকতে তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

"আমার কাছে?"

"তাই ত মা, তুমি এমন।"

"কি আমি? আমার ওই ভূতে পাওয়া দেখেই কি আমাকে কেমন বোধ হ'ল? না গো, তোমার কোনও অপরাধ হয়নি! তুমি আমার সম্বন্ধে যা মনে করেছ, আমি তাই।"

কোনও উত্তর না দিয়া আমি কেবল তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

"আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারবে না।"

আমি চোখ নামাইলাম।

খিল্-খিল্ হাসিয়া, এই অদ্ভুত-প্রকৃতি নারী বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, ওই রকম ক'রে চোখ্ হু'টি মুদে আমাকে দেখুন। তা হ'লেই বুঝতে পারবেন—আমি কি।"

এ সব কথা হেঁয়ালি, না গুরুদেবেরই ইচ্ছামত আমার পরীক্ষা ?

"আমাকে দেখে কি, আবার আপনার সংসার পাততে ইচ্ছা হয়েছিল ?"

সত্য সত্যই তাঁহার কথাতে এইবার আমার বিরক্তি আসিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল মনের নানাপ্রকার অবস্থা নিষ্ঠুরভাবে আমার ভিতরটাকে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছিল, এইরূপ সময়ে, যদিই তাঁহার রহস্য হয়, আমার ভাল লাগিল না।

"বল্‌তে দোষ কি, এখনি হয় ত বাবাজি মহারাজ এসে, আপনাকে নিয়ে যাবে, আর ত তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হবারই সম্ভাবনা। তখন, ব'লেই ফেলুন না! বা! বল্‌তে সরম কেন গো, ঠাকুর ?"

"প্রথম প্রথম তোমার কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগেনি।"

"তাই বলুন। মন, মুখ আলাদা ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া হয়। গেরুয়া প'রে অনন্তকাল ধ'রে পথ চল্‌লেও বস্তু লাভ হবে না।"

"বল্লুম ত মা, অপরাধ করেছি।"

"আমিও ত বল্লুম বাবা, তুমি কোনও অপরাধ করনি। গুরুর মুখে আমার কথা শুনে যা তোমার মনে হয়েছে, আমি তাই—মুচীর মেয়ে।"

"কতক্ষণ তোমার সঙ্গে এম্‌নি ক'রে কথা কাটাকাটি করব ?"

"চলুন ঘরে, আমি আপনার লোটা-কম্বল, পুঁটলি বেঁধে দিই।"

বলিয়াই, আমার সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, যোগিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৩৪

এক দিকে গুরুদেবের আকর্ষণ! তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। কোথায় আপাততঃ যাইতে হইবে, তাহার পর কোথায়, কত দিনের জন্য, আর কাশীতে ফিরিতে পাইব কি না—এ সমস্ত কিছুই আমি জানি না। যাইবার সামর্থ্য আমার কতটুকু, ইহারও পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাই নাই। গুরুদেবের আদেশ, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই আমি পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি। "প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।" সে ফেরা যে কখন্ কিংবা কবে, তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই। ফেরা তাঁহার আজ রাত্রির মধ্যেও হইতে পারে; অথবা হইতে পারে, কবে, কোন্ সময়ে, তাহার ঠিক কি! যখনই তিনি ফিরুন, আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এখন তিনি ফিরিলে কি আমি প্রস্তুত ? শুধু একটা লোটা কম্বল সংগ্রহ করাই কি আমার প্রস্তুত হইবার সীমা ? ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিলেও গৃহবাসের উপযোগী আরও ত কত জিনিস রহিয়াছে! উদরান্ন-সংস্থান কিছু টাকা-কড়িও ত আমার আছে! আমি ত একেবারে নিঃস্ব নই। সেগুলারও ত যাহা হউক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে! যাইবার পূর্ব্বে দুই এক জন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গেও ত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন! মমতার বন্ধ বলিয়া গৌরীকে দেখিবার অধিকার না পাই, কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুবনের মা'র সঙ্গে একটিবারের জন্য দেখা হইলেও কি তাহা আমার সন্ন্যাস গ্রহণের পথে অন্তরায় হইবে ?

একদিকে, সহসা একসঙ্গে জাগিয়া-ওঠা এই সকল চিন্তার রাশি; অন্যদিকে, সংসার ত্যাগটা যেন কিছুই নয়, নিত্য-ঘটনশীল ব্যাপারের মধ্যে একটা, এইরূপ ভাবে, নিজের কানে গুরু-মুখ হইতে শুনিয়াও এ অদ্ভুত প্রকৃতি নারীর আমাকে লইয়া রহস্য!

আমি যেন বুদ্ধিহীনের মত হইয়াছি। অথবা আমার মনের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, বুদ্ধি আমার কোনও কালে মস্তিষ্কের একটু ক্ষুদ্র পরমাণু আশ্রয় করিয়া ছিল কি না, ভুলিয়া গিয়াছি।

সেই অবস্থায়, যেখানে ছিলাম, সেখানে সেইরূপ ভাবেই আমি দাঁড়াইয়া। মায়াজী আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ঘরে ঢুকিলেও, আমি তাঁহার কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ অথবা অনুসরণ করিলাম না।

"কি কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আমাকে দেখিয়ে দেবেন আসুন।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু মনের এ অবস্থা লইয়া ঘরে ত প্রবেশ করিতে পারিব না। যে অদ্ভুত ভাব আমি তাঁহার দেখিয়াছি, গুরুদেবের মুখ হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র যে সব শ্রদ্ধার কথা শুনিয়াছি, তাহার পর যদি তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধার লাঘব হয়—তাই কেন—সন্ন্যাস যদি আমার ভাগ্যেই থাকে, মন মুখ পৃথক্ করিলে ত চলিবে না! সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি, সেই দন্তপংক্তির বিকাশপোরা তাড়িতের খেলার মত হাসি, সেই বীণার সুর আলিঙ্গন-করা কণ্ঠ—নির্জ্জন গৃহে, তাঁহাকে মাত্র সম্মুখে রাখিয়া এই গভীর রাত্রিকালে কথোপকথন—এই তপস্যার আবরণে ঘেরা দেবীমূর্ত্তিকে বিকারগ্রস্ত মনের প্রেরণায় যদি ভিন্নভাবে দেখিয়া

ফেলি, নিজের কাছেই লুকান মন লইয়া কেমন করিয়া গুরুর অনুসরণ করিব ?

আমি সেইস্থান হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"গুরুদেব কখন্ ফিরবেন, তার ত স্থিরতা নাই, বাইরের দোর খোলা।"

"তা থাক্, তুমি একবার এসো—একবারটি।"

একবার 'আপনি', একবার 'তুমি।' আমার বুক কাঁপিবার মত হইয়াছে। আমি চলিলাম বটে, কিন্তু পা দুইটাকে অতিকষ্টে টানিয়া।

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি—নাঃ! এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, এ বেটী পাগল,—কাপড়, চাদর, বিছানা, বালিশ, কম্বল ঘরের যেখানে যা ছিল, সব মেঝের একস্থানে জড় করিয়া যেন পাহাড়ের মত করিয়াছেন, আর সেইগুলার পার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া সেই তখনকার মত আপনার মনে হাসিতেছেন।

"কি বল্‌বে বল।"

"ভিতরেই আসুন।"

"আর ভিতরের মায়া কেন—ওইখান থেকেই বল।"

"ওইখান থেকেই বৈরাগ্য নিলেন নাকি ?"

আমি উত্তর দিলাম না।

"এগুলোর কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা আপনি সঙ্গে নেবেন, দেখিয়ে দিন। বাঃ! আমি কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর্‌ব ?"

"অপেক্ষা তোমাকে কর্‌তে কে বল্‌ছে। যা নেবার, আমিই নেবো এখন।"

"তা হ'লে আমি যাই ?"

"কোথায় ?"

"যাব না ? সারা দিন রাত কি আপনার ঘর আগ্‌লে ব'সে থাকব ?"

"সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ?"

"একবার না যাওয়া কি ভাল হয়, আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

এইবারে আমি ফাঁকরে পড়িলাম।

"সেখানে সকালে গেলে হবে না ?"

মায়ীজী চুপ করিয়া রহিলেন।

"রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা না হবারই সম্ভাবনা।"

"তা যা বলেছেন, তার যে বাপ। রাত্রিতে তার বাড়ী গেলে, হয় ত খড়ম নিয়ে মার্‌তে আসবে।"

"কখনো এসেছিল নাকি ?"

"এসেছিল বই কি! বিশেষতঃ আমার গেরুয়ার ওপর সে হাড়ে চটা। বুড়ো বলে, চোখে অত বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, গেরুয়া কেন ? নীলবসন পর। তবে তার কোনও দোষ দেখিনি। সংসার তার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে।"

"এ জেনেও মা, এই রাত্তিরে তুমি সেখানে যেতে চাচ্ছিলে ?"

"কি করি বাবা, রাগী হ'ক আর যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ। মন মত্ত-করী, মাঝে মাঝে সিংহের নখরা-ঘাত না খেলে সে ঠিক থাকে না। তার রাগের কথা-গুলো আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর পিছাইতে গেলে আমাকে মায়ীজীর কাছে হেয় হইতে হয়। আজ না হউক, কাল সব ঘটনা সে জানিবেই। আমি বলিলাম—"বুড়ো আর নেই।"

"নেই!"

"মারা গেছে—আজ দুপুরবেলা।"

"তা, সে কথা আমার কাছে এতক্ষণ গোপন রেখে-ছিলে কেন বাবা ?"

মায়ীজী একেবারে দ্বারের কাছে। ঘরের জিনিস-পত্র সব তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"আমাকে যেতে একটু পথ দিন।"

অবশ্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমাকে অতিক্রম করিয়া এক পদ তিনি না চলিতেই, আমি বলিলাম—"আজ আর যাবেন না।"

"আর আমাকে নিষেধ কর্‌বেন না বাবা!"

"নিষেধই কর্‌ছি। আরও আমার বল্‌বার আছে।"

মায়ীজী মুখ ফিরাইলেন।

"আরও একটা কথা আমি গোপন করেছি—একটা দুর্ঘটনার কথা।"

সমস্ত কথা এইবারে আমি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

মায়ীজী স্থির হইয়া শুনিলেন। শুনিবার পরও তিনি স্থির রহিলেন। এই সময়ে রাণীর কথাটাও উত্থাপন করিলাম। বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর রক্ষার ও সেবার লোক মিলিয়াছে।

"এখন গেলেও সিদ্ধেশ্বরীর দেখা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।"

"যাব না।"

"কথা গোপন ক'রে কি অন্যায় করেছি ?"

"আপনি দোর দিয়ে আসুন।"

"সিদ্ধেশ্বরীর খবরটা আর একবার নিয়ে আসি না কেন ?"

"বেশ।"

* * * *

সদর দ্বার পার হইব, এমন সময় মায়ীজী বলিয়া উঠিলেন—"যদি আপনার গুরুজি এর মধ্যে এসে পড়েন ?"

আমার গতি স্থগিত হইয়া গেল।

খিল্, খিল্, খিল্—পাখীর কলরবে মায়ীজী হাসিয়া উঠিলেন।

"তা হ'লে ত আমার যাওয়া হ'ল না!"

"যাও গো, তিনি আসেন, আমি হাতে পায়ে ধ'রে তাঁকে আট্‌কে রাখব।"

পথে নামিয়া অনেকটা চলিলাম। কিন্তু কই, কবাট বন্ধ করিবার শব্দ এখনও ত শুনিতে পাইলাম না।

৩৫

ঠিক যেন একটা নাটকীয় ঘটনা! এখন এই দূরাতীত কালে, নির্জ্জন গিরি-উপত্যকার নির্জ্জন কুটীর হইতে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি। কিন্তু তখন? একটু একটু করিয়া সেই গলির পথে অগ্রসর হইতেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে বাড়ীর দ্বারবন্ধ-শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁকে নিষেধ করিব? যদি আমার এই আসা-যাওয়া, আর তাঁহার পথের পানে অমায় চাওয়া, কেহ কোথা হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে? ফিরিয়া দেখিব? ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীর-দোলা মনের উপর তাঁহার বিদ্রূপকরা খিল্ খিল্ হাসি যদি কেহ শুনে? যে সে লোক ত তাঁহার গৈরিক-বসন মর্য্যাদার চক্ষে দেখিবে না! না বাপু, আমি চলি, ফিরিয়া কায নাই।

যে গলি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে যাইতে হয়, আমি সেই মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে, জোরে কবাট বন্ধ করিলেও, আর আমার শুনিবার প্রত্যাশা রহিল না।

কিছু পথ এইবারে বেশ জোরেই চলিলাম। আরও খানিকটা পথ—গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। এখন ত মধ্যরাত্রি—আমি কোথায় যাইতেছি—যে বাড়ীতে কেবলমাত্র দুইটি স্ত্রীলোক আছে—দুইটি পরমা সুন্দরী যুবতী? একটির সম্বন্ধে যাহাই মনে করি না কেন, আর একটি আর এক জন মর্য্যাদাবান ভূ-স্বামীর স্ত্রী। আমার নিজের বাড়ীর দিকেই মুখ ফিরাইতে যখন আমার সাহস হইতেছে না, তখন কোন্ সাহসে সে বাড়ীর ভিতরে আমি মাথা গলাইতে চলিয়াছি?

গতি আমার এক মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিল।

এই চলা ফেরায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই অল্পসময়ের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। শুধু বাহিরে ঘটিয়াই তাহা ক্ষান্ত হইল না। অন্তর বাহিরে সমভাবে ঘটিয়া সে যেন আমার জীবনটাকে এক মুহূর্ত্তে ওলট-পালট করিয়া দিল।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার হাট করিয়া খোলা। বিস্ময়-অচলতায় একবারটি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছি, শুনিলাম—উপরে আমার ঘর হইতেই কে গান গাহিতেছে ;—

শুনে যা শুনে যা মরণ, কাছে এসে শুনে যা রে,
কানে কানে বল্‌ব তোরে বলিস্‌নিকো যেন কারে।
সঙ্গোপনের সরস হাওয়ায় বাদল-ঘন রাতে
তোর আসার আশায় ব'সেছিলাম বাদল-মালা-হাতে ;
আঁধার ভেঙ্গে কেমন ক'রে কে এলো যে ঘরে,
তোরে মনে করে' মালা পারয়ে দিলাম তারে।
শোন্ রে মরণ সে এক স্বপন বাহু-পাশের বাঁধা,
অবশ আলস, হিয়ার পরশ মরণ-সুরে সাধা।
যা কিছু সব দেবার আমার আগেই দিছি তারে,
আগেই আমি মাতাল মরা বাচাল আঁখির ঠারে।

অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারের কবাট দুইটি বন্ধ করিয়া, সেইখানেই দাঁড়াইয়া সমস্ত গানখানি শুনিলাম।

এ গীত কখন্ বন্ধ হইল? সত্যই কি বন্ধ হইয়াছে? না না আকাশের সর্ব্ব রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার শ্রবণলালসাকে উন্মত্ত করিবার জন্য ওই যে সে বাতাসের প্রতি পরমাণু ধরিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

উপরে উঠিলে আর কি গুরুর অনুসরণ করিতে পারিব?

৩৬

তবু আমি উঠিয়াছি। কখন, কোন্ ফাঁকে, মনের কোন্ অছিলায়, এতকালের পর সেটা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

"প্রস্তুত থাক,"—মৃত্যুর স্থান কাল তুচ্ছ-করা ডাকের মত গুরুর সেই গম্ভীরস্বরের আহ্বান! উঠিবার সময়ে সেটা কি একটিবারের জন্যও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছি?

কে জানে! এখন ত আমি সন্ন্যাসী, বয়সে অশীতির উপরের বৃদ্ধ, দেহচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে, "প্রস্তুত থাক," আমার সকল ইন্দ্রিয়গুলার ভিতর দিয়া, গুরুবাক্যের প্রতি-ধ্বনির মত, আমার অন্তরাত্মা অবিরাম আমাকে শুনাইতেছে। এখনও কি আমি সে গুহামধ্যে প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলাম না?

"আসুন।"

গানটি তাঁহার সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। দেখি

নিজেকেও লুকাইয়া কত টিপি টিপিই না পা ফেলিয়া, আমি দ্বারটির পার্শ্বে চোরের মতই যেন দাঁড়াইয়া আছি।

কিন্তু সেই নারী? কেমন করিয়া আমাকে সে দেখিতে পাইল? কোনও দিক্ হইতে আমার আসার নিদর্শন আমি ত বুঝিতে পারিলাম না! সমস্ত জগৎটা যেন নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গিয়াছে! কেবল একটি শব্দ—আমার বুকে অবিরাম আঘাত-করা ঘন ঘন নৃত্যশীল একটি শব্দ-তরঙ্গ—ঢুপ্, ঢুপ্, ঢুপ্। এই শব্দ কি এ মায়াবিনীর কানে বাজিয়াছে?

"এসো না গো।"

যেন কি এক আত্মগোপনশীল শক্তির ইঙ্গিত তাঁহার এই আবাহন-কথার ভিতর দিয়া আমাকে তাঁহার ঘরের দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইল।

তাঁহারই ঘর বলিতেছি, এখন আর সে ঘর আমার বলিতে সাহস নাই। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখি, ঘর যেন এতদিন পরে তাহার অধীশ্বরীকে পাইয়াছে। পাইয়া, সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়া তাহাকে আপনার হৃদয়ের ভিতর বসাইয়া তৃপ্তির আঁখি নিমীলনে স্থির হইয়াছে। ঘরসাজানো দ্রব্যগুলা বুঝি তাঁহাকে পাইয়া মত্ত হইয়াছিল! এখন মত্ততার অবসানে সেগুলাও যে যাহার স্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

"ওখানে কেন গো, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়াছি। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলিতে আমি অশক্ত। ইচ্ছা আমার তখন স্বাধীন ছিল কি না, বলিলে পাছে ভুল হয়, আমি বলিতে পারিব না।

আমি নির্ব্বাক্, শুধু তাঁহার কথা শুনিয়াছি। কথা কহি নাই, কহিতে পারি নাই। কহিতে শক্তি ছিল না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিব? যে বলিতেছে, সে কোথায়? আমি উত্তর দিলে সে কি শুনিতে পাইবে?

তবু শুনিয়াছি—তোমরাও শুন। আর এই শোনার ভিতর হইতে আমার সে সময়ের গতিবিধির অবস্থা অনুমান করিয়া লও।

অনেকবার কৈফিয়ৎ দিয়াছি, আর একবার দিই না কেন? এ যে সন্ন্যাসীর কৈফিয়ৎ। তোমরা নিত্য যাহা শুনিয়া আসিতেছ, এ সে শোনা নয়। যাহা দেখিয়া আসিতেছ, এ সে দেখা নয়। আমি ত আর মায়ার অনুরোধে তোমাদের মন-জোগানো কথা কহিতে পারিব না।

"দূরে দাঁড়িয়ে রহিলে কেন? সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে তুমি যেতে পার নি? তা আমি বুঝেছি। না গিয়ে ভালই করেছ। তুমি যেতে ইচ্ছা করেছিলে, তাই আমি নিষেধ করলুম না।

"আমার চোখে জল দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ? হি হি হি,—আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অনেক কাল ধ'রে ত গানটা গেয়ে আস্ছি। কই কখনো এক ফোঁটা জলও ত চোখের কোণে আসেনি।"

"আজ তবে হুহু ক'রে চোখে জল এলো কেন?"

"তুমি কি মনে কর্‌ছ, এ গানের আধ্যাত্মিক কোনও মানে আছে? কিছু না। অথবা থাকতে পারে, আমি জানি না। কে জানে, তাও বল্‌তে পারি না। তুমি মনে কর্‌ছ আমি রচনা করেছি? হি হি হি, তখন আমি লিখতে পড়তেই জানতুম না। কে রচেছে জানি না। সে কি ভুগে লিখেছে, না সখ্ ক'রে লিখেছে? কিন্তু এই গানই আমার এই দশা ক'র্‌লে!"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা! উঃ! তাহার কি অসহ আক্রমণ! ঠিক যেন মরণোন্মুখ, বিকারী রোগীকে ঘেরিয়া নিঃশব্দে তাহার মমতার বস্তুগুলি বসিয়া আছে। বসিয়া, তাহার শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস শব্দ দিয়াও এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু তাহার একটা নিঃশ্বাসের মৃদু আর্ত্তনাদকারী শব্দে আবার সমস্ত ঘরখানা বিষাদে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

"এই গানই আমার এই দশা কর্‌লে! কে বল্‌বে, সে ভুগে রচেছে, না ভাবে রচেছে? না, এ রচনা করা তার সখ্? কিন্তু সে ত জানে না, এ রকম শব্দভেদী বাণে কত হরিণীর বুক ভেদ হয়ে যায়।"

"কাছে এসো—বসো। দয়াময়ীর কাছটিতে কেমন ক'রে বস্‌তে? বাঃ! সে কি তোমার স্ত্রীই ছিল? তার সেই অহেতুক সেবায় কখনও কি তোমার মা'কে মনে পড়ত না?

"হাঁ—বসো—এইখানে। একটিবারের জন্য মনে কর না আমি সে। ভুবনের মা'র মুখে তাহার অদ্ভুত-চরিত্রের কথা শুনে আমার একবার দয়াময়ী হ'তে ইচ্ছা হয়েছিল।

"আর যেমন মনে হওয়া—শুন্‌তে ভয় পাচ্ছ? সে কি গো, তুমি যে ব্রহ্মচারী!" তখন ত বুঝি নাই! এখনই কি বুঝিয়াছি? কিন্তু মিথ্যা কহিব কেন, তাঁহার শেষ কথায় আমার সমস্ত দেহটা—কাঁপিয়াছিল বলিতে পারি না—আমার নিদ্রিত স্মৃতির সহসা জাগরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুর আহ্বানবাণী এই সমস্তার মুহূর্ত্তে যদি আমাকে রক্ষা না করিত!

"অম্বিকাচরণ!"

আমার চৈতন্য ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গ কথা কহিবার শক্তি আসিল।

"গুরুদেব ডাক্‌ছেন।"

"তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক্‌বেন কেন? উপরে আসতে পারেন না?"

"তাঁর আস্‌বার উপায় নেই।"

বিস্মিতবৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি তাঁর আস্‌বার পথ রোধ ক'রে এসেছেন?"

অপ্রতিভের মত আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

"এগুলো নিয়ে যাও বাবা, তোমার অনন্তপথের সঙ্গী।"

আমি মুখ ফিরাইতেই মায়ীজী একত্র করা লোটা-কম্বল কাপড়গুলা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

৩৭

দ্বার খুলিতে না খুলিতেই গুরু বলিয়া উঠিলেন—"বেশ ত তুমি! আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। তোমার প্রস্তুত থাকা মানে কি ঘুমিয়ে পড়া?"

গলির আলোটা আমার বাসার দ্বার হইতে খানিকটা দূরে। আর, সেটা পূর্ব্বে বেশ উজ্জ্বল ছিল না। আলোটাকে পিছন করিয়া গুরুদেব দ্বার হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ ভালরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। না হ'লেও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার পরিব্রাজকের বেশ।

আমি বলিলাম—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"আবার ভিতরে যাবার কি প্রয়োজন?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই যেন গুরু এবার বলিলেন—"তোমার কি যাবার ইচ্ছা নেই?—সঙ্কোচ কেন? যা বল্‌বার স্পষ্ট ক'রে বল। ইচ্ছা না থাকে, বল্‌তে লজ্জা কি! মর্কট-বৈরাগ্যের ত কোনও মূল্য নেই!"

"ইচ্ছা আছে, প্রভু!"

"তবে চ'লে এস। মেয়েলি পুরুষের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন?"

"কম্বল, কমণ্ডলু—এগুলো সব নিয়ে আসি।"

গা হইতে কম্বল খুলিয়া নিজের কমণ্ডলু ও লাঠিগাছটি সব একসঙ্গে আমার গায়ে যেন নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই নাও। আর কি তোমার চল্‌তে বাধা আছে?"

"একটু আছে বই কি বাবা! উনি ত এখনো তোমার মতন সমস্ত মায়া-মমতা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পাষাণ হ'তে পারেন নি।"

পিছন ফিরিয়া মায়ীজীর পানে চাহিতে আমার সাহস হইল না। শুধু তাঁহার কথা শুনিলাম।

আমি উত্তর দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"কি আপদ, মা বাড়ীতে আছেন, আগে বল নি কেন?"

তাঁহার পদতলে মাথা নিক্ষেপ করিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য পড়িয়া রহিলাম।

করুণামাখা-স্বরে গুরু আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন—"সন্ন্যাস নেবার যোগ্যতা তোমার যদি এসে থাকে, তখন কোনও কারণে কারও কাছে তোমার লজ্জিত কি সঙ্কুচিত হ'বার কিছু নেই।—মা, এইবারে আমাদের অনুমতি কর।"

"এগুলো?" বলিয়াই আমার জন্য রক্ষিত কমণ্ডলু প্রভৃতি মায়ীজী গুরুদেবকে দেখাইলেন।

গুরু বলিলেন—"ওগুলোর আর প্রয়োজন কি? এই ত অম্বিকাচরণের সে সব আগেই পাওয়া হ'য়ে গেছে।"

"সে ত গুরুর শিষ্যকে দেওয়া আশীর্ব্বাদের উপহার। শিষ্যেরও ত গুরু-প্রণামী বলিয়া একটা জিনিস আছে।"

"হাতে ক'রে নিয়ে দাও আমাকে অম্বিকানন্দ!"

সম্বোধনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই কি আমার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুদত্ত উপাধি?

নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার বোধ হইল, যেন সমস্ত মমতার বন্ধ আমার মানস-দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! একটি হৃদয়ভার লাঘবকারী নিঃশ্বাসের ভিতরে অতীতের সমস্ত অনুভূতি গলিয়া যাইতেছে! আমার সেই পরিত্যক্ত পল্লীর সংসার—সেই আমার শূন্যঘর-পূরণের তিন তিনবারের ফলহীন প্রচেষ্টা, দগ্ধ সংসারের সেই হীরকোজ্জ্বল উত্তপ্ত ভস্মাবশেষ দয়াময়ী ও তাহার বুকে-ধরা কন্যা—আর এ কাশীধামে আমার বানপ্রস্থকে বিব্রত করা—রাণী, সিদ্ধেশ্বরী, পরমকল্যাণময়ী ভুবনের মা, আর তাহার জগদম্বার স্নেহে বাঁচাইয়া তোলা গৌরী—আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

"সমস্ত মমতার স্থান এইবারে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও সন্ন্যাসী!"

কে বলিল, কি জানি কেন, বুঝিতে না পারিয়া একটা বিপুল চমকে মুখ ফিরাইতেই দেখি, সেই প্রহেলিকাময়ী রাণী ঘুমন্ত গৌরীকে কাঁধের উপর ধরিয়া ভাবাবিষ্টের মত আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পশ্চাতে ভুবনের মা।

"ও গো মা, আর দেখা ভাগ্যে ঘটে কি না ঘটে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'রে নে।"

যোগিনীর কোলে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত গৌরীকে রাখিয়া রাণী ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রথমে গুরুকে, পরে আমাকে প্রণাম করিলেন।

অতি কষ্টে পা দুইটাকে টানিয়া আনিয়া নীরবে ভুবনের মা আমাকে প্রণাম করিল।

"নিশ্চিন্ত হ'লে ত অম্বিকানন্দ? এইবারে চল।" তথাপি একবার ঘুমন্ত গৌরীর দিকে চাহিলাম।

যোগিনী বলিলেন, "দেখ্‌ছ কি ঠাকুর, এ তোমার দয়াময়ীর দান। নমস্কার।"

গুরুর পিছন পিছন দুই চারি পদ চলিতে না চলিতে কবাট বন্ধ করার শব্দ আমার কানে গেল।

আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

কেন? গৃহ আমাকে চির-জীবনের জন্ত বিতাড়িত করিল, না ক্ষুদ্র শিশু আমার নির্ম্মমতায় মুখ ফিরাইল?

৩৮

কাশী হইতে বাহির হইয়া তিন বৎসর। এই তিন বৎসরে গুরুর সঙ্গ ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিলাম। এই তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণের পথে একটি বারের জন্তও কি আমার কাশীর—সংসারের কথা মনে উঠে নাই? ভুবনের মা, সিদ্ধেশ্বরী, যোগিনী, রাণী, সেই বারান্দায় ছুটোছুটি করা শিষ্ট ছেলেটি, আর তার মায়ের কোলে ওঠা মায়ের মমতার প্রবল অংশীদার গৌরী—একজনকেও কি একমুহূর্ত্তের জন্তও চিন্তা করি নাই? স্মরণে আসিতেছে না। আসিলেও কিন্তু ক্ষতি ছিল না। তখনও আমি ব্রহ্মচারী।

চতুর্থ বৎসরে নাসিকে কুম্ভমেলা, সেই খানে গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিলেন। নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলাম। বিরজা-হোম—প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে এষণাত্রয়—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ইন্দ্রিয়াদির সুখাভিলাষ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা—এককথায় সংসারে আবদ্ধ করিবার যা কিছু সমস্ত ওই হোমানলে আহুতি দিলাম। পূর্ণাহুতির মুখে সর্ব্বোচ্চ অনল-শিখায় তড়িদ্দীপ্তির মত গৌরীর মুখের মত একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল। কি তার শান্ত করুণদৃষ্টি! যুগ-যুগান্তর আবেদন পুরিয়া আমাকে কি যেন বলিবার জন্ত চাহিয়া আছে!

ক্ষণেকের জন্ত আমাকে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখ হইতে বিনির্গত গুরু-গম্ভীর স্বরের প্রশ্ন—"দাঁড়াইলে কেন অম্বিকানন্দ?"

"একটা মায়া—"

"ও শিখা-সিংহাসনে মায়ার বসিবার স্থান নাই।"

কথার অর্থ বুঝিয়া লইলাম, গৌরীমুখ দর্শনের বাসনা বাসনা নয়।

* * * *

এইবারে আমি সম্পূর্ণরূপেই আত্মনির্ভর। এখন হইতে আমি যাহাকে খুঁজিব, আমার ভিতর হইতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আত্মনো মোক্ষায় জগদ্ধিতায়—নিজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল গুরুর নিকট হইতে উপদেশবাণী গ্রহণ করিয়া, ভারতের যে কোনও এক মনোমত নিভৃত স্থানে আসন করিতে চলিয়াছি।

চলিবার পথে কাশী পড়িল। ভাবিলাম লুকাইয়া লুকাইয়া একবার বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া চলিয়া আসি।

* * * *

পথ ভুলিয়াই যেন আমার সেই বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুকটা যে কাঁপে নাই, এ কথা নিশ্চয় কেমন করিয়া বলিব? কেন না অনেকক্ষণ মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারি নাই।

বাহির হইতে বোধ হয়, কেহ আমাকে দেখিয়াছে। কেন দাঁড়াইয়া আছি, জানিবার জন্ত একটি বালিকা আসিল। এগারো বারো বৎসরের না হইলে তাহাকেই গৌরী মনে করিতে আমার দ্বিধা হইত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীতে তোমরা কত দিন আছ?"

পশ্চাৎ হইতে, বুঝি তার মা, প্রতিজিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"সুমুখে এস মা।"

আমার সন্ন্যাসীর বেশ, শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ—তাহার সঙ্কোচ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু সে সুমুখে আসিল না। বলিল—"কি বলতে চান বলুন?"

কথাটা কেমন বিরক্তিরই প্রকাশ বলিয়া আমার মনে হইল। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বাড়ীতে ভুবনের মা বলিয়া একটি বৃদ্ধা থাকিতেন" কথা শেষ না করিতেই উত্তর পাইলাম—"কে সে আমরা জানি না।"

"তবে দরজা দাও মা।"

বালিকা আমার মুখের দিকে একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—মায়ের আদেশের অপেক্ষা করিল না।

চলিয়া আসিতে শুনিলাম, উপরের যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘর হইতে পুরুষের কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"কেয়া মেনো?"

"একটি সন্ন্যাসী, বাবা?"

ইহার পরই নারীকণ্ঠে—"হতভাগা মেয়ে, দোর খুলে রাখিস কেন?"

"ওর দোষ কি, দোষ তোমার। আমি যে দরজার

কুলুপ দিয়ে রাখতে বলি। সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে কত চোর এ কাশীতে ঘুরে বেড়ায় তা জানো ?"

বুঝিলাম, ইহারা এ যুগের বাঙ্গালী; যাহারা সন্ন্যাসের আবরণকে সন্দেহ করে। আর বুঝিলাম, মেনোর অধিষ্ঠান ভূমিতে গৌরীর থাকিবার স্থান নাই।

* * * *

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, চারিবৎসর পূর্ব্বের সেই ভীষণ নির্জ্জনতাপূর্ণ গৃহ কলরবে ভরিয়াছে।

একটি যুবককে প্রশ্ন করিলাম—"এ বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া একটি মেয়ে আছে ?"

"না।"

"ওই নামের একটি মেয়ে এ বাড়ীতে ছিল জান ?" সম্মুখের সেই গোয়ালাদের বাড়ী দেখাইয়া সে বলিল—"ওই ওদের জিজ্ঞাসা কর।"

"আপনারা এ বাড়ীতে কতদিনের ভাড়াটে ?"

"ভাড়াটে নয়, এ আমাদের কেনা বাড়ী"—

"কত দিনের কেনা ?"

"অত কথা জানবার তোমার দরকার কি ?" প্রথমটা বেশ একটু রাগের চিহ্ন তার পর ভ্রূর আকুঞ্চনে একটু মৃদুমন্দ রহস্য—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে কিছু চিট আছে না কি ?"

"একটু আছে বৈ কি বাবা, নইলে এত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করব কেন ?"

অপ্রতিভ অথবা সদয় হইয়া যুবক বলিল,—"চার বৎসর আমরা এ বাড়ী কিনেছি। সিদ্ধেশ্বরী নামে কেউ এখানে ছিল কি না জানি না।"

বুঝিলাম পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী এ বাড়ী হইতে তার ভ্রাতৃকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে।

সন্ধানে ক্ষান্ত দিয়া কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

৩৯

ইহার পর দীর্ঘ পোনেরো বৎসর। এমন স্থানে আসন করিয়াছি, যেখানে পূর্ব্বপরিচিতদিগের ভিতরে এক জনের সঙ্গেও দেখার সম্ভাবনা নাই। এক জনকেও দেখি নাই। যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা আমার অধিষ্ঠিত সেই তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া আমাকে দেখিয়াছে, কথা কহিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশই চিরদিনের মতন। যে দুই এক জনের সঙ্গে বারংবারের আলাপ, তাহা উল্লেখে অযোগ্য। এক কথায় যাহাকে প্রকৃত নিঃসঙ্গের অবস্থা বলে, তাহাই অনুভব করিয়াছি; গুরুর সঙ্গেও এ সময়ের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় নাই, যেহেতু তাঁহারই আদেশে আমি নিঃসঙ্গ। মন্ত্রমূলং গুরোর্মূর্ত্তি। মাতৃরই তাঁর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া, গঙ্গাজল দিয়াই গঙ্গার পূজা করিয়াছি। কি আমার অবস্থা হইয়াছে গুরুই জানেন।

সন তেরশো চার সালের জ্যৈষ্ঠ। একদিনের বিকালে সমস্ত বাংলা কাঁপিয়া উঠিল। কত বাড়ী ঘর চূর্ণ হইয়া গেল, কত মানুষ মরিল।

এই বাংলা দেশেই ছিল আমার আসন। সেই আসন টলিয়া উঠিল। সহসা গুরুদর্শনের জন্ম চিত্ত ব্যাকুল হইল। মনে হইল, তাঁর শরীর-রক্ষার দিন আসিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিবার জন্ম হৃষীকেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

যাইবার পথের নিকটেই আমাদের গ্রাম। আমার সেই কত বৎসরের মমতা সাজানো-ডালা হাতে চির আবাহনকারিণী জন্মভূমি। স্বর্গাদপি গরীয়সী যিনি, তাঁহাকে একবার দেখিয়া যাই না কেন ? বারো বৎসর অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শন সন্ন্যাসীর প্রতিও আদেশ আছে। আমি ত ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই।

আমাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন দুই ক্রোশ, ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার ভাল পথ নাই। যাইতে হইলে মাঠ, বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বসন্তের কালে সুগম বটে, কিন্তু দুচার পশলা বৃষ্টি হইলে সে পথে চলিবার উপায় থাকিত না। তখন আষাঢ়, বর্ষার সূচনা হইয়াছে।

পথ দুর্গম হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি পরবর্ত্তী ষ্টেশনের টিকিট লইলাম। সেখান হইতে গ্রাম তিন ক্রোশের কম নয়।

গ্রামের কাছের ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল, তখনই রাত্রি দশটা। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিতে আরও অন্ততঃ পোনেরো মিনিট। বুঝিলাম, একটার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছানো আমার সম্ভব হইবে না।

শুক্লপক্ষের রাত্রি—যতটা মনে হয়, ত্রয়োদশী। আকাশটা পরিষ্কার ছিল না। না আলোক, না অন্ধকার। জ্যোৎস্না যেন নিজেরই বস্ত্রাঞ্চলে নিজের মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে। আর রেলপথের উভয় পার্শ্বের প্রকাণ্ড প্রান্তর লক্ষ লক্ষ ভেকের মুখ দিয়া ঘুম-পাড়ানি গান ধরিয়াছে।

গাড়ী থামিতেই, মুখ বাড়াইয়া সেই পূর্ব্বপরিচিত স্থান দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

দেখিলাম, গাড়ী হইতে অতি অল্পলোকেই অবতরণ করিল। তাহাদের মধ্যে এ কি, এমন মধুর মূর্ত্তি পূর্ব্বযুগের

দেখার সেই তিনটি মুখ স্মরণ করিয়াও—দেখি নাই বলিলে ত ভুল হয় না! মেটে জোছনাকে পরিহাস করিতেই যেন দেখিতে দেখিতে, মুখ তার সুন্দর হইতে আরও সুন্দর হইয়া উঠিল।

তার হাতে ধরা, একটি নয় দশ বছরের ছেলে। পরিধানে তার হিন্দুস্থানীদের মত মালকোঁচা করিয়া পরা একখানি শুভ্র বস্ত্র, গায়ে একটা বোধ হয়, আদ্ধির পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী। মুখ সে সেই সুন্দরীর মুখের দিকে তুলিয়াছিল,—দেখিতে পাইলাম না।

"তোমার বাপের বাড়ী এখান থেকে কতদূর দিদি?"

"রোস্ না রে বোকা, কাউকে জিজ্ঞাসা করি। আমি কি আর কখন এ দেশে এসেছি, তা বলব।"

অমনি পশ্চাৎ হইতে কৃষ্ণবর্ণ একটি পুরুষ, মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠী, দেখিয়া বোধ হইল আমারই মত বৃদ্ধ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবে গা তোমরা?"

মেয়েটি আমাদেরই গ্রামের নাম করিল।

এ দিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—এ কথা বার্ত্তাটা যদি আর একটু পূর্ব্বে হইত, তা হ'লে পরের ষ্টেশনে আমি যাইতাম না। এখন আর আমার নামিবার উপায় নাই।

উত্তরোত্তর তাহাদের কথা অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। তবু শুনিলাম—

"সেখানে কার বাড়ী যাবে?"

উত্তর, কি চৌধুরী? মনে মনে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, আমার কন্যা? কেমন করিয়া হইবে? নামটা বুঝি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই! অথবা হয় ত, এই ত্রিশ বৎসরে আমার নামের আর কেহ আমাদের গ্রামে বাস করিয়াছে।

তবু অত্যন্ত আগ্রহে, তাহাদের আর একটা কথা শুনিবার জন্য গাড়ীর জানালা হইতে মাথা বার করিতে, বৃদ্ধকে যেন চিনিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভৈরব!"

তিন জনেই মাথা তুলিয়া সাগ্রহে যেন আমার পানে চাহিল।

আমি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আমি ও দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

খুব দূর হইতে, বোধ হইল, ভৈরব যেন ছেলেটাকে কাঁধের উপর তুলিয়াছে।

৪০

যা ভয় করিলাম তাই, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌছিয়া, ষ্টেশন ছাড়িয়া পথে পা দিতে না দিতে বৃষ্টি আসিল।

এ পথটা পূর্ব্ব-পথের চেয়ে অনেকটা সুগম হইলেও, সহরের পাকা রাস্তার মত সুগম নয়। তার উপর আমাদের গ্রাম এ পথের ঠিক ধারে ছিল না—সেখান হইতে মাইলখানেক কাঁচা রাস্তা চলিয়া তবে গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। তাহা আবার গাছপালায় এমন ঢাকা যে, পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত্রিতেও অমাবস্যা বুকে করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ছিল, রাত্রিকালেই জন্মভূমি দেখিয়া, পাছে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গ্রামত্যাগ করিব।

ভয়ের জন্য সঙ্কল্প ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দোষের হইলেও, পথে পা দিয়া, প্রথমটা আমাকে ইতস্ততঃ করিতে হইল। বর্ষাকালে আমাদের দেশে বিলক্ষণই সর্পভয় আছে।

কিন্তু যখন মনে হইল, হেঁয়ালির আবির্ভাবের মত সেই মেয়েটা আমাদের গ্রামে যাইবে, তখন আর না চলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সবেমাত্র পা দশেক চলিয়াছি, পিছন হইতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কে যেন আমাকে ডাকিল—"বাবা!"

আমি মুখ ফিরাইলাম।

"কোথায় যাবেন?"

দেখিলাম স্ত্রীলোকই বটে, ষ্টেশনের সিঁড়ি হইতে আমাকে ডাকিতেছে।

বাধ্য পড়িল বুঝিয়া তাহার কাছে আসিলাম। সে ছিল আধা-আঁধারে আমি আধা আলোকে—ভালরূপ বুঝিতে না পারিলেও স্বরে বুঝিলাম সে আধা-বয়সী।

"আমাকে ডাকছ?"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"তুমি কোথায় যাবে মা?"

"আমি যাব না, একটি মেয়ে গেছে?"

"কোথায় গেছে।"

সে-ও আমাদের গ্রামের নাম করিল। "সেখানে কার বাড়ীতে গেছে সে বল্‌তে পার ত?"

"অম্বিকা চৌধুরীর।"

বুঝিতে আর আমার কিছু বাকি রহিল না। হইলামই বা সন্ন্যাসী, বুকটা একটু কাঁপিল বই কি! অম্বিকা চৌধুরির কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতা—একটু জাগিল বই কি!

আমি আর কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "তাঁর বাপের বাড়ী।"

"তোমার সে কে হয়?"

"এমন কেউ হয় না পথের পরিচয়।" এমন সঙ্কুচিতভাবে, দুই চারিটা ঢোক গিলিয়া কথা কয়টা সে বলিল যে,

সন্দিগ্ধনেত্রে তার মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তার মুখ দেখিতে পাই নাই, সে বুঝি দেখিল। মুখ সে অবনত করিল। মনোভাব গোপন করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি সেখানে যেতে ইচ্ছা কর?"

"কতদূর হবে বাবা, এখান থেকে?"

"তিন ক্রোশের কম ত নয়ই, বরং বেশী।"

"তিন ক্রোশ!"

"পথও সুগম নয়—তার উপর বর্ষা।"

ব্যাকুলভাবে সে বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে কি হবে!"

"কি করতে হবে বল, আমিও সেই গ্রামে যাচ্ছি।"

"আমার ছেলেটি বাবা, তার সঙ্গে গেছে।"

"আগের ষ্টেশনে তারা কি নেমে গেছে?"

"আপনি দেখেছেন?"

"পথের পরিচয়—তার সঙ্গে ছেলেকে পাঠানো—এমন অসম্ভব কাজ কেন করলে মা?"

সে কোনও উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না—লজ্জায় কিম্বা দুঃখে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"কাজ ভাল করনি মা, সে পথ আরো দুর্গম।"

সে কপালে হাত দিল।

"আমি সে পথে যেতে সাহস করিনি ব'লে এ পথে চলেছি।"

সে এইবারে বসিয়া পড়িল।

"তাদের সঙ্গে কোন পুরুষকে ত দেখলুম না।"

"কেউ নেই।"

"সে মেয়েটি কি একাই পথে চলাফেরা করে?"

"তাইত দেখলুম।"

"কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা?"

"প্রথম দেখা হরিদ্বারে, তখন তার সঙ্গে লোক ছিল। দ্বিতীয় দেখা এই গাড়ীতেই। সেও কলকেতায় গিয়ে ফিরে আসছিল।"

"তোমার সঙ্গে?"

"আমার মামা ছিলেন, চাকরও ছিল।"

"তিনি?"

"একগাড়ী জিনিস পত্র ব'লে নামতে পারলেন না। মামা বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তার ওপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়েছে। তিনি বরাবর কাশী চলে গেছেন।"

"তা হ'লে ত তুমি বড়ই বিপদে পড়েছো মা!"

"কি হবে বাবা, ছেলেকে না নিয়ে গেলে, বাড়ীতে যে ঢুকতে পারবো না!"

"আমার সঙ্গে যেতে চাও?"

"আপনি নিয়ে যাবেন?" বলিয়াই বারান্দা হইতে নামিয়া সে আমার পাদুটা জড়াইয়া ধরিল।

৪১

পোয়াখানেক পথ আমরা অতিক্রম করিয়াছি, বেশ জোরে বৃষ্টি আসিল। দু'ধারে মাঠ, সারাটা পথের মধ্যে একটা আশ্রয় স্থান নাই, একটা প্রাণীর সমাগম নাই, কেবল আমি ও আমার সেই এখনো পর্য্যন্ত অপরিচিতা পথের সঙ্গিনী। আমার মাথায় ছাতি, সে এই সমস্ত পথটাই বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। পূর্ব্বে বলিবার ততটা প্রয়োজন না হইলেও এখন আমাকে বলিতে হইল—"ছাতিটে তুমি নাও মা।"

"না বাবা, বেশ যাচ্ছি।"

"না হয় আমার ছাতির ভিতর এস।"

"বেশ যাচ্ছি বাবা। আমার ছেলেও ভিজছে। সেই মেয়েটিও ভিজছে।"

সেই বৃষ্টি পতনের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত একটি মর্ম্ম বেদনার সুর।

আমি তার মুখের দিকে চাহিলাম। বর্ষার মেঘ—ঠিক এমনি সময়ে অট্টহাসিতে গর্জ্জিয়া একটা আর একটার উপর চাপিয়া পড়িল। এতক্ষণ সঙ্গিনীর মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, এইবারে দেখিলাম। মেঘ গর্জ্জনের শব্দ নিবৃত্তি হইতেই বলিলাম—"এতক্ষণ চিনিতে পারিনি। তাই ত, তোমার সে শ্রীর যে আর চিহ্নমাত্র নেই সিদ্ধেশ্বরী।"

বিপুল বিস্ময়ে সে আমার মুখের পানে চাহিল। বুঝিলাম প্রাণপণে সে আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"চিনতে পারছ না?"

সে আর কোনও উত্তর না দিয়া, প্রবল বৃষ্টির জল, পথের কাদা- সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমার কাদাভরা পায়ে মাথা লুটাইল। আর সে কি ক্রন্দন! ওঠ মা—ওঠ, পায়ে মাথা দেবার এ স্থান নয়! কে শোনে? অতিকষ্টে পায়ে সবলে জড়ানো তার হাত ছাড়াইলাম। অতিকষ্টে উঠাইলাম।

"ধৈর্য্য ধর, মা, আমি সব বুঝেছি। ছেলেটি—"

ইহারই মধ্যে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, আমি কথা শেষ করিতে না করিতে সে বলিল—"ছ' বৎসর স্বামি-সেবার ভাগ্য পেয়েছি। কাশীতে আমারই সুমুখে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে ওই বালকই তাঁর মুখাগ্নি করবার ভাগ্য পেয়েছে।"

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে সে মেয়েটার পরিচয় তুমি ত জানো সিদ্ধেশ্বরী।"

সে আবার আমার পায়ে পড়িতে গেল। আমি ধরিয়া ফেলিলাম।

"বুঝেছি মা, পরিচয় তার নিতে পর্য্যন্ত তোমার সাহস নেই।"

"বাবা! ও ইচ্ছা করলে, তবু এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমার পরিচয় লোকে জানলে ছেলের হাত ধরে' গাছতলায় দাঁড়ানো ভিন্ন যে আমার গতি থাকবে না। আমার মামার ছেলে পুলে কিছু নেই, যথেষ্ট সম্পত্তি তাঁর, ওই বালকই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

"তোমার কোনও দোষ নেই মা!"

"চোখের ওপর তাকে দেখছি, মা ব'লে বুকে তোলবার জন্ম ব্যাকুল হচ্ছি, হাত বাড়াতে পারছি না।"

"কি রকম সে আছে জানো?"

"আপনি কি তাকে দেখেন নি?"

"এই বিশ বৎসরের ভিতর এক দিনের জন্মও না।"

"তা হ'লে একবার দেখুন।"

"দেখবার কি সে যোগ্য?"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"পাপ-ঔরসে পাপ-গর্ভে অমন দেবীর জন্ম কেমন ক'রে হয়েছিল!"

"জলে ভেসে গেল মা, একটু এগিয়ে চল, যদি পাই একটা আশ্রয় খুঁজে নি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল—"মিছে কইব কেন বাবা, তাকে পরিচয় জানাতে ভয় পাই।"

"তার বিবাহ হয়েছে?"

"কেমন ক'রে হবে?"

এই বিশ বৎসর কোথায় সে ছিল, কেমন করিয়া ছিল, জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী ক্রমশঃ কাতর হইতেছে। ইহার পরেই জানিব। গৌরীর সঙ্গে কি আমার সাক্ষাৎ হইবে না?

তবে একটা কথা জানিবার কৌতূহল হইল। "হাঁ সিদ্ধেশ্বরী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অন্তর্য্যামিনীর মত মেয়েটা বলিয়া উঠিল—"আমি ঠিক্ আছি কি না জানতে চান" বলিয়াই, বালিকা কন্তা যেমন পিতার সম্মুখে, অসঙ্কোচে আপনার ঊর্দ্ধদেহের সমস্ত বসন উন্মুক্ত করিয়া দিল।

"মা! তোমার কপালের দাগ না দেখলে, আমি কিছুতেই তোমাকে সিদ্ধেশ্বরী ব'লে চিনতে পারতুম না।"

"আপনি যে আমার পুনর্জ্জন্ম দান ক'রে এসেছেন বাবা! সেই অভাগিনীর মত আমিও যে অম্বিকা চৌধুরীর কন্তা।"

দেখিলাম, ব্রহ্মচর্য্যের প্রচণ্ড কঠোরতায় পূর্ব্বের সেই অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী এই বিশ বৎসরের মধ্যে আপনাকে কঙ্কালসার বৃদ্ধার মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছে।

সিক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে করিতে, সে বলিয়া উঠিল—

"সে সিদ্ধেশ্বরী কি এখন বেঁচে আছে বাবা?"

কথাটা শুনিয়া সেরূপ অবস্থার ভিতরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—আগেকার সিদ্ধেশ্বরীকে ত দেখি নাই! যাকে দেখেছিলুম, যার মুখ থেকে সে তেজের কথা শুনেছিলুম, 'আমার সে কন্তা এই যে বেঁচে রয়েছে।

৪২

আরও ক্রোশ খানেক পথ চলিয়া একটা গ্রামের কাছে উপস্থিত হইতেই এমন মুষলধারে বৃষ্টি আসিল যে, আমাদের কোনও একটা আশ্রয় না লওয়া ভিন্ন গতি রহিল না। সমস্ত পথ ঘাট জলে ভরিয়া গেল, চারিদিকে যেন নদীর স্রোত চলিয়াছে।

ছেলের ভাবনায় সিদ্ধেশ্বরী পাগলের মত হইল, তবু চাই আশ্রয়। একপদ অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে যেখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার অতি নিকটেই ছিল গ্রামের হাট।

অতি কষ্টে সিদ্ধেশ্বরীকে একরূপ কাঁধে করিয়াই সেইখানেই উপস্থিত হইলাম। একটা দোকানের দাওয়ায় আশ্রয় মিলিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুত্রের চিন্তায় মৃতপ্রায়। তাহাকে আশ্বাস দিতে বলিলাম—"ভগবানকে স্মরণ কর মা, তিনিই তোমার পুত্রকে রক্ষা করবেন।"

অনুমান পাঁচ মিনিট সময় আমরা দাঁড়াইয়াছি, বৃষ্টিও একটু কমিবার মত হইয়াছে, দেখিলাম বিপরীত দিক্ হইতে কে এক জন আলো হাতে আমাদের দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিতেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ, কাঁধে তার সেই বালক—একটা প্রকাণ্ড 'টোকায়' মাথা তার ঢাকা—একখানা চলন্ত ঘরের মত আসিতেছে।

"এই দিকে এস ভাই!"

"কে তুমি গা?"

"এই দিকে এসো।—এসো ভিতরে।"

দাওয়ায় উঠিবার আগে সে লণ্ঠন রাখিল। তার পর টোকা, তার পর বালক।

"চোখ মেলে চাও সিদ্ধেশ্বরী, তোমার ছেলে এসেছে।"

"মণিমোহন?" সিক্ত বস্ত্রেই সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে বুকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইল। "আপনি নেয়েছ, ছেলেকে আর নাইয়ো না। দেখছ না, বৃদ্ধ কি যত্নে তাকে নিয়ে এসেছে?" বলিয়াই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই মেয়েটি?"

"তুমিই কি বাবা আমাকে ভৈরব ব'লে ডাকছিলে?"

বলিয়াই লণ্ঠনটা সে আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তীব্র দৃষ্টি কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"ঠিক কি তোমাকে আমি চিনতে পারছি, দাদাঠাকুর?"

জাতিতে ভৈরব বাগ্‌দী। বাল্যে সে আমাদের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিত। আমাকে সে বড় ভালবাসিত। প্রায়ই সে আমার বয়সী। আমিই বোধ হয় দু এক বছরের বড় ছিলাম। তার সঙ্গে নূতন পরিচয় করিয়া কথা কহিবার আমার অবকাশ ছিল না। আমি একবারেই বলিলাম—"ভৈরব ভাই, আমার সে মেয়েটি?"

"সত্যিই কি সে তোমার মেয়ে, দাদাঠাকুর?"

"এ কথা তোলবার কি প্রয়োজন হয়েছে ভৈরব?"

"প্রয়োজন না হ'লে জিজ্ঞাসা করব কেন?"

"তুমি ত, শুনেছি, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছ!"

"এখনি বা কি দেখ্‌ছ?"

"তাতো দেখছি, তবে মেয়ে পেলে কোথা থেকে?"

"কেন, কেউ কি তার অপমান করেছে?"

ভৈরব উত্তর দিতে না দিতে বালকটা, গ্রামবাসীদের কাছে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে শুনাইয়া দিল। বুঝিলাম, পতিতার গর্ভজাত পতিতা বোধে, এরূপ দুর্দ্দিনেও কেহ তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পরন্তু আমার মর্কট-বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া, গৌরীকে এবং ওই বালককে তাহারা অনেক তীব্র ভাষা শুনাইয়াছে।

"তাকে কোথায় রেখে এলে ভৈরব?"

"মাকে আনবার ঢের চেষ্টা করলুম, কিছুতেই সে এলো না।"

"কোথায় সে রইল?"

"সে তোমার পোড়া ভিটেয়, সেই পোড়া ঘরের ঢিবির উপর ব'সে আছে।"

"এই জলে?"

"এখন আর জল কই দাদাঠাকুর, বৃষ্টি ত থেমে গেল। ওঠাবার ঢের চেষ্টা করলুম, সাপের ভয় দেখালুম—কিছুতেই যখন উঠলো না, তখন বুড়ীকে তার কাছে বসিয়ে এই ছেলেকে নিয়ে চ'লে এসেছি।"

সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"আপনি যান্ বাবা?"

"ভৈরব! এই ছেলেটিকে আর এই তার মাকে ষ্টেশনে দিয়ে আসতে পারবে?"

"ষ্টেশনে দিতেই বেরিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে ভাগ্যে এখানে দেখা হয়ে গেল।"

"আমি আসি সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়াই 'দাওয়া' হইতে এককপ ঝাঁপ দিয়া নীচে আসিলাম।

ভৈরব লণ্ঠনটা সঙ্গে দিতে চাহিল। আর তার সঙ্গে দেখা হইবে কি না, না হইলে কোথায় রাখিব ভাবিয়া লণ্ঠন লইলাম না। কিছুদূর যাইতেই বিবেক আবার আমাকে ফিরাইয়া আনিল।

"ভৈরব! তুমি পরমাত্মীয়ের কাজ করেছ, তবু তোমাকে যে আমি কিছু দিতে চাই।" সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"সে আমি দেব বাবা!"

ভৈরব বলিল—"কেন? তোমাদের কাউকেও কিছু দিতে হবে না—মা দিতে এসেছিল, আমি নিইনি। সে যে তোমার মেয়ে ব'লে আমাকে পরিচয় দিয়েছে দাদা-ঠাকুর!"

"ভাই, তুমি ধন্য।"

"কেবল একবার বল সে তোমার কন্যা। তা হ'লেই বুঝি আমার পরিশ্রম সার্থক।"

"ভৈরব! সীতা জনক রাজার কে ছিল? একবার আলোটা ধ'রে দেখ তার মমতায় সন্ন্যাসীর চোখে কত জল!

"শিগ্‌গির যাও, আমার সীতা মায়ীকে রক্ষা কর।"

৪৩

"গৌরী, গৌরী!"

সম্মুখে অম্বিকা চৌধুরীর সোনার সংসারের দগ্ধাবশেষ। ত্রিশ বৎসর পরে। বাড়ীর সর্ব্বস্থান জঙ্গলে ভরিয়াছে। যেখানে আমার স্ত্রী কন্যা পুড়িয়া মরিয়াছিল, সেইটুকু কেবল মুক্ত আছে। ত্রিশ বৎসরের অবিরাম আক্রমণেও একটি তৃণ পর্য্যন্ত সে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

মেঘ চলিয়া গিয়াছে, ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাসি মিশাইয়া প্রচণ্ড মায়া সেই স্তূপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার পনেরো বৎসরের তপস্যাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আর দণ্ড খানেক থাকিলে আমার বুক বুঝি নিস্পন্দ হইবে! কই, এত স্পন্দন আর কবে জীবনে আমি অনুভব করিয়াছি?

গৌরী—গৌরী! কোথায় তুই গৌরী?

গৌরী আশ্রয়হারা, পরিচয় খুঁজিতে আর কোথায় বুঝি চলিয়া গিয়াছে!

একবার যখন সে বিতাড়িত, তখন নিশ্চয় সে প্রতিবেশীদের কাহারও বাড়ীতে যায় নাই বুঝিয়া, গ্রামপ্রান্তে ভৈরবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে জানিলাম, ভৈরবের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৌরী আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়াছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ আমি। তবু যুবার বল দেহে বাঁধিয়া সেই অভাগিনীর অনুসরণ করিলাম।

যে পথে চলিবার ভয়ে আমি অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, সেই পথে চলিয়াছি। প্রতি পদস্খলনে গৌরীর অবস্থা মনে তুলিয়া নিজের সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছি।

তবু মা, তোকে আমি ধরিতে পারিলাম না! ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, মাত্র মিনিট দশেক আগে একটি মহিলা, সঙ্গে এক বৃদ্ধা, ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

আর কোথায় তাকে খুঁজিব? অবসন্ন দেহে ষ্টেশনের একটা স্থানে শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

আর একদিন পূর্ব্বে যদি হৃষীকেশে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হইত। উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গুরু দেহরক্ষা করিয়াছেন।

গৌরীর চিন্তা আমার তপস্যা পণ্ড করিল। গৌরীর অন্বেষণ আমাকে গুরুদর্শন হইতে বঞ্চিত করিল।

যা হতভাগী, তোর নিরর্থক জীবন, আর তোকে মনের কোণেও আমি আসিতে দিব না।

৪৪

ইহার পর তিন মাস। গুরুর তপস্তার স্থানে বসিয়া উত্যক্ত মনকে আবার শান্ত করিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া আমি ত সংসারের কাছে মরিয়াছি! মরা কি কখন পৃথিবীর কোথায় কি হইল জানিতে আসে?

আশ্বিন মাস। হিমালয়ে শারদীয়া প্রকৃতি। ফুলে ফুলে সমস্ত গিরি উপত্যকা ভরিয়া গিয়াছে। হিম-নদী গলিয়া গলিয়া গৌরিকবরণের উচ্ছ্বাস লইয়া মেদিনীকে শুনাইতে ছুটিয়াছে, পার্ব্বতী কৈলাস হইতে তাঁর পিতৃগৃহে আসিতেছেন।

এই সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ। দূর প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যে যার গৃহে ছুটিয়া আসে।

ভিখারী উমা-মেনকার সংবাদ গানে বহন করিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঢালিয়া যায়। বালক-বালিকারা নানা বর্ণের বসনে সাজিয়া ওই গিরি-প্রকৃতির মাথায় ধরা ফুলের মত ফুটিয়া উঠে।

আমি বাঙ্গালী। এ আনন্দ উপভোগের লোভ সংবরণ বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। চণ্ডী দেবীকে দেখিতে, আসন ছাড়িয়া আমি হরিদ্বারে আসিয়াছি।

আসিবার তৃতীয় দিবসে পাহাড়ের অধিত্যকার প্রান্ত হইতে উত্থিত সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের শোনা গান—"শুনে যা শুনে যা মরণ"—সেই পরিচিত কিন্নরী কণ্ঠ! তপস্বিনীর সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল না, যাইতে পারিলাম না। যাইলে গঙ্গার আরতি দেখা হইবে না।

পরদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া তপস্বিনীর আবাসে উপস্থিত হইয়াছি। সে আবাস একটা গুহা। দূর হইতে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে মানুষের বাসের চিহ্ন যদি না দেখিতে পাইতাম, তাহাকে অতিক্রম করিয়া নিষ্ফল প্রয়াসে আমাকে ফিরিতে হইত।

গুহা-মুখে একখানা গৌরিক-বস্ত্র বাতাসে উড়িতেছিল। গুহামধ্যে—একখানা ছিন্ন কম্বল, একটা কমণ্ডলু, দু চারিখানা পুস্তক - সমস্তই শাস্ত্র-গ্রন্থ। আর কতকগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ।

মানুষের বাসের নিদর্শন আছে, কিন্তু মানুষ নাই। তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গুহাধিকারিণী হয় ত স্নান করিতে গিয়াছে, সত্বরই ফিরিবে। অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? একঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। তখনও যখন কেহ আসিল না, কি করি, গুহামধ্য হইতে টানিয়া ছড়ানো কাগজগুলা বাহির করিলাম। একখানা খুলিতে দেখি, চিঠি।

"আয় গৌরী, আয় বোন্ ফিরিয়া আয়। মা মরে, আমিও মরিতে বসিয়াছি। এতদিন তোর অবস্থা না জানিয়া মনে মনেও তোর উপর যা অত্যাচার করিয়াছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার যা আছে, সব তোকে দিয়া যাইব! দুই লক্ষ টাকা আয়ের মালিক হইলেও কি সমাজে তোর স্থান হইবে না?

তোমার স্নেহে বঞ্চিত তোমার চেয়েও অভাগা
তোমার ভাই ললিতমাধব।

পুঃ—যদিই এই পাপসংসারে পুনঃপ্রবেশে তোমার ইচ্ছা না হয়, বাবা তোমাকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তার কি ব্যবস্থা করিব, জানাইলে বাধিত হইব।"

পত্রখানা হাতে ধরিয়া স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

আর একখানা জড়ানো কাগজ খুলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, পাহাড়ের অন্তরাল হইতে আগত একটি গীতের অস্ফুট আলাপ আমার কানে আসিল।

একটু পরেই—"কে বাবা তুমি ?"

ভাবিয়াছিলাম গৌরীকে দেখিব, দেখিলাম তপস্বিনী।

নিকটে আসিয়াই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই সস্মিতমুখে আমাকে প্রণাম করিলেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ কেহ কাহারও সঙ্গে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। ক্ষণেক নীরব রহিয়া যোগিনী মাই প্রথম কথা কহিলেন—"ভাগ্যবশে যখন আপনাকে দেখতে পেয়েছি, যেটার আশা এ জীবনে আমার ছিল না, তখন এ কন্যার আশ্রমে আপনাকে ভিক্ষা নিতে হবে।"

"আমারও আজ বহুভাগ্য মা !"

অত্যন্ত উল্লাসের সহিত তপস্বিনী বলিলেন—"তা হ'লে একটু বসুন, আমি নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি।"

"আমাকেও একবার নীচে যেতে হবে মা! মায়াদেবীকে একটা অঞ্জলি দিতে হবে।"

"ঠিক্, আজ যে বিজয়া, আমার ত মনে ছিল না! চলুন, আপনার সঙ্গে মা মায়াকে আমিও একটা অঞ্জলি দিয়ে আসি।"

"তুমি ত চির মায়ামুক্ত মা !"

"আর আপনি ?"

"গৌরীর মায়া ত এখনো ভুলতে পারি নি !"

"গৌরীর মায়া কি মায়া, স্বয়ং শঙ্কর যাকে ত্যাগ করতে পারেন না, বাবা ?"

এ হেঁয়ালির কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী কি তার পিত্রালয়ে ফিরে গেছে ?"

কোনও উত্তর না দিয়া আঁচল হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, যোগিনী-মা আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, "নীচে যাবার বিশেষ প্রয়োজন, এই খানাকে ডাকে ফেলে দেওয়া। আপনি একবার পড়ুন।"

পত্র হাতে করিতে হাতটা কেন কাঁপিয়া গেল! হাতটাকে একটু স্থির করিয়া পত্র পড়িলাম।

"পতিতাদের সঙ্গিনী হইবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম, পারিলাম না। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এক বুড়ী সন্ন্যাসিনীর জন্য পারি নাই। জানিতাম, আমাদের মত অভাগিনীর মুক্তিলাভের এই দুইটা মাত্র পথ আছে। অবশ্য স্বধর্মে যদি থাকিতে চাই, অর্থাৎ একটা বিয়ে মাত্র করবার জন্য যদি ধর্মান্তর গ্রহণ না করি। সেই বুড়ী আমাকে এক বুড়া সন্ন্যাসীর পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছে। সে বুড়া আমাকে, মরিবার একটা ভাল উপায় শিখাইয়া দিয়াছে।

"সেই উপায় অবলম্বনে ধীরে ধীরে মরণের পথে চলিয়াছি! যাহাকে বাপ বলিতে পারিলে ধন্য হইতাম, তাহার দেশে গিয়াছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হয়। সেই জ্বর যক্ষ্মায় দাঁড়াইয়াছে।

মাকে মরিতে বল। কেন সে সমস্ত জানিয়া আমাকে অমন স্নেহ দিয়াছিল। তুমি—বিবাহ কর।

যেখানে চিরকুমারীর স্থান নাই, সেখানে সম্পত্তি লইয়া কি করিব ?

মাকে আমার শত সহস্র প্রণাম দিও। ইতি।

তোমার—ভগিনী বলা তোমার অপমান—সম্পর্কশূন্যা

গৌরী।

উত্তরকাশী, আশ্বিন সন ১৩০৪।"

হায় ব্রজমাধব, বালিকাকে সম্পত্তি দিয়াছ, পরিচয় দিতে পার নাই। বুঝিলাম, ললিতমাধব আর কেহ নহে—গৌরীর পূর্ব্বযুগের সেই দুষ্ট শিশু-সহচর। সত্যই ত গৌরী ললিতের কেহ নহে। তার মাতার একটা ভুলে সমাজ হইতে দূরে নিক্ষিপ্তা এক অভাগিনী।

"তা হ'লে গৌরী আর নেই ?"

উপর দিকে হাত তুলিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"এখানে থাকবে না কেন বাবা ? এ যে গৌরীর চিরাধিষ্ঠিত পিত্রালয়। যেখানে না থাকবার সেখানে নেই!" বলিয়া গুহামধ্যে অতি যত্নে রক্ষিত একটি কৌটায় গৌরী-দেহের ভস্মাবশেষ দেখাইল।

দীর্ঘশ্বাস—শত চেষ্টাতেও রোধ করিতে পারিলাম না।

"কাশী হইতে বিদায় লইবার সময় গুরুদেবের সে আদেশটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা !"

"ঠিক বলেছ জ্ঞানময়ী ? মমতার সমস্ত পাশ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও সন্ন্যাসী।"

সমাপ্ত।

কুলভঙ্গ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

কুলভঙ্গ

১

কৃষ্ণধনের স্ত্রী মহামায়া দেবী একবার করিয়া শ্বশুরালয়ে যান, আর একটা করিয়া বিপদ আনিয়া স্বামীর কাছে গচ্ছিত করিয়া দেন। কৃষ্ণধন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। হাকিমি করিতে তাঁহাকে অনেক জেলায় ঘুরিতে হয়। প্রতিবার স্থান-পরিবর্ত্তনের সময় তিনি মহামায়া দেবীকে দেশে রাখিয়া আসেন। তাঁহার যে গ্রামে বাস, সে গ্রামের লোক অতিশয় দরিদ্র। কাজেই গ্রামবাসিগণের বিপদ, এক মহামায়ার কল্যাণে নানামূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণধনের উপার্জ্জিত অর্থে হস্তক্ষেপ করে। মোটা মাহিনা পাইয়াও বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া কৃষ্ণধন মহামায়াকে দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কৃষ্ণধন একবারে দয়াদাক্ষিণ্য-শূন্য ছিলেন না। তবে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যের একটা সীমা ছিল। দারিদ্র্য-প্রতীকারে, বিপন্নের সহায়তায়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি আপনার শক্তির অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া, মহামায়ার মত পরোপকারের জন্য নিজের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতেন না। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে আবার যে কেহ দারিদ্র্যের জ্বালাময় দংশনে জর্জ্জরিত হইবে ও তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচনায় তাহাদের জীবনেতিহাসের মুখবন্ধ রচনা করিবে, এটা তিনি কল্পনায়ও আনিতে সাহস করিতেন না। জীবনযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের সমুদায় দোষ, পূর্ব্বপুরুষের অমিত-ব্যয়িতার উপর নিক্ষেপ করা বাঙ্গালীর একটা প্রধান স্বভাব —এটাও কৃষ্ণধনের বিশেষ বিদিত ছিল। পুত্রের মঙ্গলচিন্তা পিতামাতার কর্ত্তব্য, কিছুমাত্র সঞ্চয় না রাখা বর্ত্তমান কালোচিত সভ্যতার অনমুমোদিত—ইত্যাদি নানা উপদেশ-সূত্রে কৃষ্ণধন মহামায়ার হাত বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। দুই চারি দিনের জন্য কৃতকার্য্যও হইতেন। কিন্তু যেদিন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়া মহামায়া স্বামীর উপদেশটা ভুলিয়া যাইত, সেদিন মহামায়ার ব্যয়-স্রোতে বান ডাকিত। কখন বা অনির্ণয়ণীয় কারণ-পরম্পরায়, আন্তঃ-সলিলিক প্রবাহের ন্যায় মহামায়ার দান, কৃষ্ণধনের উপার্জ্জনটাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিত। মাহিনা আনিয়া ঘরে না রাখিতে রাখিতে কৃষ্ণধন শুনিতেন, তাহার অর্দ্ধেক খরচ হইয়া গিয়াছে। মহামায়ার এই আত্মবিস্মৃতিরোগটা দেশের জলবায়ুর গুণেই কিছু প্রবল হইত। নিরুপায় কৃষ্ণধন মহামায়াকে দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কিন্তু মহামায়াকে পাঠাইবেন কোথায়? পিতামাতার মৃত্যুর পর মহামায়া পিত্রালয়ে যাইতে চাহিত না। যদিও বা কখন যাইত, সে সময় কৃষ্ণধনকে সঙ্গে যাইতে হইত। আর সেখানে যাইলেই, যে কয়দিন থাকিতে হইত, সেই কয়দিনই সময়ে অসময়ে পিতামাতার উদ্দেশ্যে মাহামায়ার করুণ-ক্রন্দনে কর্ণের বধিরতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। কৃত্রিম কোপপ্রকাশে মহামায়াকে নিরস্ত করিতে যাইলে বিপরীত ফল হইত। হৃদয়ের আবেগগুলা বাহির হইবার পথ না পাইয়া, শিরায়, ধমনীতে প্রবৃষ্ট হইয়া একটা না একটা রোগের সৃষ্টি করিত। তাহার জন্য যে অস্থিরতা ও অর্থব্যয়, তা হইতে মহামায়ার মুক্তহস্ততা শতগুণে ভাল। কৃষ্ণধন স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে রখিবেন স্থির করিলেন।

২

সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াও কৃষ্ণধনের মহামায়া-ভীতি দূর হইল না। কৃষ্ণধন যখন মেদিনীপুরে, তখন মহামায়া এক নূতন রকমের বিপদ আনিয়া উপস্থিত করিল। একদিন নিমন্ত্রণোপলক্ষে বাটীর বাহির হইয়া মহামায়া চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র শ্যামসুন্দরের একটি ক'নে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকাটি পথে খেলিতেছিল, আর সেই পথ দিয়া পাল্কী করিয়া মহামায়া নিমন্ত্রণ-বাড়ী যাইতেছিল। বালিকার সৌন্দর্য্যে মহামায়ার নয়ন আকৃষ্ট হইল। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই দেখিয়া, তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পাল্কী হইতে নামিয়া মহামায়া কন্যাটিকে কোলে করিল, তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। পাল্কীর ভিতর শ্যামসুন্দর ছিল, তাহাকে বলিল, "শ্যামসুন্দর তোর হারগাছটা খুকীকে দে না।" শ্যামসুন্দরের

গলায় গার্ডচেন ছিল। সে তৎক্ষণাৎ মাতৃআজ্ঞা পালন করিল। হার খুলিয়া বালিকার গলায় পরাইয়া দিল।

মহামায়া কি করিতে আসিয়াছিল ভুলিয়া গেল। বালিকাকে পাল্কীতে তুলিয়া বাটী ফিরিল। কৃষ্ণধনকে দেখাইয়া বলিল, "এই লও, তোমার বউ আনিয়াছি।"

কৃষ্ণধন বালিকাটিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু মহামায়ার বুদ্ধির অস্তিত্বে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ থাকায়, বালিকাকে শুধু দেখিয়াই পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণধন স্বভাব-কুলীন, তাঁহার পুত্রের বিবাহে নানারূপ বাধাবিপত্তি ছিল, সামাজিক নিয়মানুসারে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ঘরের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের বাধ্য-বাধকতায় যে সে ঘরে কুলীনের পুত্র-কন্যার আদান-প্রদান চলিতে পারে না। কৃষ্ণধন কন্যার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। এইখানেই একটু গোল হইল। মহামায়া কন্যাটিকে সুন্দর দেখিয়াই ধরিয়া আনিয়াছিল। সৌন্দর্য্যই বালিকার পরিচয়। অন্য পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে, এটা মহামায়ার মনেই ছিল না। মহামায়া বালিকার পরিচয় দিতে পারিল না বলিয়া, কিছু অপ্রতিভ হইল। কৃষ্ণধন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিলেন, আর মহামায়াকে আবার নিমন্ত্রণ রাখিতে ও যেখান হইতে কন্যাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে, সেই স্থানেই ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

৩

মহামায়ার হৃদয়ে সরলতা ও দয়ার কিছু আধিক্য ছিল। এমন কি আধিক্যটা গর্হিত হইবার সমস্ত লক্ষণই পাইয়াছিল, শুধু কৃষ্ণধনের সাবধানতায় সেটা বড় একটা অনিষ্ট করিতে-পারিত না। অনিষ্টের প্রকোপটা তাঁহার উপার্জ্জনের উপর দিয়াই চলিয়া যাইত। সেটা কৃষ্ণধনের এক রকম সহিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু এবারে কৃষ্ণধন বিষম ফাঁপরে পড়িলেন।

পুত্র বিবাহ করিয়া বধূরত্নের সহিত কিছু ধনরত্নও শ্বশুরগৃহ হইতে আনিবে, এটা এখনকার শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল পিতারই আন্তরিক ইচ্ছা। তাহার উপর কৃষ্ণধন বড় কুলীন। কৃষ্ণধন স্থির করিয়াছিলেন, মহামায়ার হাতে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন পুত্রকে কোন ধনীর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, তাহাকে দারিদ্র্যের হাত হইতে রক্ষা করিব। কিন্তু সে আশাতেও মহামায়া ছাই দিল। মহামায়া বালিকার কুল-গোত্রের সন্ধান লইয়া আবার স্বামীর কাছে উপরোধ করিল। বালিকার পিতা তাঁহারই আদালতের এক জন সামান্য আমলা। সদ্‌ব্রাহ্মণ, ভাল কুলীন ভঙ্গ! কিন্তু বিবাহ হইলেই শ্যামসুন্দরের কুলভঙ্গ হইবে। এমন বিবাহে কেমন করিয়া কৃষ্ণধন সম্মতি দেন! তিনি মহামায়াকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন। পুত্রের শিশুত্ব, বাল্যবিবাহের বিষময়, কুলভঙ্গের অপকারিতা, নানা তর্কযুক্তি তিনি মহামায়ার কাছে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সমস্তই মহামায়ার চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তখন নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণধন মহামায়ার ইচ্ছায় আর বাধা দিতে চাহিলেন না। সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থার ও পদমর্য্যাদার অসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মচারীর কন্যাকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। বিবাহের কেবল একটা পাকা দেখার অপেক্ষা ছিল। এমন সময় বালিকাটি নিজের বিবাহের প্রতিবন্ধক হইয়া সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিল। একদিন মহামায়া বালিকার মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনিল। বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। আসিয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিল। খেলিতে খেলিতে কেমন করিয়া সে হতভাগা মেয়ে শ্যামসুন্দরকে রোয়াক হইতে ফেলিয়া দিল যে, সেই পতনেই বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় সে মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। লজ্জিতা বালিকার মাতা কন্যা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি বালিকার পিতাও লজ্জায় কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। মহামায়াও আর এই অলক্ষণা কন্যার জন্য কৃষ্ণধনের কাছে একটিও কথা কহিতে পারিল না। মহামায়া ভাবিল, ইহা কুলভঙ্গোদ্যমের কুফলের পূর্ব্বসূচনা; একমাত্র পুত্র শিক্ষিত কৃষ্ণধনও এই আকস্মিক ঘটনায় একটু অশুভ ফলাশঙ্কী হইয়া পড়িলেন। ঘটনাটা আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে তাঁহার হৃদয়বলে কুলাইল না। তবে তিনি মহামায়াকে এই সময় দুটা মিষ্ট-তিরস্কার করিবার অবকাশ পাইলেন। বলিলেন,—"সৎকার্য্যই কর, আর অসৎকার্য্যই কর, গুরুজনের অনুমতি লইতে হয়। হিন্দুর ঘরের স্ত্রী, স্বামীকে যদি গুরু বলিয়া জান, তবে আর স্বেচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করিও না।"

মহামায়া বলিল,—"এবার হইতে তোমার অনুমতি না লইয়া আর কোনও কার্য্য করিব না।"

কৃষ্ণধনের বেশী দিন মেদিনীপুরে থাকা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লজ্জিত ব্রাহ্মণ আর কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। আদালতে স্বাক্ষরাদির প্রয়োজন হইলে অন্য লোক দিয়া পাঠাইয়া দিত। ব্রাহ্মণের লজ্জায় কৃষ্ণধন বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিবার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও যখন তাহাকে কাছে আনিতে পারিলেন না, তখন মেদিনীপুর তাঁহার কণ্টকময় বলিয়া বোধ হইল। শেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া যে মনোভঙ্গের হেতু

হইয়াছিলেন, তাহার পূরণ স্বরূপ তাহাকে উচ্চপদে উন্নীত করাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আর মনে মনে স্থির করিলেন, সকল নষ্টের মূল মহামায়াকে আর কখনও বাটীর বাহির হইতে দিব না।

৪

ইহার পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্যামসুন্দর এম, এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণধনও বহুকালের পর স্ত্রী ও পুত্র লইয়া ছুটী উপলক্ষে দেশে আসিয়াছেন। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া অবধি কৃষ্ণধন আর কোথাও মহামায়াকে যাইতে দিতেন না। বাটীর বাহির হইলেই স্বামীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন বলিয়া মহামায়াও আর কোথাও যাইতে চাহিত না। এই আট বৎসরে কৃষ্ণধন কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; মহামায়ার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছেন। এই কাগজও মাতামহ হইতে প্রাপ্ত, শ্যামসুন্দরের নিজের কিছু ভূসম্পত্তি, দুয়ের আয় এবং পুত্রের উপার্জ্জনের উপযোগিতা—এই সমস্ত কারণে তাঁহার অবর্ত্তমানে মহামায়ার কোন ক্লেশ থাকিবে না ভাবিয়া, কৃষ্ণধন ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার এতটা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে তাঁহাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। সে কষ্টের কথা স্মরণ হইলে জীবনের কাব্যমাধুর্য্যভরা বাল্যস্মৃতিও তাঁহার মর্ম্মপীড়া আনিয়া উপস্থিত করিত। তাঁহার প্রিয়জনের মধ্যে আর কেহ যে সেই অবস্থায় পড়িবে, এটা তাঁহার মনে আসিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠিত। তাই তিনি মহামায়ার মুক্তহস্ততায় বড় তুষ্ট ছিলেন না। শুধু স্ত্রী বলিয়া নয়, আর এক বিশেষ কারণে তাঁহাকে মহামায়ার ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল।

অনাথ আশ্রয়হীন বালক কৃষ্ণধন, মহামায়ার পিতার দয়ায় সংসারে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কাছ হইতেই মহামায়া-রূপ স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া তাহারই ভাগ্যে সমাজে উচ্চস্থান ও চাকরীতে উচ্চ পদ পাইয়াছেন। এই সব ভাবিয়া কৃষ্ণধন মহামায়ার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। মহামায়ার পিতা অনেক উপার্জন করিয়াও বিশেষ রকম কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মহামায়াও পিতার গোত্র ধরিয়াছে দেখিয়া তাঁহার রক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কৃষ্ণধন নিজের হাতে খরচ-পত্রের হিসাব রাখিয়াছিলেন। এখন একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া আটবৎসর পরে, কৃষ্ণধন মহামায়াকে স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান করিলেন। শ্যামসুন্দরের বড় বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। দুই দিন বাদেই পুত্র পুত্রবধূ লইয়া তাহাকে সংসার রাজত্বের রাণী হইতে হইবে, পুত্রের জন্য তাহাকে আবার অনেক পরিবারের সংস্পর্শে আসিতে হইবে বুঝিয়া কৃষ্ণধন মহামায়াকে যথেচ্ছা কাজ করিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ মহামায়ার হস্তে দিয়া এবং উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ মাসে মাসে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আপনি কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়াছে বলিয়া গ্রাম-সম্পর্কীয়া ঠান্‌দিদি, মাসী, পিসী, ননদিনীর দল মহামায়াকে চারিদিক্‌ হইতে দেখিতে আসিল। কেহ মহামায়ার শরীরে শত চেষ্টা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না,—"আহা! তোর শরীরে আর কিছুই নাই,"—বলিয়া প্রায় সমস্ত চোখটা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া সেই অঙ্গহীনার মুখের ভাবটা একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইল। দেখিয়া লইল—মহামায়ার ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না। কেহ "তোর পানে আর চাওয়া যায় না" বলিয়া, দৃষ্টির সমস্ত ভার মহামায়ার মুখের উপর চাপাইয়া রাখিল। কেহ মহামায়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া, ক্ষীণ হইয়া, "আর কাহারও সহিত ভাব রাখিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধা, সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, কেহ কৃষ্ণধনের শরীর-রক্ষায় বড় অমনোযোগ দেখিয়া, তাহার নিদ্রাহীনতার কথা মহামায়াকে শুনাইল। আর আফিসের পরিশ্রমটা দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে কত আক্ষেপ করিল। আর ভাগ্যহীন দগ্ধমুখ সাহেবই যে শান্ত নিরীহ কৃষ্ণধনের এই চাকরী-রূপ দুর্গতির কারণ, তাই তাহাকে অজস্র গালি দিল। কেহ বা শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াই তাহার প্রতি মায়ের যত্নহীনতার সমস্ত চিহ্নগুলাই দেখিতে পাইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কেশ রুক্ষ, গায়ে ধুলা—মহামায়ার মায়ার নিদর্শন বালকের অঙ্গের কোন স্থানে দেখিতে পাইল না। কাজেই মমতাহীনা মহামায়া তাহার কাছে দুইটা তিরস্কার খাইল। গ্রামাকুল-কামিনীগণের এইরূপ অযাচিত আদরের ভিতরে পড়িলে, অতি বড় বুদ্ধিমতীও আত্মহারা হইয়া যায়, কিন্তু মহামায়ার এবারে বড় তাহা হইল না। তাহার দুই চারিদিনের ব্যবহারেই প্রতিবাসিনীগণ বুঝিলেন, এই বারো বৎসরের ভিতরে মাগী কেমন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিল,—"সাহেব-বিবির সঙ্গে থাকিয়া ও তাহাদের ধরণ দেখিয়া মহামায়ার ভিতর হইতে হিন্দুয়ানি লোপ পাইয়াছে। মেজাজ সাহেবী হইয়াছে। লোক দেখান একটা নমস্কার করিতে হয়, তাই করিল, প্রাণে আর ভক্তি নাই। নহিলে তার হাত হইতে আর জল গলে না কেন?"

আসল কথা বহুদিন হইতে স্বাধীনতা ভোগের অভ্যাস না থাকায় কর্ত্তৃত্বলাভটায় মহামায়ার কিছু বাধবাধ ঠেকিতে

লাগিল। তাহার উপর মহামায়া স্থির করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ করিবে না। কাজেই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তাহাকে কথায় কথায় স্বামীর কাছে ছুটিতে হইত। ক্রয়ের কথায়, দানের কথায়, লৌকিকতার কথায়, গৃহধর্ম্মের প্রতি কথায় মহামায়া স্বামীর কাছে অনুমতি চাহিতে লাগিল। তাহার অনুমতিগ্রহণের জ্বালায় অস্থির হইয়া, কৃষ্ণধন মহামায়ার হাত হইতে কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার ভাণ দেখাইলেন। বলিলেন, "তোমার যাহা বিবেচনা হয় করিবে, আমার অনুমতি লইবার অপেক্ষা করিও না।"

মহামায়া এই সময়ে স্বামীকে পথে পাইল, বলিল,— "হিন্দুর ঘরের স্ত্রী—স্বামীর আদেশ পালনই যদি তার ধর্ম্ম, তাহা হইলে মহামায়ার স্বামী কোন্ আদেশ পালন করিবে?—সেই তখনকার না এখনকার?"

মহামায়ার কথা শুনিয়া কৃষ্ণধনের সেই আট বৎসরের আগের কথা মনে পড়িল। কৃষ্ণধন বলিলেন,—"স্বামী যখন যেমন আদেশ করিবে, তাহাই পালন কর, ধর্ম্মে পতিত হইবে না। আগে তোমাকে অনুমতি লইতে আদেশ করিয়াছিলাম, এই বারো বৎসর তুমি পালন করিয়া আসিতেছ, এখন আবার অনুমতি লইতে নিষেধ করিতেছি, তুমি অসঙ্কোচে নিষেধ মানিয়া চলিয়া যাও।"

"যদি আবার তোমাকে বিপদে ফেলি?"

"কেন আমাকে কি বিপদে ফেলিতেই শিখিয়াছ! তুমি যা ইচ্ছা কর। তার জন্য যদি বিপদেই পড়ি, তোমাকে তিরস্কার খাইতে হইবে না। আমার বিশ্বাস, সাধ্বীগতপ্রাণা মহামায়া যদি স্বামীর আদেশে বিপদও ডাকিয়া আনে, তাহাতে কৃষ্ণধনের শুভ ভিন্ন অশুভ হইবে না।"

মহামায়া। দেখ এখনও বুঝিয়া বল।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াই বলিয়াছি।

স্বামীর এই শেষ কথাটায় বড় সাহস হইল। সে আর কোনও উত্তর না দিয়া স্বামীকে একটি গড় করিল।

কৃষ্ণধন ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার যখন কেম্পানীর কাগজ হইয়াছে, তখন নগদ টাকা সব উড়াইয়া দিলেও খাইবার পরিবার কষ্ট হইবে না। মহামায়াও ভাবিয়াছিল, স্বামী যত কেন বলুন না, যখনই একটু গোলমাল ঠেকিবে, তখনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার মনে যা' খুসী তাই করিয়া মহামায়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছে।

নব্যপাঠকারিণীর চক্ষে এ স্থানটায় কেমন কেমন ঠেকিতে পারে। কিন্তু কি করিব? এক একটি স্ত্রীলোকের কেমন একটা স্বভাব যে, সুবিধা পাইলেই কর্ত্তাটিকে একটি আধটি প্রণাম করিয়া বসে, নানারকম পড়িয়া, ভালবাসার সাম্যভাব বিশেষ করিয়া বুঝিয়াও তাহাদের জ্ঞান জন্মে না। পাঁচ জনের দেখিয়া শুনিয়াও তাহারা শিখিতে পারে না। স্বামী বেচারীর তাহাতে বড় বিশেষ লাভ নাই, বরং সমানে সমান হইলে, প্রাণ-প্রতিমার আদর-আবদারে দুই একটা তর্ক-বিতর্ক চলিতে পারে। কিন্তু ওই একটি আধটি প্রণামের নেশায় পড়িয়া তাহাকে সময়ে সময়ে বিষম দায়ে ঠেকিতে হয়। স্বামীর সহিত সমান পদবীরূঢ়া কোন পাঠিকা ঠাকুরাণী, আজও পর্য্যন্ত যদি জীবনের সঙ্গীটির নিকট হইতে সমস্ত প্রাপ্যগণ্ডা আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভুকে এই প্রণাম ঔষধটা একবার সেবন করাইয়া দেখিবেন, বাকী শুদ্ধ আদায় হইয়া যাইবে! এমন কি, স্বামীটিই যোল আনা রকমে আয়ত্তাধীনে আসিবে। তবে সেটি করিতে হইলে, আগে আত্মাভিমানটি ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু হায়! এখন এত অগ্রসর হইয়া, স্বামীর সঙ্গে আইনসঙ্গত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, এখন এ স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে আবার কি তাহার কাছে মাথা হেঁট করিতে পারা যায়!

মহামায়ার অভিমান রাখিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কৃষ্ণধন কোন্ দেশে বাস করিত—সে হট্টমালার দেশে গাই-বাছুরে মাটী চষিত, কি লোকে হীরার ছাইয়ে দাঁত ঘসিত, কি প্রতি গৃহস্থের ঘরে রুইমাছ ও পটোল ভারে ভারে আসিত, মহামায়া কিছুই জানিতেন না। এমন অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, মহামায়ার পিতৃগৃহ হইতেই কৃষ্ণধন একরূপ মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতামাতার আদরের অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। হট্টমালার দেশ এখন তাহারই পিত্রালয়ের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থানেই কৃষ্ণধনকে রাজা করিয়া দিল। এখন কৃষ্ণধনের উপর এক আধ দিন আদেশ করিবার, কিম্বা একটু আধটু অভিমান দেখাইবারও কি অধিকার মহামায়ার ছিল না?

অধিকার সম্পূর্ণই ছিল। আর সে অধিকার দেখাইলে, কৃষ্ণধন সহিতে পারিতেন কি না কে বলিতে পারে? দারিদ্র্যনিপীড়িত, পরান্নভোজী, পরাবসথশায়ীর আবার গর্ব্ব করিবার আছে কি? ঘর-জামাইয়ের সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও কৃষ্ণধন মহামায়ার পিতার কাছে এক দিবসের জন্যও অনাদর প্রাপ্ত হয়েন নাই; সেই সে কালের ব্রাহ্মণ, কুলীন-জামাতার মর্য্যাদা রাখিয়াই শুধু নিশ্চন্ত হয়েন নাই; মহামায়াকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন যে, আজও পর্য্যন্ত মহামায়া স্বামীর উপর অভিমান করিতে শিখিল না। বালিকা মহামায়া বুঝিতে পারিত না যে, তাহার পৈতৃক

ধনে তাহার কি অধিকার ছিল। দুই এক পয়সা খরচ করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই কৃষ্ণধনের মুখ চাহিয়াই থাকিতে হইত। বাপের কাছে চাহিলে পাইত না; কিন্তু বুঝিতে পারিত না, কৃষ্ণধন কোথা হইতে পয়সা পাইত। বালিকা শ্বশুরালয়ে আসিবার জন্য কৃষ্ণধনকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করিত, বিশ্বাস ছিল, সেখানে যাইলেই সে মনের মত খরচ করিতে পাইবে। কিন্তু জানিত না যে, সে হট্টমালার দেশে, স্বামীর এমন একটি তরুতল নাই যে, ভ্রমণ ব্যপদেশে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার তলে দাঁড়াইয়া সে রৌদ্রের আক্রমণ হইতে মাথাটাকে রক্ষা করিতে পারে।

মহামায়ার পিতা কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃষ্ণধনের গ্রামে একটি ছোট অথচ সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দৌহিত্র শ্যামসুন্দরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে গ্রামের সমস্ত লোককে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া কৃষ্ণধনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহামায়া সেই প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিল। আসিয়া দিন কয়েক মনের মত খরচ করিয়া বাঁচিল। আর বুঝিল, এমন শ্বশুরঘর থাকিতে এতকাল বাপের বাড়ী পড়িয়াছিলাম কেন ?

মহামায়া বাপের বাড়ী আর বড় একটা যাইতে চাহিত না। তাহাতে মহামায়ার পিতা-মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। কালে যখন মহামায়া স্বামীর অবস্থার কথা সমস্তই জানিতে পারিল, তখন তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে পতিভক্তি গাঁথিয়া গিয়াছে।

কাজেই নব্যপাঠিকা ঠাকুরাণীদের কাছে হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া মহামায়া স্বামীকে একটি নমস্কার করিয়া বসিল। তার পর বলিলেন, "যেমন তুমি আমাকে আমার অনিচ্ছায় স্বাধীনতা দিলে, আমিও তেমনি জব্দ করিয়া তোমাকে প্রতিশোধ দিব। তোমার সব টাকা খরচ করিব, তবে ছাড়িব।"

কৃষ্ণধন বলিলেন—"তাই যদি তোমার একান্তই অভিরুচি, ভাল তাই করিও। আমি আর উহাতে বড় ভীত নই। ফতুর হয়, তোমার পুত্রই হইবে।"

মহামায়া হাসিয়া উত্তর করিল—"না, এবারে আর তা করিব না। তুমি যেমন কৃপণ, আমি তার শতগুণ কৃপণতা দেখাইব। তোমাকে ধানে-চালে খাওয়াইব। এখন হইতেই গ্রামে আমার কৃপণ নাম রাষ্ট হইয়াছে।"

কৃষ্ণধনের প্রাণটা নমস্কারে খুলিয়া গিয়াছিল। তাই মহামায়ার শেষ কথায় তিনি একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "পুত্রের মঙ্গলার্থে, তোমার মঙ্গলার্থে ব্যয়বিষয়ে একটু সংযত হইতে বলিয়াছিলাম। ব্যয়কুণ্ঠ হইতে ত বলি নাই!"

মহা। ভাল, অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিব। শ্বশুরের ঘর, একেবারে লোকাভাবে নিরানন্দময় দেখাইবে, সেটা আমার কেমন ভাল লাগিতেছে না।

কৃষ্ণ। বেশ, নিরানন্দময় বোধ কর—বল এখনি আমি নিজে যাইয়া পাড়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া আসি।

মহা। তা হ'লে দেখিতেছি, তুমি চোরের হাতে সিন্দুকের চাবী সমর্পণ করিলে।

কৃষ্ণ। শুধু তাই কেন মহামায়া, এতকাল তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছি, আজ হইতে সেই কর্ত্তৃত্বভার তোমার উপরে দিলাম! আজ হইতে আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম।

৫

তথাপি মহামায়া মাসখানেক চূড়ান্ত গৃহিণীপণা দেখাইল। তাহার হাত হইতে যথার্থই জল গলিল না। প্রতিবেশনীগণ, যাহারা মহামায়াকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহার মুখের দুটি কথা শুনিতে সকল কাজ ফেলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিত, তাহারা এখন মহামায়ার মুখ দেখিয়া অন্নাভাবের আশঙ্কা করিতে লাগিল। কথায় কর্কশতা অনুভব করিল। ক্রমে তাহারা মহামায়ার কাছে আসা বন্ধ করিল। তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইল না, তখন একত্র বসিয়া মহামায়ার স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা আরম্ভ করিল।

মহামায়ার বর্ত্তমান কৃপণতায় সকলেই প্রথমে দুঃখ করিল। দুঃখ ক্রমে রাগে পরিণত হইতে লাগিল। রাগ হইতে গালি আসিল। সকলে একবাক্যে বর্ত্তমান মহামায়ার মুখে অগ্নিদেবের আবাহন করিল। আর তাহারা যে মহামায়ার কাছে যাইয়া তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিত, এটাও পরস্পরকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিল।

যাদুর মা বলিল,—"আমার পায়ের ধুলা মাথায় লইতে, কত রাজনন্দিনী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করে।"

হারুর পিসী একটা কোন দেশের রাজকন্যাকে যাদুর মায়ের কুটীরের কানাচে ঘুরিতে দেখিয়াছে। যাদুর মা সে দিন চাঁদাই চাটুজ্যের শ্রাদ্ধে রাঁধিতে গিয়াছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইল না বলিয়া রাজকন্যাটা ম্লান মুখে ফিরিতেছিল। পথে পোড়া পিসীর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে দেখা হইল বলিয়া, তাঁহারই পায়ের ধুলা লইয়া খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু কি জন্য যে ভাগ্যবতী রাজনন্দিনী সে গ্রামে মাথা পবিত্র করিতে আসিয়াছিল, সেটা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হারুর পিসীর অবসর হয় নাই। কোথায়

ঘর, তাহাও জানিবার উপায় নাই। নিঃস্বার্থ প্রেমপরায়ণা শুধু রাজকুমারীর উপকার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

তবে মহামায়ার এটা সর্ব্বতোভাবে জানা কর্ত্তব্য ছিল। সেই সব রাজকুমারীর আদর-যত্ন উপেক্ষা করিয়া তাহারা যে মহামায়ার বাটীতে যাইত এবং উদরটাকে রোরুদ্যমানা রাখিয়া রিক্ত-হস্তে নিজ নিজ পর্ণকুটীরে ফিরিয়া নিস্পৃহতার পরাকাষ্ঠা দেখাইত, এটাও রমণীকুলমধ্যে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

মহামায়া এখনই এমন হইয়াছে। আগেই বা সে কি ছিল? তাহার চেয়ে দানে, এই রমণীকুলমধ্যে সকলেরই, এমন কি অনেক নীচ জাতীয়া রমণীর মধ্যেও অধিক মুক্ত-হস্ততা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মহামায়াকে ছাড়িয়া তাহারা অতীত মহামায়াকে ধরিল এবং সকলে একবাক্যে সেই অতীতের করুণা মাধুর্য্যময়ীরও মুণ্ডপাত করিল।

সর্ব্বশেষে তাহার রূপের, গুণের, স্বভাবের—এমন কি, বংশের অসংখ্য অনংখ্য দোষ বাহির করিয়া এই নিঃস্বার্থ প্রেমিকাকুল সভা ভঙ্গ করিল। সেই মহিলাগণমধ্যে দুই এক জনের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ছিল। এক মহামায়ার কল্যাণে, তাহাদের সেই পূর্ব্ব বিবাদ মিটিয়া গেল।

৬

এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কৃষ্ণধন কলিকাতায় আসিলেন। শ্যামসুন্দরও পিতার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। মহামায়া বাড়ীতে একেলা পড়িল। বহুদিন পরে মহামায়া কৃপণতার ফল বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল—স্বামী-পুত্র গৃহে না থাকিলে, তার গৃহে ও অরণ্যে পার্থক্য থাকে না।

পূর্ব্বে তাহার গৃহ সর্ব্বদাই জন-কলকলে পূর্ণ থাকিত। মহামায়ার গৃহে নিত্য ভোজের আয়োজন হইত। তাহার অন্ন, প্রতি আগন্তুককে যথেচ্ছ বিতরণ করিয়া প্রতি-বেশিনীগণ কেহ সাবিত্রী, কেহ দ্রৌপদী, কেহ বা লক্ষ্মী,—বিবিধ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া, নারী-জন্মের সৌভাগ্যে আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করিত। কৃষ্ণধন কোথাও যাইলে, তাহাদের সঙ্গে আলাপে আমোদে, মহামায়া স্বামীর অদর্শন বড় একটা অনুভব করিতে পারিতেন না। আজি কালি আর তাহারা বড় কেহই আসে না। কাজেই একেলা থাকাটা মহামায়ার বড় কষ্টকর হইয়া পড়িল। মহামায়া তখন বুঝিল,—"একেবারে হাত বন্ধ করিয়া বড় অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি।"

মহামায়া স্থির করিল, স্বামী গৃহে আসিলেই, তিনি স্বামী ও পুত্রের যে কোন কল্যাণ কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া একবার পাড়ায় নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইবেন এবং প্রতি-বেশিনীগণের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃ সংস্থাপিত করিবেন।

এই ভাবিয়া, মহামায়া কোনরূপে কয়টা দিন কাটাইবার জন্য হৃদয় বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয় বাঁধা পড়িল না। মহামায়া মনে মনে ভাবিল, মানুষই লক্ষ্মী। আগে সেই মানুষকে গৃহে স্থান দিতাম, আদর যত্ন দেখাইতাম, নিজের সুখের জন্য। তাহাদের কি? তাহারা যে আপ্যায়িত হইত, তাহার আদর গ্রহণ করিত, এটা তাহাদের অনুগ্রহ, আর মহামায়ার সৌভাগ্য। মহামায়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। সে পাল্কী করিয়া ননদীর গৃহে চলিয়া গেল।

ননদীর নাম সারদাসুন্দরী, মহামায়ার বাল্য-সখী। তাহার সম্বন্ধে এই স্থানে দুই একটি কথা বলিব।

কৃষ্ণধনের আপনার বলিতে কেহই ছিল না। তবে কোথা হইতে মহামায়ার ননদী আসিল?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণধনের পৈতৃক গ্রামের এই বাটী মহামায়ার পিতা ভবতারণ চক্রবর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা গ্রামখানিকে কতুগ্রাম বলিব।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জোগাঁয়ে কৃষ্ণধনের কোন সম্পর্কের কেহ আছে কি না জানিতে চাহিয়াছিলেন। গৃহ ত নির্ম্মাণ করিবেন, কেন না, কন্যার শ্বশুর গৃহ-বাসিনী হইবার বড় সাধ। স্বামীর গৃহ নাই শুনিলে, আদরের কন্যা মর্ম্মাহত হইবে। কাজেই কৃষ্ণধনের গ্রামে একটি ঘর বাঁধিতে হইবে। কিন্তু সেখানে কাহার কাছে কন্যাকে পাঠাইবেন?—কে বালিকা কন্যার অভিভাবকত্ব করিবে? তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান করেন। কৃষ্ণধন বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন। শ্বশুরকে তিনি এ বিষয়ে নিজে কোনও সন্ধান দিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মনে ছিল, বাল্যে মাতৃ-বিয়োগের পরে একটি রমণী তাহাকে কিছুকাল স্তন্য-দান করাইয়াছিল। কিন্তু সে-ও অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, আছে কি না আছে, কৃষ্ণধন তাহার সন্ধান বলিতে পারিলেন না।

ভবতারণ নিজেই এক জন আত্মীয়ের সন্ধানে ফিরিলেন, কিন্তু গ্রামস্থ কেহই আত্মীয় হইতে চাহিল না। কেহ গর্ব্ববশে, কেহ অভিমানে, কেহ বা আশঙ্কায় ঘরজামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিল না।

বহুদিন সন্ধানের পর মহামায়ার পিতা কৃষ্ণধন কথিত আত্মীয়ার সন্ধান পান। তখন তাহার বড়ই দুরবস্থা। স্বামি-পুত্রবিয়োগিনী দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, একটিমাত্র কন্যা লইয়া গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটি গ্রামে পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। ভবতারণ অনেক সন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন।

তৎপূর্ব্বে, সেদিনকার আহারের কথা লইয়া, কন্যা ও মাতায় কলহ চলিতেছিল কন্যা সারদাসুন্দরী তখন দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা। দরিদ্রতার শিক্ষায় সেই অল্প বয়সেই তাহার বিজ্ঞের জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাহার আহারের জন্য মাকে প্রতিবেশিনীগণের কাছে প্রায়ই হাত পাতিতে হইত। কন্যার সেটা ভাল লাগিত না। সে এই অন্যায় কন্যাবৎসলতার জন্য মাকে প্রায়ই তিরস্কার করিত এবং নিজে চরকা কাটিয়া পৈতা বিক্রয় করিয়া, পরের গৃহের ধান ভানিয়া, মা ও নিজের অন্ন-সংস্থানের আভাব দিত। মা কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে ও আশঙ্কায় এই যৌবনোন্মুখী অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যাকে বাটীর বাহির হইতে দিত না নিজে কাজ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত, কখন বা অপমান সহিত, তথাপি কন্যার ইচ্ছা পূর্ণ করিত না। সেদিনও মায়ে-ঝিয়ে কলহ চলিতেছিল। বালিকা মাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহাকে কোথাও যাইতে দিবে না। মা বলিল—"যদি কোথাও যাইতে না দিস্, তবে খাইবি কি ?"

বালিকা বলিল,—"খাইতে না পাইলেই কি ভিক্ষা করিতে হইবে ?"

মা। তবে কি করিব ?

বালিকা। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাক্।

মা। সে কতক্ষণের জন্য ? কালকে অর্দ্ধ উপবাস। আজ কিছু খাইতে না পাইলে যে, ঢলিয়া পড়িবি !

বালিকা। না খাইয়া মরিব, তবু তোকে ভিক্ষা করিতে দিব না।

মা। আমার সব মরিয়াছে, তুই মরিলি না কেন ?

বালিকা। বেশ, তবে ঘরে বসিয়া থাক। মৃত্যু আপনি আসিয়া আমাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে। মরিতেই যখন হইবে, তখন ভিক্ষান্ন খাইয়া আত্মহত্যা করিব কেন ? মরিব ত ভগবানের উপর অভিমান করিয়া মরিব। এত লোকে আহার পায়, আর আমাদের কখন আধপেটা খাইয়া, কখন পুরা উপবাস দিয়া থাকিতে হয় কেন ? এ কথা মনে হইলেও রাগ হয়। কিন্তু সে রাগ কাহার উপর করিব মা ! আজ আমি স্থির করিয়াছি, যে আমাদের পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তাহার উপর রাগ করিয়া বসিয়া থাকিব। যদি পাঠাইবার উদ্দেশ্য থাকে ত সে আপনি আসিয়া আহার যোগাইবে। নহিলে উদ্দেশ্যহীন জীবন রাখিয়া লাভ কি ? যত শীঘ্র যাইতে পারি, ততই মঙ্গল। আজ আমি তোকে কোথাও যাইতে দিব না।

সারদা মাতার হাত ধরিয়া রহিল। মাতা কন্যার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, আর বলিল—"হাত ছাড়িয়া দে। ঘরে বসিয়া থাকিব, পরিশ্রম করিব না—কে আমাদের আহার যোগাইবে ? সেই অদৃষ্টই যদি আমার হইবে, তাহা হইলে একঘর সন্তান থাকিতে, আমি একা তোর চিন্তা লইয়া মরিব কেন ?"

সারদা বলিল—"তবে খাইতে পরিতে পাই, এমন ঘরে আমাকে দে না কেন—অনাহারে মরিতে চলিলাম, কৌলিন্য লইয়া কি করিব ?"

বালিকার মুখে এ কথা শুনিতে অনেকেরই বাধ বাধ ঠেকিতে পারে। কিন্তু উদরের যন্ত্রণা যে অনুভব করিয়াছে, সেই জানে, অন্নকষ্টে লজ্জা-সরম রক্ষা করা কত কঠিন। দুর্ভিক্ষে লোক ছেলে বেচিয়া খায় ! কোথাও আহার পাইলে পুত্রকে ঠেলিয়া নিজের উদর পূরণ করিতে বসিয়া যায়। সারদাও দারিদ্র্যের নিত্য-পেষণে কতকটা লজ্জাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দুটি ডুমুরের জন্য সে গাছে উঠিত, কলমীশাকের জন্য জলে নামিত। কখন বা বালক-বালিকাদের সঙ্গে কোন্দল করিত। নিজেদের কোন ক্ষতি দেখিলে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মা তাহাকে অতি অল্প দিন হইল আটক করিয়াছে। কাজেই বালিকা মুখরা হইয়া মায়ের সঙ্গে কোন্দল করিতেছিল।

এমনই সময়ে মহামায়ার পিতা, তাঁহাদের বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। বাটীর ভিতরের কলহ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাহারা কি বলিতেছে শুনিতে তাঁহার কৌতূহল হইল। তিনি কান বাড়াইয়া তাহাদের কলহের আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল।

তাহার পর বালিকার শেষ প্রশ্নে মা যখন দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল—"তা কখন পারিব না, তবে বসিয়া বসিয়া অনাহারে শুকাইয়া মর্। আমি তোমার জন্য বংশমর্য্যাদা-লোপ করিয়া তোমাকে অঘরে দিতে পারিব না।" তখন সেই অপরিচিতার উপরে আপনা আপনি শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল।

পূর্ব্বে তিনি অতিথি হইয়া তাহাদের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর রহস্য করিয়া তাহাদিগকে মনোবেদনা দিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ধীরে ধীরে কবাট ঠেলিয়া বাটীর উঠানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বালিকা তখনও পর্য্যন্ত হাত দুখানি দিয়া মায়ের দুটি হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল। শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষু হইতে গলগল করিয়া জল বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ প্রকৃতিস্থা ছিলেন, যে কোন প্রকারে হৃদয় বাঁধিয়া কন্যাকে বুঝাইতেছিলেন, কিন্তু কন্যার শেষ

কথার একটা ভবিষ্যতের ছবি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

তিনি যেন মাতৃহীনা কুমারী কন্যার বিবাহের ছায়ায় ঘেরা ভবিষ্যতের যৌবনশ্রীটি দেখিতে পাইলেন. সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কাল্পনিক মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া দিল। চক্ষু সহস্র চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হাত কন্যার হাতে বদ্ধ, মুছিবার অবকাশ হইল না। অশ্রু দেখিতে দেখিতে গণ্ড বহিয়া ছুটিয়া গেল। সারদা মায়ের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

তার পর?—তার পর এই নবাগত অতিথির আগমনে তাহাদের জীবনমৃত্যু প্রশ্ন মুহূর্ত্তমধ্যে মীমাংসিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অধিকক্ষণ তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের পরিচয় দিলেন। আর কৃষ্ণধন ও তাঁহার কন্যার কথা তুলিয়া, তাহাদের গৃহের অস্তিত্ব রক্ষা ও নবসংসার প্রতিষ্ঠারূপ মহদুদ্দেশ্যের জন্য যে ঈশ্বর তাহাদিগকে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছেন, এ কথাও শুনাইয়া দিলেন।

বালিকা ঈশ্বরের নির্ভর করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার ভার লইলেন। ব্রাহ্মণ আহারসামগ্রী আনাইয়া, সেই স্থানেই সে বেলার মত রহিলেন। তাহার পর যে কয়দিন না জোগাঁয়ে কৃষ্ণধনের গৃহ নির্ম্মিত হয়, সেই কয়দিনের জন্য তাহাদের আহারের সুব্যবস্থা করিয়া, স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণধনের গৃহ নির্ম্মিত হইবার পরেই, মাতা ও পুত্রী জোগাঁয়ে আনীত হইল। কোথাকার ভাব কোথায় মিলিয়া এই নবসৃষ্ট আত্মীয়তার একটা সোনার সংসার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মহামায়া শ্বশুর-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার মমতাময়ী শ্বশ্রূ আছে, আনন্দময়ী ননন্দা আছে। আর তাহাকে ঘেরিয়া হাস্য-পরিহাসে আমোদ-রঙ্গে দিবসের দীর্ঘতানাশিনী সঙ্গিনী আছে।

মহামায়ার পিতা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সারদাসুন্দরীকে সৎপাত্রে ন্যস্তা করেন. তাহার স্বামী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। অল্প-দিন পরে সারদাসুন্দরীর মাতা পরলোকগতা হন। মহা-সমারোহে মহামায়ার পিতা তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

এখন রমাপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতেছেন। হাসপাতালের ভার লইয়া তাঁহাকেও জেলায় জেলায় ঘুরিতে হয়। সারদাসুন্দরীও স্বামীর সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মহামায়া দেশে আসিলে, সারদাসুন্দরীও দেশে আসে। কিন্তু এবারে আজিও পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। রমাপ্রসাদ নিজেও বহুদিন কৃষ্ণধনকে দেখেন নাই বলিয়া, ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছেন. ছুটি মঞ্জুর হইলেই নিজে সারদাকে লইয়া আসিবেন সঙ্কল্প।

মহামায়া কিন্তু তার আগমনের অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সারদাসুন্দরীর দেশে আসিবার পূর্ব্বেই সে তার শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গোপালপুরে তাদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

৭

পাল্কী হইতে নামিয়া মহামায়া বাটীর উঠানে দুই-একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে পাছু হইতে মা বলিয়া কে তারে সম্বোধন করিল। মহামায়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা।

বালিকার মুখ দেখিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি অর্দ্ধ-বিস্মৃত মুখচ্ছবি দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল; আর মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয়টাকে নিপীড়িত করিয়া সমস্ত ধমনী-গুলাতে শোণিত-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া, কি একটা অজ্ঞাতকারণ তড়িচ্ছক্তি তাহার বিশাললোচন দুটি জলে ভরাইয়া দিল ব্যাপার কি বুঝিতে না বুঝিতেই মহামায়ার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় চলিয়া গেল। যখন আত্ম-সংযতা হইল, তখন তিনি বুঝিলেন, মেদিনীপুরের সেই মেয়েটির সহিত এই মেয়েটির আকৃতিগত একটা সাদৃশ্য আছে। মহামায়া সাদৃশ্যই স্থির করিলেন। মেদিনীপুর হইতে সে বালিকা এতদূরে কেমন করিয়া আসিবে বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা রমাপ্রসাদের বাটীর উঠানে বেড়াইতেছিল। মহামায়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই মাতৃভ্রমে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিল। মহামায়া মুখ ফিরাইতেই যখন বুঝিল সে মা নয়, তখন লজ্জায় যেমন সে পলাইয়া যাইবে, অমনি মহামায়া ছুটিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বালিকা তাহাকে ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু মহামায়া তাহাকে কোলে জোর করিয়া তুলিয়া লইল এবং বার বার তার মুখ-চুম্বন করিল। বালিকার বয়স চৌদ্দ বৎসর।

কিন্তু মা-বাপের দারিদ্র্যবশতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার দেহের আজিও সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হয় নাই দেখিয়া মহামায়া তাহার বয়স বছর বারো অনুমান করিল। তবে স্ফুটনোন্মুখী যৌবনকান্তি মহামায়াকে বিমুগ্ধা করিল। এমন মেয়ে যারে 'মা' বলে, সে কত ভাগ্যবতী! মহামায়ার মনে ঈর্ষা জাগিল।

রমণী জীবন-বৃক্ষের রসাল ফল—সুন্দরী, রসময়ী, দয়াবতী, মায়ারূপিণী! কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য, সেই রস, সেই দয়ামায়ার আবরণে রসালান্তর্গত কীটের ন্যায় কখন কখন কেমন করিয়া যে এই ঈর্ষ্যা কীটটি প্রবেশ করে, দয়াময়ীরা নিজেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহার প্রবেশ-পথ মানব-দৃষ্টির অগোচর। তুমি অনুসন্ধান করিতে যাও, সেটি তোমার চোখের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে। একটু মধুর শব্দে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে, ধরা দিবে না। সখী সখীর দুঃখে কাঁদিয়া মরিবে, তবু তার সুখ দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে বাধা দিতে পারিবে না। পুত্রবৎসলা জননী, স্বামিনিগৃহীতা পুত্রবধূর জন্য পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তার প্রতি স্বামীর ভালবাসার আধিক্য দেখিতে তাঁর আঁখি সঙ্কুচিত হইবে। ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, কাব্যদর্শনে সহস্র সহস্র নীতিশিক্ষায়ও ঈর্ষ্যা ঠাকুরাণী সেই কোমল সিংহাসনের দখল ছাড়েন না। তবে মূর্খার কঠোর ঈর্ষ্যা মুক্তকণ্ঠে বিধাতাকে গালি দেয়, বিদুষীর মার্জ্জিত রুচি ঈর্ষ্যার সঙ্গে কবিতারসের আবরণ দিয়া তাহাকে একটু অম্ল-মধুর করিয়া তুলে। তোমার সিভিলসার্ভিস পাশ করা স্বামীকে দেখিয়া তোমার মূর্খা সখী স্বামীর সহিত কলহ করে। তোমার বিদুষী সখী বিবাহ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া, ব্রহ্মচারিণীর কবিতারসে মেদুর অম্বরে, সাগরে ভূধরে বিরহী যক্ষের প্রতিকৃতিসক্ত করিতে নিযুক্ত থাকেন।

বালিকার মুখের 'মা' কথা শুনিয়া, তার মুখ দেখিয়া, স্পর্শ-সুধানুভাবিনী মহামায়া ঈর্ষ্যায় গলিয়া গেলেন। এই চাঁদ মুখ হইতে অজস্র নিঃসৃত 'মা মা' সুধা শুধু যে তার জননীর হৃদয়রাজ্যেই অবিরাম ঝরিতে থাকিবে, এটা তার সহ্য হইল না। ঈর্ষ্যান্বিতা মহামায়া তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার জন্য যেন লালায়িত হইলেন।

বালিকার মুক্ত হইবার চেষ্টায় মহামায়া আরও জোর করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। প্রসভোদ্ধৃতা বালিকা ক্ষুদ্র বলটুকু সে দুই একবার মহামায়ার এই স্বাধীনতাহরণরূপ দুর্ব্বোধ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

৮

কোনও বিশেষ কারণে রমাপ্রসাদের ছুটী পাইতে বিলম্ব ঘটিল। সারদাসুন্দরীর সেই দিনেই দেশে আসিবার কথা ছিল, নিজের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, তিনি সারদা-সুন্দরীর জেদে তাহাকে আগে হইতেই বাটী পাঠাইলেন। তাহার আসিবার সংবাদ দুই স্থানেই প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু মহামায়া সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল। বাড়ীর দাস-দাসী সারদাসুন্দরীকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। রমাপ্রসাদের মা বৃদ্ধা, বড় একটা বাহিরে আসিতেন না। কাজেই মহামায়ার এই অন্যায় আদর-পীড়নে বাধা দিতে শীঘ্রই সে স্থানে আসিবার বড় একটা কেহ ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া, বালিকা মহামায়ার চুম্বন-তরঙ্গে সলজ্জ মুখখানি ভাসাইয়া চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বাস ছিল, শীঘ্রই মা আসিয়া তাহাকে এই অপরিচিতার বাহু-কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিবে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল, মা আসিল না। মহামায়াও নিজে কি করিতে আসিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছিলেন, 'ন যযৌ ন তস্থৌ' কেবল বালিকাকে মা বলিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। বালিকা চারিদিকে বারবার চাহিল—মা আসিবার কোন নিদর্শন দেখিল না। তখন মুক্তির অন্য উপায় না দেখিয়া, অগত্যা মহামায়াকে মাতৃসম্বোধন রূপ উৎকোচ প্রদান করিল।

এমন সময় বালিকার মাতা তথায় আসিয়া পড়িল। মা দেখিল, কন্যা এক অপরিচিতার কোলে উঠিয়া তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে। আর দেখিল, তা'র দুটি পদ্মপলাশে জল ঢল ঢল করিতেছে।

বালিকার মাতাও সারদাসুন্দরীর গৃহে নবাগতা। সে-ও কখন সারদাসুন্দরীকে দেখে নাই। কাজেই মমতা-ময়ী মহামায়াকে সে একেবারে সারদাসুন্দরী স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল —"কতক্ষণ আসিলে বউ?"

মহামায়ার কুটুম্বিনী সম্বন্ধে নূতন পুরাতনত্ব ছিল না, পরিচয় অপরিচয় ছিল না। যেখানে তৃপ্তি পাইত, সেই খানেই পরিচিতার মত ব্যবহার করিত,—পরিচয় হইতে হয়, পরে হইবে। মহামায়া বালিকার মাতার প্রশ্নে উত্তর না দিয়া বলিল, "এটি কি ভাই তোমার মেয়ে?"

বালিকার মাতার মুখে সহসা বিষাদের ছায়া পড়িল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, আধ জড়ান স্বরে বলিল;—

"কেমন করিয়া বলিব?"

মহামায়া তা'র মুখের দিকে বেশীক্ষণ চক্ষু রাখিবার অবকাশ পায় নাই। সে বালিকার মুখের সৌন্দর্য্য বারবার দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছিল না; তা'ই বালিকার মাতাকে প্রশ্ন করিয়াই মুখ ফিরাইয়া, বালিকার মুখ আবার চুম্বিত করিলেন। তাহার প্রশ্নে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"বলিতে পার আর না পার, এখন হইতে এই দুষ্ট মেয়েটার 'মা' বলার অর্দ্ধেক ভাগ আমায় দিতে হইবে।"

এই কথা বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বনাশী মহামায়া কত চিন্তাই না করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাশি রাশি চিন্তার আবরণে

পড়িয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে এবারেও বালিকার পরিচয় লইবার অবকাশ পাইল না।

বালিকার মাতা তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া চলিল যাইতে যাইতে মহামায়া বালিকার নাম জিজ্ঞাসা করিল, শুনিলেন রাধারাণী। মহামায়ার সর্ব্বাঙ্গ আবার শিহরিল। বালিকার মাতার ললাটের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সেখানে সিন্দূর দেখিল না। বাম হস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিলেন হাতে লোহা নাই। জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এ অবস্থা কতদিন হইয়াছে ?"

"দুই মাস !"

"স্বামীর কি হইয়াছিল ?"

"কি হইয়াছিল !—"

মহামায়া দেখিলেন, অপরিচিতা যুবতীর সুন্দর মুখশ্রী সহসা রক্তরাগরঞ্জিতা হইয়া গেল !

"কি হইয়াছিল ? কি বলিব ভাই ?—বলিলে বিশ্বাস করিবে কি ? একটা কালসর্প আর কালনাগিণী, আমার স্বামীর মস্তকে দংশন করিয়াছিল। ঘরে চল, বসিয়া বসিয়া সমস্ত দুঃখ-কাহিনী বলিব।" বলিতে বলিতে যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

মহামায়ার পা টলিতে লাগিল। তার পর যুবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমার স্বামী মেদিনীপুরের কাছারিতে কাজ করিতেন—"

চলিতে চলিতে মহামায়া দাঁড়াইল, বালিকার হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিল—"একটা কাজ আছে, সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছি ; আসিয়া সমস্ত কথা শুনিব।"

প্রয়োজনের কথা শুনিয়া যুবতী মহামায়ার হাত ছাড়িয়া দিল ! মহামায়া বরাবর বাটীর বাহিরে আসিল—আবার পাল্কীতে উঠিয়া বাটী ফিরিয়া গেল।

মহামায়া চলিয়া গেলে, বালিকা মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"হাঁ মা ! ও কে গা ?"

মা বলিল,—"তোর আর এক মা।"

বালিকা বলিল,—"তবে এতকাল দেখি নাই কেন ?"

মা বলিল,—"আমাদের অদৃষ্ট।"

তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল—দাঁড়াইয়া অপরিচিতার ফিরিবার আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল—অপরিচিতা ফিরিল না।

তখন মা মেয়েকে ঘরে যাইতে অনুরোধ করিয়া, আপনি বাটীর বাহিরে গেল, সেখানেও অপরিচিতাকে দেখিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পল্লীগ্রামের পথ, দুই এক জন কচিৎ আসিল—চলিয়া গেল—অপরিচিতার আসিবার কোনও নিদর্শন দেখা গেল না। যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময় ক্রমে উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। অপরিচিতাকে সারদাসুন্দরী বলিয়াই প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু সারদা বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই, কোথায় ফিরিল ? গৃহ-প্রবেশোন্মুখী 'আসি' বলিয়াই চলিয়া গেল, এখনও ফিরিল না কেন ? তবে কি অপরিচিতা সারদা নয় ? যুবতীর সন্দেহ আসিল। তখন তাহার মনে হইল মহামায়াকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে। মনকে—সেই কোথায়—অতীতের মিলন স্থানে ফিরাইবার সে বহু চেষ্টা করিল পারিল না।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন অপরিচিতাকে ফিরিতে দেখিল না, তখন যুবতী বাটী ফিরিতে মনঃস্থ করিল।

দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দূরে পাল্কী-বাহকের কণ্ঠশব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল যুবতী বুঝিল, অপরিচিতা আবার ফিরিতেছে। সে আবার অগ্রসর হইল। বহির্ব্বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, বাটীর দাস-দাসী পাল্কীর সহিত ছুটিয়া আসিতেছে।

বাটীর উঠানে আসিয়া পাল্কী থামিল দাসী যুবতীকে দেখিয়াই মায়ের শুভাগমনের সংবাদ দিল। যুবতী আগু বাড়াইয়া আনিতে গিয়া দেখিল—একি ! এই কি সারদা-সুন্দরী !

৯

মেদিনীপুরের সেই ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ বায়ুরোগ ছিল। কৃষ্ণধনের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইবে, এই বিশ্বাসে তাহার আনন্দ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে সেই কথা প্রতিবেশিগণের সকলকেই শুনাইয়া দিয়াছিল ! বাঙ্গালা পল্লীগ্রামের প্রতিবেশী সেই কথা শুনিয়া যে বড় তুষ্ট হইবে না, অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাহা ভাল বুঝিতে পারে নাই। যদি কেহ এই কথা শুনিয়া, আত্মতৃপ্তির জন্য এইরূপ সম্বন্ধ-বৈষম্যের অসম্ভাবিতার উল্লেখ করত তাহাকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিত, ব্রাহ্মণ তাহার সহিত কলহ বাধাইত। তা'রপর যখন সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণের মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না।

তাহার উপর দুষ্ট প্রতিবেশিগণ তাহাকে দেখিলেই বিবাহ-কথা লইয়া রহস্য করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। সম্বন্ধের কথা কেহ তুলিলেই ব্রাহ্মণ তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শেষে এমন হইল যে, কেহ যদি একটি ইঙ্গিত করিত, তাহাও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্রাহ্মণের সহ্য হইত না।

ব্রাহ্মণ বাহিরের লোককে গালি দিয়া নিবৃত্ত হইল না। বালিকা কন্যা ও অভাগিনী পত্নীকেও নিত্য তিরস্কার করিতে

আরম্ভ করিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, কন্যা বাটীর বাহির না হইলে তাহাকে রাক্ষসী মহামায়া দেখিতে পাইত না, আর স্ত্রী নিমন্ত্রণ না যাইলে কন্যা শ্যামসুন্দরকে ফেলিয়া দিত না।

লোকের উৎপাতে ব্রাহ্মণের কাছারি যাওয়া বন্ধ হইল। যে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত, তাহা আর রহিল না। ব্রাহ্মণের এ অবস্থা অধিক দিন রহিল না। শীঘ্রই মারা গেল। এ দুরবস্থায় ব্রাহ্মণকে অধিকদিন থাকিতে হইল না। ব্রাহ্মণীও কন্যাকে দুঃখের ভার বহন করিতে রাখিয়া অভাগা সাত বৎসরের ভিতরেই মারা গেল। স্বামীর রোগের চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় করায় ব্রাহ্মণী গহনাপত্র সব নষ্ট করিয়াছিল। এখন এক বৎসর ধরিয়া কন্যাটিকে পালন করিতে তাহার ধুলা গুঁড়া যা' ছিল, সব ফুরাইল। বৎসর শেষে দেখিল, আর কোন মতে চলে না। তখন আত্মীয়ের সন্ধান তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। আত্মীয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাতুল-বংশে নিঃস্ব, ব্রাহ্মণীর পিতৃকুল নির্ম্মূল। কুলীনদিগের অধিকাংশেরই মাতামহ মাতুলাদি লইয়াই পরিচয়—ব্রাহ্মণী কোথায় যাইবে—কি করিবে? আশ্রয় পাইবার জন্য অভাগিনী নিত্য ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিল।

একদিন যোগ উপলক্ষে ব্রাহ্মণী কতকগুলি প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। যাহার কিছু নাই, সে কেমন করিয়া মেদিনীপুর হইতে এতদূরে আসিতে পারিল? এ প্রশ্ন করিবার পাঠকের অধিকার আছে। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য হিন্দুনারী কত কষ্ট সহিতে পারে, আজও পর্য্যন্ত সমালোচনা, গবেষণা, গণিত, দর্শনে তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই।

অনাহার-পীড়িতা কেমন করিয়া অর্থ-ব্যয়ে অনুষ্ঠেয় ব্রত-নিয়মাদি পালন করে—এ গুপ্ততত্ত্ব আজিও পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে ও গুপ্তভাবে লুকাইত রহিয়াছে!

কালীঘাটে আসিয়া গঙ্গাতীরে রমাপ্রসাদের মা'র সহিত তাহার পরিচয় হয়। পরিচয়ে বৃদ্ধা একটি নিধি হাতে পাইলেন। এত আপনার জন এতকাল কোন্ অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল? বৃদ্ধা নিধিটিকে জোর করিয়া ধরিলেন, আর হাতছাড়া করিলেন না। মা ও মেয়েকে চক্ষুজলে সিক্ত করিয়া আপন আলয়ে ধরিয়া আনিলেন, আর মেদিনীপুরে যাইতে দিলেন না।

কুলীন যখন স্বকৃতভঙ্গ হয়, তখন প্রায়ই বহু বিবাহ করিয়া বসে। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণের পিতা নিজে ভঙ্গ হইয়াছিল, আর সেই উপলক্ষে বিশ-পঁচিশটা বিবাহ করিয়াছিল। তাহার হিসাব তাহারই কাছে ছিল—সে আয়-ব্যয়ের তালিকা অন্যের জানা দূরে থাকুক, সপত্নীগণই তাহা জানিত না।

তাহাদের একটির গর্ভে রমাপ্রসাদের মাতা আর একটির গর্ভে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুরে ও বৃদ্ধার পিত্রালয়ে বিংশক্রোশব্যবধান। ভ্রাতা ভগিনী কেহ কাহারও অস্তিত্বও জানিত না। মাতৃকুলে বৃদ্ধার কেহ ছিল না। পিতৃকুলেও কেহ নাই জানিয়া বৃদ্ধা পরকে আপন করিয়া সংসার করিতেন। পুত্র, পুত্র-বধূ চিরদিনই প্রায় বিদেশে থাকিত, কোন্ গঙ্গাহীন দেশের আঘাটায় মরণের ভয়ে তাহাদের সঙ্গে যাইতেন না। কাজেই দুই একটি প্রতিবেশিনীর ভার বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে লইয়াছিলেন।

গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কালীঘাটে আসিয়া তাহার যুবতী ভ্রাতৃজায়া ও বালিকা ভ্রাতুষ্কন্যাকে পাঠাইলেন। মেয়েকে কোলে তুলিয়া সহস্রবার মুখচুম্বন করিলেন। মাও কন্যার অপূর্ব্বলাভে একটু-আধটু ভাগ বসাইল বৃদ্ধা অত্যধিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে মায়েরও মুখচুম্বন করিতে ছাড়িল না। তা'র পর ভাইএর অকালমৃত্যুর কথা শুনিয়া যত পারিলেন কাঁদিলেন। জন্মাবধি তাহার সহিত অপরিচিতা রহিলেন বলিয়া যত পারিলেন আক্ষেপ করিলেন। তাহার পর এই অভাবনীয় ধনপ্রাপ্তির আনন্দের প্রতিদান স্বরূপ ষোড়শোপচারে মা কালীর পূজা প্রদানানন্তর মা ও মেয়েকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

বাটীতে আসিয়াই বৃদ্ধা এই আত্মীয়ার শুভাগমনের সংবাদ পুত্র রমাপ্রসাদকে প্রেরণ করিলেন। সারদাসুন্দরী, একে মহামায়া তাহার উপর আবার নূতন কুটুম্বিনী বাটীতে আসিয়াছে, এ জন্য স্বামীকে দেশে ফিরিতে বড়ই পীড়াপীড়ি করিল। নিজের যাইতে বিলম্ব দেখিয়া রমাপ্রসাদ অগত্যা স্ত্রীকে বাটী পাঠাইলেন। সারদাসুন্দরী বাড়ী আসিয়াই একটি সুন্দরী যুবতীকে প্রত্যুদগমন করিতে দেখিল! বুঝিল—এইটিই তাহার নবাগতা মাতুলানী।

মাতুলানী কিন্তু সারদাসুন্দরীকে দেখিয়া ম্লানমুখী হইয়া গেল। সে যে তখন নলিনীর নূতন মায়ের অস্তিত্ব মহামায়াতেই অর্পণ করিয়াছিল।

সারদাসুন্দরী অপরিচিতাকে দেখিয়াই—বলিল,—"তুমিই কি আমার মামী?" মাতুলানী বিস্ময়-বিমুগ্ধা, কথা কহিল না। সারদাসুন্দরী তাহার সকল কথাই শুনিয়াছিল। সুতরাং তার নীরবতায় বিস্মিত হইল না। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, অপরিচিতাকে একটি প্রণাম করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া চলিল।

১০

মহামায়া দুইখানি পত্র পাইলেন, একখানা খুলিয়া পড়িলেন—দেখিলেন, স্বামীর পত্র।

"আমি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়াছি। বাটী যাইতে আরও দুই এক দিন বিলম্ব হইবে। হাঙ্গামার কথাটা বাটী যাইলেই শুনিতে পাইবে; তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, যাইতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইলে, অনাহারে শয্যায় ঢলিয়া পড়িও না। বাবাজীউ সুস্থ আছে, এক বন্ধুর বাড়ীতে পুত্রাধিক আদরে রহিয়াছে। তাহার কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার জন্য একটি বাসা স্থির করিলাম। রমা-প্রসাদকে এই স্থান হইতে পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাই-য়াছি। সারদা বাটী আসিতেছে। সে হরিপুরের বাটীতে আসিলেই তাহাকে লইয়া আসিবে। তাহার আসিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে! মাকেও সেই সঙ্গে আনিতে পারিলে ভাল হয়।"

দ্বিতীয় পত্র সারদাসুন্দরীর হরিপুর হইতে প্রেরিত।

"আমি মুঙ্গের হইতে এত শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি যে, তোমাকেও পত্র লিখিতে সময় পাই নাই। বাড়ীতে আসিয়া তোমার ওখানে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মা অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিতেছি না; সেখানে শুনিয়াছি দাদা কলিকাতায়। আসিলেই শ্যাম-সুন্দরকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে। যদি যাইতে দুই দিন বিলম্ব হয়। ভাল কথা, তোমাকে আসিতেই হইবে। মা বলিলেন, তোমাকে অনেক দিন দেখেন নাই। কেন, আমি না আসিলে কি তোমার এখানে আসিতে নাই? আর এক কথা—বাড়ীতে আসিয়া একটি মামীশাশুড়ী ও একটি ননদী পাইয়াছি। তাহাদের দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না—তাহারা এত সুন্দর! তোমাকে না দেখা-ইতে পারিলে ত তৃপ্তি নাই। তুমি যত শীঘ্র পার আসিবে।

আসিবার এত জেদ করিতেছি কেন?—এমন ধারা অল্পভাষিণী লজ্জাশীলা মামীশাশুড়ী বুঝি কোন ব'উ কোন জন্মে দেখে নাই। আমি কোথায় তাহাকে লজ্জা করিব, না তা'র লজ্জা দেখিয়া আমাকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। তুমিই তা'র যোগ্যা সঙ্গিনী। দুইজনে মনে মনে কথাবার্ত্তা কহিবে, আর ইঙ্গিতে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে দুইটি উপন্যাসের সখী—কেবল আলেখ্য-শোভাকরী হইয়া আমার চক্ষু সার্থক করিবে; আমি তাহাকে প্রথম দিন কোনও প্রকারে মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া মামী বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। পরদিন হইতে 'ভাই' বলা ধরিয়াছি। সে এত মৃদু—এত ছোট—এত মিষ্ট! দেহযষ্টি স্পর্শভরে অবনত হইয়া যায়। আমার পক্ষে তাহাকে দূরে দূরে রাখিয়া দেখাই ভাল, সখী করা বড় সুবিধা হইবে না! জানই ত বারবৎসর পর্য্যন্ত আমি প্রাচীরে প্রাচীরে গাছে গাছে বেড়াইয়াছি। তার পর তোমরা আবার আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইবার জন্য একটি স্বর্গস্পর্শী বৃক্ষের মাথায় তুলিয়া দিয়াছ। আমি মনের কথা চাপিতে জানি না। আর আজন্ম বানরী থাকিয়া কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হয় ভুলিয়া গিয়াছি। কি বলিতে কি বলিয়া শেষে কি তার মনোবেদনা আনিয়া উপস্থিত করিব? ভয় হয়, কেন না, একে ত রহস্যের সম্পর্ক নয়, মা তাহাকে কন্যার মত দেখিতেছেন বলিয়াই আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিতেছি—তাহার উপর হতভাগিনী এই বয়সে সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা হইয়াছে।

এখানে আসিলে সমস্ত জানিতে পারিবে। তবে এটা না লিখিলে আমার পেটের ভাত হজম হইবে না;—মেদিনীপুরে যে সময় ছিলে, সে সময় কি সেই সর্ব্বনেশে মেয়েটাই কেবল তোমার চক্ষে পড়িয়াছিল। একটি চাঁদের কিরণঢাকা-রঙমাখা ননীর পুতুল কি কখনও তোমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? তার কথাও কি কখন শুন নাই?

তুমি সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী, তাহার উপর তোমার আঁখির করুণা কোমল দৃষ্টি কুৎসিতকেও সুন্দর করিয়া তুলে। সেটিকে তোমার দেখা উচিত ছিল।

যাক্ এখন আর সে কথায় কাজ নাই। মাথা খাও, দাদা আসিলেই শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে করিয়া এখানে অবশ্য চলিয়া আসিবে।"

১১

এক দুই করিয়া সারদাসুন্দরী মহামায়ার প্রত্যাশায় সাত দিন বসিয়া রহিল—মহামায়া আসিল না! পত্র লিখিল—উত্তর পাইল না। বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতনও ত তাহার তত্ত্ব লইতে এক ক্রোশ দূর হইতে "পিসীমা পিসীমা" করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত। সেই বা আসিল না কেন! তবে মহামায়ার কি হইল?

সারদাসুন্দরী এক দিন বৈকালে রাধারাণীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল আর ভাবিতেছিল। সু-কু নানা চিন্তা সারদার হৃদয়পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। শেষে সব চলিয়া গেল, কেবল গোটাকতক কু পড়িয়া রহিল! তাহারা এ-দিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া তাল প্রমাণ কেমন এক রকম হইয়া দাঁড়াইল।

সারদা বুঝিল, মহামায়ার নিশ্চয়ই কিছু বিভ্রাট ঘটি-য়াছে। সে আজ সাত দিন আসিয়াছে। আসিবার কথা শুনিলে আগে হইতে যে পথ আগুলিয়া বসিয়া থাকে, সে মহামায়া সাতদিনের ভিতরে একটা সংবাদও লইল না! মহামায়ার বিপদে তাহার সন্দেহই রহিল না।

কিন্তু কি বিপদ?—ভাবিবার উপক্রমেই সারদার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বাল্যকালের কথা—নিজের দুর্দ্দশা,

দুর্দ্দশার প্রতীকার, মহামায়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম দর্শনেই ভালবাসার নিগড়-বন্ধন—তাহার আদর, যত্ন, মমতা, তাহার সহিত কলহ, অভিমান—নানামুখগামিনী স্রোতস্বিনী তাহার হৃদয়ে একটা আবর্ত্ত তুলিয়া বসিল। রাধারাণীর বেণীসংবদ্ধ হস্ত তাহার পৃষ্ঠে খসিয়া পড়িল—বালিকার কেশপাশ আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

রাধারাণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল—বউদিদি কাঁদিতেছে। বালিকাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া, সারদা নিজের অন্যমনস্কতা বুঝিয়া, মুহূর্ত্তেই ভাবপরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। বলিল "তুই কি দেখিতেছিস্?"

ক্রন্দন দেখিতে বালিকা এমনই অভ্যস্তা হইয়াছিল যে, সারদার চক্ষে জল দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরন্তু সারদার প্রশ্নে তাহার মুখের স্বভাবসংলগ্ন হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"দেখিতেছি তুমি কাঁদিতেছ।"

"আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কি তোর হাসি আসিল?"

"কি করিব?

"কি করিবি!" বিস্ময়ে সারদা রাধারাণীর মুখপানে চাহিল। রাধারাণী আবার হাসিয়া তাহার স্থিরদৃষ্টিকে রহস্য করিল।

"চোখে জল না আসুক, আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া মুখখানা তোর একটু মলিনও হইল না। লোকে লোকের খাতির রাখিতেও দুই এক বিন্দু অশ্রুপাতের ভাণ করে। আর তুই হাসিয়া আমার চক্ষুজলকে অপ্রস্তুত করিলি! করিলি কি রাধারাণী?"

রাধারাণী বলিল—"কান্না অনেক দেখিয়াছি। মাকে অনেক কাঁদিতে দেখিয়াছি। বাবাকেও কাঁদিতে দেখিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমিও কত কাঁদিয়াছি। মনে হয়, বাবার মতন বুঝি কেহ কাঁদিতে পারিবে না। এখন আর কান্না আসে না। লোকের চোখে জল দেখিলে এখন আমার হাসি পায়।"

"বলিস কি!—তুই এই দুধের মেয়ে, বলিলি কি রাধারাণী?"—

বালিকা মুখ অবনত করিল। সারদা অঙ্গুলি-প্রান্ত দিয়া সেই অবনত মুখ আবার তুলিয়া ধরিল। রাধারাণী তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল। সারদা দেখিল, কুসুমকোমলা বালিকার মুখে প্রবীণার গাম্ভীর্য্য মাখিয়া গিয়াছে।

সারদার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জোর করিয়া মুখ তুলিয়াছিল—পলক তুলিতে ত আর জোর চলিবে না। সারদা আর একবার চাহিতে তাহাকে অনুরোধ করিল। সবালিকা অনুরোধ রক্ষা করিল না। তাহার হস্ত অধরে লগ্ন ছিল, সারদা সেই হস্ত খুলিয়া লইল; বালিকা মুখ ফিরাইল। সারদা তাহার চুল ছড়াইয়া দিল, বালিকা কথা কহিল না। কেশকলাপ ইতস্ততঃ—পৃষ্ঠে মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল, তথাপি রাধারাণী কথা কহিল না। তখন সারদা বুঝিল, বালিকা লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্য আবার তাহার মুখ ফিরাইল, বারবার তাহা চুম্বিত করিল, আর বলিল—"তোর মা আমার মামী, আর তুই আমার ননদী; এবার তোর মাকে দেখিলে আমি ঘোমটা দিব, আর তোর সঙ্গে গল্প-গুজব আদর-সোহাগ, বিবাদ-বিসম্বাদ—যাহা কিছু করিবার সমস্ত করিব। তুই আমার যোগ্যা সঙ্গিনী।—এখন বল্ দেখি—আমাকে ছাড়িবি না।"

রাধারাণী আবার মুখ ফিরাইল—চোখ তুলিতে তুলিতে অধরপ্রান্তে আবার হাসির রেখা দিল। সারদার চক্ষুজল শুকাইয়া মেঘের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে বালিকাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ ভালবাসিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহার স্বভাবের—একটা প্রতিবিম্ব বিধাতা মেদিনীপুরে আঁকিয়া রাখিয়াছিল। সেটা আপনা আপনি কেমন করিয়া তার ঘরে আসিয়াছে। ইহাকে কোনও গতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে—প্রকৃতিদত্ত এই ক্রীড়নক লইয়া, সারদার সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলা ভুলিবার উপায় হইবে।

"আমার মাথা খাস, বল্ ভাই! আমাকে ছাড়িবি না।"—সারদা উপযাচিকা, বালিকার হাত দুইটি জোর করিয়া ধরিল।

বালিকা ননদীর পদে অনধিকারিণী ছিল। এ কয়দিন সারদা তাহাকে কন্যা-বাৎসল্যেই দেখিয়া আসিতেছিল—স্বভাব-সুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বিজ্ঞার মত ব্যবহার করিতেছিল। আজ সে সেই গর্ব্ব-ভরা আসন পরিত্যাগ করিয়া, বালিকাকে আপনার সকল অধিকার ছাড়িয়া দিল।

বালিকা ননদীর পদ পাইল, ননদীর তেজ পাইবে না কেন? সে সারদার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"বলিতে পারি না।"

"কেন ভাই?"

"তাও বলিতে পারিব না।"

"কেন, আমি কি তোদের অযত্ন করিয়াছি?"

বালিকা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। আবার মাথা হেঁট করিল, অঙ্গুলি দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। সারদা তাহার হাত টানিয়া ধরিল। আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই! আমার সঙ্গ কি তোর ভাল লাগিতেছে না?"

বালিকা উত্তর করিল না। সারদা তাহার গাল টিপিয়া ধরিল, আর বলিল—দুষ্টমেয়ে তোকে ছাড়িবে কে!

বালিকার মুখ আবার প্রশান্ত হইল—সেই ঈষদবনত প্রশান্ত মুখের ঈষদুন্নমিত নয়ন সারদার পিপাসিত লোচনের উপর পড়িল। মুগ্ধা সারদাসুন্দরী মোহের সাগরে ডুবিয়া গেল। বালিকা বলিল—"মা এ স্থানে থাকিতে চাহিতেছে না, কয়দিন ধরিয়া যা'ব যা'ব করিতেছ।"

অতি আগ্রহে সারদা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"মা বলে, তোমরা কুহকিনী—তোমরা আমাদিগকে আর একটা কি বিষম বিপদে ফেলিবার জন্ত ধরিয়া রাখিয়াছ।"

"তোমরা! এক কুহকিনী আমিই না হয় হইলাম, আর কুহকিনী কে? মা—আমার শাশুড়ী?"

কথাটায় সারদার আনন্দ উছলিয়া উঠিল, কিন্তু ভাবার্থ বুঝিবার একটা নূতন কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

রাধারাণী বলিল—"বাপের বোন কি কুহকিনী হয়? পিসীমা আমার মায়াময়ী—আপনার। তোমরা পর—তোমরা আদর দেখাও, আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত।"

"আবার তোমরা!—সত্য করিয়া বল্—আমি ছাড়া এ বাড়ীতে আবার কে তোকে আমার মত আদর করিয়াছে? না বলিলে সত্য বলিতেছি, কিল্ মারিয়া তোর মাথার খুলি ভাঙিয়া দিব।"

বালিকা বলিল—"তোমার মত আর এক জন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া মা বলাইয়াছে।"

"কোথায়?"

"এইখানে।"

"কবে?"

"যেই দিন তুমি এখানে আসিয়াছ।"

"কখন?"

"তোমার আসিবার কিছু পূর্ব্বে।"

"তা'র পর?"

"তা'র পর আসি বলিয়া যে চলিয়া গেল, আর আসিল না।"

"বলিস কি!"

"আজ সাত দিন হইল, আমার সেই নূতন মা ফিরিতেছে।"

"তা'র বাড়ী কোথায়?"

"তা' কেমন করিয়া বলিব? সেই দিন সবেমাত্র তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আমার মা তাহাকে তুমি মনে করিয়াছিল।"

"তাহাকে দেখিতে কেমন?"

"সুন্দর।"

"তোর মায়ের মতন?"

"মা আমার শোকে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মায়ের আর সে শ্রী নাই।"

"আমার মতন?"

বালিকা চুপ করিয়া রহিল।

সম্মুখে একখানি দর্পণ ছিল। সারদাসুন্দরী সেইটা টানিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিল। তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত অধর অঙ্গুলি নিপীড়িত করিয়া, নিজের সুন্দর মুখখানি একবার দেখিয়া লইল। তার পর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অলকগুচ্ছ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া মুখখানিকে আরও একটু সুন্দর করিয়া লইল এবং প্রতিবিম্বের উপরেই নয়ন রাখিয়াই রাধারাণীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আমার মতন?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বালিকা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কোন রকমে কথাটা চাপা দিবার জন্ত বলিল—"সন্ধ্যা হইতে চলিল, চুল বাঁধিবে কখন?"

"কেন এ এলো সৌন্দর্য্য কি তোর পছন্দ হইল না?"

বালিকা হাসিয়া সারদার কোলে মুখ লুকাইল।

সারদা বলিল—"তোর সত্যকথা বলিতে ভয় হইতেছে—কেমন?"

বালিকা বলিল—"তুমি অতি সুন্দর!"

"আর তোর নূতন মা 'অতির' উপর এক পোঁচ বেশী সুন্দর। সত্য বল, আমি তোরে আরও বেশী ভালবাসিব।"

বালিকা সারদার কোল হইতে মাথা তুলিল। গ্রীবা-ভঙ্গে সারদার মুখের পানে আর একবার চাহিল। আর বলিল—তুমি তাম্বূলরাগে ঠোঁট দুটি রাঙাইয়া, আরসী ধরিয়া চক্ষে কটাক্ষ বাঁধিয়া যেমন সুন্দর, আমার নূতন মা শুধু শুধুই তেমনি সুন্দর। বলিয়াই বালিকা লজ্জায় হাত দু'খানি সারদার গলায় জড়াইয়া দিল।

তাহার এই অস্বাভাবিক আত্মীয়তায় সারদাসুন্দরী গলিয়া গেল। মনে মনে আপনাকে বহু ভাগ্যবতী বিবেচনা করিল। আর বুঝিল—সংসারে মানস-ব্যাধির এইরূপ শত সহস্র ঔষধ থাকিতে, মানুষে খুঁজিতে জানে না জানিতে চায় না বলিয়া এত দুঃখ পায়। আপনার সুখের সন্ধানে না ঘুরিয়া মেদিনীপুরের এই আপনার সামগ্রীটির যদি সে সন্ধান করিত, সেও মহামায়ার মত চির সুখিনী হইত; সুখ বিনা বাক্যব্যয়ে উপযাচক হইয়া, আপনার কোট ছাড়িয়া, তাহার দ্বারস্থ হইয়া পড়িয়া থাকিত। মহামায়ার বাপ—কোথাকার কে তাহাদিগকে আত্মীয় করিয়া মহামায়াকে একটি দুর্ভেদ্য সুখদুর্গে বসাইয়া গিয়াছে। তাহার বাড়ীর কাছে এখন আর

দুঃখ আসিতে সাহস করে না। আর তাহার এত আপনার—তাহাদের অবহেলায় মেদিনীপুরের কোন অন্ধকারে পড়িয়াছিল।

তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে সন্তপ্তমেদিনী কেমন করিয়া সারদার জন্য সুখময় ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে।

সারদাসুন্দরীর এইরূপ তর্ক মীমাংসা সকলের পক্ষে ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু মানুষ যে বিষয়টি পছন্দ করে, সেটি তর্ক-যুক্তিতে যেমন করিয়া পারে, আপনার মত করিয়া লয়। কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক-বৈষয়িক ব্যবহারে, প্রতি কার্য্যানুষ্ঠানে এইরূপ বিভিন্ন পথগামী বিভিন্ন তর্কের নানা মীমাংসায় সংসার ভরিয়া রহিয়াছে। কেহ পরকে তর্ক-মীমাংসায় আত্মীয় করে, কেহ বা তর্ক মীমাংসায় আত্মীয়কে পর করে। কেহ মনকে বুঝাইতে পরকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বসে, আবার কেহ বা তাই করিতে ভাইয়ের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। যে যাহা করে শুদ্ধ আত্মতৃপ্তির জন্য। সুখ দুঃখ পরস্পর-সাপেক্ষ। মহামায়ার সুখটা কি বুঝিতে পারুক, আর নাই পারুক, সারদা নিজের সুখটি কোথায় আছে বুঝিয়া লইল! নিজে বন্ধ্যা ছিল—পুত্রের জন্য কত ঔষধ খাইয়াছিল, দেবতার কাছে কত মানসিক করিয়াছিল, কিছুই ফল পায় নাই! আজ দেবতার কৃপায় এই কন্যারত্ন পাইয়া সারদা সন্তানের অভাব ভুলিয়া গেল।

সারদা রাধারাণীর বাহুদুটি নিজের হস্তে ধরিয়া তাহাকে বক্ষে সংলগ্ন করিয়া বলিল,—"হাঁ রাধা, তুই কি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারবি?"

বালিকা বলিল,—"এখনও আমি তাহাকে তোমার মুখের ভিতর দিয়া যেন দেখিতেছি।"

"বুঝিয়াছি, তুই দেবী দর্শন করিয়াছিস। সে দেবী চুরি করিয়া আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছিল, তুই দেখাটা বাটপাড়ী করিয়া লইয়াছিস।"

সারদা উত্তর করিল—"যাই মা" নিম্নতল হইতে সারদার শাশুড়ী ডাকিলেন—"সারদা"। রমাপ্রসাদের মা বধূকে বধূ বলিতেন না। আর বধূ বলিলে সারদাও উত্তর দিত না। এই কথা লইয়া সারদার স্বামীর সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া মহামায়া ও তাহার কত প্রতিবাসিনী সহচরী তাহাকে কত রহস্য করিয়াছে। তথাপি সারদা কন্যা-বাৎসল্যে নাম ধরিয়া না ডাকিলে শাশুড়ীর কথায় উত্তর দিত না। স্বামীর সহিত সারদার বন্ধন-সূত্র কিরূপ ছিল, সারদাই জানিত, অন্য কাহাকেও জানিতে দিত না।

শাশুড়ী রাধারাণীকেও ডাকিলেন। রাধারাণী বলিল, "যাই পিসী।"

চুল যেমন তেমন বাঁধিয়া, রাধারাণীর মাথায় একটা গোঁজা করিয়া দিল, আরসী চিরুণী যেখানে হ'ক রাখিয়া সারদা রাধারাণীকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

১২

সারদার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি মহামায়ার প্রাণে এক দিনের জন্যও সুখ ছিল না। সে দেখিল, মেদিনীপুরের সেই বিপদ নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার বাড়ীর দ্বারে হত্যা দিতে আসিয়াছে। মনের কথা প্রকাশ করিবার লোক নাই—ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয়ভারে মহামায়া দুইদিনের মধ্যেই শীর্ণ হইয়া গেল। সারদার পত্রের উত্তর দিতে সাহস হইল না, স্বামীকে পত্র লিখিতে মহামায়ার হাত আসিল না।

এই রকমে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তাহাকে একাকিনী পাইয়া চারিদিক্ হইতে চিন্তা আসিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া বসিল. বালিকার মূর্ত্তিখানিও কিছুতে তাহার দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইল না। মহামায়া তাহাকে পুত্রবধূ কল্পনা করিয়া ভবিষ্যৎ সংসারের একটা ছবি আঁকিয়া দেখিল। দেখিল সে সংসারে কত সুখ।

বালিকার মা'র মুখে স্বামিনিন্দা শুনিয়া মহামায়া সে স্থান হইতে যত শীঘ্র পারিল পলাইয়া আসিল। আসিয়াই স্থির করিল, বালিকার সমস্ত বিবাহের ব্যয় সে নিজের স্কন্ধে লইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই সে বালিকার স্নেহে জড়ীভূতা হইয়া পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে কতবার স্বামীর সঙ্গে কলহ করিল। সাত দিনের পর আবার তাহার বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল।

পরদিন সারদার বাটীতে যাইবে মনস্থ করিয়া মহামায়া রাত্রে নিদ্রা গেল। ভোর হইয়াছে, কাক কোকিল ডাকিতেছে, মহামায়া যেই শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছে, অমনি বাহির হইতে কার যেন কথা শুনিতে পাইল—রাধারাণী! এ নামটা অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি যেন একবার কোথায় শুনিয়াছেন। ভাবিতেই তাঁহার মেদিনীপুরের কথা মনে হইল। তাহার বোধ হইল, এখনও যেন তার ঘুমের ঘোর রহিয়াছে—সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

মহামায়া কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া অবস্থিত রহিল। এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইল "রাধারাণী! রাধি! কোথায় গেলি!" মহামায়া শয্যা হইতে উঠিল, ঘরের দ্বার খুলিল। বাহিরে পাল্কীবাহকের মৃদু কোলাহল তাহার কানে আসিল। ভৃত্য সনাতন উপরে এমন সময় আসিয়া বলিল —"মা! পিসীমা আসিয়াছেন।"

মহামায়া বিস্ময়ের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে

না করিতে নীচে চাহিয়া দেখিল, সারদা সেই কন্যাটিকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

মহামায়া ছুটিয়া উপর হইতে নামিয়া গেল এবং বালিকাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া, সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল। তার পর এক হাতে সারদার হাত ধরিয়া, অপর হাতে রাধারাণীকে কোলে বাঁধিয়া উপরে ফিরিয়া আসিল।

সারদাসুন্দরী মহামায়াকে দেখিয়াই কত কথা বলিবে, কত তিরস্কার করিবে মনে মনে কল্পনা করিয়া, সারাটা পথ ঝগড়ার একটা পাকা মুখবন্ধ করিতে করিতে আসিতেছিল। আর মহামায়ার উপর তাহার যে কতটা আধিপত্য, তাহাও বিশেষ করিয়া রাধারাণীকে বুঝাইতেছিল। মহামায়ার বাড়ী ও তাহার নিজের শ্বশুরালয় এ দুটোর মধ্যে শুধু ইট, কাঠ, বর্ণ গঠন—এইরূপে গোটাকতক অতি বিনশ্বর পদার্থ লইয়া যা প্রভেদ, তাহাও সে অতীতের গল্পমালায় রাধারাণীকে বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিল, রাধারাণী বুঝিয়াছিল—পিসীমার এক বাড়ী হইতে সে যেন তাঁহার আর এক বাড়ীতে চলিয়াছে। সেখানেও সমান আদর, সমান যত্ন। সেখানেও তাহার বউদিদির প্রতাপে গৃহের অন্যান্য পরিবারবর্গ শশব্যস্ত।

কিন্তু মহামায়াকে দেখিয়া ও তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া সারদাসুন্দরীর কথা ফুটিল না। মহামায়ার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল ছুটিয়াছিল।

সারদা শুষ্কমাত্র বলিল—"তুমি আজ যাইবে, কাল যাইবে করিয়া প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। দিন গণিলাম, মুহূর্ত্ত গণিলাম! যখন দেখিলাম, কিছুতেই আসিলে না, তখন তোমার নূতন মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

মহামায়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ করিয়াছ। তুমি আমার জীবনদায়িনী।"

সারদা আর একবার মহামায়াকে ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল মহামায়া শীর্ণ হইয়াছে।

১৩

সমস্ত দিন মহামায়ার সহিত সারদার অনেক কথা হইল। সমস্ত ব্যাপার বিশদরূপে বুঝিয়া সারদা সমস্তা মীমাংসার সমস্ত ভারটা নিজের স্কন্ধে লইল। রাধারাণীকে শ্যামসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে এত বলবতী হইয়াছিল যে, কৃষ্ণধনকে যে কোন উপায়ে তাহার মতাবলম্বী করাই সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল। নহিলে সে আর তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না। স্বামী প্রতিবাদ করিলে তাঁহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না। বলুক লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞা, বলুক তাহাকে নারীসুলভ ধীরতা-বর্জিতা স্বাধীনা!

মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে সারদার মনে অনেক প্রশ্ন উত্থিত হইল। কেন, কুল ভাঙিলে ক্ষতি কি? ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে ইংরাজীভাবাপন্ন সমাজে, কুলকর্ম্মত্যাগী ধর্ম্মত্যাগী নিত্য পদলেহী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার সেই পুরাতন বাঙ্গালী প্রথা কেন? বাপ হাকিমী করিতেছে, ছেলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে—তাহাদের আবার কুল-গৌরবে কি অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে? আর রাধারাণীর সহিত বিবাহ দিলে কুলটাও একেবারে রসাতলে যাইতেছে না। বড় জোর ভঙ্গ হইবে। কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পাঁচ ছয় পুরুষ লাগিবে। শ্যামসুন্দরের পর পাঁচ ছয় পুরুষ! ততদিনে ওলাউঠা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাঙ্গালায় বাঙ্গালী থাকিবে কি?

মনে মনে তবে সারদা কৃষ্ণধনের ভ্রম বুঝিল, তাহাকে মূর্খ পণ্ডিত স্থির করিল। আর শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর মিলনে একটি সোনার সংসারের ছবি দেখিতে দেখিতে পাড়ায় বেড়াইতে গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় রাধারাণী বাড়ীর সম্মুখস্থ ছোট একটি ফুলের বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ইচ্ছামত ফুল তুলিতেছিল। সনাতন জিনিসপত্র আনিতে হাটে গিয়াছে। পাচিকার অসুখ হইয়াছে বলিয়া মহামায়া নিজেই রন্ধনের উদ্যোগে আছে। কাজেই বালিকা বাগানেই রহিল। বহুক্ষণ কেহ তার সংবাদ লইল না।

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণধন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গের ভৃত্য কলিকাতা হইতে আনীত দ্রব্যাদি আনিবার ব্যবস্থায় দূরে পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি একাই বাড়ী আসিতেছিলেন। বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ছোট বাগানটিতে একটি কাঞ্চনলতা ফুল-সাজে সাজিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে।

কৃষ্ণধন প্রথমে বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় দেখিতে দেখিতে শঙ্কায় পরিণত হইল। তিনি বুঝিলেন, মহামায়া আবার একটা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে! বিভ্রাট—কেন না, কৃষ্ণধন কলিকাতায় গিয়া শ্যামসুন্দরের একটা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কথা একরূপ পাকা হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য ভাবী বৈবাহিক তাঁহার গ্রামে আসিয়া পাকা দেখিয়া যাইবেন।

গৃহ-প্রবেশমুখে কৃষ্ণধন একবার দাঁড়াইলেন। বালিকা আপন মনে ফুল তুলিতেছিল, কৃষ্ণধন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। আর মহামায়া কি করিল, নিজেই বা তাড়াতাড়ি কি করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিয়া বুঝিলেন, সম্বন্ধ

স্থির করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তাঁহার মহামায়াকে একবার সংবাদ দিলে ভাল হইত।

সহসা বালিকার দৃষ্টি কৃষ্ণধনের উপর পড়িল। অস্তগমনোন্মুখ অরুণ-আভায় সুবর্ণ-রাগ-রঞ্জিত, অতসী-বর্ণা বালিকার মুখ-মণ্ডলশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের তারকাযুগল ভেদ করিয়া হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকা কে-ত-কে আসিয়াছে ভাবিয়া, আবার ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা!"

রাধারাণী মুখ ফিরাইয়া ইঙ্গিতে কৃষ্ণধনের বাড়ী দেখাইয়া দিল। তার পর আবার ফুল তুলিতে লাগিল।

চঞ্চল পদে এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত আকাশ-তলে গোলাপ-মল্লিকাদি-পুষ্প-শোভিত উদ্যানটির সমস্ত শোভা নিজের ক্ষুদ্র অঙ্গটিতে পুরিয়া, সেই বালিকা কৃষ্ণধনের অন্তরের স্তরে স্তরে ইন্দ্রিয়ের অনুপভোগ্য এক অপূর্ব্ব আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল, কৃষ্ণধন গলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, "কি করিলাম! মহামায়া পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষিনী। যদি শ্যামসুন্দরের জন্যই এই কন্যা আনিয়া উপস্থিত করে! যদি কেন, নিশ্চিতই সে পুত্রবধূ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে গৃহে আনিয়াছে। তা হইলে ত তাহাকে বলিবার কিছুই নাই!"

কৃষ্ণধন আবার প্রমাদ গণিলেন। বালিকাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন:—"এ বাড়ীতে তোমার কে আছে?

বালিকা বলিল—"মা।" মুখ না ফিরাইয়াই সে উত্তর করিল। মুখ না ফিরাইয়াই পূর্ব্ববৎ সে ফুল তুলিতে লাগিল।

কথাটা কৃষ্ণধনের পক্ষে হেঁয়ালির মত ঠেকিল, আর কোন কথা না কহিয়া, তিনি বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বাটিতে প্রবেশ মাত্রেই মহামায়ার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কৃষ্ণধন দেখিলেন, মহামায়া কৃশা ও মলিনা হইয়াছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার অবকাশ হইল না। আর মহামায়াকে শ্যামসুন্দরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে দিতেও তাঁহার সময় হইল না। তিনি একেবারেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাহিরে যে কন্যাটিকে দেখিলাম, ওটি কে?"

মহামায়া মৃদু হাসিলেন,আর বলিলেন—"সারদা আসিয়াছে, তাহার কাছেই সমস্ত শুনিতে পাইবে; আমি বলিতে পারি না।"

কৃষ্ণধন। বালিকার মুখে শুনিলাম, এ বাড়ীতে তাহার মাও আসিয়াছে।

মহামায়া। মা আইসে নাই। তাহার মা এই বাড়ীতে বরাবর বাস করিতেছে।

মহামায়ার উত্তরে প্রশ্নের কোথায় একটা মীমাংসা হইবে, না সেটা একটা উৎকট প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে কৃষ্ণধন মানসনয়নে তাঁহার বাড়ীর সকল গৃহ, বহির্ব্বাটী দালান উঠান এমন কি কাঠকুটা রাখিবার চালাগুলা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন! কই, কোথাও ত সেই বরাবর থাকা 'মা'টাকে দেখিতে পাইলেন না।

কৃষ্ণধন। তুমি আমাকে কি রহস্য করিতেছ?

মহামায়া। কবে তোমাকে আমি রহস্য করিয়াছি?

কৃষ্ণ। তাই বুঝি আজিকার এক রহস্যে তার শোধ লইলে!

মহা। তুমি রহস্য মনে করিলে, আমি আর কি করিতে পারি!

কৃষ্ণ। বালিকার মা বরাবর আমাদের বাড়ীতে থাকে, ইহার অর্থ কি!

মহা। অর্থ আমিই বা কি বলিব।

কৃষ্ণ। বরাবর থাকে, এমন ত কাহাকেও আমি দেখিতে পাইলাম না।

মহা। না পাও, সে গরীবের অদৃষ্ট।

কৃষ্ণ। সত্য মহামায়া, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মহা। তবে এইবারে প্রথম রহস্য করি। এত কথাতেও যদি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে হাকিমী করিতে সূক্ষ্ম বিচার কর কেমন ক'রে। তোমার এজলাসে তা হ'লে কেবল কাজীর বিচার হয় দেখিতেছি!

বলিতে বলিতে হতভম্ব কৃষ্ণধনের মুখের পানে চাহিয়া মহামায়া হাসি রাখিতে পারিল না।

কৃষ্ণ। তুমিই নাকি?

মহা। তা হ'লে বুঝিলাম, চোর ডাকাতগুলা একেবারে অবিচারে জেলে যায় না।

ক্রমে প্রহেলিকার মীমাংসা হইল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন—মহামায়া যে কৃষ্ণধনের স্ত্রী, মেয়েটা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিল। জানিয়া অন্তঃপুরস্থা মহামায়ার উদ্দেশে "মা মা" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহাদের গ্রামের চারিধারে ঘুরিতেছিল। শেষে পথ ভুলিয়া কেমন করিয়া কৃষ্ণধনের গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে কোন্ গৃহস্থ-কন্যা আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারে?

কৃষ্ণধন কতক কতক যেন বুঝিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—"মহামায়া! এমন সুন্দর বালিকা আর আমার চক্ষে ঠেকে নাই। তুমি যে ইহাকে পুত্রবধূ

করিবার জন্ম গৃহে আনিয়াছ, আমার মত লইবার অপেক্ষা কর নাই, ইহাতে তোমার কোনও দোষ দেখিতে পাই না; অধিকন্তু তোমার পছন্দের প্রশংসা করি। বলিতে কি মহামায়া! বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। মহামায়া বলিল—"তবু বালিকা ভাল খাইতে-পরিতে পায় নাই। এখানে কিছুদিন থাকিলে রূপ চারিগুণ ফুটিয়া উঠিবে।"

কৃষ্ণ। কিন্তু মহামায়া, বড়ই দুঃখের কথা, এবারেও তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

সাগ্রহে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

কৃষ্ণধন বলিলেন—"আমি শ্যামসুন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছি। কাল তাহারা পাকা দেখিতে আসিবে।"

মহা। এখনও নিষেধ করিলে চলে না?

কৃষ্ণ। চলিলে, আমি নিজেই এখনি নিষেধ করিবার জন্ম ফিরিতাম। কিন্তু সে উপায় নাই। দুই জন সবজজ, দুইজন মুন্সেফের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। তাহাও না হয় আমি কোনও প্রকারে ভঙ্গ করিতে পারিতাম। যাঁহার অনুগ্রহে ও সাহায্যে আমি এই উচ্চপদ পাইয়াছি, তিনিই এই সম্বন্ধে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার নিকট হইতে পুত্রকে কাড়িয়া লইয়া তিনি ভাবী বৈবাহিকের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। কাল তাঁহারা সকলেই এখানে আসিতেছেন।

মহা। তাঁহারা কি?

কৃষ্ণ। সাবর্ণ চৌধুরী। কলিকাতারই নিকটে বাড়ী। বড় জমীদার বার্ষিক প্রায় লক্ষ টাকা আয়। বাপের মেয়ের মধ্যে ওই একটি। বিশ হাজার টাকা নগদ আর পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি তোমার পুত্রকে দিবেন।

মহা। মেয়েকে দেখিয়াছ?

কৃষ্ণ। তোমার যেমন বুদ্ধি, সেই রকমই প্রশ্ন করিলে! মেয়ে না দেখে একেবারে পাকা দেখার আয়োজন করতে বসেছি? মেয়ে দেখতে মন্দ নয়।

মহা। মন্দ নয় মানে কি?

কৃষ্ণ। মানে তুমি ঘরে ব'সে গালে হাত দিয়ে বোস।

মহামায়ার মুখ আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু আর কোনও কথা না বলিয়া সে শুদ্ধ মাত্র স্বামীকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণধন উপরে গেলেন। মহামায়া আবার কৃষ্ণধনের আগমনে আহারাদির নূতন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল।

১৪

সারদা প্রতিবেশিনীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, কৃষ্ণধন আসিয়াছে। সে অমনি তাঁহাকে একটি গড় করিয়া আসিল। বেশী কোন কথা না কহিয়া শুদ্ধমাত্র শ্যামসুন্দরের কুশল সংবাদ লইয়াই কার্য্যব্যপদেশে আবার নীচে নামিয়া গেল। কৃষ্ণধনও তাহাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার অন্তরে তখন নানাবিধ চিন্তা আসিয়া কোলাহল উপস্থিত করিতেছিল।

একটু অধিক রাত্রে কৃষ্ণধন আহারে বসিলেন। সারদা তাঁহাকে বাতাস করিবার জন্য একখানি পাখা লইয়া তাঁহার কাছে বসিল। বসিয়া কৃষ্ণধনের সঙ্গে কিরূপ ভাবে কথা কহিবে, তাহার একটা খাঁজ মনে মনে গড়িতে লাগিল। সে মহামায়ার কাছে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিল।

সারদা পাছে কন্যার কথা পাড়িয়া একটা আব্দার তুলিয়া বসে, এই ভাবিয়া কৃষ্ণধনও মনে মনে তাহার মুখ বন্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। কোন মতে রাত্রি প্রভাত দেখিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। পরদিন শ্যামসুন্দর ও তাহার ভাবী শ্বশুর আসিয়া পড়িলেই, সারদা নূতন মেয়েটির জন্য আর তাহাকে বড় একটা জেদ করিতে পারিবে না, এটা তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

কৃষ্ণধন রমাপ্রসাদের ও তাহার মাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সারদা সংক্ষেপে উত্তর দিল। রমাপ্রসাদ আজিও আসিতে পারিল না বলিয়া, কৃষ্ণধন দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা মাতাকে গৃহে ফেলিয়া বিদেশে চাকরী করিতে পড়িয়া থাকা রমাপ্রসাদের মত সন্তানের তিনি উপযুক্ত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না, স্বাধীনভাবে যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, সে কেন পরের অনুগ্রহ ভিখারী হইবার জন্য লালায়িত—স্বাধীনভাবে যে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া যে দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সক্ষম, বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশিমণ্ডলী সকলকে লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে তার কেন প্রবৃত্তি হইতেছে না? দুই একদিন ছুটীর জন্য আজিও পর্য্যন্ত কেন যে সে হাঁ করিয়া সাহেবের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে, কৃষ্ণধন কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। রমাপ্রসাদের কথা হইতে চাকরীর কথা হইল, চাকরীর দোষগ্রাম খড়জ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমে উঠিল। বড় বড় বাক্য যোজনায়, বড় বড় পদবিন্যাসে, চাকচিক্যময় অলঙ্কার প্রয়োগে স্বাধীন জীবনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শ্যামসুন্দরকে যাহাতে আর

চাকরী করিয়া না থাইতে হয়, তাহারও একটা বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, এটাও সারদাসুন্দরীকে শুনান হইল। সারদা শুধু শুনিতে লাগিল, উত্তর করিল না।

এ কথা হইতে ও-কথা—এইরূপ কথার পর কথায় কৃষ্ণধন বহুক্ষণ সারদাকে চুপ করাইয়া রাখিলেন। তিনি বাক্যচ্ছলে সারদাকে এমন আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সারদা কন্যাটির কথা তাঁহার কাছে কাল পাড়িবেই স্থির করিল, আজ আর কথা কহিবার বাগ দেখিল না। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণধন নিজেই বিপদ ডাকিয়া উপস্থিত করিলেন।

ব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণধনের মুখে আজ বড়ই সুস্বাদু বোধ হইল। কৃষ্ণধন বলিলেন,—"রাঁধুনী কি সাতদিনের মধ্যেই হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে! সে এমন রান্না কেমন করিয়া রাঁধিল?"

সারদা বলিল,—"রাঁধুনীর জ্বর হইয়াছে। সে বাড়ী গিয়াছে।"

কৃষ্ণধন। এ ত মহামায়ার রান্না নয়। তা হইলে এতগুলা ব্যঞ্জন মুখে দিলাম, এখনও একটাতে লবণের স্বাদ পাইলাম না কেন?

সারদা। তার শরীর অসুস্থ, তাহাকে রাঁধিতে দিই নাই।

কৃষ্ণধন। তুই রাঁধিয়াছিস?

সারদা। আমার স্বামী ডাক্তার। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন সুসিদ্ধ না করিলে, ও তাহাতে মসলার আধিক্য থাকিলে, অম্ল ও অজীর্ণাদি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাঁহার আদেশ পালন করিলে আমি শুদ্ধ তরকারি সিদ্ধ করিতে ও আঁকাইয়া ফেলিতে শিখিয়াছি। রাঁধিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শাশুড়ী পর্য্যন্ত আর আমার হাতে থাইতে চান না।

কৃষ্ণধন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এখন কথার মীমাংসা না করিয়া কেমন করিয়া চুপ করিবেন। তাই বলিলেন,—"তবে বুঝি পাড়ার কেহ?"

সারদা বলিল,—"পাড়ার সহিত মহামায়ার সদ্ভাব নাই। মহামায়া নাকি আর তাহাদের খোঁজ লয় না। পূর্ব্ব সময়ে দয়াময়ী মহামায়া এখন তাহাদের ভাগ্যদোষে কৃপণ হইয়াছে।"

কৃষ্ণধন বড় ফাঁপরে পড়িলেন। সারদা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া মুখ নামাইয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিল।

কৃষ্ণধন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কে? আমি এমন রান্না আর কখন মুখে তুলিয়াছি, এমন আমার মনে হয় না।" কৃষ্ণধনের জানিবার কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সাগ্রহে বলিলেন,—"তবে কি মা আসিয়াছেন?"

সারদার মনে আনন্দ যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে গর্ব্ব আসিল। কৃষ্ণধনের মুখপানে চাহিয়া সারদা গর্ব্বভরে বলিল-"যথার্থই মা আসিয়াছেন। মা কমলা আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।"

কৃষ্ণধন সব বুঝিয়া নীরব হইলেন। আবার তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। সারদা বুঝিতে পারিল। আর কোন কথা কহিল না।

কৃষ্ণধন অবনত মুখে অন্নপাত্রে হস্ত রাখিয়া গম্ভীর স্বরে সারদাকে বলিলেন,—"সারদা!—কলিকাতার গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। মিথ্যা কথায় কত শাস্তি দিয়াছি, তার সংখ্যা নাই। বৃদ্ধকালে নিজেই কি সেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব?"

সারদা কি উত্তর দিবে বুঝিতে পারিল না।—কোন উত্তরও করিল না। ক্ষণেক নীরবে বসিয়া, একটু জোরে দাদাকে বাতাস করিতে করিতে বলিয়া উঠিল—"হাঁ দাদা, সাবর্ণের বাড়ীতে বিয়ে করিলে নাকি কুলভঙ্গ হয়?"

কৃষ্ণ। হয়।

সারদা এর পর কোনও কথা না কহিয়া কেবল বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু প্রশ্নটা বজ্রের ধ্বনির মত কৃষ্ণধনের কানে বাজিয়াছে। একটা কৈফিয়ত না দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"ছেলের কি শুধু রূপ দেখিয়া সে এত টাকা দিতে ব্যাকুল হইয়াছে?"

সারদা। কত টাকা।

কৃষ্ণ। সে তোর বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করিস্।

সারদা বুঝিল, প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই দাদার রাগ হইয়াছে, সুতরাং আর তাঁহাকে উত্তেজিত করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়া কেবল মাত্র বলিল, "আপনি আহার করুন।"

কিন্তু কৃষ্ণধন অন্নপাত্রে শুধু হাত রাখিয়া আবার বলিলেন, "সাবর্ণের বাড়ী স্বভাব কুলীন বিবাহ করিলে কুলভঙ্গ হয়, জান না?"

"জানিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন দাদা?" আহার সম্পূর্ণ না হইতেই কৃষ্ণধন আসন ত্যাগ করিলেন।

"ওকি দাদা, সবই যে পাতে পড়িয়া রহিল!

"পেট ভ'রে গেছে রে!"

হাতে জল দিবার জন্য সারদাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। কিন্তু বুঝিল, তাহারই প্রশ্নের দোষে দাদার আজ খাওয়া হইল না।

১৫

রাত্রে কৃষ্ণধন মহামায়ার কাছে বালিকার সমস্ত পরিচয়ই পাইলেন। মহামায়াও কৃষ্ণধনের কাছে শ্যামসুন্দরের

সম্বন্ধের সমস্ত কথা অবগত হইল। বুঝিলেন, নদীয়া জেলার কোন গ্রামে জয়রাম চৌধুরী বলিয়া এক জন জমীদার আছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র তারিণীচরণ। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বিষয় অনেক, সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট। দেশে ত কথাই নাই, কলিকাতাতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কলিকাতাতেও তাঁহার নিজের বাড়ী। পরিবারবর্গ লইয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি সহরে বাস করেন। শ্যামসুন্দর কালে কিরূপ সম্পত্তির কার্য্যতঃ অধিকারী হইবে, তাহাও তিনি মহামায়াকে বেশ করিয়া বুঝাইলেন। আপাততঃ জয়রাম শ্যামসুন্দরকে বিংশ সহস্র মুদ্রা নগদ দিবে। শ্যামসুন্দর আইন-শিক্ষার জন্য যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, ততদিন তার বিদ্যা-শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে তাহারা আপনা হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে! শ্যামসুন্দর গাড়ী-ঘোড়া চড়িবে, ভবিষ্যতে চাকরীর ভাবনা ভাবিবার তার বংশাবলীর আর প্রয়োজন হইবে না। কৃষ্ণধন এখন হইতে যাহা উপার্জ্জন করিবেন, মহামায়া তাহা দুই হাতে খরচ করিলেও তাঁহার তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকিবে না।

কৃষ্ণধন ইহা ছাড়া মহামায়াকে আরও অনেক কথা বুঝাইলেন। সহসা কোন কাজ করিতে নাই, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ না করিলে ভবিষ্যতে অনেক বিপদে ঠেকিতে হয়, মহামায়াকে উদাহরণ স্বরূপ করিয়া কৃষ্ণধন অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন।

মহামায়া বড় একটা জবাব দিতেছিল না। কেবল "হুঁ"—"তা ত বটে"—"বুঝিয়াছি"—ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণধনের বক্তৃতায় কেবল সায় দিতেছিল। তাই কৃষ্ণধন বুঝিয়াছিলেন, মহামায়া এতকাল পরে ভালমন্দ কাহাকে বলে বুঝিয়াছে। এক জন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রীর যোগ্য হইয়াছে। কৃষ্ণধন এত যে তর্ক-বিতর্ক, এত যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, সে কি শুধু মহামায়াকে বুঝাইবার জন্য? মহামায়াকে বুঝাইবার জন্য কখন ত তাঁর এত কথার প্রয়োজন হয় নাই। তবে বক্তৃতা বাগাড়ম্বর কেন? বালিকার মুখ দেখিয়া অবধি কৃষ্ণধন নিজেই কতকটা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মনটাই বিশেষরূপ অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

মহামায়ার স্থানীয় করিয়া কৃষ্ণধন সেই অবাধ্য মনকেই যথাসাধ্য প্রবোধ দিতেছিলেন। নিজে শ্বশুরের বিষয়ে অধিকারী হইয়া লুব্ধ, তিনি শ্যামসুন্দরকেও পরের ধনে অধিকারী দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। এক দিকে বিষয়-লোভ, অন্য দিকে অষ্টবর্ষীয়া নবাগতা বালিকার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লইয়া লড়াই করিতেছিল। কলিকাতার মেয়েটি সুন্দরী বটে, কিন্তু এ হতভাগ্য মেয়েটা যে রূপের সাগর! তাহার উপর এ মেয়েটা শ্বশুর-শাশুড়ী-গুরুজনের সেবার জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াছে—শুধু শিখিতে আসে নাই, শিখাইতে আসিয়াছে! ব্যঞ্জনের মিষ্ট-স্বাদ তখনও পর্য্যন্ত কৃষ্ণধনের মুখে লাগিয়াছিল। সহরে মেয়ে—বিশেষতঃ সহরে ধনীর মেয়ে শুধু পড়িতে জানে—কেমন করিয়া রাঁধিতে হয়, পুস্তকে দেখিয়াছে—হাঁড়ি দেখিয়াছে কি? সে হইবে স্বামীর সঙ্গিনী; এ হইবে সংসারের স্বেচ্ছা-প্রণোদিতা বিনা মাহিনার দাসী।

হউক আর নাই হউক, রাধারাণীকে দেখিয়া কৃষ্ণধনের সে বিশ্বাসটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর লোভেরই জয় হইল। মহামায়া তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছে ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে মন হইতে সরাইয়া দিলেন। মহামায়া যখন বশে আসিল, তখন সারদা আসিতে কতক্ষণ?—কৃষ্ণধন বক্তৃতা শেষ করিয়া মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল দেখি কাজটা কি মন্দ করিয়াছি?"

মহামায়ার উত্তর শুনিয়া কৃষ্ণধনের প্লীহা চমকিয়া উঠিল। মহামায়া বলিল—"কোন্ কাজ?"

"কোন্ কাজ কি মহামায়া!—এতক্ষণ তবে কি করিতেছিলে?"

"একটা কথা ভাবিতেছিলাম।"

কৃষ্ণধন বুঝিলেন,—এতক্ষণ তিনি ভস্মে ঘী ঢালিয়াছেন। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, একটা চুরুট ধরাইয়া মুখে ধরিলেন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এ তো দেখিতেছি সেই মহামায়া! সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা, পর-দুঃখ-কাতরা, সদাই অন্যমনস্কা সর্ব্বনাশী মহামায়া!

কৃষ্ণধনের অন্তর ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ হইয়া রহিল,—দেখিতে দেখিতে চুরুটটা ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। নিজের ও মহামায়ার মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ধূম্র প্রাচীর রচিত করিয়া অবশিষ্ট চুরুটটাকে ভূমে নিক্ষেপিয়া কৃষ্ণধন চিৎ হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িলেন।

মহামায়া উপযাচিকা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহারা কি কুলীন?"

কৃষ্ণধন উত্তর করিলেন না।

মহামায়া। বল না, চুপ করিলে কেন?

কৃষ্ণধন। আমি তোমার মত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না। সাবর্ণ চৌধুরী আবার কোন্ কালে কুলীন হইয়াছে! তাহারাই এতকাল ধরিয়া কুলীনের কুল ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

কোনও উত্তর না দিয়া মহামায়া কৃষ্ণধনের সম্মুখে যেন পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণধন তখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—জয়রাম চৌধুরীর পৌত্রী—সুন্দরী কন্যা, প্রকাণ্ড জমিদারী, অনেক টাকা, সুন্দর বাড়ী, সুন্দর বাগান, গাড়ী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, মান-সম্ভ্রম।" এক দিকে কুল, অন্য দিকে এই সমস্ত প্রলোভন। কুলকে লঘু দেখাইবার জন্য কৃষ্ণধন প্রতি কথাটায় জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এবারে ক্রিয়া কর্ম্মগুলা তাঁহার আন্তরিক ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া চুরুটের ধূমের সঙ্গে উড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব বারে তিনি যেরূপ গুছাইয়া কথা কহিয়াছিলেন, এবারে সেরূপ পারিলেন না। সে কথাগুলো মহামায়ার কর্ণগোচর হইলে কাজ হইতে পারিত, এবারে হইবে না।

মহামায়া কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"সমস্তই হ'ল বুঝিলাম, কিন্তু কুলটি ত ভাঙ্গিয়া গেল!"

"তোমার ওই মেদিনীপুরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিলেও ত কুলটি ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

"তার সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে আর ত আমি কখন তোমাকে অনুরোধ করি নাই।"

"তবে ওটিকে এখানে আনা হইল কেন?"

"আমি ত আনি নাই, সারদা আনিয়াছে। আমি জানিলে, আনিতে নিষেধ করিতাম।"

কৃষ্ণধন একটু উগ্রভাবে বলিলেন—'কুলভঙ্গে ক্ষতি কি? যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর কুল-গর্ব্ব কয় দিন থাকিবে? জয়রাম বৃদ্ধ বলিয়া কুলের মর্য্যাদা রাখিতেছে। পুত্র তারিণীচরণের কাছে কুলের এত মূল্য হইত কি?"

মহামায়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কুলই যদি ভাঙ্গিতে হইল, তবে মেদিনীপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা কি অপরাধ করিয়াছিল?"

কৃষ্ণধন বুঝিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে,; শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, স্বভাবতঃ ধীর—তিনি প্রাণপণে আত্ম-সংযমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহামায়ার কথায় তাঁহার সে চেষ্টা একেবারেই গুঁড়াইয়া গেল। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত—বলিয়া উঠিলেন,—"ধন-সম্পত্তি, আমার একাল পর্য্যন্ত যা কিছু উপার্জ্জন, আমার গর্ব্ব-অহঙ্কার সমস্তই তোমার হইতে পারে, ঘর-জামাইয়ের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি?—কিন্তু কুল আমার, তোমার বাপের নয়। সে আমার ইচ্ছায় থাকিবে—আমার ইচ্ছায় ভাঙ্গিবে।"

"কি করিলে,—তুচ্ছ কথায় আমার বাপ তুলিলে?"

কহিতে কহিতে মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারায় জল ছুটিল। বসিতে পারিল না। আর কোনও কথা না কহিয়া নিঃশব্দে ধীর-পদ-সঞ্চারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ কৃষ্ণধন আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "কি করিলাম!"

তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে অবস্থিত রহিলেন। মহামায়াকে ফিরাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

তিনি বরাবর বাহিরে গিয়া ভৃত্য সনাতনকে পরদিন প্রত্যূষে একখানা পাল্‌কী আনাইতে আদেশ করিলেন। সকালেই তাঁহাকে একবার কলিকাতা যাইতে হইবে।

এরূপ আকস্মিক যাইবার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া যেমন সে প্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছে, অমনি এমন তিরস্কার সে শুনিল যে, এ বয়স পর্য্যন্ত আর কখনও সে এরূপ রূঢ় বাক্য প্রভুর মুখ হইতে শুনে নাই।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া প্রভুকে লুকাইয়া মহামায়ার কাছে তিরস্কারের কথা কহিল। বলিল—"হাঁ মা, বাবুর মেজাজ আজ এমন হইল কেন? কখন ত তাঁকে এমন দেখি নাই!"

তার সঙ্গে দুই এক কথা কহিয়াই মহামায়া বুঝিল, স্বামী তাহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলেন—"আমাকে তোমার চেয়েও রূঢ় কথা শুনিতে হইয়াছে। ওঁর শরীর মেজাজ দুই-ই আজ ভাল নয়। ওঁর কথায় উত্তর না দিয়া যা বলিয়াছেন করিও।"

মহামায়ার কথায় সনাতনের দুঃখ দূর হইয়া গেল।

১৬

বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণধনের রাত্রি কাটিয়া গেল। কৃষ্ণধনের যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন তিনি দেখিলেন—উষালোক ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। শুনিলেন—দোয়েল ডাকিতেছে। ক্রমশঃ দাস-দাসীগণ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল! মহামায়ার, সারদার কণ্ঠস্বরও ক্রমে ক্রমে তাঁহার কর্ণে গেল। তিনি ঘর হইতেই সারদাকে ডাকিলেন। সারদা আসিলে বলিলেন, "তোর বৌদিকে ডাকিয়া দে।"

কথায় ভাবে ও কৃষ্ণধনের মূর্ত্তি দেখিয়া সারদা বুঝিল, রাত্রে কিছু গোল বাধিয়াছে। সারদা মহামায়ার কাছে ছুটিল। প্রভাতালোকে মহামায়ার মুখ দেখিল। মহামায়া এমন সুকৌশলে মুখখানি হাসির আবরণে ঢাকিয়াছিল, কিছুতেই সারদা তাহাতে ভাব-বিকার দেখিতে পাইল না। তবু সে একবার রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা

করিল। বলিল,—"রাত্রে দাদার সহিত বুঝি ঝগড়া করিয়াছিস্ ?"

মহামায়া। কখন দেখিয়াছিস্ কি ?

সারদা। তবে দাদাকে কেমন কেমন দেখিলাম কেন ?

মহামায়া। তোমার দাদার অদৃষ্ট! তুমি ত চিরকালই তাহাকে কেমন কেমন দেখ।

সারদা। তুমি কি রাধারাণী সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিয়াছিলে ?

মহামায়া। তুলিয়াছিলাম।

সারদা। তার পর ?

মহামায়া। ভবিতব্য।

সারদা। সে কি কথা !

মহামায়া। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, রাধারাণীকে কন্যা বলিয়াছি, মায়ের চক্ষে তাহাকে চিরকাল দেখিব,—আদর যত্নের ত্রুটি করিব না।

সারদা। সে কি আমি পারিব না ? আমার পুত্র-কন্যা নাই। কন্যাত্বে গ্রহণ করিবার জন্য আমি মহামায়ার কাছে আসি নাই। মহামায়ার পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, তা'র আর কন্যার প্রয়োজন কি ?"

রাগে সারদা ফুলিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইল, কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল,—"শীঘ্র যাও, তোমার স্বামী কি জন্য তোমায় ডাকিতেছেন।" তার পর মহামায়া গেল কি না গেল, আর ফিরিয়াও দেখিল না।

মহামায়া বরাবর স্বামীর কাছে গেল। কৃষ্ণধন মহামায়াকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে তাহার হাত ধরিলেন, আর বলিলেন,—"মহামায়া! আমি অকৃতজ্ঞ নরাধম,—দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর।"

মহামায়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "ওকি বলিতেছ, তুমি কি পাগল হইয়াছ ?"

কৃষ্ণধন বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"বল, এখনই কলিকাতায় যাইয়া নিষেধ করিয়া আসি।

মহামায়া বলিল, "ছি! তা' করিলে লোক নিন্দা হইবে। তোমার মান-সম্ভ্রম, আমরা স্ত্রীলোক কি বুঝি ?"

কৃষ্ণধন সাগ্রহে বলিলেন,—"অনেক ভদ্রলোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। তাহার ভিতরে আমার সহপাঠী আছে, আমার চির উপকারী বন্ধু আছে। আমি পুত্রকে কলিকাতায় রাখিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, তাহারা জোর করিয়া তাহাকে তাহাদের গৃহে লইয়া গিয়াছে। বল এখন আর কি করিতে পারি ?"

মহামায়া বলিল—"আর কিছুই করিতে হইবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে ?"

৯৭

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই কৃষ্ণধনের গৃহে ধুম পড়িয়া গেল। দাস-দাসী সকলেই শুনিল,—"দাদা বাবুর বিবাহের পাকা দেখা হইবে; প্রভাত হইতেই উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই করিয়া রাখিতে হইবে, দাদা বাবুর হবু শ্বশুরের সঙ্গে অনেক হাকিমও আসিতেছে।" মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাদিগের মনে লাভালাভের খতেন খুলিয়া গেল—আগে হইতেই পাতা উল্টাইয়া হিসাব-নিকাশ মিলাইতে মিলাইতে তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া, সকল কার্য্যেই ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল। কেহ জেলে ডাকিয়া পুকুরের দিকে ছুটিল, কেহ ডাব পাড়িতে গাছে উঠিল, কেহ বা কোনও নির্দ্দিষ্ট কায না পাইয়া ভিতর হইতে বাহির ও বাহির হইতে ভিতর—শুধু কাজের আগ্রহ দেখাইতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতন আজ একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, অন্যান্য ভৃত্যগণকে শুধু কাজের উপদেশ দিতেই নিযুক্ত রহিল এবং এক হস্তে হুঁকা ও অন্য হস্তে কপোল ধরিয়া, তাহার যৌবনের কার্য্য-কুশলতার গল্প জুড়িয়া দিল। আর কেহ শুনুক আর নাই শুনুক—আপনার মনে সেকাল আর একালের সমালোচনায়, আজি-কালিকার ভৃত্যগণের অলসতার উপর দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দাসী রামমণি, সনাতনের দোসর—সে একগাছা ঝাঁটা হাতে লইয়া, বাটীর প্রাঙ্গণে কুণ্ডলিত অর্দ্ধনিদ্রিত কুকুরগুলাকে ঠেঙাইতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণধন নিজে যাইয়া প্রতিবেশী আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন—আর মহামায়া আত্মীয়া কুটুম্বিনীদিগকে ডাকিয়া আনিল। এক নিমিষে মহামায়ার ঘর কোলাহলে ভরিয়া গেল। আত্মীয় প্রতিবাসিনীগণ—আসিয়াই যে যাহার নিজের চাকরা বুঝিয়া লইল, মহামায়ার কাছে ভার লইবার অপেক্ষা রাখিল না। এতকাল পরে মহামায়া তাহাদের চক্ষে যে মহামায়া আবার সেই মহামায়া হইল। কেহ মহামায়াকে সদানন্দময়ী দেখিল, কেহ রুগ্না, কেহ বা মলিনা, কেহ বা কঠিনা—এক মহামায়া বহুরূপিণী সাজিয়া যেন তাহাদের এক এক জনের চোখের উপর এক এক বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠিল। মহামায়া সকলকে সমভাবে আপ্যায়িত করিল। আর আজীবন যাহাতে তাহাদের সহিত এইরূপ ভাবে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইতে পারে, তাহার জন্য সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল।

মহামায়া পাড়ার নিমন্ত্রণে বাহির হইবার পূর্ব্বে সারদাকে সমস্ত কথা শুনাইল আর বলিয়া রাখিল, "আমি দেখিতে পারি আর নাই পারি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়িত করিতে তোমার উপর ভার দিলাম।" সারদা

মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। মহামায়া তাহাই সম্মতির লক্ষণ স্থির করিয়া নিজ-কার্য্যে চলিয়া গেল।

মহামায়া চলিয়া গেলে, সারদা—রাধারাণীকে ডাকিল। রাধারাণী তখনও ঘুমাইতে ছিল; আর একটি মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নে দেখিতেছিল, মেদিনীপুরের সেই পথের পার্শ্বস্থ স্থান, যে স্থানে মহামায়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল, যে স্থানে একটি সুন্দর বালক মায়ের আদেশে নিজের গলা হইতে একগাছি সুন্দর হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিল। অনেক দিনের নিতান্ত বালিকা বয়সের কথা! জাগরণেই যাহা স্বপ্নের ন্যায় ক্ষীণ স্মৃতির সূক্ষ্ম রেখায় তার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে দুর্ব্বল বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজি স্বপ্নের সাহায্য পাইয়া, সে বাঁধনে কোথা হইতে যেন একটু বল আসিল। যৌবনোন্মুখী বালিকা সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখিতেছিল - দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছিল না। সহসা কোথা হইতে তাহারই মত আর একটি বালিকা আসিয়া সেই হার লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। বালিকা দারুণ মনস্তাপে চীৎকার করিয়া উঠিল; মা কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল না। চারিদিকে লোক। তাহারা বুঝি শুনিয়াও শুনিল না—তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য হার তাহাকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টাও দেখাইল না। সহসা কোথা হইতে এক দেবী আসিয়া উপস্থিত হইল— বালিকা বুঝিল, তাহাকেই রক্ষা করিবার জন্য। দেবী আসিয়াই কোমর বাঁধিল। কোমর বাঁধিয়াই সেই হারাপহারিণীকে ধরিল—ধরিয়াই হার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন নানাদিক হইতে লোক আসিয়া অপহারিণীর সহায় হইয়াছে। বহুলোক একদিকে, আর দেবী একদিকে, বালিকা দেখিল, দশভূজার মত তাহার রক্ষয়িত্রী দেবতা দশ হস্তে প্রহরণ ধারণ করিয়া দশদিক হইতে আগত শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার হার রক্ষা করিতেছে। আবেগে উৎকণ্ঠায় আশা-নিরাশায় ঘুমন্তেই বালিকা ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িল।

সারদার আহ্বানে তাহার ঘুম ভাঙিল। কিন্তু স্বপ্নের প্রভাব তখনও যায় নাই—ঘুমের ঘোর ঘুচিল না। অর্দ্ধ উন্মীলিত চক্ষে বালিকা দেখিল, সেই দেবী। কিন্তু তাহার হস্তে হার কই?

রাধারাণী উঠিয়া বসিয়াই জিজ্ঞাসিল—"বউ দিদি! আমার হার?"

এ কথা শুনিবামাত্র সারদা চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, নিদ্রিতা রাধারাণীর গলা হইতে কে বোধ হয় হার চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তার পর চিন্তিয়া দেখিল। কই! আসিবার সময় রাধারাণীর গলায় ত হার ছিল না। রাধারাণীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে নিরাভরণে মহামায়ার কাছে আনিয়াছে। তখন সারদা বুঝিল, রাধারাণী স্বপ্ন দেখিয়াছে।

সারদা সর্ব্বদাই রহস্যপ্রিয়া। যখনই সে বুঝিতে পারিল, বালিকা একটা না একটা কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছে, তখনই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"হার লইয়া এতক্ষণ টানাটানি করিতেছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কই?"

সামান্য কথা! কিন্তু সামান্য কথা সময়ে সময়ে কি অমিত বল ধারণ করে, তাহা কে বলিতে পারে! সামান্য কথায় কতলোক কতলোকের চিরশত্রু হইয়াছে; কত সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কত অঘটন সংঘটিত হইয়াছে! শুনিয়াছি—'বাসনা আলাও'—রজকী মুখোচ্চারিত এই সামান্য কথায় রাজ-সম্পদের অধিকারী প্রসিদ্ধ লালাবাবু গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন।

সামান্য কথায় সারদা একটা বিপত্তি ঘটাইয়া বসিল। রাধারাণী একটা অব্যক্ত ধ্বনির সহিত মায়ের নাম উচ্চারণ করিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতার মত আবার শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। সারদার দুইচার ডাকেও তার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না।

১৮

উঠিয়া বসাইবার অনেকক্ষণ পরে রাধারাণী চোক মেলিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন রাধা! তুই এমন হ'লি?"

রাধারাণী বলিল,—"মা কোথায়?"

সারদা বুঝিল, বালিকা জননীর সন্ধান করিতেছে। বুঝিয়াও যেন বুঝিল না। সে মহামায়াকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—

"মা পাড়ায় নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছে, আসিল বলিয়া।"

রাধারাণী বলিল—"আমাকে মা'র কাছে লইয়া চল।"

সারদা। কেন, তোর কি অসুখ করিতেছে?

রাধারাণী। না।

সারদা। তবে এত 'মা 'মা' করিয়া কাতর হইতেছিস কেন?

রাধারাণী। আমি মাকে দেখিব।

সারদা। কেন, তোর কি মন কেমন করিতেছে?

রাধারাণী উত্তর করিল না। সারদার ভয় হইল। বৃদ্ধা পরিচারিকা রামমণিকে ডাকিল। রামমণি সবে মাত্র কুকুর ঠেঙান কার্য্য শেষ করিয়া, বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কাজ না করিলে সে থাকিতেই পারে না। আজি কালিকার দাসীদের কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই, পরিচ্ছন্নতা জানে না, আটটার সময় উঠিবে, আর সূর্য্য পাটে না বসিতে

বসিতেই ঘরে যাইবার জন্ত ছটফট করিবে—ইত্যাদি কথায় নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্ত লোক খুঁজিতে চারিদিকে চাহিতেছিল, কাঁহাকেও দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সারদার স্বর তাহার কর্ণে গেল।

যেন কত কার্য্য করিয়া ক্লান্ত—হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঝাঁটা শোভিত শীর্ণ হস্ত দুলাইতে দুলাইতে, রামমণি সারদার গৃহে প্রবেশ করিল। সারদা তাহাকে দেখিয়াই বলিল,—"বউকে ডাকিয়া দে।"

রামমণি গৃহে প্রবেশ করিয়াই রোদনের সুর ধরিল,—এত লোকের মৃত্যুর হয়, আর আমার সঙ্গে মৃত্যুর কি যে আড়া-আড়ি, এতকাল ডাকিয়া ডাকিয়া চুলের টিকিটি পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম না।"

সারদা। যা' বলিলাম, শুনিলি কি?

রামমণি। শোনবার আর সময় পাই কই পিসী মা! তোমার মধু-মুখের কথা কতকাল শুনি নি। শোনবার জন্ত কাল থেকে ছট্‌ফট্ করিতেছি। তা' এ পোড়া অবকাশ আর ঘটিয়া উঠিল না!

ঘরের কোণের প্রান্ত-সংলগ্ন গোটাকতক ধূলিকণা তীব্র জ্যোতিতে তাহার চোখের তারা যেন পুড়াইয়া খাইতে লাগিল। রামমণির কিছুতেই তাহা সহ্য হইল না। সে ঝাঁটা লইয়া ডাকিনীর মন্ত্রে অন্ত দাসীগণের গতরে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে, সেই ধূলি কয়টির মুণ্ডপাত করিতে ছুটিল।

সারদা একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—"ঝাঁটা রাখিয়া, শীঘ্র বউকে ডাকিয়া দে।"

রামমণি তখন বুঝিল, কাজ দেখাইয়া আর সে গিন্নীমার মন পাইতেছে না, অগত্যা সে ঝাঁটা বাহিরে নিক্ষেপ করিল। তখন রাধারাণীর দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। রাধারাণী তখনও পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শয্যায় শুইয়া ছিল। রামমণির হস্ত আপনা আপনি চিবুক স্পর্শ করিল। দন্তহীন বদন আপনা আপনি ব্যাদিত হইল। চক্ষু কপালে উঠিবার জন্ত ভ্রূযুগলকে ঠেলিয়া ধরিল, তোব্‌ড়ান গাল যতটা পারিল হাসি পূরিয়া ফুলিয়া উঠিল। সেই ভাবেই থাকিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল—"আ পোড়া কপাল! আমাদের ঘরের লক্ষী বউদিদি উঠিয়াছে, এতক্ষণ দেখি নাই!" এই বলিয়া সে ক'নে বউদিদির রূপের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল। রামমণি পূর্ব্বদিবসে এই রাধারাণীকে দেখিয়া, সারদা ও মহামায়ার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিল যে, এ স্বর্ণপ্রতিমা দাদাবাবুরই ঘরে আলো করিবার জন্ত আসিয়াছে। দাসদাসীগণের কেই বা তাহা না বুঝিয়াছিল?

বউদিদির রূপ হইতে রামমণি শ্যামসুন্দরের রূপে পড়িল—সারদা বড়ই বিরক্ত হইল। অন্ত সময়ে রামমণির প্রলাপ সারদার বড়ই মিষ্ট লাগিত। রামমনি নীরবে থাকিলে সারদা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহাকে কথা কহাইত। আর রামমণি একবার কথা ধরিলে, সে কথা-সরিৎসাগরে বাড়ীশুদ্ধ লোককে 'নাকানি চোবানি' না খাওয়াইয়া ছাড়িত না। সারদার এই স্বভাবের জন্ত কত দিন মহামায়ার কাছে তিরস্কার খাইয়াছে। আজ সারদা নিজ পাপের ফল অনুভব করিল। অনুনয়ে বৃদ্ধাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল।

অনুনয়ে বুড়ী আরও ফুলিয়া উঠিল। ফুলিতে ফুলিতে শ্যামসুন্দরকে ছাড়িয়া সারদাকে ধরিল। গুণবর্ণনচ্ছলে সারদার রূপের নানাপ্রকার দুরবস্থা করিয়া, নিজের পৈতৃকস্থান ঘেঁচুগ্রামের জলার সন্নিকটস্থ কোন এক আলাময়ী রূপসীর ষোড়শ বৎসরের রূপ লইয়া টান দিল। শেষে সুন্দরী হইতে সুন্দর আসিল। সুন্দর আসিল ত বর্দ্ধমান আর নিজ জেলায় থাকিবে কেন? রামমণি রূপের রূপান্তর করিয়া, সর্ব্বশেষে বর্দ্ধমান জেলার গুণবর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল!

সারদা বুঝিল, যে তুব্‌ড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছি, তাহা তাহাকে ক্ষার না করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না। কাজেই নিরুপায় বুঝিয়া নিজেই মহামায়ার সন্ধানে যাইবে মনস্থ করিল।

১৯

সারদা ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে প্রতিবাসিনী সঙ্গিনীগণের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে গেল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সঙ্গিনীগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারই কাছে আসিতেছে। তাহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিতে সে বাহিরে চলিল। যাইবার কালে রাধারাণীকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিল, "বিছানায় শুইয়া থাক্, আমি শীঘ্র ফিরিতেছি।" চৌকাঠে মাত্র পা দিয়াছে, অমনি বর্ষার জলপ্লাবনের ন্তায় কোলাহলের রঙ্গ তুলিয়া চারিদিক্ হইতে সঙ্গিনীগণ তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল।

এক জন বলিল—"এত বেলা হইতে চলিল, এখনও ঘরে রহিয়াছিস্। ব্যাপার কি সারদা?"

সারদার অহঙ্কার হইয়াছে; আর সেই জন্ত আদর অভ্যর্থনায় আজি-কালি সে কৃপণা - এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার ছিল না। কেন না, পূর্ব্বদিন সেই বাল্যের চিরানন্দময়ী মূর্ত্তিতে, ঘরে-ঘরে সে আনন্দ ছড়াইয়া

আসিয়াছে। কাজেই অন্য কিছু না বলিয়া সকলেই তাহার অদর্শন-জনিত একটা উৎকণ্ঠার পরিচয় দিল।

সারদা তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করত একটা বিশেষ কাজের অছিলা করিয়া শীঘ্র তাহাদের কাছে ফিরিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মহামায়ার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সারদা দেখিল, মহামায়া স্বামীর সহিত কি একটা কথা কহিতেছে। উপর-পড়া হইয়া কথা শুনায় তাহার কখনও প্রবৃত্তি ছিল না। কৃষ্ণধন ও মহামায়া কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই, সারদা এই অবকাশে ফিরিয়া আসিতেছিল। আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল—"সে কথা আমার মনে আছে, আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে সেইজন্য বালিকার পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম ; পত্রের উত্তর পাইয়া বুঝিয়াছিলাম, সে আমার কাছে একটি কাণা কড়িও লইতে চায় না!"

সারদার কৌতূহল হইল ; আর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া বসিল ; আড়ি পাতিয়া কৃষ্ণধনের ও মহামায়ার কথা শুনিতে লাগিল।

কৃষ্ণধন বলিতে লাগিলেন—"আমাদিগের কন্যা নাই। নলিনী নামে একটি পুত্র বধূ আসিতেছে। তখন রাধারাণী নামে একটি কন্যা আগে হইতে ঘরে ধরিয়া রাখি না কেন?"

সারদা শুনিয়া মনে মনে বলিল—"তা নহিলে চলিবে কেন? পুত্রবধূ লইয়া তাঁহার সাধ মিটিবে না, আবার কন্যা চাই! আর আমি শূন্য ঘর লইয়া, আনন্দ উপভোগের জন্য উঁহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকি!—এ নহিলে চলিবে কেন?"

কৃষ্ণধন আবার বলিলেন—"মহামায়া! ভালই হইয়াছে। রমাপ্রসাদের পুত্র-কন্যা কিছুই নাই—সারী পোড়ারমুখী পুত্র পুত্র করিয়া পাগল। আমাদের ঘরে কন্যারই প্রয়োজন—পুত্র-বধূ ত ইচ্ছা করিলেই আনিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি সুবর্ণ প্রতিমা কন্যা মিলে মহামায়া!"

সারদা জিব কাটিল নিজের স্বার্থপরতায় লজ্জিত হইল। "এমন সোনার দাদা! নিজের সমস্ত আমাকে দিয়াও তাঁর তৃপ্তি নাই ; এমন সোনার ভ্রাতৃজায়া! আমার জন্য কোন সামগ্রীটি সে আপনার বলিতে পারে না। একটা পরের মেয়ে আপনার করিয়া সেটাকে এখনি তাদের সামগ্রী বলিতে কাতর হইতেছি। আমার প্রাণের এমন সঙ্কীর্ণতা কেন আসিল? আসিল ত সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আসিল না কেন?"

সারদার পূর্ব্ব কথা সমস্ত এই সময়ে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সে অনুতপ্ত হইল। দুটি চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া তাহার হৃদয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

এদিকে কৃষ্ণধনের কথাও চলিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে তখন স্নেহের একটা আবেগ আসিয়া পড়িয়াছিল। "রাধারাণী আমাদের কন্যা। তাহার উপর একটি পুত্র-বধূ। একটিকে কন্যা করিয়া রাখিলে পুত্র কন্যা লইয়া যদি আমাদের চারিটি হয়—তবে এমন সহজ প্রাপ্য মহামূল্য ধন একটু বুদ্ধির দোষে হারাইবার প্রয়োজন? মহামায়া একটা কন্যা আর একটা পুত্র লইয়া, সারীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তুমি যে নিত্য তাহার সহিত কলহ করিবে, সেটি হইবে না। আমি রাধারাণীর একটি সৎপাত্রের সন্ধান করি। রমাপ্রসাদ আসুক, তাহাকে সমস্ত কথা বলিব, তুমি এদিকে রাধারাণীর বিবাহ দিতে যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় কর—আমি একটি কথাও কহিব না।"

সারদা নাক-কান মলিল।

মহামায়া বলিল—"বেশ, তবে সারদাকে বুঝাইয়া বল। সারদা বড় কষ্ট হইয়াছে।" কৃষ্ণধন হাসিয়া উঠিলেন। সারদা পালাইবার উদ্যোগ করিল।

সারদা চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় মহামায়ার স্বর তাহার কর্ণে গেল—"ওকি ঠাকুরঝি, আসিতে আসিতে পালাইতেছিস্ যে?—"

সারদা মুখ ফিরাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া মহামায়াকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল।

এমন সময়ে কৃষ্ণধন গৃহের বাহিরে আসিলেন। সারদাকে দেখিয়াই বলিলেন—"হাঁ সারি! পোড়ারমুখী, তুই নাকি রাগ করিয়াছিস্?—তা' সে রাগটা কি আমি দেখিতে পাই না?"

সারদা লজ্জায় ম্রিয়মাণা—কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। কৃষ্ণধন কহিলেন,—"যদি কিছু করিতে হয়, রমাপ্রসাদের সহিত পরামর্শ করিয়া করিব। আমি রমাপ্রসাদকে পত্র লিখিয়াছিলাম, এই দেখ্ তাহার সম্মতি আসিয়াছে।"—এই বলিয়া একখানা পত্র মহামায়ার হাতে দিয়া সারদাকে দিতে দিলেন।

সারদা পত্র লইল না। অবনমিত মস্তকে কেবল বলিল,—

"আমি না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি।"

কৃষ্ণধন। কেন, কাল আহারের সময় তোকে ত সমস্ত কথা কহিয়াছি। বলিয়াছি ত যে অনেক লোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। তোরা কি আমাকে মিথ্যাবাদী দেখিতে ইচ্ছা করিস্?

সারদা। বললুম ত, আমি না বুঝে অন্যায় করিয়াছি।

কৃষ্ণধন। অন্যায় করিয়াছিস্ কি? এখনও ত করিতেছিস্! এখনি তোর মুখে অভিমানের রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভিমান রাখিয়া, ভাবী বৈবাহিকের আদর-অভ্যর্থনার ভালরকম আয়োজন কর্। দেখিস্ যেন কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়। হ'লে তোর মুণ্ডপাত করিব।

আদেশ দিয়া কৃষ্ণধন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মহামায়া বরাবর নিরুত্তর ছিল, স্বামী চলিয়া গেলে কথা কহিল। বলিল—"রাধারাণী কি এখনও ঘুমাইতেছে?"

তখন সহসা তাহাকে সকল কথা বলিবার অবকাশ পাইল।

মহামায়া সারদার কাছে রাধারাণী সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া ছুটিয়া রাধারাণীকে দেখিতে গেল।

১৯

সারদা চলিয়া আসিলে রামমণি শুভ অবকাশে রাধারাণীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাকে নিবারণ করিবার লোক ছিল না; সুতরাং তাহার গল্প বন্ধ হইবারও উপায় ছিল না। সেই অপ্রতিহত-গতি গল্পের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে স্বপ্নের দেশ ছাড়িয়া রাধারাণী একটা নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। রামমণি গুছাইয়া গুছাইয়া বলিতে বলিতে সে দেশটাকে এত মধুর করিয়া তুলিয়াছিল যে, রাধারাণী সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। শয্যায় শুইয়া ছিল, একমনে গল্প শুনিতে শুনিতে তাহার আবার তন্দ্রা আসিল।

রামমণির কিন্তু নিবৃত্তি নাই। তবে তাহার সব কথা আর রাধারাণীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে পঁহুছিতেছিল না। অধিকাংশই তন্দ্রায় ডুবিয়া মরিতেছিল। কিন্তু যা' দুই একটা ফাঁক পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছিল, তাহারা অযুত হস্তীর বল ধরিয়া তন্দ্রাটিকে তোলপাড় করিতেছিল।

আহা কি সুন্দর দেশ! চারিধারে আবেগময়ী নদী; উপরে আবেগময় লোহিত, পীত, হরিৎ খণ্ড খণ্ড মেঘ; পদতলে নবদূর্ব্বাদলময় প্রান্তরের উপর, তরুর গায় বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজি মাথায় লইয়া আবেগময়ী লতিকারাজি। এমনই মধুর দেশে রাধারাণী যাইয়া পড়িয়াছিল; রাধারাণী আপনাকে সেখানকার রাণী দেখিতেছিল। কিন্তু শ্যামসুন্দর কে?—

রামমণি একশতবার শ্যামসুন্দরেরই বা নাম করে কেন? শ্যামসুন্দর কি সে দেশের রাজা। শ্যামসুন্দর!—আহা কি শ্যামসুন্দর! রাধারাণী ভাবিল, শ্যামসুন্দর সেখানে থাকিলে সে দেশ আরও কত সুন্দর হয়!

রামমণি বলিতে লাগিল—"দেখ ভাই! শ্যামসুন্দর আসিলে, এতদিন দেরী হইল কেন বলিয়া ছুটিয়া গিয়া যদি তার কান মলিয়া দিতে পারিস্, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোকে আমি আমার দমা হার ছড়াটা বক্‌সিস্ দিই। তোর শাশুড়ী এই তিন-কালখাকী বুড়ীকে এই হার ছড়াটা দান করিয়াছে। আমি সে হার লইয়া কি করিব? যতক্ষণ না তোকে দিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই। এখনই দিতে পারি, তবে তোদের দু'টিকে একসঙ্গে না দেখ্‌লে আমার হাত উঠ্‌ছে না।"

রাধারাণী এত কথার মধ্যে শুধু শুনিল "শ্যামসুন্দর," আর দেখিতে পাইলে তাহার কান। কিন্তু সে কর্ণে তাহার হস্ত উঠিল না। সে শুধু কাছটিতে গিয়া দাঁড়াইল। রাধারাণীর ইচ্ছা, সেই নদী-বেষ্টিত-প্রান্তরে, শ্যামসুন্দরকে লইয়া মনের সাধে একবার ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।

বেড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে, পার্শ্বস্থ সলজ্জ শ্যামসুন্দর বশে আসে আসে হইয়াছে—এমন সময় মহামায়া ও সারদা সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই মহামায়া রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ হইয়াছে মা রাধারাণী!"

রামমণি অমনি ব্যাঘ্রীগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল—"বালাই, শত্রুর অসুখ হোক। বউদিদির সহিত গল্প করিতেছি, মন দিয়া শুনিতেছে কেমন দিদি! গল্প মিষ্ট লাগিতেছে ত?"

মহামায়ার আগমনে, তাঁহার বাক্য শ্রবণেও রাধারাণীর তন্দ্রা ভঙ্গ হয় নাই। তন্দ্রার রাজ্যে সে একটা বড় বিপদে পড়িয়াছে। সে শ্যামসুন্দরের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কথা শুনিতেছে, কিন্তু আঁখির পূর্ণবিস্ফারণেও তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছে না। যেন একখণ্ড তড়িৎবরণী সৌদামিনী সেই স্বপ্নরাজ্যের রাজার মুখের উপর দিয়া চলাচল করিতেছে।

রাধারাণী রাজাকে মেঘখানা সরাইয়া দিতে অনুরোধ করিল।

রাজা বলিল—"পারিব না।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে রাধারাণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পারিবে না? কথাটা তিন জনেরই কানে গেল। রামমণি অবাক হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একবার মহামায়ার মুখপানে, আরবার সারদার মুখপানে চাহিল। তার পর বলিল—"যথার্থই মা, রাধারাণী আমার গল্প শুনিতেছিল—কত সায় দিল, কত মুচকিয়া হাসিল। আমি দেবতার দিব্য বলিতে পারি, একটি কথাও মিথ্যা নয়।" মহামায়া সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে গৃহের কি কি

কাজ করিতে হইবে, দেখিয়া শুনিয়া করিয়া লইতে বলিলেন। রামমণি দিব্যের উপর দিব্যযোগ করিল।

সারদা হাসিয়া বলিল—"তোর গল্প টিকটিকিটা পর্য্যন্ত শুনিয়াছে।"

তাহার গল্প আজ কেহই শুনিল না বলিয়া রামমণি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। গোলের মধ্যে পড়িয়া রাধারাণীরও তন্দ্রা ভাঙ্গিল।

২৩

কৃষ্ণধন সারদার কাছে শুনিলেন, রাধারাণীর বড়ই অসুখ হইয়াছে। প্রাতঃকালে সে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, এখনও দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ শোধরাইতে পারে নাই। শুনিয়া কৃষ্ণধন ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ডাক্তার আসিলেন—আসিয়া রাধারাণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় একটা রোগ হইয়াছে—এটা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। আর এ রোগের প্রধান কারণ শরীরের কোন না কোন স্থানে থাকা সম্ভব, ইহা স্থির করিয়া, একটা শব্দমান যন্ত্র দিয়া শরীরের চারিদিকে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেন! ভয়ে রোগ নীরব—তবু কি তার নিস্তার আছে? মুখের ভিতর দিয়া বটিকারূপ শব্দভেদী গুলী নিক্ষেপের আয়োজন হইল। রোগীর উপসর্গ—চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, সাত ডাকে কথা বাহির হইতেছে না। প্রশ্ন করিলে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। সুতরাং রোগ লজ্জা। লজ্জা হৃদয়ের দারুণ দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া সংসারে বালিকা কেমন করিয়া চলিবে? সুতরাং এ দুর্ব্বলতা যেমন করিয়া হউক দূর করিতে পারিলেই, সমস্ত রোগটা দেহ হইতে ঝরিয়া যায়, বালিকাও চলিতে শিখে।

ডাক্তার বালিকাকে নির্লজ্জা করিবার ঔষধ লিখিয়া দিয়া, আর সাগু আহারের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে নিঃশঙ্ক-চিত্তে থাকিতে আদেশ দিয়া আপনার গণ্ডাটি বুঝিয়া লই-লেন। তার পর কৃষ্ণধনের সঙ্গে দুই চারিটি মিষ্টালাপ করিতে করিতে—অর্থাৎ কৃষ্ণধন দেশে থাকিলে সাধারণের যে একটা বিশেষ উপকার, এই কথা বুঝাইতে বুঝাইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণধনের গৃহে এই ভীষণ সংক্রা-মক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল! নতুবা আর কারও ঘরে হইলে সে ডাক্তার ডাকিত না। কাজেই রোগও ধরা পড়িত না। তাহা হইলে গ্রামের যে কি সর্ব্বনাশ হইত, তাহা কি কেহ অনুমানে আনিতে পারে?

ডাক্তার ডাকিতে ও ঔষধ আনাইতেই নয়টা বাজিয়া গেল।

এইবারে মহামায়ার অত্যাচার। মহামায়া রাধারাণীকে ঘর হইতে বাহির হইতে দিলেন না। বাড়ীর সব কাজ কর্ম্ম দেখিতে সারদাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনি রাধারাণীর শয্যা-পার্শ্ব দখল করিয়া বসিলেন। দুঃখিনীর একমাত্র ধনকে সঙ্গে আনিয়াছে। যার ধন, তাহাকে ফিরা-ইয়া দিতে পারিলেই সারদা নিশ্চিন্ত হইত। সে মহা-মায়াকে সমস্ত মনের কথা বলিল। মহামায়া সে দিনের মত রাধারাণীকে ছাড়িতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সারদা কি করে। বহুকাল পরে মহামায়াকে দেখিতে পাইয়াছে, তাহাকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবার অভিলাষ, তাহার একটুও ছিল না। কাজেই আর কোনও গোলযোগ না করিয়া সে মুখ টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারদা চলিয়া গেলে, মহামায়া রাধারাণীকে শয্যা হইতে উঠাইলেন। উঠাইয়া মুখ-চোক ধোয়াইয়া দিলেন। তার-পর অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইলেন। তার পর হস্ত দিয়া পৃষ্ঠ, বক্ষের উষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—ডাক্তার! পাগল, স্বামী পাগল, সারদা পাগল! অসুখ হইলে ত গা গরম হইবে, মুখ ভার ভার হইবে, সে সব কিছু হইল না ত অসুখ হইল কেমন করিয়া? মহামায়া এতক্ষণে বুঝিলেন—পাগল-দিগের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারও বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। নহিলে ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বে সে একবার রাধারাণীর গা দেখিল না কেন?

মহামায়া রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা! তোমার কি অসুখ হইয়াছে?" রাধারাণী কোনও উত্তর করিতে পারিল না। সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই, তাহার কি হইয়াছিল। তবে সারদা তাহাকে শুইয়া থাকিতে বলিয়াছিল, সে শুইয়াছিল। রামমণি বুড়ী তাহাকে মনো-রম গল্প শুনাইতেছিল, তাহার গল্পে তাহার নিদ্রার কিছু আধিক্য হইয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। তার পর ডাক্তারের আগমন ও তাহার প্রশ্ন-পরীক্ষায় সে কিছু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। রাধারাণী প্রথমে কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

মহামায়া যখন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বলিল—"কই, কিছুই ত অসুখ হয় নাই। আমি বুড়ীর গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।" অসুখ হয় নাই, তবে ডাক্তারকে দেখিয়া ভয় হইয়াছে।

মহামায়া আর প্রশ্নে বালিকাকে উত্যক্ত করিলেন না। রাধারাণীকে অভয় দিয়া ও বসিতে বলিয়া বাহিরে গেলেন, বালিকা একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল। সে স্বাভাবিক একটু চঞ্চলা, কাজেই চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। বালিকা ঘরের মধ্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

ঘরটি সারদার। শ্বশুর-গৃহ হইতে এখানে আসিলে সে এই ঘরেই থাকিত। না থাকিলে, ঘর বন্ধ থাকিত। রামমণি সকাল-সন্ধ্যায় কেবল পরিষ্কার করিবার ও ধুনা দিবার জন্য দ্বার খুলিত। সপ্তাহে একবার করিয়া সনাতন দেরাজ, আলমারী ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামগুলি ঝাড়িয়া যাইত, বাড়ীর মধ্যে সকল গৃহের অপেক্ষা এই গৃহটিই বিশেষ রকম সজ্জিত ছিল। ইহার চারি ধারের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। একদিকের আলমারীতে সুন্দর সুন্দর কাচের পুতুল ও নানাবিধ দেশীয় বিদেশীয় শিল্প-দ্রব্য সুন্দর করিয়া সাজান ছিল, অন্যদিকের দেরাজের উপর একখানি বড় আয়নার উভয়পার্শ্বে কতকগুলি পুস্তক—সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, সুন্দর বাঁধাই—দাঁড় করিয়া সাজান ছিল।

বালিকা উঠিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে আলমারীর কাছে গেল, পুতুলগুলি দেখিল, কিন্তু হাত দিতে পারিল না বলিয়া তৃপ্তি পাইল না। তখন অন্যদিকে ফিরিল। দেরাজের কাছে আসিল। আয়নাতে নিজের মুখ দেখিল; তাহার ভাগ্যে এত বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আর কখন নিজের পূর্ণ গঠন দেখিবার সুবিধা হয় নাই। সে নানা ভাবে অবস্থিত হইয়া কখন সোজা দাঁড়াইয়া কখন বা ঈষৎ হেলিয়া কখন বা দেহযষ্টি নত করিয়া, প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল। একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা-শুভ্র দন্তগুলির দ্বারা অধর চাপিয়া দর্পণস্থা রাধারাণী দাঁতের শোভা দেখিয়া লইল, অধরোষ্ঠ পরস্পরের সংলগ্ন করিয়া, বামহস্তে টিপিল, তার পর একটু দুষ্টামির সহিত নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। সর্ব্বশেষে রসনাগ্রভাগ বাহির করিয়া কোন রাজ্য হইতে আগতা সেই রাধারাণীকে ভেঙচাইয়া ছবি দেখিতে গেল।

দেখিল, একখানা ছবিতে একটা কাক একটা ছেলের মাথায় ঠোকর মারিতেছে। প্রহারের চোটে ছেলেটা হাঁ করিয়া চীৎকারের ভাব দেখাইতেছে। মুখে সন্দেশ ছিল—সেটা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে, আর একটা কাক তাহা ঠোঁটে করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। লালা-নিষিক্ত অর্দ্ধচর্ব্বিত সন্দেশের কিয়দংশ, লালার সহিত মুখ হইতে ঝরিয়া চোখের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া লম্বোদরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছে। বালিকা কাক তাড়াইতে গেল, কাক উড়িল না। কাক ত রহিলই বালকের হাঁও স্বল্প প্রমাণ কমিল না, মাঝখান হইতে তাহার হাত লাগিয়া দেরাজস্থিত একখানা বই মেজেতে পড়িয়া গেল। অমনি সেই সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত আরও কতকগুলি পুস্তক দুপ্‌দাপ করিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' অবলম্বন করিল। রাধারাণী অপ্রতিভ হইয়া সেইগুলা তুলিয়া আবার সাজাইতে বসিল।

তুলিতে তুলিতে রাধারাণী দেখিতে পাইল, একখানি পুস্তকে কেমন সুন্দর একখানি ছবি রহিয়াছে।

সেখানি অ্যালবম্। তাহাতে কৃষ্ণধনের আত্মীয়-স্বজনের ফটো ছিল! সেখানি পড়িয়া উলটাইয়া খুলিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ পরে বালিকা দেখিবার একটি জিনিষ পাইল।

রাধারাণী ছবিতে দেখিল—একটি বৃদ্ধের মূর্ত্তি। তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুলও তথৈব চ, একটিও কৃষ্ণ নাই—অন্ততঃ বালিকা তাহার চিহ্ন দেখিল না। বক্ষের কেশও শুভ্র, বৃদ্ধ নগ্নদেহ। একখানি আসনে উপবিষ্ট—সম্মুখে অন্নব্যঞ্জন সমন্বিত একখানি প্রকাণ্ড থালা। থালার দক্ষিণপার্শ্বে গেলাস বেষ্টন করিয়া তদুপযুক্ত সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের বাটি। কোলে একটি শিশু; বালিকা শিশুটিকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। ভাবিল—সেটিকে একবার বৃদ্ধের কোল হইতে ছিনাইয়া লই। কিন্তু তাহা অসম্ভব বুঝিয়া বৃদ্ধের দাড়ী ছিঁড়িবার চেষ্টা করিল। তাহাও অসম্ভব বুঝিয়া পাতা উলটাইয়া দিল।

বৃদ্ধ, মহামায়ার পিতা—ভবতারণ চক্রবর্ত্তী—কোলে শিশু শ্যামসুন্দর।

পরপৃষ্ঠায়ও সেই বৃদ্ধ। কিন্তু এ বার বৃদ্ধ ব্যাধিতে দুর্ব্বল; শয্যায় শয়ান। মুখে মৃত্যুর ম্লানছায়া। তথাপি তাহার ভিতর হইতে সন্তোষামৃততৃপ্তের শান্তচিত্তের একটি মধুময় ভাব মরণাপন্ন বৃদ্ধের মুখ এক অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল রাখিয়াছিল। চারিধারে ঘিরিয়া তাঁহার কন্যা-জামাতা, দৌহিত্র, সারদা ও রমাপ্রসাদ দাঁড়াইয়াছিল। বালিকা তাহাদের প্রায় সকলকেই চিনিল। কেবল পারিল না—বালক শ্যামসুন্দরকে আর রমাপ্রসাদকে। বালিকা বিস্মিত হইল। ভাবিল, ছবির ভিতরে মানুষ কেমন করিয়া প্রবেশ করিল। বালিকা ছবিকে ছবিই জানিত। ছবি আবার বউদিদি হয়, এখানকার নূতন মা হয়!—বালিকার আরও চেনা মানুষ দেখিবার সাধ হইল!

পর পৃষ্ঠায় দেখিল, সেই বালক। শ্যামসুন্দর তখন অষ্টম বর্ষে পা দিয়াছে। রাধারাণী এই বালককে যেন কেমন কেমন দেখিল; দেখিতে দেখিতে ছবির শোভার অসম্পূর্ণতা তাহার চক্ষে ঠেকিল। তাহার গলে হার কই?

দূর পূর্ব্বগগনের উদয়োন্মুখী অরুণ প্রতিভার ন্যায় এক অপরূপ আনন্দের স্মৃতি তাহার কাছে ক্রমশঃ বৃহত্তর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আসিতে আসিতে পথের মধ্যেই তাহা মিলাইয়া গেল।

নীরবে অতিধীরে একটি কোমল দীর্ঘশ্বাস বালিকার

হৃদয় হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। বালিকা যেন কি করিবে—ঠিক না পাইয়া পাতা উলটাইয়া দিল।

পরপৃষ্ঠায় অষ্টাদশবর্ষীয় শ্যামসুন্দর। বালিকা সে মাধুর্য্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সমস্ত স্বপ্নটা তখন সজাগ হইয়া তাহার দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া বসিল! বালিকা কেবল দেখিল—শ্যামসুন্দর। সেই মুখ, সেই নাক, সেই মধুময় সরল দৃষ্টি, সেই মধুর অধর-সম্বদ্ধ হাসির রেখা—বালিকার হৃদয় আনন্দে, বিস্ময়ে, বিষাদে কেমন এক রকম হইয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন চারিদিক হইতে কত লোকে তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেছে!

তাহাদের সম্মুখে এমন করিয়া শ্যামসুন্দরের কাছে বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না, নূতন মা দেখিলে কি বলিবে? বউদিদি দেখিলে কি বলিবে? অন্যমনে রাধারাণী চারিদিকে চাহিল—কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন অতি সন্তর্পণে আলবম্ হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দোরের দিকে যেই মুখ ফিরাইয়াছে, অমনি তার নূতন মাকে দেখিতে পাইল,—তাহার হাত হইতে ছবি পড়িয়া গেল।

এমন সময় মহামায়া খাদ্য ও জলপাত্র হস্তে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মহামায়াকে দেখিয়াই রাধারাণী থতমত খাইয়া গেল। ভাবিল, বুঝি তাহার নূতন মা তাহার অপহরণ কার্য্য দেখিতে পাইয়াছে!

মহামায়া রাধারাণীর মুখের ভাব দেখিয়া ও চারিদিকে পুস্তকাদি ছড়ান দেখিয়া বুঝিলেন যে, চঞ্চল বালিকা হাত-পা নাড়িতে বইগুলা ফেলিয়া দিয়াছে। তখন তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলেন, "পড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আর ক্ষতি কি? এখনই সারদাকে পাঠাইয়া দিতেছি—সে সমস্ত গুছাইয়া রাখিবে।" এই বলিয়া রাধারাণীকে তুলিয়া তাহার মুখে-চোখে জল দিয়া মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর নিজহস্তে তাহাকে জল খাওয়াইতে বসিলেন।

রাধারাণী নীরবে নূতন মায়ের সব আদেশ পালন করিল—কোঁত কোঁত করিয়া মিষ্টান্নগুলা গলাধঃকরণ করিল, ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইল; পানান্তে মুখখানা মুছাইবার জন্য মহামায়ার হস্তে সমর্পণ করিল। কেবল বাহিরে যাইবার জন্য তাঁহার কোলে উঠিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কেন না, বক্ষে বস্ত্রমধ্যে সে শ্যামসুন্দরের ছবি লুকাইয়াছিল। কিন্তু মহামায়ার জিদে বাধ্য হইয়া বালিকা কোলে উঠিল। উঠিবার কালে ছবি মাটীতে পড়িয়া গেল। মহামায়া কিন্তু দেখিতে পাইলেন না—বালিকা পতিত চিত্রের পানে চাহিতেও সাহস করিল না।

২৬

ছবিপড়ার কথা সারদা মহামায়ার কাছে শুনিয়া ঘরে আসিল। আসিয়া দেখিল, রাধারাণী জিনিষ পত্রগুলি কতক কতক তুলিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানের যা ঠিক রাখিতে পারে নাই। পরিচ্ছন্নতা সারদার কার্য্যের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল—এই জন্য বাল্যের এই মুখরা বালিকাকে প্রতিবাসিনীগণ বড়ই ভাল বাসিত। কৃষ্ণধনের গৃহে আসিয়া সারদা দুই দিনেই মহামায়ার পিতার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল! এই গুণেই শাশুড়ী তাহাকে একদণ্ডও চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পারিত না—রমাপ্রসাদ বিদেশে গেলে প্রায়ই তাহাকে একা যাইতে হইত। এই গুণেই সারদার তিরস্কার খাইয়া মহামায়া চুপ করিয়া থাকিত, কৃষ্ণধন দোষ দেখিয়াও তিরস্কার করিতে পারিত না।

গৃহ অপরিষ্কার দেখিয়া সারদা জ্বলিয়া গেল। পোড়ারমুখী রাধারাণীকে কতকগুলা গালি পাড়িল। শেষ পুস্তকগুলা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলা—সাজাইতে লাগিল। আলবম্‌টি ভাল করিয়া সন্তর্পণে মুড়িয়া রাখিল। কার্য্য শেষ করিয়া কোথায় কি পড়িয়া আছে দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিল। দেখিল, কপাটের অন্তরালে দেরাজ হইতে দূরে শ্যামসুন্দরের একখানি ফটো পড়িয়া রহিয়াছে।

যেমন দেখা—অমনি সারদার মনে সন্দেহ আসিল। সারদা বুঝিল—এ সুন্দর ছবি দেখিয়া বালিকা নিশ্চয়ই তন্ময়ী হইয়াছিল, তাই সে আলবম্ হইতে এ ছবি বাহির করিয়া লইয়াছে। নহিলে এত সামগ্রী থাকিতে আলবম্ এত দূরে গিয়া পড়িল কেন? পড়িল ত খুলিয়া গেল কেন? আর খুলিল ত আরও অনেক চিত্রের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া শ্যামসুন্দরের—নবযৌবন-সুন্দর মধুর শ্যামসুন্দরের ছবিখানিই বা অতদূরে যাইয়া কপাটের আড়ালে লুকাইল কেন? মীমাংসায় উপনীত হইবার বিরুদ্ধে আমাদিগের নানা যুক্তিতর্ক করিবার অধিকার থাকিলেও সারদা একেবারে রাধারাণীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। এরূপ অন্যায় মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিলে হয় ত সে বলিতে পারিত,—'তাহার মন বলিয়াছে।' মনের উপর ত আর কারও কথা নাই। আমি দীনভিখারী, মনে মনে যদি আপনাকে বিশ্ব-রাজ্যেশ্বর জ্ঞান করি? শুনিয়া হাসিয়া তুমি বড় না হয় আমাকে পাগল বলিবে—আমার মনের তা'তে কি?

সারদা ভাবিল, তবে উপায়? শ্যামসুন্দরের ছবি দেখিয়াই যদি বালিকা আত্মহারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্যামসুন্দরকে দেখিলে—তাহার সঙ্গে দু'টো কথা কহিলে বালিকা যে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, তাহার ঠিক কি!

তার অভাগিনী মা অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ভুগিয়া তাহাদের গৃহে আসিয়া ছুইদিন মাত্র শান্তি পাইয়াছে—সবে ছুইদিন মাত্র তাহার মুখে হাসি আসিয়াছে—বিদ্যুৎ চমকের পর ঘনান্ধকারের মত ক্ষণিক হাসির বিকাশ দেখাইয়া সেই মধুর মুখখানি চিরজীবনের জন্ম ঘোর বিষাদ মাখিয়া থাকিবে? আর সারদাই কি হইবে এই অনিষ্টের মূল? ভাবিতে ভাবিতে সারদা প্রমাদ গণিল। ছবিখানি কুড়াইয়া, কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া বাহিরে লইয়া গেল।

২২

বাহিরে আসিয়া দেখিল—মহামায়া একটা বিষম গোলে পড়িয়া গিয়াছে,তাহার কোলে অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্তাকে দেখিয়া প্রতিবেশিনীমণ্ডলী চারিদিক হইতে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। বিপন্না রাধারাণী নিরুপায়—মহামায়ার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া চুপটি করিয়া রহিয়াছে।

বালিকা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে,—এ সব পরিচয় লইবার পূর্ব্বেই রাধারাণীকে ভাবী পুত্রবধূ স্থির করিয়া মহামায়াকে ঘেরিয়া তাহারা সমবেতস্বরে বালিকার রূপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

তনয়া ঠাকুরঝি বলিতেছিল—"আহা বউ! কি আর বলিব, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, পাকা চুলে সিঁদুর পরিয়া সকল সুখের অধীশ্বরী হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বাঁচিয়া থাক। এমন সুন্দর কন্তা আমি কখন দেখি নাই। শ্যামসুন্দরের যোগ্যই বউ হইয়াছে। শীঘ্র ছুই হাত এক করিয়া দে, আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"

এ কথায় মহামায়া উত্তর করিতে পারিলেন না। "ভবিতব্য" এই কথাটি বলিয়াই সকলের অলক্ষ্যে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন। সারদা আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্তার অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি না দিলে মহামায়াকে তাহাদের শ্রবণের অপ্রীতিকর কথা বলিতে হইত, বলিতে হইত—শ্যামসুন্দরের সহিত এক অজ্ঞাতকুলশীলা কন্তার সম্বন্ধ হইতেছে। বিধাতা বারবার উপঢৌকনস্বরূপ এ অমূল্য রত্ন তাঁহার কাছে আনিতেছেন, কর্ম্মদোষে তিনি আপনার বলিয়া তাহাকে বুকে ধরিতে পারিতেছেন না। দূর হইতেই সারদাকে দেখিয়া তিনি রাধারাণীকে তাহার নিকটে যাইতে আদেশ দিলেন এবং সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্ম তাঁহাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহামায়া যাইতে না যাইতেই আতরমণি পিসী বলিয়া উঠিল,—হাঁ মেয়ে দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু এ হইতে আর একটু ভাল হইলেই মেয়েটি নিখুঁত হইত।

সোনামণি খুড়ী সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—"তা হইলেই ত এ মেয়ের তুলনাই থাকিত না। তা যখন নাই, তখন একটু দোষ রহিল বৈ কি! তা একটু আধটু দোষ থাক, গৃহস্থের ঘরে এত নিখুঁত মেয়ের প্রয়োজন কি?"

পুঁটিঠানদি সোনামণির পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল, "তাই ত—রূপধন আজ-কালই যেন মেজেষ্টার হইয়াছে,—তা জন্ম জন্ম হোক্ তা বলিতেছি না, তবে কিনা এক দিন ত তার বড় কষ্টই গিয়াছে:—তার এত নিখুঁত বউএর দরকার কি?"

সারদা তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়াছিল। সে কার্য্যের ভান দেখাইয়া দূর হইতে যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাবে যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল, একটু একটু করিয়া ঈর্ষাপূর্ণ-হৃদয়াদিগের মনের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, তখন অগ্রসর হইয়া বলিল—"বুদ্ধিমতী মহামায়া ইচ্ছা করিয়াই খুঁতওয়ালা এই মেয়েটাকে ঘরে আনিয়াছে। নিখুঁৎ সুন্দরী দেখিবার চোখ জোগাঁয়ে অনেক আছে। তাহাদিগকে ঠকাবার জন্তই বিধাতা বালিকার অঙ্গে সুকৌশলে একটি খুঁত লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যদি তাহা বাহির করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের বাহাদুরী।"

সারদা রাধারাণীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতিবেশিনীগণ তাহার কথায় কোন উত্তর করিল না। সকলেই বুঝিয়াছিল, সারদা তাহাদিগকে মর্ম্মভেদী রহস্য করিতেছে। কিন্তু স্বভাব যে মরিলে যায় না! সারদার রহস্যে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার অনুপস্থিতে প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাহারা রাধারাণীর রূপকে সমবেত দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আক্রমণ করিল। তখন এক একটি করিয়া রূপের অসংখ্য দোষ বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাধারাণীর চোক ছোট হইয়া গেল, কান কিছু বড় হইল; চুল একটু একটু কটা হইল; ভয়ে কেশরাশি বেশী দূর লম্বিত হইতে পারিল না—মধ্যপথে পৃষ্ঠদেশে আসিয়াই যেন মিলাইয়া গেল। নাকে-মুখে-চোখে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুন্তল আপনি পড়ে নাই, মহামায়া মেয়েকে সুন্দরী করিবার জন্ম কোঁকড়াইয়া গুছাইয়া সাজাইয়া দিয়াছে। এক জন মেয়েটার যথার্থ একটা খুত বাহির করিয়া সকলকে একটু উঁচু গলায় শুনাইয়া বলিল "তোমাদেরও যেমন দৃষ্টি! উহাকে মেয়ে বলিল কে? মেয়ের মা বলা উচিত ছিল। ষোল সতের বছরের একটা বুড়ীকে কোলে তুলিয়া আমাদের কচি খুকী দেখাইতে আনিয়াছে।" মুহূর্ত্তের মধ্যে বালিকা কুৎসিতা হইয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিল। নতুবা অন্ধকার চক্ষাচোক্ষে যে বিষম ব্যাঘাত পড়িত তা'র জন্ম দায়ী হইত কে?

২৩

সারদা রাধারাণীকে আবার নিজ-গৃহে লইয়া গেল, ঘরের মধ্যে লইয়া আবার তাহাকে শয্যায় বসাইল। কোলে কোলে ঘুরিয়া রাধারাণী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে শয্যায় বসিয়াই শুইয়া পড়িল। সারদা ভাবিল, সে বুঝি চিন্তা-জ্বরে অস্থির হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ রাধা, আবার শুইলি যে?"

রাধা। আর আমি কোলে কোলে ঘুরিতে পারি না।

সারদা। তুই কি ছবি দেখিতেছিলি?

রাধারাণীর মুখ শুকাইল। সারদা বুঝিল, চোর ধরা পড়িয়াছে। মনে সুখও হইল, দুঃখও হইল। সুখ হইল—বুঝিয়া—প্রাণপ্রতিম শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া প্রাণপ্রতিমা রাধারাণী মুগ্ধ হইয়াছে। আমার ভালটিকে দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়—ইহা কে না কামনা করে? দুঃখ হইল—ভাবিয়া—ইহার কি পরিণাম!

"ভয় নাই রাধারাণী!—আমাকে ভগিনী জানিয়া নির্ভয়ে মন খুলিয়া বল্। আমার কাছে কথা না ভাঙিলে বলিবার যোগ্য লোক আর পাইবি না—বড় অসুখে দিন কাটাইতে হইবে। তুই কি আলবম্ খুলিয়াছিলি?"

রাধা। আমি খুলি নাই। ছবির বই পড়িয়া খুলিয়া গিয়াছিল।

সারদা। তবে কি ছবি দেখিস্ নাই?

রাধারাণী আবার চুপ করিল।—সারদাও আবার জেদ করিল। কথা না কহিলে, আর তাহাকে আপনার ভাবিবে না ভয় দেখাইল। বলিল—"মনে কর্ আমি তোর সখী।"

রাধারাণী হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—"তবে দেখিয়াছি।"

সারদা। কি দেখিয়াছিস্?

রাধা। এক বুড়োকে দেখিয়াছি, সে ভাত খাইতেছিল। তাহার কাছে একটি ছেলে ছিল। আমি তাকে ধরিব মনে করিয়াছিলাম।

সারদা। ধরিতে পারিলি?

রাধা। দেখ বউদিদি! দিব্য ছেলেটি!

সারদা। বল দেখি, অমন ছেলের মা যে, তার কত সুখ!—থাক্—আর কিছু দেখিয়াছিস্?

রাধা। তার পর দেখি, বৃদ্ধ বিছানায় শুইয়াছে। পার্শ্বে তুমি আছ, তোমার কাছে আর এক জন কে রহিয়াছে।

সারদা। তাহাকে কেমন দেখিলি?

রাধা। সুন্দর।

সারদা। পাশাপাশি দুই জনের মধ্যে কে বেশী সুন্দর?

রাধা। সে কে বউদিদি?

সারদা। আমার স্বামী।

রাধা। তবে তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। আর তুমি আরসীর সম্মুখে বসিয়া সগর্ব্বে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া, চোক-মুখের ভঙ্গী করিয়া চুল আঁচড়াইও না।

মহানন্দে সারদা রাধারাণীকে সবলে হৃদয়স্থ করিয়া তার মুখ বার বার চুম্বিত করিল। বলিল—"রাধারাণী! স্পষ্টভাষিণী! ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তুই যেন সুখী হ'স। সেই সুন্দর দেবোপম দেব-হৃদয় পুরুষটিই আমার হৃদয়-দেবতা। সেই জন্যই আমার এত তেজ। আর সেই শয্যাশায়ী বৃদ্ধ সমুদ্র মথিত করিয়া ওই সুধাভাণ্ডটি তুলিয়া আমায় ধরিয়া দিয়াছে। তাই তার পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম।"

সেই অশ্রু-স্রোতের অবশিষ্ট গোটাকতক বিন্দু সারদার গণ্ডে ঝর ঝর ঝরিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, সারদা রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ রাধা! তুই এই দুধের মেয়ে—কেমন করিয়া এরূপ গুছাইয়া কথা কহিতে শিখিল? তোর মা এরূপ কথা কহিতে জানে না, আর যে পারিবে, তা তার লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় না। তোর নূতন মা-ও এমন গুছাইয়া কথা কহিতে পারে না। আমি এই বয়সে শুধু ঝগড়া করিতে পারিতাম। এমন করিয়া কথা কই, এ বুদ্ধি আমারও ত তখন ছিল না।"

বালিকার মুখে বিজ্ঞার কথা! শুধু সারদার কেন, পাঠক-পাঠিকারও কর্ণে কথাগুলো কেমন কেমন ঠেকিতে পারে। তাঁহারা দেখিয়াছেন, "কুন্দ-কুসুম" ফুটিতে শিখিল না বলিয়াই, মনের আগুনে পুড়িয়া ফুটিবার মুখেই অঙ্গার হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞ নৈতিক অশিক্ষিতা প্রগল্‌ভা বলিয়া দুঃখিত হইতে পারেন। নীতিজ্ঞা বিদুষী বালিকা-বয়সে অসহনীয় জেঠামি উপলব্ধি করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। সহৃদয় গৃহিণী স্নেহবশে মৃদু হাসিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। রসাস্বসন্ধি যুবক মৃদুভাষিণী প্রণয়িনীকে শিক্ষা দান ছলে রাধারাণীর আদর্শ উপস্থিত করিতে পারেন। রসান্বসন্ধিনী প্রিয়তমকে সরস বাক্যে ব্যাকুল করিবার জন্য কোমর বাঁধিতে পারেন। সমালোচক আমাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারেন। আমরা এই চিত্রের প্রতিকৃতি যথাবৎ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে পারি, কৈফিয়ৎ দিতে পারি না।

প্রথমে রাধারাণী উত্তর করিল, আর এক দিন যেমন সারদার এই প্রকারের প্রশ্নে মস্তক অবনত করিয়া নখ খুঁটিয়াছিল, এবারেও তাই করিল।

সারদা। বলিতে কুণ্ঠিত হ'স, বলিবার প্রয়োজন নাই।

রাধা। কই, আর ত কখন কাহাকে বলি নাই। তুমিই বলাইতে শিখাইয়াছ, তাই আমি তোমাকেই কেবল বলি।

সারদা। শুনিয়া তৃপ্তি পাইতেছি বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রাধা। তুমি ঝগড়া শিখিয়াছিলে কেন?

সারদা। দারিদ্র্যে।

রাধা। আমিও দারিদ্র্যে পড়িয়া কথা শিখিয়াছি। তবে এতকাল সঙ্গীর অভাবে মনে মনে নিজের সঙ্গেই কথা কহিতাম। তোমার কাছে আসিয়া আমার মুখ ফুটিয়াছে। তুমি দারিদ্র্যে পড়িয়াও একটা বিষয়ে সুখী ছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। তুমি মায়ের স্নেহ উপভোগ করিয়াছ, আমি পিতার তিরস্কারে বঞ্চিত হইয়াছি। অথচ সে পিতার উপর এক দিনেরও জন্য ক্রোধ হয় নাই। পিতার মমতাও এক সময় অনুভব করিয়াছিলাম। সে স্নেহ ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। আট বৎসর সে স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া মা ও কন্যা দিবারাত্র কেবল তাঁর তিরস্কারের ভাগী হইয়াছিলাম। বৌদিদি! পাঁচ শত্রুতে পড়িয়া আমার পিতাকে পাগল করিয়াছিল। আর আমিই হইয়াছিলাম, সে সকল শত্রুতার মূল কারণ। আমি যদি না জন্মিতাম—

ভাবস্রোত বিপরীত মুখে ছুটিতে চলিল দেখিয়া, সারদা প্রারম্ভেই বাধা দিয়া বলিল—"থাক্ আর কাজ নাই। ভাল, ইহাকে দেখিয়াছিস্ কি?"

এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে শ্যামসুন্দরের ছবিখানি বাহির করিয়া রাধারাণীর চোখের সম্মুখে ধরিল। "ইহাকে দেখিয়াছিস্ কি?"

রাধা। দেখিয়াছি।

সারদা। কে জানিস্?

রাধা। জানি।

সারদা। কে?

রাধারাণী মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

সারদা। জানিস্ ত বল্।

তবু রাধারাণী উত্তর করিল না।

সারদা বলিল—"না, তুই জানিস্ না।"

রাধা। জানি।

সারদা চমকিল। ভাবিল, বালিকা বরাবর এই কয় বৎসর ধরিয়া বালক শ্যামসুন্দরের রূপের স্মৃতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছে! কৌতূহল হইল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন করিয়া জানিলি?"

রাধা। আমি তাহাকে বহু দিন আগে মেদিনীপুরে দেখিয়াছি।

সারদা। নাম জানিস্?

ঈষৎ হাসিয়া রাধারাণী উত্তর করিল—"শ্যামসুন্দর।"

২৩

সনাতন পাল্কী লইয়া কৃষ্ণধনকে সংবাদ দিল!

কৃষ্ণধন তখন ক্রোধোপশমে আপনার কাজে আপনিই লজ্জিত।

সনাতনকে দেখিয়াই বলিলেন—"পাল্কীর যা ভাড়া করিয়াছিস্, তাই দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দে।

সনাতন সে কথা শুনিবে কেন? সে যে তিরস্কার খাইয়া অতি অনিচ্ছায় রাত থাকিতে পাল্কী আনিতে ছুটিয়াছে।

সনাতন বরাবর বাটীর ভিতরে গেল। গিয়া মহামায়াকে বলিল—"মা! বাবুর জন্য পাল্কী আনিয়াছি, তুমি যাবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

মহামায়া নিমন্ত্রিতগণের জন্য আহার্য্য ফল, মূলাদি কাটিয়া কুটিয়া পাত্রে পাত্রে সাজাইতেছিল। সনাতনকে দেখিয়া বলিল—"তো'র বাবুকে একবার বাটীর ভিতর পাঠাইয়া দে।"

"তিরস্কার খাইতে কে যাইবে"—বলিয়া সনাতন্ বহুক্ষণ বিচ্ছিন্ন হুঁকা-সুন্দরীর সঙ্গে রহস্যালাপ করিতে চলিয়া গেল।

মহামায়া কাজ ফেলিয়া উঠিতে পারিল না। ভাবিল —স্বামী যায় যাক্—কলিকাতার বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেওয়া আমার কিছুতেই ত ইচ্ছা নয়। দুই দিনেই একমাত্র ছেলে পর হইয়া যাইবে।

মহামায়া আপন মনে কাজ করিতে লাগিল—সনাতন নিজ স্থানে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া আপন মনে তামাকু টানিতে লাগিল; বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

বেহারারা দেখিল, ট্রেণের সময় উত্তীর্ণ হয়। আর বেশী বিলম্ব হইলে সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিবে না ভাবিয়া, বাহিরে বসিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল।

শব্দ কৃষ্ণধনের কানে গেল। কৃষ্ণধন ডাকিলেন— "সনাতন!" সনাতন বেগতিক বুঝিয়া, তাহাদের পয়সা দিয়া বিদায় করিল। তবে বলিয়া রাখিল, বেলা নয়টার সময় অন্ততঃ চারখানা পাল্কী ইষ্টেশনে যাইবে। তাহারাও যেন যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

নয়টা বাজিল। মহামায়া দেখিলেন—বহুক্ষণ স্বামীর কোনও সংবাদ নাই। তবে কি ক্রোধের বশে তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়াই আহার না করিয়াই চলিয়া গেলেন! মহামায়া কাজ ফেলিয়া উঠিল—কৃষ্ণধনের সংবাদ লইতে লোক খুঁজিতে লাগিল।

মহামায়া দেখিল—রামমণি রাধারাণীকে পাড়া বেড়াইয়া সঙ্গে করিয়া আনিতেছে।

মহামায়া রামমণিকে বলিল—"উহাকে আমার কাছে রাখিয়া, দেখ দেখি বাবু বাহিরে কি করিতেছে। যদি দেখিতে পাস, তা' হ'লে বাটীর ভিতরে একবার আসিতে বল।"

রামমণি বলিল—"বাবু বাহিরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। এতক্ষণ বাবু বউদিদিকে লইয়া কত কথা বলিল—আদর করিয়া কাছে বসাইল। কোথায় কি রকম গহনা কেমন সাজিবে দেখিতে বাবু মেয়ের হাত-পায়ের গড়ন দেখিতেছিল। তার পর এ সোনার গায় কি রকম অলঙ্কারে সাজান যায়, ভাবিতে বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম, যখন বাবুর মুখে কথা ফুটিল না, মাথা টলিল না, তখন কি করি আবার বউ দিদিকে কোলে করিয়া আনিলাম। পাড়ায় যে দেখিয়াছে, সেই মেয়ের রূপের শত মুখে সুখ্যাতি করিয়াছে। বাবুও দূর হইতে আমার কোলে মেয়ে দেখিয়া কাছে ডাকাইয়া শ্যামসুন্দরের বউকে দেখিল। 'কেমন দিদি! শ্বশুরের সঙ্গে কথা কহিয়া তৃপ্তি পাইয়াছ ত? অমন গুণের শ্বশুর, এমন গুণের শাশুড়ী, সোনার স্বামী—অনেক পুণ্য করিয়াছ তা'ই পাইয়াছ'।"

মহামায়া রামমণির কথাটা শুনিয়া বাস্তবিকই উল্লসিত হইয়াছিলেন। রামমণি সর্ব্বনাশী যা বলিল, বাস্তবিকই কি সত্য? সত্যের একটু আভাস পাইয়া আর সংশয়ের দিকে চলিলেন না। দেবতাকে অনেক সামগ্রী মানিয়া ফেলিলেন। রামমণির আনন্দোচ্ছ্বাসে তিনি বাধা দিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু দেখিলেন—রামমণি বিনা বাধায় ত নিবৃত্ত হইবে না। কাযেই বলিলেন—"এখন কথা ছাড়িয়া যা' বলিতেছি তা' কর। শীঘ্র বাবুকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া দে।"

রাধারাণী কিছুক্ষণ মহামায়ার কাছে বসিল, তার পর বাল্যসুলভ চাঞ্চল্যবশে সমাগত দুই চারিটি প্রতিবেশিনী বালিকার সঙ্গে অন্যত্র চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সারদা মহামায়ার কাছে আসিল। আসিয়া রাধারাণী সম্বন্ধে সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক সে তাহাকে শুনাইয়া দিল।

মহামায়া বলিলেন—"সমস্তই বুঝেছি ঠাকুরঝি। বুঝিয়াও আমার কিছু করিবার উপায় নাই। তোমার দাদার যদি ইচ্ছা হয় সুখের কথা, না হইলে তাঁর কাছে আমি নিজে কুলভঙ্গের প্রস্তাব করিতে পারিব না।"

সারদা। যদি আমি করি?

মহা। তোমার দাদা কি মনে করিবেন। সে কথার ভিতরে আমি নেই?

সারদা। তবে এক কাজ করি না কেন, বউ?

মহা। তুই কি বলবি আমি বুঝেছি ঠাকুরঝি।

সারদা। খোকা আসবার আগে আমি রাধারাণীকে বাড়ী নিয়ে যাই না কেন?

মহামায়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। সারদা বলিতে লাগিল—"এখন দেখছি, তোমাকে পূর্ব্বে একবার না জানিয়ে হতভাগা মেয়েটাকে এখানে এনে অন্যায় করেছি।"

তথাপি মহামায়া চুপ করিয়া রহিলেন। সারদা বুঝিল, তার চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে। তাহার চক্ষুও আর্দ্র হইল।

"তাই ত বউ, তোমাকে কাঁদাবার জন্য—"

"ও কি বলছিস ঠাকুরঝি—"

"সত্যি বলছি বউ, এমন বোকামির কাজ আমি আর কখন করি নি।"

"চিরকালই বোকামির কাজ ক'রে এসেছিস। এই প্রথম বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিলি। কিন্তু ভাই, যখন বোকা ছিলি, তখন ভগবান্ তোর সহায় ছিল। যেমনি বুদ্ধির কাজ করিলি, অমনি ভগবান্ বিরূপ হ'ল।"

"ওই সমস্ত কথা শুনে তুমি কি মনে কর, মেয়েটাকে এখানে আর রাখা উচিত?"

"না।"

"তা হ'লে কলকেতা থেকে আসবার আগে আমি ওকে বাড়ী নিয়ে যাই। তারা সব কখন আসবে বউ?"

"এখন বেলা হ'ল কত?"

"ন'টা বেজে গেছে।"

"তবে ত তাদের আসবার সময় হ'ল। এগারটার সময় আসবার কথা।"

তা' হ'লে আমি এখনি রওনা হই।"

"সে কি, এত বেলায় না খেয়ে!"

"কতক্ষণ লাগবে—এখন বেরুলে বারোটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব।

"তা হ'তেই পারে না, সারদা?"

"তবে?"

"সে যা হবার হবে। তোর কি বুদ্ধি আছে, বাপের বাড়ী থেকে কাউকে কখন কি অনাহারে শ্বশুরবাড়ী যেতে শুনেছিস? ঠাকুর-জামায়ের অকল্যাণ করতে চাস?"

সারদা এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। মহামায়া বলিতে লাগিলেন—"আমি শিগ্‌গির তোদের জন্য দু'টো ভাত রেঁধে দি—তুই ততক্ষণ এ দিক দেখ। আর যাব বললেই বা কেমন ক'রে যাবি—সমস্ত পাল্কী এতক্ষণ বোধ হয় ইষ্টেশনে চলে গেছে।"

সারদাকে আপাততঃ যাইবার ইচ্ছা রোধ করিতে হইল। কিন্তু যাইবার সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল না।

২৪

"ডুলি ক'রে কে যাচ্ছে নিধে ?"

"পিসীমা, খোকা বাবু ।"

সারদা পাল্‌কী পায় নাই, হু'খানা ডুলির জোগাড় করিয়া একখানায় রাধারাণীকে বসাইয়া অপরখানায় আপনি বসিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়াছিল ।

রাধারাণীর ডুলি অগ্রে এবং কিছুদূরে পশ্চাতে সারদার ডুলি আসিতেছিল। বিদায় গ্রহণকালে মহামায়ার সঙ্গে কথায় তাহার কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তাহারা এখন বাড়ী হইতে ষ্টেশনের মধ্যপথে আসিয়াছে ।

শ্যামসুন্দরও কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিতে ঠিক ওই সময়ে ওইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

বেয়ারা নিধিরামের মুখে পিসীমার নাম শুনিয়াই শ্যামসুন্দর আর কেনেও কথা না কহিয়া ডুলির সমীপে উপস্থিত হইয়া ঢাকনি তুলিয়া ফেলিল। আবরণ উন্মোচন করিতেই পিসীমার পরিবর্ত্তে সে দেখিল, কখন-না-দেখা এক অপূর্ব্ব বালিকা ডুলির ভিতর বসিয়া রহিয়াছে ।

এ উহার মুখের পানে একবার মাত্র চাহিয়া যে যার পলক মুদ্রিত করিল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিদ্যুদ্দীপ্তির মত শ্যামসুন্দরের চোক ক্ষণেকের জন্য একটা বিপুল অন্ধকার মাখাইয়া তাহার মাথাটা যেন ঘুরাইয়া দিল। আবরণ পুনর্নিক্ষেপ করিয়াই সে নিধেকে বলিয়া উঠিল, "হাঁ রে হতভাগা, পিসীমা যাচ্ছে বললি যে!"

"কে রে—খোকা ?"

শ্যামসুন্দর ছুটিয়া তার ডুলির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

"একি পিসীমা, এমন সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"বাড়ী।"

"বাড়ী !—সত্যি ?"

"তোর সঙ্গেও কি তামাসা করব রে বোকা ছেলে! তা যা হ'ক, তুই একা আসছিস্ যে ? তোর হবু শ্বশুরদের আস্‌বার কথা ছিল, তারা কোথা ?"

"তারা এ গাড়ীতে আস্‌তে পার্‌লে না।"

"আসবে ত ?"

"তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব।"

"সত্যিই বল্‌তে পারিস্ না ?"

পথে লোকচলাচল করিতেছিল। সেখানে বহুক্ষণ কথা কহিবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, পথের পার্শ্বে জমীদারদের ঘাটবাঁধা পুকুরওয়ালা এক আমবাগান ছিল, সারদা বেয়ারাদের সেইখানে ডুলি দুটা লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

সেখানে রাধারাণীর ডুলি হইতে নিজের ডুলি কিছু দূরে রাখিয়া সারদা সঙ্গে-সঙ্গে আগত শ্যামসুন্দরকে পুনঃ প্রশ্ন করিল—"সত্যিই কি খোকা, তুই বল্‌তে পারিস্ না ?"

"তারা সব খাওয়া-দাওয়া ক'রে সাড়ে দশটার গাড়ীতে রওনা হবে।"

"খাওয়া-দাওয়া ক'রে কি রে ? তা হ'লে এখানকার সব উদ্যোগ আয়োজন ?"

"শ্বশুর বাবাকে টেলিগ্রাম করেছেন। তাঁর ছটার গাড়ীতেই আস্‌বার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দাদা-শ্বশুর নিষেধ করাতে আসতে পার্‌লেন না। কর্ত্তা বলেছেন, পাকা দেখার দিন কাটা-কুটি কোন জিনিষ মুখে তোলা চল্‌বে না—কেবল মিষ্টিমুখ ক'রে চ'লে আস্‌বে।"

"গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। এখনও পাকা দেখা হ'ল না, এরই মধ্যে শ্বশুর,দাদা-শ্বশুর! এর পর আমাদের উপায় হবে কি রে ?"

অন্যমনস্কতায় কথাটা কহিয়া শ্যামসুন্দর বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গেল। লজ্জা দূর করিবার অন্য কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে পিসীমার গলা দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। শৈশব হইতে পিসীমাকে ওইরূপ আদর দেখাইতে সে এতই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, তার বর্ত্তমান বয়সের অবস্থা এইরূপ ভাবে গলবেষ্টনে কিছুমাত্র তাহার মনে সঙ্কোচ উপস্থিত করিল না।

কিন্তু সারদার, পথের ধার বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে তার চোখে জল আসিলেও মনে সঙ্কোচ আসিল। তবে শ্যামসুন্দর বাহু বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া কেবল বলিল—"করিস্ কি, তুই কি এখনও সে পাঁচ বছরের ছেলে আছিস রে বোকা ?"

"আগে বল, তুমি এমন সময় বাড়ী থেকে চ'লে যাচ্ছ কেন ?"

"তোর মা-বাপের উপর রাগ ক'রে।"

শ্যামসুন্দর কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে পিসীমার গলা ছাড়িয়া বোকার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"বুঝতে পার্‌লি নি, কেন তোর মা-বাপের উপর রাগ করেছি ? তারা অর্থের লোভে তাদের একমাত্র সন্তানকে একটা বড় লোকের ঘর-জামাই ক'রে দিচ্ছে। তোকে এক রকম বিক্রি করেছে রে খোকা!" এই এক কথাতেই শ্যামসুন্দর ভবিষ্যতে শ্বশুর-গৃহে তার কি অবস্থা হইবে, বুঝিতে পারিল। সে একেবারে বলিয়া উঠিল, "পিসীমা, আমি সেখানে বিয়ে করব না।"

উত্তর শুনিয়া সারদা সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু একেবারে সে এরূপ উত্তর শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই বলিয়া বলিল

—"না, বাপ ও কথা বল্‌তে নাই। দাদা তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করছেন, তোর মায়েরও দেখলুম এ বিয়েতে অমত নেই। বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'তে নেই। তুই নিজে ঠিক থাকতে পারলেই হ'ল। এর পর শ্বশুর শাশুড়ীর বশ হয়ে আমাদের যদি না ভুলে যাস্, তা হ'লে বিয়ে করতে দোষ কি।"

"তুমি ফিরে চল" বলিয়াই শ্যামসুন্দর রাধারাণীর ডুলির পানে চাহিল! এতক্ষণ সে তার সম্বন্ধে কোনও কথা কহিবার অবকাশ পায় নাই।

রাধারাণী অনেকক্ষণ ডুলির ভিতরে চোরটির মত বসিয়াছিল! শ্যামসুন্দরের সঙ্গে এক অভাবনীয় রূপে চোখে-চোখে মিলন হওয়ায় সে কেমন হতভম্বের মত হইয়াছিল। দেখিবামাত্র সে শ্যামসুন্দরকে চিনিয়াছে।

বউদিদির ডুলি দূরে থাকিলেও সে তাহাদের আলাপের অনেক কথা শুনিয়াছে, ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া এবং অনেকক্ষণ ঘেরাটোপের ভিতর নীরব অবস্থানে বিরক্ত হইয়া যেমন সে আবার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া মুখটি বাহির করিয়াছে, অমনি শ্যামসুন্দরের চোখে আবার তার চোখ পড়িল। সে আবার আবরণের ভিতর মুখ লুকাইল।

"ও মেয়েটি কে পিসীমা?"

"তুই ওকে কেমন ক'রে দেখলি?"

"ভিতরে তুমি আছ মনে ক'রে, আমি ডুলির ঢাকনি তুলেছিলুম।" সারদা বুঝিল, শ্যামসুন্দর রাধারাণীকে চিনিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার পরিচয় না দেওয়া ভাল মনে করিয়া সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওটি আমার মেয়ে।"

"বল না, পিসীমা।"

"মেয়ে বললুম তোর বিশ্বাস হ'ল না!

শ্যামসুন্দর হাসিল।

"সত্যি রে খোকা, আমার ঘরে ছেলে-মেয়ে কিছু নেই দেখে ভগবান্ দয়া ক'রে উটি আমাকে দান করেছেন। বিশেষতঃ ওরই জন্য আমাকে বাড়ী যেতে হচ্ছে।"

শ্যামসুন্দর কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

কারণ আর মাথা-মুণ্ড কি সে তাহাকে শুনাইবে, তাই সারদা কথা ফিরাইতে বলিল—"হাঁ খোকা, কলেজের অনেক ছেলের সঙ্গে ত তোর আলাপ আছে, তা'দের ভিতর থেকে একটি গরিবের ছেলে আমাকে ব'লে দিতে পারিস্?"

"কেন?"

"আমার ওই মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর-জামাই ক'রে রাখব।"

"তা গরীবের ছেলে কেন?"

"তোমার মত হাকিমের ছেলেকে ঘর-জামাই করতে পারি, এত টাকা কোথায় পাবো?"

"আমি মনে করেছিলুম, তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।"

সারদা এইবারে কৌশলে রাধারাণীর একটু ইতিহাস দিবার সুবিধা পাইল। বলিল—"বিয়ে ত অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। ছেলে বেলাতেই ওর একটি ভাল সম্বন্ধ হয়েছিল—তোরই মত এক হাকিমের ছেলের সঙ্গে।"

কথাটায় একটু সুরের বিভিন্নতা অনুভব করিয়া সারদা শ্যামসুন্দরের মুখের পানে চাহিল।

"হ'ল না কেন, পিসীমা?"

"তুইই আঁচ ক'রে বল্ দেখি।"

"কোন জায়গায় বেশী পয়সার লোভে তার হাকিম বাপ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে, কথা রাখতে পারলে না; কেমন, না পিসীমা।"

"তা ছাড়া আর কি বলব। ওর বাপ ছিল অতি গরীব। সে যে কিছু জামাইকে দিতে পারত, তা আমার মনে হয় না।"

"সে হাকিমও কি আমার বাবার মত ছেলেকে ঘর-জামাই ক'রে দিয়েছে?"

"অত জানি না, তবে মনোভঙ্গে মেয়েটার বাপ্ শুনেছি পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন সেই অবস্থায় থেকে ব্রাহ্মণ মারা যায়। তার পর বুঝতেই ত পারছিস্ বাবা, একে কুলীনের মেয়ে, তাতে সম্পত্তির মধ্যে তার ওই একটু রূপ নিয়ে ত বরের মা ধুয়ে খাবে না—সেই জন্য আজও ওর বিয়ে হয় নি।"

"তুমি বাড়ী ফিরে চল।"

"সকলকে ব'লে কয়ে ঠিকঠাক ক'রে এতদূর চলে এসেছি—"

"তা হ'ক, তুমি ফিরে চল।"

"নে পাগলামি করিস নি। দুদিন পরেই ত আবার আমাকে ফিরতে হবে। আষাঢ়ের দোসরা তেসরার ভিতরেই তোর বিয়ে দেবার কথা হচ্ছে। আর আমাকে ফেরাবার জেদ করিস্‌নি। ছটার সময় গাড়ীতে উঠেছিস, মুখ দেখে বুঝতে পারছি, এখনো তোর কি; খাওয়া হয় নি! বেলা ঢের হয়েছে, এখনও আধক্রোশ রাস্তার উপর যেতে হবে, অসুখ করবে, বাড়ী যা।"

"ফিরে যাবে না?"

"না রে, ফিরে যাব ব'লে কি এমন দিনে অসময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।"

শ্যামসুন্দর পিসীমার জেদ জানিত, তবু সে আর একবার বলিল—"যাবে না ?"

নীরব হাসিতে সারদাসুন্দরী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল।

"যদি পিসে মশাই আসেন ?"

"তার আসবার কথা আছে না কি ?"

"কথা নেই ? আমার পাকা দেখায় পিসেমশাই আসবেন না ? বাবা কলকেতা থেকে তাঁকে টেলিগ্রাম করেছেন। তিনি এই তেইশ ডাউনে আসছেন। আসছেন কেন, হয় ত এতক্ষণ এসে পড়েছেন। আমি তাঁর অপেক্ষা করতুম, কিন্তু এঁরা এ গাড়ীতে আসতে পারলেন না, বাবা ভাবিত হবেন ব'লে আমি চ'লে এসেছি।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়েই কলিকাতাগামী ট্রেণের শব্দ পাইল।

"এই গাড়ীতে তোর পিসে মশাই আসছে না কি ?"

"নিশ্চয়—'না কি' কি ! এই আমার কাছে তাঁর টেলিগ্রাম। আমি তাঁর পাল্কী ঠিক ক'রে রেখে এসেছি। এইবারে ফেরো।"

"বেশ ত, একটু অপেক্ষাই করি, তিনি আসুন।"

"বাড়ীতে অপেক্ষা করবে চল না কেন !"

"এলেই বা তোর পিসেমশাই। সে এই শুভকর্ম্মে উপস্থিত থাকবে, তার থাকা হ'লেই আমার থাকা হ'ল।"

"তা হ'লে বুঝছি, ব্যাপার কিছু গুরুতর হয়েছে পিসীমা।"

"হয়েছে বই কি—নইলে তোর বিয়ের পাকা দেখা, আমি এ শুভকর্ম্মে যোগ না দিয়ে চ'লে যাচ্ছি।"

"কি হয়েছে বলবে না ?"

"তোর মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবি।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্যামসুন্দর চলিয়া গেল, যাইবার সময় একবার সে রাধারাণীর ডুলির পানে চাহিল, দেখিল, ডুলির আবরণ উঠিতে উঠিতে পুনর্নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থির হইয়া গেল।

শ্যামসুন্দর চলিয়া যাইবার একটু পরেই সারদা নিধিরাম বেয়ারাকে রাধারাণীর ডুলি নিকটে আনিতে আদেশ করিল। রাধারাণী নিকটে আসিতেই বলিল—"রাধারাণী !"

"কি বউ দি ?"

"চিনেছিস ?"

রাধারাণী চুপ করিয়া রহিল।

"বল্ না, মিছে লজ্জায় লাভ কি ?"

তবু রাধারাণী উত্তর করিল না। এই সময় নিধিরাম বলিয়া উঠিল—"আর বেলা বাড়িয়ে লাভ কি পিসীমা ! আমরা রওনা হই না কেন !"

"আর একটু বিলম্ব কর না নিধু, শুনছি বাবু এই গাড়ীতে আসছেন। তাঁর পাল্কি আসছে কি না, তুই একবার পথে দাঁড়িয়ে দেখ্ দেখি।"

নিধিরাম চলিয়া গেল।

রাধারাণী এইবারে কথা কহিল—"আর দেরী করছ কেন বউদি !"

"এই ত নিধেকে বললুম, শুনতে পেলিনি ?"

"দাদা বাবুর সঙ্গে পথেই ত আমাদের দেখা হ'তে পারত !"

"এদিকে খোকা বাবু যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত জেদ ধরেছিল। আমি যেতে চাইলুম না ব'লে সে অভিমানভরে গেল।"

"দাদা বাবু যদি ফিরে যেতে বলেন, তুমি কি ফিরে যাবে ?

"তুই ?"

"আমার আসবার ইচ্ছা ছিল না বউদি, খোকা বাবুর পাকা দেখা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল।" শুনিয়া সারদা চমকিল, তবে ত বালিকা সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে।

"তবে চল্ ফিরে যাই।"

"আর যাব না।"

"যদি তোর দাদা বাবু এসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ?"

"তুমি যাও।"

"আমাকে ত তা হ'লে যেতেই হবে, তাঁর কথা ত আমি কাটাতে পারব না।"

"তুমি যেয়ো।"

"তুই যাবি নি ?"

এমনি সময়ে নিধিরাম পথ হইতে বলিয়া উঠিল, "পিসীমা, জামাই বাবুর পাল্কী আসছে।"

উভয়েই তার আগমনের অপেক্ষায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল।

২৫

নিধিরামের মুখে স্ত্রীর অবস্থানের কথা শুনিয়া বিস্মিত রমাপ্রসাদ পাল্কী হইতে নামিয়া যেমন বাগানের ভিতর আসিতে লাগিল, অমনি রাধারাণী দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ততার সহিত আবার তার ডুলির মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, এক সৌম্য সুন্দর দেবতার মত পুরুষ তার মৃত পিতার অপূর্ব্ব সাদৃশ্য লইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এমন সাদৃশ্য যে, দেখিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে পিতা বলিয়াই তার ভ্রম হইল। সে দৃশ্য

সে সহ্য করিতে পারিল না। হৃদয়ের একটা তীব্র আলোড়নে অস্থির হইয়া সে ডুলির আবরণে মুখ লুকাইল।

সারদা সেটা দেখিতে পায় নাই। স্বামীর আগমন-বার্ত্তা শুনিবা মাত্র সে পিপাসুর দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়াছিল।

রমাপ্রসাদ নিকটে আসিয়া সারদাকে প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি?"

প্রথমে কোনও উত্তর না দিয়া সারদা পিছন পানে চাহিল। দেখিল-রাধারাণী নাই। বুঝিল, আজন্ম অপরিচিত ভাইকে প্রথম দেখিয়া একটা বিষম সঙ্কোচে বালিকা আত্মগোপন করিয়াছে। সব কথা বলিবার সুবিধা হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে আর না ডাকিয়া সারদা স্বামীকে আর একটু দূরে যাইবার ইঙ্গিত করিল।

ইঙ্গিতের কারণ নির্ণয়ে রমাপ্রসাদ আর একখানা ডুলি দেখিয়া বুঝিল, উহার ভিতরে তাহার মামাতো বোনটি বসিয়া আসে। সারদা দূরে লইয়া তাহাকে ওই বালিকার সম্বন্ধেই কিছু বলিবে, বুঝিয়া আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া সে সারদার অনুসরণ করিল।

অন্তরালে লইয়া যখন সারদা যথাসম্ভব সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল, তখন রমাপ্রসাদ আর হাসি রাখিতে পারিল না।

"হাসিলে যে?"

"যতগুলা পাগলের একত্র মেলা হইয়াছে বুঝিয়া হাসি আসিল।"

"একি হাসির কথা! দাদা, বউ, বাড়ীতে যারা যারা আছে—এমন কি প্রতিবাসীদের মধ্যে কেহ-কেহ যাহারাই এই ব্যাপারের কথা শুনিয়াছে, সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত।"

"তোমার ত কথাই নেই! দাদাও দেখিতেছি পাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে বউ ঠাকুরাণীও কি পাগল হইল!"

"বাড়ীতে এমন উৎসবের ব্যাপার চলিয়াছে, কিন্তু বউএর চোখে জল পড়িতেছে।"

"ফিরে চল।"

"এই সব কথা শুনিবার পর তুমি ফিরিতে বল?"

"নিশ্চয়। না ফেরাই দুঃখের কারণ হইবে। ভগবান্ তোমার সঙ্গে পথে আমার দেখা করাইয়া দিয়াছেন, নতুবা তোমাকে আনিতে আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটিতে হইত। স্নান আহারেরও অবকাশ পাইতাম না সারো, আমার একটি কথাতে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইবে। সকলের দুঃখ হাসিতে মিলিয়া যাইবে।"

সারদা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

"আমার কথা কি তামাসা মনে করছ?"

"বল কি!"

"আর বলাবলি নেই, তুমি ত পেটঠেসে খেয়ে এসেছ, আমাকে স্নানাহার করতে হবে।"

"কি বলবে?"

"সে কথা তোমাকে বল্‌ব কেন, যাকে বল্‌বার তাকে বল্‌ব। সারো, যতই রূপের অহঙ্কার কর, আমি তোমাকে দেখে ও বাড়ীতে বিবাহ করি নি, ওই মহিমামণ্ডিত দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধে ধন্য হব ব'লে করিছি।"

"পথের মাঝে ঝগড়া করতে এলে না কি, রূপের অহঙ্কার কবে দেখলে?"

"ভুল হয়েছে—তোমার এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ঝগড়া করা উচিত ছিল। বেলা হয়েছে, ক্ষিধে ধরেছে ব'লে করলেম না, ফিরে চল।"

"আমি ত ফিরতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার বোন যে ফিরতে চায় না।"

কথা প্রসঙ্গে দুইজনেই কিছুক্ষণের জন্য রাধারাণীকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এইবারে রমাপ্রসাদ এখনও পর্য্যন্ত না-দেখা বোনটিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

উভয়েই তখন রাধারাণীর ডুলির দিকে চলিল। সারদা চলিল অগ্রে, রমাপ্রসাদ তাহার পশ্চাতে। ডুলির নিকটে উপস্থিত হইয়াই সারদা রাধারাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হাঁ লো তোর দাদা এলো, আর তুই ডুলির ভিতরে লুকিয়ে বসেছিস্। যত লজ্জা হ'ল কি তোর দাদাকে দেখে!" বলিয়াই সে ডুলির আবরণ উন্মোচন করিল। দেখিল, ডুলির ভিতর বসিয়া বালিকা মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছে। তার রোদনের মনগড়া অনেক কারণ নির্ণয় করিল, তথাপি সে সম্বন্ধে একটিও কথা না কহিয়া সারদা তাহাকে বাহিরে আসিতে আদেশ করিল। আঁখির অশ্রু জীবনে এই প্রথম দেখা দাদার চরণে উপহার দিয়া যখন বালিকা দাঁড়াইল, আর সারদা অঞ্চল দিয়া চোখ মুছাইয়া স্বামীর সম্মুখে তার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, তখন মুগ্ধ রমাপ্রসাদ একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিল—'তাই ত সারো, ছেলে-মেয়ে না হবার দুঃখ এ যে এক দেখাতেই ঘুচিয়ে দিলে!" তার পর রাধারাণীকে বলিল—"ওকি রে বানর মেয়ে, আমাকে তোর লজ্জা কি! তুই এখন আমার ছেলে-মেয়ে সব। এত আপনার জিনিষ এমন ক'রে লুকানো ছিলি, তা কি আমি জানতুম। আর কি তোকে আমি ছেড়ে দেবো মনে করেছিস্?"

"না দাদা, লজ্জা করি নি আপনাকে—"

"তুমি বল্—তোর অত সভ্যতা দেখাতে হবে না।"

"তোমাকে দেখে আমার বাবাকে মনে পড়েছে। দেখতে তুমি ঠিক আমার বাবার মতন।"

"বলিস্ কি রে!"

"মিছে বলি নি দাদা ! সেই জন্ম চোখের জল সামলাতে পারছিলুম না, কথাও কইতে পারছিলুম না।"

চিরানন্দময়ী সারদাও এ কথায় চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

রমাপ্রসাদ বলিল—"তা হ'ক তুই আমাকে দাদাই বলিস্, বাবা হবার আমার আর সাধ নেই।"

সারদা এদিকে দেখিল, বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। অথচ স্বামীর এখনও স্নানাহার হয় নাই। তাই সে কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তোর দাদা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে। তুই কি করবি বল্।"

"কেন, তোর কি আর ফিরতে ইচ্ছা নেই ?"

"না।"

"বউ ঠাকরুণ কি তোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি ?"

জিব কাটিয়া রাধারাণী উত্তর করিল—"আমার নূতন মা'র কাছে আমি যে আদর পেয়েছি, এ রকম ভালবাসা—সত্য বলছি দাদা, আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কারও কাছে পাই নি—মা'র কাছেও না।"

"তবে যেতে চাচ্ছিস্ না কেন ?" কথায় ঝঙ্কার দিয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া রাধারাণী কেবল রমাপ্রসাদের মুখের পানে চাহিল।

"তোকে বল্‌তে হবে না" বলিয়াই রমাপ্রসাদ ভৃত্যকে ডাকিলেন—"বাবুলাল"!

দূর হইতে উত্তর আসিল—"হুজুর !"

"জল্‌দি এদিকে আয়।"

বাবুর জিনিষপত্র আগলাইয়া বাবুলাল পাকীর পার্শে বসিয়া ছিল।

আদেশ শুনিয়াই বেয়ারাদের কাছে সে গুলার জিম্মা রাখিয়া সে ছুটিয়া আসিল। আসিতেই আদেশ পাইল, হুজুরের বহিনের সঙ্গে তাহাকে এখনি গোপালপুরে যাইতে হইবে !

এই সময় রাধারাণী ডুলির ভিতর হইতে একটি পুঁটলি বাহির করিল! পথের মাঝে সারদাকে না বলিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া তাহার নূতন মা সঙ্গোপনে ডুলির ভিতরে এই পুঁটলিটি রাখিয়া দিয়াছে, বলিয়া দিয়াছে, বাড়ী ফিরিয়া তোমার মাকে দিয়ো।

রমাপ্রসাদ পুঁটুলি খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতরে ভারী মূল্যবান্ অলঙ্কার। রাধারাণীও দেখিল। সে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। এরূপ অলঙ্কার আর ত কখন সে দেখে নাই। কাচের চুড়ি ছাড়া আজও পর্য্যন্ত তাহার হাতে কিছু উঠে নাই।

রমাপ্রসাদ ও সারদা উভয়েরই ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাধারাণীকে পুত্রবধূ করিতে অশক্ত হইয়া যাহাতে অর্থাভাবে সে অযোগ্য পাত্রে না পড়ে, দয়াময়ী মহামায়া নিজের অলঙ্কারগুলি দিয়া আগে হইতেই তার ব্যবস্থা করিয়াছে।

সারদা অলঙ্কার গ্রহণ সম্বন্ধে স্বামীর মত জিজ্ঞাসা করিল। রমাপ্রসাদ বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া মত স্থির করিবার সময় নাই" বলিয়াই বাবুলালকে গহনাগুলা দেখাইয়া তার হাতে পুঁটলি দিয়া আদেশ দিল—"অতি সাবধানে লইয়া যাইবি এবং বাড়ীর ভিতরে যাইয়া খুকীর মায়ের হাতে তুলিয়া দিবি। আর কেহ যেন জানিতে না পারে।" এমন কি তাহার মা'র নিকট পর্য্যন্ত বালিকাকে সাবধানে লইয়া যাইবার জন্য নিধিরামকেও তিনি বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

নিধিরাম বলিল—"কিছু ভয় নেই পিসেমশাই।

বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বেয়ারারা ডুলি তুলিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত ছুটিয়া চলিল। বাবুলালও পুঁটুলি সযত্নে কোমরে বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিল।

বাড়ীতে আসিয়া মায়ের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের অমনি দেখার সুযোগ ঘটিল, অমনি দুই একটা এ-কথা সে-কথার পর সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, পিসীমা এমন অসময়ে বাড়ী চলিয়া যাইতেছে কেন ?" প্রশ্ন শুনিয়াই মহামায়া একটু চিন্তিত হইলেন। তবে ত রাধারাণীর সঙ্গেও পুত্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। রাধারাণী সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিয়া আরও অপ্রসন্নতা আনিয়া একটা প্রচণ্ড অশান্তির সৃষ্টি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। এই জন্য শ্যামসুন্দরকে রাধারাণীর নাম পর্য্যন্ত তুলিবার অবকাশ না দিয়া সময়ান্তরে সে সম্বন্ধে বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে স্নানাহার সারিয়া লইতে আদেশ করিলেন এবং কার্য্যব্যপদেশে স্থানত্যাগ করিলেন।

পিসীমাকে ছাড়িয়া পথের কিছুদূর আসিলেই শ্যামসুন্দরের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাধারাণীকে দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, তাহাকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে। কিন্তু পিসীমার সঙ্গে কথায় বালিকার পরিচয়ের কোনও আভাস না পাইয়া সে তার স্মৃতিকে আলোড়ন করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস করিল না। যখন তাহার মনে পড়িল, তখন সে পিসীমাকে ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়াছে। তথাপি সে দুই চারি পা পিছাইল, ভাবিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয়টা ঘুচাইয়া লই। পরক্ষণেই মায়ের কাছে সব তথ্য জানিবার আশায় সে বাড়ী যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিল। পিসীমার কথায় তার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে। তার সঙ্গেই ত মেদিনীপুরের

সেই বালিকার বিবাহের কথা হইয়াছিল। টাকার লোভে তার ডেপুটী পিতাও ত সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

এই সময়ে সে একবার তারিণীবাবুর কন্যা ও রাধারাণী উভয়ের রূপ তুলনায় ভাবিয়া লইল। ভাবিতে গিয়া তাহার মাথা গুলাইয়া গেল। রাধারাণীর রূপ তখন এমন একটা আক্রোশে তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করিল যে, শ্যামসুন্দর জ্বালায় অস্থির হইয়া পাগলের মত পা ফেলিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিল।

২৬

স্নানাদি শেষ করিয়া শ্যামসুন্দর আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় শুনিল, তার পিসে মশাইয়ের সঙ্গে পিসীমা ফিরিয়া আসিতেছে। অভিমানে সে ফুলিয়া উঠিল। তাহাকে দু' কথা শুনাইতে সে আহারে না বসিয়া বহির্ব্বাটীতে ছুটিয়া গেল। অবশ্য পিসীমার আসার সঙ্গে সে রাধারাণীর ফিরিয়া আসাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া রমাপ্রসাদের পশ্চাতে যখন সে শুধু সারদাকে আসিতে দেখিল, রাধারাণীকে দেখিল না, তখন তার অভিমান দূর হইলেও পিসেমশাইকে প্রণাম করিয়া সারদাকে বলিল—"সেই ত এলে, পিসীমা!"

"আসবার বাধা দূর হয়ে গেল যে বাবা, তাই এসেছি।"

আর বেশী কথা বলিবার অবসর তাহার রহিল না। বাবাকে আসিতে দেখিয়া সে আহার করিতে ফিরিয়া গেল।

নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ সে গ্রামের জামাতা, কেন না, সারদাসুন্দরীর সেই গ্রামেই জন্ম। সুতরাং রমাপ্রসাদের আগমনে আদর-আপ্যায়নের এমন ধুম লাগিয়া গেল যে, আশিস-সম্ভাষণ ভিন্ন তাহার সঙ্গে কৃষ্ণধনের আর কোনও কথা বলিবার অবকাশ রহিল না।

ইতিমধ্যে সারদা বাড়ীর মধ্যে যাইয়া মহামায়ার কাছে যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি বুঝিলেন, পথের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়ায় ঠাকুর-জামাই তাহাদের ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝিতে পারিলেন, রাধারাণী ফিরে নাই, তখন সারদাকে একটু তিরস্কার-ছলে বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই তাকে আসতে দাওনি ঠাকুর-ঝি।"

যদিও সারদার কথায় মহামায়া রাধারাণীকে পাঠানোই ভাল মনে করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে পাঠাইবার পর হইতে একদণ্ডও তাঁর মনে সুখ ছিল না, শুধু লোকজনকে আদর-আপ্যায়নের জন্য অন্তরের ভাব তাঁহাকে যথাসাধ্য গোপন করিতে হইয়াছিল! এরূপ অবস্থাতেও দুই একবার তাঁর আন্তরিক দুঃখ তাঁহার মুখে এরূপ তীব্রভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল যে, তাঁহার বিশেষ সাবধানতায়ও তাহা দুই এক জন বুদ্ধিমতী প্রতিবেশিনীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তাঁহাদের প্রশ্নে তিনি বিশেষ সদুত্তর দিতে পারেন নাই, শুধু সারদার দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সারদা একা ফিরিয়া আসাতে এবারে তাহার উপর মহামায়ার ক্রোধ হইল। চিরশান্ত মহামায়ার ওই কথা শুনিয়াই সারদা বলিয়া উঠিল—"আমার উপর রাগ করলে কি হবে বউ, আমি তাকে ফিরিয়া আনতে পারলে বুঝি তোমার চেয়েও কম সুখী হতুম?"

"সেকি নিজেই আসতে চাইলে না?"

"তাতেও আমি তাকে ছেড়ে আসতুম না। তোমার ননদাই তাকে আসতে দিলে না।"

"তুই কি সমস্ত কথা তাকে বলেছিস।"

"বলতে হয়েছে বই কি, বউ; এ সব কথা তার কাছে গোপন করা কি তুমি উচিত মনে কর?"

"তা করি না। কিন্তু ঠাকুর-জামাই ত বিজ্ঞ। এই কথা শুনেই কি আমার উপর তাঁর রাগ হ'ল!"

"কি হ'ল, তা আমি জানি না। তার সঙ্গে দেখা হইলে বুঝতে পারবে, সে তোমাকে কি বলবে, সেটা আমি শোনবার জন্য অনুরোধ করেও তার কাছে শুনতে পাই নি।"

ঠিক এমনি সময়ে রমাপ্রসাদ বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—"কোথায় গো বউদিদি!" বলিয়াই মহামায়ার কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মহামায়া মৃদুমধুর হাসির সঙ্গে আপ্যায়নের জন্য রমাপ্রসাদকে বলিলেন, "এই যে ভাই, তোমাকে দেখব ব'লে আমি পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।"

কিন্তু বউদিদির পদধূলি গ্রহণ করিয়া যেই রমাপ্রসাদ দাঁড়াইল, অমনি মহামায়া আর কোনও কথা না কহিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ ঠাকুর জামাই, আমরা না হয় অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক, না বুঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেছি, তুমি ত ভাই বিজ্ঞ, তুমি এমন কাজ করলে কেন?"

"কি করেছি বউদি?"

"মেয়েটাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন?" এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া রমাপ্রসাদ ফিরিয়া পার্শ্বস্থা সারদাকে বলিল—"এই যে আগে থাকতেই পথ আগুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

"বেশ তো আমি যাচ্ছি।" বলিয়াই সারদা প্রস্থানোদ্যত হইল।

"কেন, ও চ'লে যাবে কি জন্য?"

"এ কথার উত্তর তুমি ছাড়া আর কাউকে শুনতে দেবো না।"

মহামায়া একটু উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"এমন কি কথা হইবে যে, ওর শোনবার অধিকার নেই ?"

"ও যে অধিকার হারিয়েছে বউদি !"

"অধিকার হারিয়েছে !"

"নিশ্চয়, নইলে ওর এখানে থাকায় আমি আপত্তি করছি কেন ?"

"বেশ, আমি অধিকার দিচ্ছি। ও যা শুনতে পাবে না, তা আমি তোমার কাছে শুনতে চাই না।"

রমাপ্রসাদ সারদাকে বলিল—"তবে আর যাচ্ছ কেন, দাঁড়াও।" বাস্তবিকই সারদা স্বামীর কথার ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বোকার মত চলিয়া যাইতেছিল। সে উত্তর করিল—"না গো, আমি থাকব না। শোনাবার হয় বউই আমাকে শোনাবে।"

মহামায়া তাহাকে নিমন্ত্রিত মেয়েদের পরিচর্য্যার আদেশ দেওয়ায় সে প্রস্থান করিলে রমাপ্রসাদকে বলিল – "নাও ঠাকুর জামাই, কি গুহ্য কথা বলবে এইবারে বল।"

"তার আসবার ইচ্ছা ছিল না।"

"শুধু সেই জন্তই কি তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না ? আমি কিন্তু ঠাকুরঝির কথায় বুঝলুন, তুমি আনতে. চাইলে সে আসতো। তুমিই জেদ ক'রে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।"

"তা দিয়েছি বউদি। তাকে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আসতে দিই নি। শুধু তাই কেন, সে যদি আসতে চাইত আমি আসতে দিতুম না।"

"কেন ঠাকুর জামাই, আমি কি অপরাধ করলুম ?"

"অপরাধী তোমাকে বলতে পারি না বউঠাকরুণ, বলতে গেলে বলতে হয় আমার দুর্ভাগ্য !"

"আমি যে তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাই !"

"তোমার ননদকে দেখে আমি এ বাড়ীতে বিবাহ করি নি ! এ কথা তাকেও বলেছি। তাকে বিবাহ করেছিলুন তোমাকে দেখে।"

"সে কি তোমার সঙ্গে কোন অসরস ব্যবহার করেছে ?"

"সে করলে আমি তত গায়ে মাখতুম না, কেন না, সে নির্ব্বোধ।"

"আমি করেছি ?"

"রাধারাণীকে তুমি বউ করতে চাও ?"

"চাইলেও আর ত সে হবার যো নেই !"

"যো আছে কি না, সে দাদার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। তুমি চাও কি না বল না !"

"আমার চেয়ে ঠাকুরঝির আকিঞ্চন বেশী।"

"এই যে বললুম বউদি, সে নির্ব্বোধ। কিন্তু একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে তোমার বুদ্ধিও কি লোপ পেয়ে গেছে !"

মহামায়া এখনও বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন—"আমি ত সে আশা ছেড়ে দিয়েছি ভাই !"

"ছেড়ে ত সুখী হ'তে পারছ না !"

"না ঠাকুর-জামাই, তা পারছি না।"

"সেটা আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

"তুমি কি এ বিবাহে অমত কর ?"

"যদি সম্পর্ক তোমার সঙ্গে রাখতে হয়, তা হ'লে করি বই কি !"

"তাই ত ঠাকুর-জামাই, তাই ত ভাই, এ জ্ঞান ত আমার আসি নি !"

"বুঝেছো বউদি !" রমাপ্রসাদের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, অন্তরের আনন্দ সে গোপন করিতে পারিল না। এতক্ষণ পরে বউদি তাহার কথা বুঝিয়াছে।

"তাই ত ভাই, মেয়েটাকে দেখে আমার এমনই মোহ হয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, আমার মনেই আসে নি !"

"তুমি কেবল খোকাকে গর্ভে ধরেছ। আমি পুত্রহীন, তাকে বুকে তুলে মানুষ ক'রে পুত্রের অভাব ভুলে গিয়েছি।"

"মাফ কর ভাই, সে তোমাদের সন্তান।"

"সেই খোকা, আমার বোনকে বিয়ে করবে! আর তাকে 'বাবা' ব'লে এ পুত্রহীন পুত্রের অভাব ভুলতে পারবে না।"

উত্তর দিতে গিয়া মহামায়ার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ছুটিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

যখন কথা বাহির হইল, তখন অন্য কোনও কিছু না বলিয়া মহামায়া কেবল বলিলেন -"যাও ভাই, স্নানাহার করগে !"

"আগে অভয় দাও।"

"আর লজ্জা দিয়ো না ঠাকুর-জামাই। সেই বোকা মেয়েটাকেও তুমি এ কথা শুনিয়ে দাও।"

"সে শোনাতে হয় তুমি শুনিয়ো, আমার দায় প'ড়ে গেছে।"

"বেশ, সে যা করবার আমি করব। তুমি শীগ্‌গির স্নান সেরে চারটি অন্ন মুখে দিয়ে বিশ্রাম নাও। কেন না, কুলকেতার তাদের আসতেও বড় বিলম্ব নেই।"

"আবার ভুল করছ বউদি, খোকার পাকা দেখার দিন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আগে আমি খেয়ে ব'সে থাকবো।"

"সর্ব্বরকমেই আজ তুমি আমাকে পরাস্ত করলে ঠাকুর-জামাই।"

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে যাইবার মুখে রমাপ্রসাদ রহস্যস্থলে আর একবার মহামায়াকে বলিল —"এখনও একবার ভেবে দেখ বউদি! যদি আমার

ভগিনীকে পুত্র-বধূ করিতে ইচ্ছা থাকে বল, আমার যা আছে সব দিয়া তোমার পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিই। অবশ্য ওই জমীদার যা দেবে, তার তুলনায় সে কিছু হবে না বটে,—"

"যাও কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলগে।"

"তবে তা নিতান্ত তুচ্ছ হবে না, বউদিদি।"

"খোকার উপর তোমার স্নেহই যে অমূল্য ভাই।"

"তারা কি করবে বলতে পারি না, কিন্তু আমি যা দেবো, সব খোকাকে দেবো। তা ছাড়া যা রোজকার করবো—"

"আর কেন ঠাকুরজামাই, আমার উপর অত্যাচার কর।"

"তোমার আশীর্ব্বাদে আজ-কাল যেরূপ রোজকার চলেছে, যদি কিছু দিন বাঁচি—"

"অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে তুমি বেঁচে থাক ভাই।"

"তা হ'লে কালে খোকার অন্ততঃ ৩।৪ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি হবে। তবে বউদি, যে দিন থেকে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বদলে যাবে, সে দিন থেকে আমার শ্বশুরের দেওয়া ঘরে আর প্রবেশ করব না।" বলিতে গিয়া রমাপ্রসাদের কথা ভার হইয়া আসিল।

আর শুনিতে গিয়া, পিতার স্মরণের সঙ্গে-সঙ্গে মহামায়ার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলিলেন—"আমি ত ও কথা আর মনেও আনবো না, তোমার সম্বন্ধীও যদি এখন রাধারাণীকে বউ করবার ঝোঁক ধরেন, জেনে রাখ ঠাকুর-জামাই, সবার চেয়ে বাধা আমি।"

"বস, নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করিগে বউ দি।"

২৭

ঘর হইতে বাহির হইয়াই মহামায়া সারদাকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সারদা এই বিপুল ভ্রমের জন্য এতই লজ্জিত হইল যে, অনেকক্ষণের জন্য সে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিল না।

ক্রমে প্রতিবেশিনীগণ এ কথা জানিতে পারিল। রাধারাণীর সহসা অন্তর্দ্ধানে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা জানিয়াছিল, শ্যামসুন্দরের বধূ করিবার জন্যই সে বালিকাকে বাড়ীতে আনা হইয়াছে। তার বাপ নাই, মা অতি দুঃখী। কুলীন কৃষ্ণধন পুত্রের কুলভঙ্গ করিয়াও সেই দরিদ্র-কন্যাকে পুত্র-বধূ করিতে যে মহত্বের পরিচয় দিতেছেন, আজি-কালিকার কালে অতি কম লোকেই সেরূপ মহত্ত্ব দেখাইতে পারে। এখন তাহারা বুঝিল, তার পরিবর্ত্তে যে পুত্রবধূরূপে কৃষ্ণধনের ঘরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে, সে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ হাজার টাকা নগদ ও পাঁচ হাজার টাকা আয়ের তালুক আনিয়া একটি দিনেই মহামায়াকে তালুকদারিণী করিয়া দিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহ কথার প্রসঙ্গ নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার ভিতরে এই অমানুষিক কুলভঙ্গের এমন কতকগুলা তীব্র সমালোচনা তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল যে, তাহা কোনও মতে 'অর্থলোভী' মহামায়ার শ্রুতি-সুখকর হইত না।

যাই হ'ক, এক রমাপ্রসাদের বুদ্ধিমত্তায় বাড়ীর ভিতরের একটা বিষাদ ভাব এক মুহূর্ত্তে উল্লাসে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কৃষ্ণধন যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার বুক হইতে একটা পাহাড়ের বোঝা নামিয়া গেল। মহামায়া অথবা সারদা কাহাকেও না জানাইয়া তিনি এ বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক রমাপ্রসাদের কল্যাণে তিনি সে দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

বৃদ্ধা রামমণি অত্যন্ত মনমরা হইয়া বাড়ীর এক প্রান্তে গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিল। খোকার বউ বলিয়া রাধারাণীকে পাড়ায় প্রায় প্রতি ঘরে লইয়া সে যে এতটা উল্লাস করিয়া আসিল, সেই তাহাকে পিসীমা এই আনন্দের দিনে হঠাৎ লইয়া চলিয়া গেল কেন? তার পর যদিও পিসীমা পিসে-মশায়ের সঙ্গে ফিরিল, সে একাই ফিরিল, তার বউদিদি ফিরিল না। বুড়ী এ সম্বন্ধে মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, উত্তর পায় নাই। তার পর যখন সে শুনিল, এক রাজার মত লোকের কন্যার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের বিবাহ হইতেছে, তাহাতে সে এক সিন্দুক টাকা পাইবে, আর গাড়ী-জুড়ী চড়িবে, তখন, সে সুখী দুঃখী কিছুই হইতে না পারিয়া বোকার মত হইয়া গেল।

বিবাহ না হওয়ার সমস্ত তথ্য মহামায়ার কাছে শুনিয়া আবার তার আনন্দ ফিরিল। সে বুঝিল, বাড়ীর বউ না হইলেও রাধারাণীর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ঘুচিবে না। পিসীমা তাহার ভাল ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে, তাহাতে যত টাকাই লাগুক। পিসীমার ছেলে-পুলে কিছুই যখন হইল না, তখন রাধারাণীকে লইয়াই তাহারা স্বামি-স্ত্রী সংসারী হইবে। আর সকলে মিলিয়া, তার মায়ের সংসারে বদ্ধ হইবে। উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, হাত-পা নাড়িতে ও বাক্যে সকলকে অস্থির করিতে রামমণি ঘরের কোণ পরিত্যাগ করিল।

শ্যামসুন্দর মায়ের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। স্থির করিয়াছিল, লোকজনের আহারাদি শেষ হইলে, মা যখন আহার সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, তখন সে তার কাছে রাধারাণীর কথা তুলিবে। তাহার সঙ্গে দেখার পূর্ব্বে তারিণী বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে

শ্যামসুন্দরের কোনও আপত্তি ছিল না, বরং তাহার সংসারে দুই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া পরিবারবর্গের আদর ও যত্নে বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যে সে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, এ বিবাহ তার পক্ষে একান্তই লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার আনন্দ সে কল্পনায় উপভোগ করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছিল। রাধারাণীর সঙ্গে দেখা হইবার পর হইতেই তার মনের ভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আর সে তারিণী বাবুর সমস্ত ঐশ্বর্য্যও কল্পনায় উপভোগ করিয়া সুখ পাইতেছে না। সমস্ত সুখ ও শান্তি এখন যেন মেদিনীপুরের সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিরাভরণা কন্যার পার্শ্বে জমা হইয়াছে। বিনা মায়ের সাহায্যে সেখানে সে বসিতে পাইবে না বুঝিয়া তার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল।

বাড়ীতে কোনও ক্রিয়া-কলাপে সমস্ত লোকের আহার শেষ না হইলে মহামায়া আহারে বসিতেন না; বসিতে কখন কখন দিন শেষ হইত, কখন কখন রাত্রিও হইত। আজ বেলা তিনটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু শ্যামসুন্দর মায়ের আহারে বসিবার কোনও লক্ষণ দেখিল না। অথচ কলিকাতা হইতে তারিণী বাবুর আসার আর বিলম্ব নাই। আসিলে দিনের মধ্যে আর মায়ের খাওয়া হইবে না!

মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়াই সে বলিল,—"মা! তুমি আহার করিলে না?" কলিকাতা হইতে যাহারা আসিবে, তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না, ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিয়াই আবার সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতায় তাদের ফিরিতে হইবে। এই জন্য মহামায়া তাদের "মিষ্টি মুখ" করাইবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পুত্র সেটা না বুঝিয়া প্রশ্ন করিয়াছে অনুমান করিয়া তিনি ঈষৎ হাসিমুখে বলিলেন,—

"এখন কেমন ক'রে খাব।"

"কেন? না খাওয়ার মত ব্যাপার কি হইয়াছে?"

"খোকা! আজ শুভদিন, শুভকর্ম্ম শেষ না হ'লে—তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তারা না গেলে আমি খেতে পারি?"

"শুভদিন? মা! এমন দুর্দ্দিন আমাদের আর কখনও আসে নি জান্‌বে, অবশ্য সে 'শুভকর্ম্ম' যদি আজ নিষ্পন্ন হয়।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া মহামায়া বলিলেন—"ওকি বলছিস্ রে পাগল?"

"পাগল হওয়াই সুখের হবে মা, বাবার আজ মনুষ্যত্ব লোপ পাইবার সময় আসিতেছে।"

"বালাই, কেন তাঁর মনুষ্যত্ব লোপ পা'বে?"

"মেদিনীপুরের সেই গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েটি এখানে এসেছিল না?"

"এসেছিল। কি বল্‌তে যাচ্ছিস্ খুলে বল।"

"সে চ'লে গেল কেন?"

"কি বলতে যাচ্ছিস খুলে বল্।"

"এই শুভদিনে শুভকর্ম্মে দেশের লোককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লে, সেই কেবল এখানে স্থান পেলে না?"

"তোর পিসীমা তাকে পাঠিয়ে দিলে।"

"পিসীমারই মুখে শুনলুম, সে তোমাদের উপর রাগ ক'রে চলে যাচ্ছিল।"

"তার রাগ করবার কোনও কাজ ত করা হয় নি।"

"শুধু শুধুই পিসীমা চ'লে যাচ্ছিল?"

"তা ছাড়া আর কি বল্‌ব—তার খেয়াল।"

"সে মেয়েটি এখানে কেমন ক'রে এলো?"

"তোর পিসীমাই এনেছিল।"

"কেন?"

"সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তাকেই জিজ্ঞাসা কর নি কেন শ্যামসুন্দর? তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ?"

"মা! ঐশ্বর্য্যের লোভে তোমারও মাথা গুলিয়ে গেল! কুল ভাঙ্গবার ভয়ে বাবা ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহ কিছুতেই দিতে পারিবেন না শুনে একদিন না তুমি কেঁদেছিলে?"

"এ বিয়েতে কি তোর মত নেই?"

শ্যামসুন্দর প্রথমে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মন না থাকিলে এতদিন সে কেমন করিয়া তারিণী বাবুর বাড়ীতে জামাই-আদর উপভোগ করিয়া আসিল? রাধারাণীকে না দেখিলে এ বিবাহে আপত্তি করিবার তার কিছুই ছিল না। আর সারদার কাছে শুনিবার পূর্ব্বে ঘর-জামাই হইবার কথাটা তার মনেও উঠে নাই। মায়ের প্রশ্নের এই ক'টা সরল কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দর কি বলিবে বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া তাকে নিরুত্তর দেখিয়া তার মনের কথা যেন জানিয়া বলিলেন—"তবে তাদের বাড়ীতে এ কয়দিন রহিতে গেলে কেন?"

"তখন জানতুম যে, কোন একস্থানে তার বিবাহ হয়ে গেছে। আর যে তার সঙ্গে দেখা হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

"তার সঙ্গে কুল-ভঙ্গের সম্পর্ক কি?"

"দেখলুম তারিণী বাবুর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে বাবার একান্ত ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছা ছিল কি না ছিল, আমায় বল।"

প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে তার চিরশান্ত মায়ের মুখের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া শ্যামসুন্দর স্তম্ভিতের মত হইয়া গেল। তথাপি সে চেষ্টা করিয়া বলিল—"কুলের গুমোর দিন দিন চ'লে যাচ্ছে মা, দু'দিন পরে একেবারেই থাকবে না। এই জেনে আমি আপত্তি করি নি।"

"তা বেশ করেছ, এখন কি করতে চাও বল, যদি তারা আসে, তাদের আসবার সময় হ'ল। তাদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে হবে, আমি আর দাঁড়াতে পারব না।"

"যদি আমি বলি, এ বিয়ে করব না?"

"যদি কেন, একবারেই বল, আমি তাঁকে বলি, তাঁর যা করবার তিনি করুন।"

"ও মেয়েটির নাম কি?"

"তার নাম জানবার দরকার কি? তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার আশা ত্যাগ কর।"

"যদি আমি এ বিয়ে না করি?"

"সে বিয়ে হবার আর উপায় নেই।"

"একবারে উপায় পর্য্যন্ত নেই! মা! বাবাকে ব'লে তার সঙ্গে আমার বিবাহ দাও, আমি তাকে যখন আবার দেখতে পেয়েছি, তখন অন্য বিয়ে আমি করব না।"

"এই যে বললুম, উপায় নেই শ্যামসুন্দর! সে তোমার গুরুজন, তোমার পিসে মশাইয়ের মামাতো বোন।"

কথা শুনিবামাত্র প্রথমটা শ্যামসুন্দর চিত্রার্পিতের মত মায়ের মুখের দিকে শুধু চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন তাহার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

মহামায়া বলিতে লাগিলেন—"নহিলে শ্যামসুন্দর, ওই মেয়েটিকেই তোমার বউ করিয়া দিতাম। বাবুও এ বিবাহে কিছুমাত্র আপত্তি করিতেন না। তোমার সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়েই তোমার পিসীমা তাকে এখানে এনেছিল।" শ্যামসুন্দর এইবারে উত্তর দিবার কথা পাইল—"পিসীমা কি এ সম্পর্কের কথা জানিত না?"

"তার মাথায় সে বুদ্ধি আসেনি।"

"এ বুদ্ধি তা' হ'লে কার মাথায় এলো?"

"তোর পিসে মশায়ের।"

"আর তোমার?"

"তোকে মিছে কথা বল্‌ব কেন, আমারও মাথায় তখন সেটা আসেনি।"

"যদি মেদিনীপুরেই আমার বিয়ে হ'ত, তা হ'লে এ পাতানো সম্পর্কের কি অবস্থা হ'ত?"

"চুপ চুপ।" "মহামায়ার মুখে ভীতির চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া উঠিল।

"আবার চুপ কি! তোমাদের যেমন বাড়াবাড়ি, এ রকমটা, দেখা দূরে থাক্, কখন কোথাও কেউ শোনে নি মা! পিসে মশায়ের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আমার, যে জন্য তাঁর মামাতো বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় না।"

"কোন সম্পর্ক নেই শ্যামসুন্দর?" চমকিত শ্যামসুন্দর দেখিল, কোথা হইতে তার কথা শুনিয়া রমাপ্রসাদ তাহাদের কাছে আসিতেছিলেন, দেখিয়াই মুখ তার মলিন হইয়া গেল। মহামায়া মৃতপ্রায় হইলেন।

নিকটে আসিয়াই রমাপ্রসাদ প্রশ্নের পুনরুক্তি করিলেন, "কোন সম্পর্ক নেই?" শ্যামসুন্দর ধরা পড়িয়াছে, চুপ করিয়া থাকায় আর কোনও বিশেষ সুবিধা নাই বুঝিয়া সে উত্তর করিল—"আপনি পণ্ডিত ত পিসে মশাই—"আর পিসেমশাই কেন, শ্যামসুন্দর!" মহামায়া এতক্ষণ স্তম্ভিতার মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবার সূচনা দেখিয়া তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। রমাপ্রসাদকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ডাকিলেন—"ঠাকুরজামাই!" কথা কানে না তুলিয়া রমাপ্রসাদ শ্যামসুন্দরকেই বলিতে লাগিল—"যার সঙ্গে সম্পর্কই নেই, তাকে আর পিসেমশাই ব'লে তামাসা কর কেন?" "অকারণ ক্রোধ করছেন পিসেমশাই, আমার কথার মর্ম্ম আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না।"

"তুমি পাঁচটা পাশ করেছ, আমি আজও অত পণ্ডিত হইনি যে, তোমার কথার মর্ম্ম বুঝতে পারি।"

"দোহাই ঠাকুরজামাই!"

শ্যামসুন্দর বলিল—"আপনার মামাতো বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে মহাভারত যে একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, এ বোধ যে আপনার নেই, এটাও কি আপনি আমাকে মনে করতে বলেন?"

"আমার মাথা খাও ঠাকুরজামাই—তুমি চ'লে যাও।"

"আর ঠাকুরজামাই কেন বউ ঠাকরুণ, তোমার ছেলে ত সম্পর্ক উড়িয়ে দিলে!"

"সে কি! ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি, তবু তোমার সঙ্গে পারি না।"

"তবে শোন শ্যামসুন্দর, তুমি এখন সত্য-সত্যই পণ্ডিত, তোমার হিসাবে আমার সম্পর্ক না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার হিসাবে তোমাকে বলি, আমার স্ত্রীকে যতদিন আমি বাঁচবো, যদি পাগল না হই, মনে করব তোমার বাপের সহোদরা, সুতরাং আমার বোনকে বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত তুমি পরিত্যাগ কর" বলিয়াই রমাপ্রসাদ স্থানত্যাগ করিল।

"তোমার লেখাপড়াকে ধিক্ শ্যামসুন্দর!"

মায়ের তিরস্কারে পুত্র মাথা হেঁট করিল মাত্র, কোনও উত্তর দিল না। বাহির হইতে এই সময় সনাতন ছুটিয়া

আসিয়া সংবাদ দিল, তাহারা আসিতেছে। তাহাদের সম্যক অভ্যর্থনা করিবার জন্য সনাতনকে আদেশ দিয়া, সে চলিয়া গেল, তখনও পর্য্যন্ত অবনত-মস্তক পুত্রকে মহামায়া বলিলেন—"আর মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? তোমার পিসেমশাই যা বল্‌লে, তা তো শুন্‌লে, এইবার তোমার যা কর্ত্তব্য কর।" বলিয়াই তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

"ছেলের সম্পর্ক তুমি ত্যাগ করতে পার মা?"

চলিতে চলিতে মহামায়া পুত্রের প্রশ্ন শুনিলেন মাত্র, উত্তর ত দিলেনই না, মুখও ফিরাইলেন না।

২৮

এ কথা শুনিতে সারদার বাকি রহিল না। রমাপ্রসাদই তাহাকে যাহা ঘটিয়াছে শুনাইল। শুনিবার সঙ্গে তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। রমাপ্রসাদের সাগ্রহ অনুরোধ না হইলে সে বোধ হয় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিত। প্রবল চেষ্টায় চোখের জল রোধ করিয়া স্বামীরই অনুরোধে শুভ কর্ম্মের সাহায্য করিতে সে মহামায়ার কাছে ছুটিল।

স্বামীর কার্য্যের উপর সারদা কিন্তু কোনও মতপ্রকাশ করে নাই, কেন না, করিবার কোনও কথা ছিল না। সে বুঝিয়াছিল, এই সমস্ত অনর্থের মূল একমাত্র সে। হায়, সে যদি অভাগা মেয়েটাকে সঙ্গে করিয়া না আনিত! স্বামীর মুখে সমস্ত শুনিয়া যদিও সে বুঝিল, মহামায়ার উত্তর মহামায়ারই যোগ্য হইয়াছে, তথাপি তাহাদের উভয় পরিবারে শুধু প্রেমে রচিত সম্পর্কের মধ্যে বিষম একটা যে চিড় খাইয়াছে, ইহজীবনের আত্মীয়ভাব শত চেষ্টায় আর তাহা.জোড়া লাগিবে না। সত্য সত্যই চলিতে চলিতে মনের আবেগে রাধারাণীকে উদ্দেশ করিয়া সে গালি দিল।

কিন্তু মহামায়ার কাছে উপস্থিত হইয়া কি বিচিত্র—সে দেখিল, কোনও কিছু যেন হয় নাই এমনি ভাবে, সে শান্ত-নারী আগন্তুকদিগের পরিচর্য্যার আয়োজন করিতেছে।

মহামায়ার কাছে তখন কেহ ছিল না, তারিণী বাবুদের আগমনের কথা শুনিয়া মেয়েরা পর্য্যন্ত কৌতূহলী হইয়া দেখিতে গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই সারদা বলিয়া উঠিল—"কি অলক্ষণা মেয়েকে সঙ্গে এনেছিলুম বউ?" সারদার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখে ধারা ছুটিল।

"চুপ চুপ! ও কথা মুখে কেন, মনেও আন্‌তে নেই ঠাকুরঝি। ভাগ্যের কথা, কার কি, যখন জান না ভাই! চোখ মুছে ফেল। অপ্রতিভের মত মুহূর্ত্তে সারদা অঞ্চলে অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিল।

মহামায়া বলিতে লাগিলেন—"সাবধান, কিছুতেই এ সব কথা যেন তোমার দাদার কানে না উঠে।"

"না বৌদি, আমি পাগল নই।"

মহামায়া পরিচর্য্যাকার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে সারদাকে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু মহামায়ার একান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও এ কথা কৃষ্ণধনের কানে উঠিল। রমাপ্রসাদই তাহাকে সমস্ত শুনাইয়া দিল।

রমাপ্রসাদের অনেকটা বালকের মত স্বভাব ছিল। বিচার-বিবেচনা না করিয়া সহসা উত্তেজনার বশে সে সময়ে-সময়ে এমন দুই চারিটা কথা কহিয়া ফেলিত যে, শেষে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণে, যতক্ষণ না সে পূর্ব্বাচরণের কোনও প্রতীকার করিতে পারিত, ততক্ষণ কিছুতেই তার মনে শান্তি আসিত না। সে সমস্ত কথা কৃষ্ণধনকে শুনাইল। শুনাইয়া তাঁহার কাছে তিরস্কার খাইল।

"তুমিও কি আজ আমার অদৃষ্টে পাগল হইলে রমা-প্রসাদ! বিদেশে চাকরী করিতে গিয়া তুমি যে এমন বুদ্ধিহীন হইয়া আসিবে, তা আমি বুঝিতে পারি নাই। পারিলে তোমার চাকরী-স্বীকারে আমি কিছুতেই মত দিতাম না।"

রমাপ্রসাদ মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণধন বলিতে লাগিলেন—"দেখছি, তোমরা সকলে মিলে খোকার বিয়ের সম্বন্ধটা পণ্ড ক'রে দিলে।"

"না দাদা, পণ্ড হবে না। এমন ভাল সম্বন্ধ কদাচ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।"

"তাই ত আগে বুঝেছিলুম হে, বুঝেই ত এ কাজ করেছিলুম। তা তোমরা হ'তে দিলে কই।"

"আমি কি করলুম দাদা, আমাকে আপনি ওদের মধ্যে ধরলেন কেন?"

"তুমি ত সবার চেয়ে বেশী করলে হে।"

বুঝিতে না পারিয়া রমাপ্রসাদ কৃষ্ণধনের মুখের পানে চাহিল।

"বুঝতে পারলে না ভাই! সারী পোড়ারমুখী কিংবা তোমার বউদি—কেউ আমাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। যা কখন হয় নি রমাপ্রসাদ, আমার সঙ্কল্প টলাতে এসে তোমার বউদিকে আমার মুখ থেকে কটু কথা শুনতে হয়েছে, তারা টলাতে পারলে না--তুমিই দেখছি টলালে।"

"আমি টলালুম!"

"তোমার সঙ্গে আমার ত হিসাব ক'রে সম্পর্ক নয়—এ সম্পর্ক বিধাতার দান! তোমার সঙ্গে আমার এই বুকের বাঁধন যা ছিঁড়িতে আমি জানতুম বিধাতারও সাধ্য নেই—দেখতে ইচ্ছা হয়েছে রমাপ্রসাদ, কেমন ক'রে ছিঁড়ে যায়।"

রমাপ্রসাদ কাঁদিয়া ফেলিল—বলিয়াছি, তার স্বভাব

অনেকটা বালকের মত—কিন্তু কৃষ্ণধন স্থিরচিত্ত, অতি কষ্টে অশ্রুর গতি রোধ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"কুলীনের ছেলের আবার সম্পর্কের অভিমান কি! অনেক সময় বাপ ছেলেকে চেনে না, ভাইয়ে-ভাইয়ে হয় ত সারা জীবনের মধ্যে দেখা হয় না। খুঁজলে আমিও হয় ত দু'একটা ভাই বোন পেতুম, কিন্তু সারীর মত বোন পেতুম কি রমাপ্রসাদ, না তোমার মত ভাই"—এইবারে কৃষ্ণধনের কথা বন্ধ হইয়াও আসিল।

"দাদা!"

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে পাল্কী-বাহকের কণ্ঠস্বর তাহাদের কানে গেল। কৃষ্ণধন শুনিয়াই রমাপ্রসাদকে বলিলেন—"শীগ্‌গির যাও, তাদের অভ্যর্থনা কর।"

"আর আপনি?"

"আমি একবার বাড়ীর ভিতরে যাব।"

"একটু পরে গেলে হয় না?"

"হ'লে পরেই যেতুম।"

"আপনি থাকবেন না, আমার অভ্যর্থনা কি ভাল হবে।"

"খুব হবে। সে ধনী, আমি কুলীন, রমাপ্রসাদ!"

"আমি ত তারিণী বাবুকে চিনি না।"

"না চেনো, আমি গিয়ে চিনিয়ে দিব।"

কৃষ্ণধন চলিয়া গেলেন। তাঁর হঠাৎ এরূপ চলিয়া যাওয়ার কারণ বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা রমাপ্রসাদকে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য যাইতে হইল।

বরাবর কৃষ্ণধন সারদার ঘরে চলিয়া গেলেন। সেখানে সারদাকে ডাকিয়া যখন তার উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি কতকাল পরে তাঁর মনে নাই—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই ঘরের সজ্জা এবং আসবাব সাজানোর শৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। এরূপ সজ্জার কণাও তাঁহার ঘরে ছিল না। এরূপভাবে ঘর-সাজনো মহামায়া ত জানেই না, তাহার ভিতরে এমন অনেক বিলাতী ধরণের আসবাব আছে, যাহাদের নাম আজিও পর্য্যন্ত নিশ্চয় মহামায়া শুনে নাই! দেখিয়া কৃষ্ণধনের চোখ হইতে এইবারে সর্ব্ব প্রথম নির্জ্জনতার আকর্ষণে জল বাহির হইল। তিনি দেখিলেন, দেয়ালে সযত্ন-রক্ষিত তাঁর শ্বশুরের ছবি। সেই সৌম্য শান্ত মমতাময় বৃদ্ধ জীবিতবৎ সাগ্রহ দৃষ্টিতে যেন তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। দৃষ্টিতে তাঁর সমস্ত প্রাণটা যেন খেলা করিতেছে, কেবল মুখে তাঁর কথা নাই।

দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণধনের প্রাণ আবেগ-পূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি করজোড়ে ভক্তি সহকারে সেই ছবিকে প্রণাম করিলেন।

প্রণামান্তে, ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য যেমন তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি দেখিলেন, কখন আসিয়া সারদা চোরটির মত নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণধন চোখ মুছিবার অবকাশ পান নাই। এখন ধরা পড়িয়াছেন বুঝিয়া চোখে আর হাত না দিয়াই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কি দেখছিস্?"

সারদা কোনও উত্তর দিল না। তাহার স্মরণে ত আসিতেছে না, কবে দাদা এর পূর্ব্বে তার ঘরে পদধূলি দিয়াছেন! তবে হঠাৎ এমন সময়ে যখন তাঁর বাড়ীতে তাঁর ছেলেকে দেখিবার জন্য অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে, তিনি যেন আত্মগোপনের মত, তার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন—কেন! বাস্তবিকই দাদার প্রশ্নে সে কোনও কথা মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না।

"তোর ঘর দেখতে এলুম সারদা!"

"আমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য দাদা!"

"তাই ত রে, ঘর তোর এমন ক'রে সাজানো, তা জানতুম না!"

"এর পূর্ব্বে আর কবে যে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে, তা আমার মনে হয় না!"

"এসেছি কেন জানিস্?"

সারদা কেমন করিয়া জানিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

"আমি এ ঘরে চাবি দেবো।"

দাদার এটা রহস্য বুঝিলেও, রহস্যটা এমন না বুঝিবার মত যে, সারদা কি উত্তর দিবে বুঝিতে পারিল না।

"বুঝতে পারলি নি?"

"তা এ ত আপনারই ঘর!"

"আমারই ঘর! এর একখানা আসবাব আমার ঘরে নেই। ঘর তোর কিন্তু তোরা যখন আর এ ঘরে বাস করবি না, তখন এ ঘর খুলে রেখে কি করব—অন্যের যখন এখানে প্রবেশ করিবার অধিকার নেই, তখন কাজেই আমাকে এ ঘর বন্ধ রাখ্‌তে হবে।"

বিস্মিতের ভাবে সারদা জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি এমন কথা আপনাকে বলেছে?"

"পাকে-প্রকারে এক রকম বলাই বই কি। তার মামাতো বোন না কি ওই মেয়েটার সঙ্গে খোকার বিয়ে হ'লে সে যখন প্রতিজ্ঞা করেছে, এ ঘরে আর প্রবেশ করবে না।"

"তা সে বিয়ে ত আর হচ্ছে না।"

"হচ্ছে না কেমন ক'রে বল্‌ব।"

"হবে?"

"দেখ না কি হয়। শুধু তোকে বল্‌তে এসেছি সারদা! কাউকেও বলিস নি—খবরদার! তোর স্বামীর কেমন

প্রতিজ্ঞার জোর আমাকে একবার পরীক্ষা করতেই হবে।" বলিয়াই কৃষ্ণধন সারদার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া, একবারে না বুঝার চারগুণ গোলমাল মাথায় পুরিয়া কতকটা অবসন্নের মত সারদা শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। দাদা চলিয়া যাইবার সময়ে,আর একটা কথাও যোগ করিয়া ত তার বোধকে সম্পূর্ণ করিবার সাহায্য করিলেন না!

শয্যায় পড়িয়া সারদা ভাবিতে লাগিল। সত্য সত্যই কি দাদা খোকার সঙ্গে রাধারাণীর বিবাহ দিবেন? তা দিলে ত এ সম্বন্ধ তাঁর ভাঙ্গিয়া দিতে হয়! সেই জন্যই কি তিনি তার স্বামীর উপর কন্যাকর্ত্তার সঙ্গে কথাবার্ত্তার ভার দিয়া নিজে সরিয়া রহিয়াছেন? তবে কি স্বামীর সঙ্গে দাদার আগেই বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছে? কিন্তু তাঁহার কথা মত ত কিছু বুঝা যায় না। স্বামী যদি দাদার সঙ্কল্পের কথা না জানে, আর জানিয়াও যদি তার সঙ্কল্পচ্যুতি না হয়, যদি সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, কিছুতেই শ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাধারাণীর বিবাহ দিব না? শুইয়া শুইয়া চক্ষু মুদিয়া সত্যই যেন সারদা তার ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইতে দেখিল।

চিন্তার অবসানে সারদার তন্দ্রা আসিল।

কিছুক্ষণ তন্দ্রামগ্ন থাকিবার পর তন্দ্রা ও নিদ্রার সন্ধি-মুখে হঠাৎ তার চৈতন্য ফিরিতেই সে বৃশ্চিক-দষ্টার মত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। তাই ত, আজ এ কি করিলাম! শ্যামসুন্দরের বিবাহের স্থিরতার দিনে আমি ঘুমাইয়া তার অকল্যাণ করিলাম! এতক্ষণে হয় ত আশির্ব্বাদ কার্য্য হইয়া গিয়াছে। শঙ্খধ্বনিতে এ শুভ ব্যাপারের ঘোষণা সর্ব্বাগ্রে তাহারই করা যে কর্ত্তব্য ছিল।

নেশার ঘোরে চলা-না-চলা অবস্থার মত দ্বারের দিকে সারদা দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছে,অমনি সে এক অভাবনীয় কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে কোথায় গো।"

শুনিবামাত্র ব্যস্ততার সহিত যেমন সে ঘর হইতে বাহির হইবে, অমনি দোরের কাছেই সে দেখিল—রাধারাণী!

তাহাকে দেখিয়া অতি বিস্ময়ে সারদা কহিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। রাধারাণীই প্রথমে কথা কহিল—"ফিরে এলুম বৌদি। খোকাবাবুর পাকা-দেখা দেখতে এলুম।"

তাহার ফেরার কারণ সারদা পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠস্বরেই অনেকটা বুঝিয়াছে। সে কণ্ঠস্বর তার খাশুড়ীর। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কি বাড়ী থেকে ফিরে এলি?"

"না, পথ থেকে।"

"মা'র সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল?"

"পিসীমা ও মা দু'জনেই এখানে আসছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা। পিসীমা ফিরিয়ে আন্‌লে।"

"তোর মাও এসেছে!" বিধাতার রহস্যের কি যেন একটা নির্দ্দয়তা অনুভব করিয়া কথাশেষে সারদা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সে নিঃশ্বাসের ক্ষীণ স্পর্শেই রাধা-রাণীর বুকটা বেশ একটু তীব্র রকমেরই আঘাত পাইল। তার মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বলিল, "আমার আসা কি ভাল হয় নি বৌদি?"

"এখানকার পাকা-দেখার কথা তুই তোর পিসীকে বলেছিলি?"

অপ্রতিভের ভাবে রাধারাণী মাথা নাড়িল। এই অন্যায় গোপনের জন্য তাকে তিরস্কার করিতে সারদা বলিল—"ভালো করিস্ নি রাধারাণী, বল্‌লে নিশ্চয় তিনি আজ এখানে আসতেন না। এখানে এসে তিনি আজ বিপদে পড়েছেন।"

বালিকার মুখ বিবর্ণ হইল। সারদা সেটা লক্ষ্য করিল। যা হ'ক একটা সান্ত্বনার কথায় বালিকাকে সুখী করিবার জন্য যেমন সে মুখটি তুলিয়াছে, অমনি সে রাধারাণীর মাকে আসিতে দেখিল। বালিকাকে আর কোনও কথা তার বলা হইল না।

এ দিকে ও দিকে চাহিতে চাহিতে তার 'ঠাকুরঝির' নির্দ্দেশে রাধারাণীর মা সারদার ঘরের দিকে আসিতেছিল। সে ত সারদার ঘর চিনে না। এরূপ বাড়ীতে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে প্রবেশ করে নাই। কৃষ্ণধনের জন্য তাঁর শ্বশুর অনেক টাকা খরচ করিয়া এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বড় না হইলেও জোগাঁয়ের মত পল্লীগ্রামের মধ্যে, ইহা সৌধের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার একপ্রান্তে ছিল সারদার ঘর। ঘর বলি কেন, ইহা সে বাড়ীর একাংশ। মহামায়ার পিতা সারদা ও তার স্বামীর জন্য ইহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। যদি কখন মহামায়ার পুত্রগণের সহিত সারদার কোন অবনিবনাও হয়, মাঝে একটা প্রাচীর দিলেই ইহা স্বতন্ত্র বাড়ী হইয়া যাইবে।

সুতরাং সারদার ঘরে আসিতে রাধারাণীর মাকে অনেক ঘর অতিক্রম করিতে হইতেছিল। সে মহামায়ার ঘর দেখিয়াছে, তাহার পার্শ্বে সারিসারি আরও তিনটা ঘর দেখিয়া সেগুলার একটাতেও সে সারদাকে দেখিতে পায় নাই। তবে তাহাদের মধ্যে একটি বিলাতী ধরণের সাজানো ঘর এবং তাহার ভিতরে একটি সুন্দর টেবিলের উপর সাজানো অনেকগুলা বই দেখিয়া সেটা শ্যামসুন্দরের ঘর অনুমান করিয়াছে। এইবারে সারদার ঘর দেখিলেই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হয়।

শ্যামসুন্দরের ঘর ও সারদার ঘরের মধ্যে এক দীর্ঘ ও

প্রশস্ত ছাদের ব্যবধান। সে ছাদ আবার গলা পর্য্যন্ত উঁচু পাঁচিল দিয়া ঘেরা, ছাদে পা দিয়াই রাধারাণীর মা কৃষ্ণধনের বাড়ী-ঘেরা বাগান দেখিতে পাইল।

সে বাগান কত বড় ও কত সুন্দর! কত রকমের ফলের গাছই না তাহার মধ্যে। এক একটা আমগাছ ফলভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। এই রূপ কাঁঠাল, লিচু, জাম, গোলাপজাম—ছাদের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রাচীরে বুক দিয়া সে দেখিয়া লইল। সর্ব্বশেষে সে দেখিল, বাগানের মধ্যে প্রশস্ত শানবাধানো ঘাটের শোভার হিল্লোলে আনন্দ প্রকাশ করিতে নির্ম্মল জলরাশি পূর্ণ বিশাল দীঘি! দেখিয়া কন্যার সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক বাঁধিবার নিরাশায় যেমন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে, অমনি সে পিছন হইতে শুনিল—"মামী!" সে চমকিয়া উঠিল। তার মনে হইল, যেন মেঘের গর্জ্জন প্রতি অণুতে মাখিয়া দীর্ঘশ্বাস তার বেদনার কথা বাড়ীর লোককে শুনাইতে চলিয়াছে।

মুখ ফিরাইতেই সে সারদাকে দেখিল। তখন ধরাপড়া চোরের মত কহিবার কোনও কথা না পাইয়া সে মৃদুহাস্তে বলিয়া উঠিল—"তোমার ঘর দেখিতে আসছি বৌমা!"

"তা আমার ঘর কি গাছের ডগায় ঝুলছে মামী!" বলিয়াই সারদা হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেই যে তার মামী এমন অপ্রতিভের ভাব দেখাইবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তাহার এই নির্দোষ রহস্তে 'মামীর' মুখ সহসা বিষণ্ণতার ছায়া মাখিতে দেখিয়া সে লজ্জিতা হইল। বলিল—"এসো তবে, পায়ের ধুলো দিয়ে ঘর পবিত্র ক'রে যাও।"

"তোমার ঘর এমন একপাশে কেন বৌমা!"

পিছনে দোরের অন্তরালে কন্যা ছিল, সে দেখে নাই। সে সেই আড়াল হইতে বলিয়া উঠিল—"এরা বৌদিকে একঘরে করেছে!"

মেয়ের কথা কানে পশিতেই মায়ের রাগ হইল। ওই পোড়া মেয়ের জন্যই না তার যত দুঃখ! আজিকার তার নিজের অবস্থা—তার মায়ের অবস্থা বুঝিয়াও সে কি না রহস্ত করে! ক্রোধের ভরে তখন মেয়ের দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনাইতে সে সারদাকে বলিল—"পোড়ারমুখো মেয়ে কর্‌লে কি মা!"

"কি করেছি?" বলিয়া রাধারাণী কবাটের বাহিরে আসিল।

তাহার কথার উত্তর না দিয়া তাহার দিকে মুখ পর্য্যন্ত না ফিরাইয়া রাধারাণীর মা বলিতে লাগিল—"পথে যদি হতভাগী ঘুণাক্ষরে আমাদের এই পাকা-দেখার আভাস দিত, তা হ'লে ত আমরা আসতুম না। এসে ঠাকুরঝির মুখ নীচু হয়ে গেল।"

"মুখ নীচু হবে কেন—পিসীমা কি আমার বিয়ের ঘটকালি করতে এসেছিল?"

"থাম্ বেহায়া মেয়ে। আর কেউ কোথা থেকে শুনতে পেলে আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে।"

এইবারে সারদা উত্তর করিল—"মেয়েকে গাল দিয়ো না মামী! ওর ত কোন দোষ নেই, কারও কোন দোষ নেই—সব ভবিতব্য। ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পার্‌লে ওর নতুন মা যত সুখী হ'ত, এত সুখী বুঝি কেউ হ'ত না। কিন্তু হবার সমস্ত সুবিধা হ'য়েও হ'ল না। বিধাতা এসে মাঝে প'ড়ে বাদী হ'ল।"

"তা তো এসেই বুঝতে পেরেছি বৌমা!" বলিতে গিয়া রাধারাণীর মা দীর্ঘশ্বাস চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারিল না।

বেশ একটু তিরস্কারের সুরে রাধারাণী তাকে বলিয়া উঠিল—"ছাই বুঝেছিস্। তুই ত বল্‌বি টাকার লোভে আমার নতুন মা বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে খোকা বাবুর বিয়ে দিচ্ছে? তা হ'লে ছাই বুঝেছিস্।"

তার মা ও সারদা উভয়েই বালিকার মুখের পানে চাহিল। সারদা চাহিল বিস্ময়ে—এ ছোট মেয়েটা বলে কি! কি বুঝিয়া সে এরূপ কথা কহিতেছে! তার মা চাহিল রাগে - সত্যই তার মনে হইয়াছে, টাকার লোভেই ইহারা বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতেছে। তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে ইহাদের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ না করার সে আর কোন কারণ দেখিল না। বাড়ীর গৃহিণী—সে ত আজ এমন দিনে তার কন্যাকে তাচ্ছল্যের ভাবেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। হতভাগ্য মেয়ে তাকে বলে কি না মা!

সারদা তার মুখের ভাব দেখিয়া অন্তরের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিল। তখন আশ্বস্ত করিতে তাহাকে বলিল—"মেয়ের এখন বিয়ের ভাবনা কি মামী; তোমার ভাগনেকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের ছেলে-মেয়ে কিছু নেই; যত টাকা লাগে খরচ ক'রে ওই খোকারই মত পাঁচটা পাশ করা কুলীন পাত্র তিনি তাঁর বোনের জন্য নিয়ে আস্‌বেন।"

"না বৌদি, আমি একটা বুড়ো বর কর্‌বো। সে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার সত্তরের ওপর বয়স, কিন্তু অনেক টাকা।"

সারদা বলিল—"বালাই।"

"না বৌদি, সেই ঠিক হবে, তার ছেলেপুলে কেউ নেই। বিয়ে করলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিধবা হ'ব। আর আমি তার অগাধ টাকা নিয়ে নতুন মায়ের বাড়ী চ'লে আসব!"

কথাগুলার ফাঁকে ফাঁকে লুকানো তার অন্তর্ঘাতনা সারদার বক্ষে কতকগুলা তপ্ত শলাকার মত আসিয়া আঘাত করিল। রাধারাণীর মুখের পানে চাহিতে সে দেখিল, এখনও একরাশ শলাকা তার ডাগর চোখ দুটির তারার অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে। শৈশবের প্রথম দেখা হইতেই কি এ কিশোরী শ্যামসুন্দরের প্রতি অনুরাগ অবিচ্ছিন্ন ডোরের বাঁধন হৃদয়ে বহন করিয়া আসিতেছে? প্রাতঃকাল হইতে রাধারাণী সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা সে দেখিয়াছে, তাহাকে তাহার মন ইহাকে নবানুরাগ বলিতে চাহিল না। রাধারাণীর মায়ের মুখের পানে চাহিতে সে দেখিল, তার গণ্ডে অশ্রু ঝরিতেছে।

রাধারাণীও সেটা দেখিল। দেখিয়াই বলিল—"আ মর! কেঁদে এদের অকল্যাণ করতে এলি!"

ভয়ে লজ্জায় রাধারাণীর মা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"না মা, এদের বাড়-বাড়ন্ত হ'ক।"

ঠিক এমনি সময়ে নীচে হইতে সারদার শ্বাশুড়ী ডাকিলেন—"সারদা!"

"মামী! তোমরা ঘরে গিয়ে ব'স, আমার মাথা খাও, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। রাধারাণি, সেটা কোথায় রেখেছিস্?"

"আছে বৌদি।"

সারদা তাহাকেও তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। চোখের সে অন্তরাল হইতেই মা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আছে?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া রাধারাণী প্রশ্ন করিল—"নতুন মা'র সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?"

আবার মা? রাগের ভয়ে রাধারাণীর মা কন্যার কথার উত্তর দিল না। রাগটা কন্যা বুঝিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"চুপ ক'রে রইলি কেন? "তবে ঘরে আয়। পাকা-দেখা না হয়ে গেলে তার সঙ্গে দেখা করিস্‌নি।" মা নড়িল না দেখিয়া হাত ধরিয়া রাধারাণী তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। চৌকাঠ পার করাইয়াই বলিল—"আমি যে কেন ও কথা বললুম, বুঝতে পারলি না?"

"কোন কথা?"

"খোকা বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে কেন হ'ল না।"

"আমি ত আর 'জান্' হয়ে আসি নি?"

"একটু বুদ্ধি থাকলেই হয়, জান্ হ'তে হয় না। আমি যাকে দাদা ব'লে ডাকবো, আমার বর তাকে পিসেমশাই ব'লে ডাকবে?"

চক্ষু দুটা যত দূর বিস্ফারিত হওয়া সম্ভব, এমনি বিস্ময়ে রাধারাণীর মুখের পানে তার মা চাহিয়া রহিল। রাধারাণী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটু করুণার্দ্র ভাবে বলিল, "কারও দোষ দেখিস্ নি মা, দেখ্‌বার আগে একবার নিজের কপাল-টায় হাত দিস্।" বলিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা সুন্দর সতরঞ্চ টানিয়া পাতিয়া মাকে তাহার উপর বসিতে অনুরোধ করিল। "এইখানে কিছুক্ষণ ব'সে থাক্। আমি একবার ঘুরে আসি।"

"তুই কোথা যাবি?"

"বা! খোকাবাবুর পাকা দেখা, গাঁ শুদ্ধ লোক এ বাড়ীতে আনন্দ করতে এসেছে, আর আমি তোর পাশে মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থাকবো! নতুন মা'র সঙ্গে দেখা করব না? আমি এসে তার সঙ্গে দেখা করি নি শুনলে তিনি মনে করবেন কি?"

"কিন্তু রাধারাণী, এদের সম্পর্ক ত শুনেছি—"

"চুপ চুপ হতভাগী—চুপ" বলিয়াই মাকে মহামায়ার বাপের ছবি দেখাইয়া বলিল—"ওই দেখ, তোর কথা শোন্‌বার আগে কর্ত্তাবাবুর চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। মুখে ত নয়ই, ও কথা আর মনেও আনিস্ নি। আমাদের সঙ্গে দাদার সম্পর্ক এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, এ সম্পর্ক থাকিতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু এদের সম্পর্কে বিধাতা ওই ঠাকুরের প্রাণ দিয়ে গেছে। সম্পর্ক নেই বললে এ ঘরের দেয়াল পর্য্যন্ত আগুন হয়ে উঠ্‌বে। তাতে তুইই কেবল পুড়ে মরবি, আর কারও ক্ষতি হবে না।"

বসিতে মাকে আবার অনুরোধ করিয়া রাধারাণী দুয়ারের দিকে চলিল। মা বলিল—"আমিও যাই না কেন?"

"না মা, তোর এখন যাওয়া হ'তে পারে না।"

"কেন, দোষ কি? আমিও গিয়ে এ শুভ কার্য্যে আনন্দ করব।"

"তুই পারবি না মা, কোন্ ফাঁকে তোর নাক দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেরুবে, কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে, তখন গলায় দড়ী দিয়ে মরা ভিন্ন আমাদের আর কোনও গতি থাকবে না।"

মা মেয়ের মুখের দিকে কেবল চাহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেয়ে তখন ঈষৎ ক্রোধের ভাবে মাকে বলিল—"বৌদির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তুই তিন চারবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিস।"

মা বলিল—"আমি যাব না লো, তুই যা।"

রাধারাণী চলিয়া গেলে সে এক বাহুমূলে চোখ ঢাকিয়া, অন্য বাহুমূলে মাথা দিয়া, মেঝের দিকে মুখ করিয়া সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

২৯

বাহিরে আসিয়াই কৃষ্ণধন জানিলেন, তারিণী বাবু কিম্বা তাঁহার পিতা পাকা দেখিতে আসেন নাই, আর যত লোক আসিবার কথা ছিল আসে নাই, আসিয়াছে মাত্র তিন জন—কৃষ্ণধন ও তারিণী বাবু উভয়েরই বন্ধু,যিনি এই বিবাহের একরূপ ঘটকালি করিয়াছেন—তিনি এবং তারিণীবাবুর এক কর্ম্মচারী ও এক বরকন্দাজ। বন্ধুটি মুন্সেফ—নাম হরেন্দ্রনাথ। ইহাতে কৃষ্ণধনের ক্রোধ হইবারই কথা ছিল, তাহাদের পিতাপুত্রের দাম্ভিকতা অনুমান করিয়া ঘটনাসূত্রে তাঁহাদের না আসায় এখন বাস্তবিক তাঁর আনন্দের সীমা রহিল না। এ সম্বন্ধ অতি সহজে ভাঙ্গিয়া দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইহাও বুঝিতে তাঁর বাকি রহিল না, এ সম্বন্ধ লইয়া পিতাপুত্রের মতের মিল হয় নাই।

কৃষ্ণধনের এরূপ অনুমান করিবার কারণ ছিল।

তারিণী বাবুর পিতা জয়রাম চৌধুরী অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কিন্তু সামান্য ব্যবসায় হইতে আরম্ভ করিয়া এক সময়ে সহসা তিনি এত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, দেশের লোক তাঁহার হঠাৎ-বাবু নাম দিয়াছিল। এখন তাঁর লাখ টাকার উপর আয়ের সম্পত্তি। ব্যবসায়, তেজারতিতেও খাটিতেছে চার পাঁচ লক্ষ টাকা।

স্বভাব-কুলীনকে কন্যাদান করিয়া তাহাকে ঘরে রাখা সে সময় সাবর্ণ চৌধুরীদের একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। যিনি এরূপ করিতেন, তাঁহার কুলপতি আখ্যা হইত। সামাজিক যে কোনও মাঙ্গল্য কার্য্যে সভামধ্যে তিনি মাল্য-চন্দন পাইতেন। এখন বিবাহাদি ব্যাপারে এই মাল্য-চন্দন দানোৎসব প্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সময় সমাজে ইহা একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ছিল।

ধনী হইবার পর হইতেই জয়রামেরও কুলপতি হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নিজের কন্যা ছিল না, সুতরাং তিনি স্থির করিয়াছিলেন, পুত্র তারিণীচরণের কন্যাকে একটি কুলীন-সন্তানকে দান করিবেন। সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেই হইল, মূর্খ হইলেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

পুত্র তারিণীচরণ ইংরাজী-শিক্ষিত। কুলের আদর তাঁহার কাছে ত ছিলই না, বরং কৌলিন্যকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সেই সময় হইতেই পাশকরার উপর কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁর অভিপ্রায় পাশ করা পণ্ডিত না হইলে শুধু বংশ-কৌলীন্য দেখিয়া কাহাকেও তিনি কন্যাদান করিবেন না। ছেলে কুলীন না হইলেও যদি সে ইংরাজী শিক্ষিত হইত, তাহাকে কন্যাদানে তাঁর আপত্তি ছিল না। তবে পিতার উপার্জ্জন, পিতার জেদ—একেবারে অকুলীনকে কন্যাদানে তাঁর সাহস হয় নাই।

কন্যার আট বৎসর বয়স হইতেই পাত্রের সন্ধান চলিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তারিণী বাবুর অভিমত পাত্র মিলে নাই। এখন কন্যার বয়স দশ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহার পর কন্যাদান করিলে দানের ফল হইবে না। বৃদ্ধ জয়রাম কোনও মতে এই সময় উত্তীর্ণ হইতে দিবেন না জানিয়া পুত্র তারিণীচরণ মনোমত পাত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

অবশ্য, তখনকার সংস্কার - এখনও যে একবারে নাই, এ কথা বলিতে পারি না—অনেক অর্থের প্রলোভন না থাকিলে পুত্রের কুলভঙ্গে কোন পিতাই সহজে সম্মত হইত না। এরূপ বিবাহে পুত্র একরূপ বিক্রীত হইত। এইরূপ বিবাহের পর, কুলীন পিতা ভগ্নকৌলীন্য পুত্রের সঙ্গে একরূপ সম্বন্ধই রাখিত না, এমন কি ভালরূপ প্রণামী না পাইলে পুত্রবধূর হাতের অন্ন গ্রহণ করিত না। বিবাহের সমস্ত উৎসব পুত্রের শ্বশুর-গৃহেই সম্পন্ন হইত এবং বিবাহের পর হইতে কন্যা বাপের ঘরেই রহিয়া যাইত, শ্বশুর-গৃহ দেখার ভাগ্য তার জীবনে ঘটিত না। জামাতা যদি এক পক্ষ হইত, তাহা হইলে আজীবন শ্বশুর-গৃহেই থাকিয়া যাইত। কিন্তু সেটা প্রায়ই ঘটিত না,—অনেক সময়েই এই সকল জামাতা বহুবিবাহ করিয়া বসিত এবং পুরোহিতের যজমান-বাড়ীতে ঘুরার মত দক্ষিণার লোভে এক শ্বশুর-ঘর হইতে অন্য শ্বশুর-ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সুতরাং শ্যামসুন্দরের মত সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন পাত্রকে জামাতৃ-রূপে পাইবার আশ্বাসে তারিণীচরণ এতই উল্লসিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বরের পিতাকে রাশীকৃত অর্থদানের অঙ্গীকারে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বহু অর্থ ও বহু মূল্যবান্ সম্পত্তির প্রলোভনে কৃষ্ণধনও পুত্রের বিবাহ দিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রের কুলের দিকে দৃষ্টি রাখিবার তাঁর অবসর হয় নাই, এ বিবাহ দিলে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কি সম্বন্ধ থাকিবে, এ কথা ভাবিতেও তাঁর সময় হয় নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিলে মহামায়ার উল্লাস হইবার সম্ভাবনা। না হইলেও পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিঃসংশয়তায় এ বিবাহে আপত্তি করিবার তার কিছুই থাকিবে না।

কৃষ্ণধনের সঙ্গে তারিণীচরণের যখন এ বিবাহ লইয়া কথাবার্ত্তা হয়, তখন বৃদ্ধ জয়রাম দেশে ছিলেন। বাড়ীর সমস্ত পরিবারেরই ইহাতে উল্লাস হইয়াছিল, পিতারও ইহাতে উল্লাস না করিবার কিছু নাই জানিয়া পাছে বাড়ী

নাইলে কৃষ্ণধনের মতের পরিবর্ত্তন হয়, এই ভয়ে পিতার মত না লইয়াই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়া নিজেও তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পাকা দেখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

পুত্রের কাছে সংবাদ পাইয়া জয়রাম কলিকাতায় আসিলেন, আসিয়া উল্লাস দেখাইবার পরিবর্ত্তে পুত্রকে তিরস্কার করিলেন, তাঁহার মত না লইয়া এ পাত্র সে মনোনীত করিয়াছে বলিয়া। বাপ হাকিম, ছেলে পাশ করা, তাহার উপর সে বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান—তাহারা ছেলেকে ঘর-জামাই করিয়া দিতে কি স্বীকৃত হইবে? তারিণীচরণ কৃষ্ণধনের সঙ্গে এ কথার মীমাংসা করেন নাই। শ্বশুর-ঘরে কন্যা পাঠাইতে তারিণীচরণের বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু জয়রামের জেদ, এত টাকা যখন পণস্বরূপ দিয়া পৌত্রীর বিবাহ দিব, তখন জামাইকে ঘরে রাখিব। হরেন বাবু ছিলেন এ বিবাহের ঘটক। এ কথার মীমাংসা করিতে তাঁহাকেই কৃষ্ণধনের বাড়ী আসিতে হইল। তাঁহার সঙ্গে দশ হাজার টাকার নোট লইয়া এক কর্ম্মচারী আসিল। কৃষ্ণধনের বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রীর মত হইলেই তারিণী বাবুর সত্যনিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ এই টাকা তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখা হইবে। মত হইলেই আর কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃদ্ধ জয়রাম নিজে পুত্রকে সঙ্গে আনিয়া পাকা করিয়া যাইবেন।

প্রস্তাবে সম্মতি দিতে কৃষ্ণধনকে তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে বৃদ্ধ জয়রামকে শুনাইতে কৃষ্ণধনের হরেন্দ্র বাবুকে একটা কথা বলিবার সুবিধা হইল। তিনি বলিলেন—"জয়রাম বাবুর ধনের অভিমান, জামাই কিনিয়া কন্যাকে চিরদিন ঘরে রাখিবার তাঁর অধিকার আছে, কিন্তু আমারও কুলের অভিমান—আমার পুত্রের দু'দশটা বিবাহ দিবার অধিকার আছে। দশটা না দিই, ঘরে থাকিয়া আমার স্ত্রীর সেবার জন্য অন্ততঃ আর একটি কন্যাকে পুত্রবধূ করিতেই হইবে। ইহাতে যদি তাঁর মত থাকে, আমাকে সংবাদ দিবেন।"

শুনিয়া হরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"এ কথা অযৌক্তিক নয়। আমি তাঁহাদের বলিব।"

কর্ম্মচারী বলিলেন—"এরূপ প্রস্তাবে কর্ত্তাবাবু কিম্বা বাবু কাহারও বোধ হয় অমত হইবে না।"

"বেশ, মত হয়, যত শীঘ্র পারেন সংবাদ দিবেন।"

রমাপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া নীরবে এই সব কথোপকথন শুনিতেছিল। বাহিরে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া যখন সে জানিতে পারিল, কন্যাকর্ত্তাদের কেহই আসে নাই, তাহারা প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, তখন তাহাদের উপর রাগের সঙ্গে তার দাদার উপরও তার রাগ হইয়াছিল। তবে রাগটা সম্পূর্ণ ভাবে গোপন করিয়া কৃষ্ণধনের কার্য্যকলাপ দেখিতে ও তিনি কি বলেন, শুনিতে সে একেবারেই নীরব হইয়া ছিল। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, দাদার যদি অর্থ-লোভ এতই বেশী হয় যে, তাহাদের এরূপ অসম্মানের ব্যবহারেও তিনি জয়রামের পৌত্রীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের বিবাহ দেন, তাহা হইলে মুখে না বলিতে পারিলেও কার্য্যতঃ সে এ বাড়ী চিরকালের মত পরিত্যাগ করিবে, সারদাকেও কখন এ বাড়ীর দোরে সে মাথা গলাইতে দিবে না।

কৃষ্ণধনের কথা শুনিয়া রমাপ্রসাদ সুখীও হইতে পারিল না, দুঃখীও হইতে পারিল না। তথাপি সে কোনও কথা কহিল না, কৃষ্ণধনকে সে এমনি শ্রদ্ধা করিত। কৃষ্ণধন কিন্তু কথাশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, তোমার এতে মত আছে ত রমাপ্রসাদ?"

রমাপ্রসাদ এতক্ষণে কথা কহিবার সুযোগ পাইল—"আবার খোঁচ রাখলেন কেন দাদা?"

"কি খোঁচ?"

"একেবারে বলিলেই ত হইত এ বিবাহ হইবে না।"

হরেন্দ্র বাবু ও তাঁর সহচর ব্যতীত সে ঘরে প্রতিবেশী-দিগের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মুখে প্রতিবাদ করিতে না পারিলেও অনেকে এরূপ বিবাহ সম্বন্ধে কৃষ্ণধনের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিজ্ঞদের মধ্যে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কৃষ্ণধনের এ একরূপ পুত্রকে বিক্রয় করা হইতেছে। বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কৃষ্ণধনের খুড়া হরাধন। তিনি কৃষ্ণধনের পিতার মামাতো ভাই—শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। কৃষ্ণধন তাঁহাদেরই দৌহিত্র-বংশ। কুলভঙ্গ করিতেছে বলিয়া নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি দুপুর বেলায় ইহাদের বাড়ীতে আহার করিতে আসেন নাই। আশীর্ব্বাদের সময় শুদ্ধমাত্র মহামায়াকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। আসিয়া হরেন্দ্র বাবু ও কৃষ্ণধনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেকটা সন্তুষ্ট হইলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র একেবারে অর্থের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি পূর্ণ সুখী হইতে পারিতেছিলেন না। জয়রাম চৌধুরীর দম্ভের কথা শুনিয়া তাঁহার রাগ হইতেছিল—মমতাময়ী মহামায়া—তার সবে ধন নীলমণি—তার বউকে লইয়া সে ঘর করিতে পাইবে না, তথাপি কৃষ্ণধনের কার্য্যের তিনিও কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। কৃষ্ণধনের—বিশেষতঃ তাঁহার পত্নীর কাছে বৃদ্ধ নানাপ্রকারে উপকৃত হইতেন। তাহার উপর এ বিবাহে শ্যামসুন্দর অগাধ টাকা পাইবে, বিপুল সম্পত্তির মালিক হইবে। এরূপ লোভ ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। কৃষ্ণধনের শেষ কথায় অনেকটা হাঁফ ছাড়িবার মত হইলেও

শ্যামসুন্দরের ছুঁই বউ হওয়াটা তাঁহার মনোমত হইতেছিল না। তবে উত্তরের হিসাবে সে কথা যে খুব যোগ্য হইয়াছে, ইহা অনুভব করিয়া মনে মনে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু রমাপ্রসাদের উত্তর শুনিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। এ উল্লাস তিনি গোপন রাখিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—"বেঁচে থাক রমাপ্রসাদ।"

রমাপ্রসাদ এবারে কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবেই বলিয়া উঠিল —"দাদা এরূপ—" বলিতে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিল।

হারাধন বলিলেন—"বল না দাম্ভিক—বল্‌তে সঙ্কোচ করছ কেন বাবা।"

রমাপ্রসাদ সত্য-সত্যই "দাম্ভিক" কথাটার প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল। স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার বশে তার বলিতে বলিতে বলা হইল না। সে এইবারে বলিল— "জয়রাম বাবুর এরূপ অভিপ্রায় শুনিবার পর তাঁহার ঘরে আপনার পুত্রের বিবাহ দিলে আপনার মর্য্যাদাহানি হইবে।"

কৃষ্ণধন এইবারে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা হ'লে এঁদের সকলের সম্মুখে কান মল, আর বল, ওরূপ আহাম্মোকের মত প্রতিজ্ঞা আর কখন করিবে না।"

সত্য-সত্যই রমাপ্রসাদ কান মলিল। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যদিও তাহার এরূপ দণ্ড গ্রহণের কারণ কেহ বুঝিতে পারিল না।

রমাপ্রসাদ বিনীতভাবে বলিল—"সেটা আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই করেছিলুম দাদা।"

"এখন ?"

"এখন আপনার যা হুকুম।"

হরেন্দ্র বাবু অতিবিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন— "ব্যাপারখানা কি কৃষ্ণধন বাবু ?"

"বলছি আপনাকে, শুধু আপনাকে কেন, সকলকেই ওঁর কীর্ত্তি শুনিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়াই রমাপ্রসাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—"যাও তোমার বৌদিদির সঙ্গে দেখা ক'রে হাত-পা ধুয়ে এখানে ফিরে এসো। আজ এত লোক আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে সমস্ত দিন ধ'রে উৎসব করলেন, এঁরা যে শেষকালে নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে যাবেন, সেটি হ'তে দিচ্ছি না।"

প্রতিবেশীদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল—"উৎসব কি যেমন তেমন !"

"অপর এক জন বলিল—"সে এক রকম বিয়ের ভোজ বল্‌লেই হয়।"

হরেন বাবু বলিলেন—"বলেন কি কৃষ্ণধন বাবু, এত আয়োজন করিয়াছিলেন।"

হারাধন বলিলেন—"যিনি করবার তিনি করেছেন— উনি কে ? বৌমা কাজ যখন করেন, তখন এই রকমই করেন,— অল্পে তাঁর মন ওঠে না !"

অপর একব্যক্তি হরেন্দ্র বাবুকে শুনাইয়া বলিলেন— "পাড়ার মেয়ে-পুরুষের—সকলেরই আজ এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ।"

দ্বারের পার্শ্ব হইতে বুড়ী রামমণি বলিয়া উঠিল— "এখনও দেখগে যাও না গো, লোক যাচ্ছে।"

হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইতে আসিয়া সনাতন বলিল "বাবুদের কুড়ি পঁচিশ জন আসবার কথা ছিল, মা তাই জেনে সেই রকম জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন, না আসাতে তাঁর মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে।"

কর্ম্মচারী বলিল—"কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে কথা ঠিক না ক'রে বাবুর এ রকম পাকা কথা কওয়া ভাল হয় নি।"

কৃষ্ণধন এ সব ভালমন্দের কোনও উত্তর না দিয়া রমাপ্রসাদকে হুকুম করারই মত বলিলেন—"ব'সে ব'সে কি শুনছ রমাপ্রসাদ, ওঠ। আজকের দিন আমি বৃথা যেতে দেবো না।"

রমাপ্রসাদ যেন অনিচ্ছায়, শুধু 'দাদা'র আদেশ পালন করিতে দাঁড়াইল।

"মনে এখনও খুঁত থাকে ত বল।"

"কোনও খুঁত নেই দাদা, কেবল বৌদির সঙ্গে কেমন ক'রে দেখা করব, তাই ভাবছি।"

"সে আমি জানি না, যদি আজকের দিন বৃথা যায়, তা হ'লে তোমার ওই ঘরের পাশ থেকে পাঁচিল তুলে দেব। আর তোমাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি রাখব না ;"

রমাপ্রসাদ যেন চোখের নিমিষে বাহিরে চলিয়া গেল।

এ ব্যাপার এখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই। হারাধন কতকটা অনুমান করিলেন। সারদা প্রাতঃকালে রাধারাণীকে লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছে। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমি বুঝেছি কৃষ্ণধন।"

"শুধু বুঝলে হবে না কাকা, আপনি আহার করিতে আসেন নি—আপনার পুত্রবধূর তাতে কি মনঃক্ষোভ হয়েছে তা জানেন ?"

"আমার শরীর ভাল ছিল না বাবা, নইলে মায়ের নিমন্ত্রণে কবে আমি না এসেছি ?"

"শরীর ভাল ছিল না, না মন ভাল ছিল না, আমি ছেলের কুলভঙ্গ করছি শুনে। আপনার নাতীর কুল আপনাকে দিয়েই ভাঙ্গাবো। রমাপ্রসাদ ছেলে মানুষ, আমি জানবো, সেই মেয়েটার অভিভাবক আপনি, নাতীকে প্রথমে আশীর্ব্বাদ আপনাকেই করতে হবে।"

"নাতী আমার বাড়ীতেই ব'সে আছে।"

আপনিই তাকে ধ'রে আনুন।"

হারাধন উঠিতে বিলম্ব করিলেন না। ঘর হইতে তাঁর বাহির হইবার সময়ে কৃষ্ণধন তাঁহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কুল ভাঙ্গায় আপনার কি আপত্তি আছে কাকা?"

"কিছু না, এতে তোমার মহত্ত্বই দেখানো হচ্ছে কৃষ্ণধন! তুমি আজ একটা কুলীনের জাত রক্ষা করছ।"

তখন সমাগত প্রতিবেশীদিগকে কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমাদের কারো আপত্তি আছে?

সকলে একবাক্যে বলিল—"কিছু না।"

হারাধন প্রস্থান করিলেন। হরেন্দ্র বাবু ব্যাপারটা বুঝি বুঝি করিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বারে জানতে পারি কি?"

"শুধু জানাবো না, আপনাদের দু'জনকেও আমি ছাড়বো না। আপনাদের এ আশীর্ব্বাদের সাক্ষী থাকতে হবে।" এই বলিয়া কৃষ্ণধন সকলকেই রাধারাণীর ইতিহাস আদ্যোপান্ত শুনাইয়া দিলেন। শুনিয়া হরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"এরূপ অবস্থায় সেই পিতৃহীনা বালিকাকেই পুত্রবধূ করা আপনার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।"

এই সময়ে কৃষ্ণধন রমাপ্রসাদের কর্ণমর্দ্দন তত্ত্বটাও হরেন্দ্র বাবুকে শুনাইয়া দিলেন। সে ঘরের সকলেই সেই সঙ্গে সে কথা শুনিল, সকলেই তখন আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল—"পিসীর মামাতো বোন, তার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের সম্পর্ক কি?"

অপর এক জন বলিল—"মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্কই নাই।"

অবশ্য প্রতিবেশীর মধ্যে এক জনও কৃষ্ণধন ও রামপ্রসাদের মধ্যে রচা সম্পর্কের সমালোচনা করিতে সাহস করিল না। রমাপ্রসাদ গ্রাম শুদ্ধ লোকের এমনি প্রিয় ছিল। উভয়ের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও আত্মীয়তা গ্রামবাসীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। আপনা-আপনির ভিতরে কখনও কলহ হইলে ইঁহাদের সম্বন্ধের তুলনা করিয়া তাহাদের অনেকেই অনেক সময় কলহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।

৩৩

রমাপ্রসাদের এই নবপরিচিতা ভগিনীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের বিবাহ-কথায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল।

রমাপ্রসাদের মা বাস্তবিক কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন না। অনেকদিন মহামায়া ও তার পতি-পুত্রকে দেখেন নাই, এই জন্য আসিতে হয়, তাই আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে মহামায়ার উপস্থিতির কথা তিনি জানিতে পারেন নাই,—কেহ তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। হঠাৎ কোথা হইতে কে যে আসিয়া রাধারাণীকে ধরিয়া তাহার মাতৃত্বের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, রাধারাণীর মা তাহা বুঝিতে পারে নাই। মেদিনীপুরে মহামায়াকে সে একদিন মাত্র দেখিয়াছিল, তাহাও তার দুরন্ত কন্যার দুষ্টপনার কল্যাণে এত অল্প সময়ের জন্য যে, পরদিন মহামায়াকে দেখিলে সে চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ। সারদা রাধারাণীর মুখে শুনিয়া একটা অনুমান করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু নিজে পরিষ্কাররূপে না জানা পর্য্যন্ত সে কথার পুনঃ প্রকাশে সে এতদূর সাবধান হইয়াছিল যে, রাধারাণী পর্য্যন্ত সে দিনের ঘটনা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল।

সারদাকে ইদানীং প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকিতে হইত। বৃদ্ধা একাকী বাড়ী আগুলিয়া থাকিতেন। রাধারাণী ও তাহার মাতার আগমনে অল্পদিন মাত্র বাড়ীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ হইয়াছিল। সারদা আসিল, কিন্তু দুটা দিন থাকিতে না থাকিতে মেয়েটাকে লইয়া গেল। বাড়ীতে থাকতে বৃদ্ধার ভাল লাগিতেছিল না, তাই ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া তিনিও জোগাড়ে চলিয়া আসিয়াছেন।

রাধারাণীর আজি পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিবার কারণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। সে কারণ তার দারিদ্র্য। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তার মায়ের কুল রক্ষা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা। তার স্বামী মৃত্যুকালে কন্যাকে অকুলীনকে দান করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। নহিলে এতদিন এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যার বিবাহের ভাবনা থাকিত না। যে কোন অকুলীন ধনিপুত্র রাধারাণীকে বধূ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিত। মধ্যে একবার জুটিয়াছিল, সে কুলীন ও স্বঘর বটে, বিষয়ও তার যথেষ্ট, কিন্তু বয়স তার ষাটের উপর। পুত্রহীন হইলেও, রাধারাণীর মায়ের চেয়েও বড় তার চারি পাঁচটা কন্যা আছে। তার এক জন দৌহিত্র পর্য্যন্ত পুত্রবান হইয়াছে। রাধারাণীর মা প্রাণ ধরিয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে পারে নাই।

বৃদ্ধা এ সমস্ত শুনিয়াছেন এবং পুত্রের নাম করিয়া এই দরিদ্রা রমণীকে তিনি যথেষ্ট আশ্বাসিত করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারেই উপযুক্ত জামাতৃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে রাধারাণীর মা একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

সুতরাং রাধারাণীর মাকে কৃষ্ণধনের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত করিতে বৃদ্ধা যখন তাহাকে সঙ্গে আনিতে চাহিলেন, তখন প্রফুল্ল মনেই সে তাঁর অনুগমন করিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই, কোথায় সে যাইতেছে। বুঝিতে পারে নাই, সে দিন তাহাদের গোপালপুরের বাটীতে

যে রমণী অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া তার কন্যার নূতন মা হইয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সেই তার চিরস্বণিতা মেদিনীপুরের "কাল-নাগিনী।" জানিলে সে মহামায়ার বাড়ীতে আসিত না। রমাপ্রসাদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক জানিলে, বোধ হয়, তারও বাড়ীতে সে থাকিতে পারিত না।

রাধারাণীর ভবিষ্যৎ বরের কথা ভাবিতে গিয়া শ্যামসুন্দরের কথা একবার রমাপ্রসাদের মায়ের মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধা হইয়া কেমন করিয়া তার মা-বাপের কাছে তিনি তার কুলভঙ্গের প্রস্তাব করিবেন।

কিন্তু কৃষ্ণধনের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মহামায়াকে সম্বোধনের পর-মুহূর্ত্তেই যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, শ্যামসুন্দরের পাকা দেখা হইতেছে, আর তাঁহাকে মহামায়া নিমন্ত্রণ করে নাই; তখন তাহার উপর বৃদ্ধার অভিমান হইল। তার পর যখন তিনি জানিলেন, অর্থের লোভে ইহারা পুত্রের কুলভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, রাধারাণীর অবস্থার তুলনা করিয়া মনে মনে তিনি ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইহার একটু পরেই মহামায়ার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যখন তার মুখে তিনি শুনিলেন, রাধারাণীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের বিবাহে তাঁর পুত্রই অন্তরায় হইয়াছে, তখন তাঁর সমস্ত ক্রোধ রমাপ্রসাদের উপর পড়িল।

রমাপ্রসাদকে না পাইয়া তাহার উপর তিরস্কার পুত্রবধূকে শুনাইবার জন্য "সারদা" বলিয়া যেমন বৃদ্ধা উপরে যাইবার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াছেন, তিনি শুনিলেন —"ওগো আবুই-মা, তোমার ছেলে বলে কি গো!" পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিলেন, পুত্র ও মহামায়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে!

"মুখপুটা কি বলছে মা?"

"আমাদের এত দিনের সম্পর্কটা ঘুষ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।"

বৃদ্ধা এখনও কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলেছিস রে রমা?"

রমাপ্রসাদ অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকের কেশ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল—"বলেছি, আর তোমাকে বউদি ব'লে ডাকবো না, "নূতন মা" ব'লে ডাকবো"।

মুখ হাসিতে পূর্ণ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন—"তা হ'লে মুখ্যু কেন মা, ওর বুদ্ধি হয়েছে। মহামায়া, এইবারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব, বুঝবো আমি ম'লে রমা মা-হারা হবে না।"

"তা কি হয় আঁবুই মা, কোথাকার কে একটা মেয়ে এসে দিন দুই তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বাঁধিয়ে আমার বাপের সাজানো ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যাবে।" এই বলিয়া রমাপ্রসাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া মহামায়া বলিলেন—"যাও ভাই ঠাকুরজামাই, তোমাদের এখন যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ কর। তোমাদের দান, তোমাদেরই গ্রহণ, মা আর আমি দু'জনে পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব।"

নীচে আসিতে পথের মাঝে সারদার কাছে তিরস্কৃত হইয়া রাধারাণী একটু বেশ তীব্র অভিমান হৃদয়ে পূরিয়া সারদার ঘরে ফিরিয়া আসিল আসিয়া দেখিল, তার মা সতরঞ্চের দিকে মুখ করিয়া বাহুমূলে মাথা ঢাকিয়া শুইয়া আছে। তার মনে হইয়াছে, পাছে খোকা বাবুর আশীর্ব্বাদ দেখিতে গিয়া ঈর্ষ্যায় দীর্ঘশ্বাসে সে শুভ কার্য্যের বিঘ্ন করে, এই জন্য বৌদিদি তাহাকে নীচে যাইতে দিল না। সে কোনও রকমে চোকের জল রোধ করিয়া তার মাকে ডাকিল। প্রথমে সে কোনও উত্তর পাইল না। তাহাকে একটু নড়িতেও দেখিল না। তখন, রাগের ভরে একটু ব্যস্ত ভাবেই সে বলিয়া উঠিল - "ম'রে গেলি না কি?"

"কি বলছিস্?

"উঠে ব'স্—মা'র সঙ্গে কি কথা ক'ইব!" —মা তার ভাবের এ সহসা পরিবর্ত্তন বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া বসিল—"উঠে কি করব?"

"আমার শ্রাদ্ধ করবি।"

মা এইবারে উঠিল। সেও এতক্ষণ আপনার ও কন্যার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে অশ্রু রোধ করিতে না পারিয়া, পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে মুখ নীচু করিয়া পড়িয়া ছিল, যদি কেহ দেখে বুঝিবে সে ঘুমাইতেছে। উঠিয়াই সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—"গেলি আবার চ'লে এলি যে?"

"আগে চোখ মুছে ফেল।"

সলজ্জভাবে মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া মা বলিল—"আমি কি এদের ছেলের বিয়ের কথা ভেবে কাঁদছি?"

"তা তো আমি বুঝি, কিন্তু এরা কেউ দেখলে কি তা বুঝবে। আমাকে যেতে দিলে না কেন বুঝেছিস? পাছে খোকা বাবুর পাকা দেখতে গিয়ে তোর মতন আমারও চোখে জল আসে।"

"কেন তোর চোখে জল আসবে—তোর দাদা বেঁচে থাক, তোর বিয়ের এখন ভাবনা কি?"

ঠিক এমন সময়ে কিন্তু রাধারাণীর চোখ জলে ভরিয়া গেল। বৈঠকখানার দিক্ হইতে বিপুল উচ্ছ্বাসে ঘনঘন শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত রাধারাণী বলিয়া উঠিল—"দেশে যাবি মা?"

মা কন্যাকে বসিতে আদেশ করিয়া বলিল—"ছি মা, অমন চঞ্চল হ'তে আছে। তোর বৌদিদি বলেছে, রূপে-গুণে কুলে, শীলে কার্ত্তিকের মতন তোর বর এনে দেবে।"

"তুই যাবি কি না বল্।"

"বোস হতভাগী, পাগলামি করিস নি।"

"উঠবি না ?"

"এখন তোর সঙ্গে কোন্ চুলোয় যাব ?"

"কোথায় এসেছি জানিস্ ?

"কোথায় এসেছি মানে কি ?"

"আমার নূতন মা কে জানিস্ ?"

"আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না বাপু।"

"তোর সেই মেদিনীপুরের কাল-নাগিনী।"

বৃশ্চিক-দষ্টার মত একবারে দাঁড়াইয়া মা বলিল—"বলিস কি !"

"এখানে থাকতে পারবি ?"

"তাই ত মা, কেমন ক'রে এদের মুখ দেখাবো ?"

কন্যা কোনও উত্তর না দিয়া বিছানার নীচে হইতে গহনার পুঁটুলি বাহির করিল এবং সহসা সঞ্জাত ভয়ে চারিদিকে অন্ধকার-দেখা মায়ের হাতে দিয়া বলিল—"আমার নতুন মাকে এটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারবি ?"

"এতে কি আছে ?"

"খুলে দেখ না !"

"তুই খুলে দেখিয়ে দে না।"

কন্যা মায়ের হাত হইতে পুঁটুলিটা লইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছে, অমনি উভয়েই শুনিতে পাইল—"বেয়ান কোথায় গো ?"

পুঁটুলি আর রাধারাণীকে হাতে করিতে হইল না, মায়ের হাত হইতে সেটা পড়িয়া গেল ! লজ্জা, বিস্ময়, ও পুলক একসঙ্গে জাগিয়া খর-প্রবাহে এক মুহূর্তে উভয়ের পরস্পর নিবদ্ধ দৃষ্টিপথ দিয়া ছুটাছুটি করিয়া গেল। সেই মুহূর্তেই একখানি অতি সুন্দর পট্টবস্ত্র হাতে মহামায়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি—তুমি—আপনি !—"

"যাও, আর তামাসা করিতে হবে না ভাই, তোমাকে মামী ব'লে প্রণাম করব মনে করেছিলুম, মেয়ে তোমার মাঝে প'ড়ে আমাদের সম্পর্কটা উল্‌টে দিলে। শীগ্‌গির এই কাপড়খানা ওকে পরিয়ে দাও—আর—সেগুলো কোথায় রাখলি রাধারাণী !" বলিয়াই তাহার পানে চাহিতে মহামায়া দেখিলেন, বালিকা যেন পতনোন্মুখী হইয়াছে। অমনি ছুটিয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া মুখ তার অজস্র চুম্বিত করিতে করিতে বলিলেন—"বিধাতা নিজে ঘটক হয়ে তোকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, আমরা মারামারি ক'রে কি তোর ঠাঁই কেড়ে নিতে পারি।"

এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমাগত মহিলাগণের উলুধ্বনি।

"ওই রমাপ্রসাদের আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। এইবারে তোমার বেয়াইয়ের পালা। তারা আসছে। যারা কলকেতা থেকে এসেছে, তারা অবাক্ হয়ে বিধাতার এই পুতুল খেলা দেখছে। খেলা সম্পূর্ণ দেখে সাঁঝের গাড়ীতেই তারা কলকেতা ফিরে যাবে। যত শীগ্‌গির পার, গহনাগুলো পরিয়ে মাকে সাজিয়ে রাখ।" বলিয়া, তখনও পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ মা ও মেয়েকে ছাড়িয়া মহামায়া ঘরের বাহির হইতে গিয়া যেই চৌকাঠে পা দিয়েছেন, অমনি রাধারাণীর মা জড়তা-মাখা স্বরে তাঁহাকে বেয়ান বলিয়া ডাকিল।

"করলে কি ভাই, পিছু ডাক্‌লে !"

"আমি ত এ সব গহনা কখন চোখেও দেখি নি, আমাকে সাজাবার কথা বলা যে তামাসা হয় বেয়ান !"

মহামায়া তখন ফিরিয়া বলিলেন—"বেশ, এ কাজ আমিই করি—আট বৎসর পূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে তোমার মেয়েকে আমিই সোনার শিকলে বেঁধে দিয়েছিলুম। শিকল আল্‌গা হ'তে গিয়ে শতপাকে জড়িয়ে গেল—আমি ব'সে ব'সে গ্রন্থিগুলো দিয়ে যাই।"

অল্পক্ষণ পরেই গোধূলি মুখে মুহুর্মুহু শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে কৃষ্ণধন রাধারাণীর মস্তকে আশীর্ব্বাদের ধানদূর্ব্বা রক্ষা করিলেন।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে, যখন রমাপ্রসাদের ঘরের সম্মুখে ছাদে বসিয়া কৃষ্ণধন ও তাঁর কাকা মশাইয়ের সঙ্গে সেই দিবাভাগের নিমন্ত্রিতেরা তারিণী বাবুদের জন্য মহামায়ার অতি যত্নের আয়োজন—মিষ্টান্নগুলি উদরস্থ করিতে লাগিলেন, তখন ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রমাপ্রসাদের মা পার্শ্বস্থ-ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন—"ওদের সম্পর্ক ওদের থাক্। চল্ বউ, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমরা কাশী যাই।"

"আজই চল না ঠাকুরঝি !"

"পারলে যেতুম রে—শত্রুগুলো যে, যেতে দেবে না বউ ?" নীচে হ'তে এই সময় সারদা আসিয়া বলিল—"মা, তোমরাও এই সময় শীগ্‌গির আহ্নিক সেরে মিষ্টি মুখ ক'রে নাও। আজ রাত্রেই আমাদের বাড়ী যেতে হবে। দোসরা আষাঢ় বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। মোটে আর দশটা দিন বাকি। এরই ভিতরে উদ্যোগ আয়োজন, গয়না গড়ানো—সমস্ত কাজ সারতে হবে। এসো বেয়ান নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বামুন খাওয়ানো দেখবার সময় নেই।"—বলিয়া সারদা তার মামীর হাত ধরিতেই উভয়ের, পরস্পরে পূর্ণ হাসির দান-প্রতিদানে, উত্তর-প্রত্যুত্তরের মীমাংসা হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ

দুর্গা

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নিবেদন

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺চণ্ডীর আখ্যান শ্রদ্ধাবান হিন্দুর পরম প্রিয় সামগ্রী। যাহাতে হিন্দু বালক-বালিকার জ্ঞাতব্য হয়, এই জন্য "ভারতীয় বিদুষী" প্রণেতা মদীয় স্নেহভাজন শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সরল বাঙ্গালায় ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়াছি। সমস্ত দেবীমাহাত্ম্যের আভাস দিতে ত পারিই নাই, যেটুকু লইয়াছি, তাহাও আশানুরূপ সরল হইয়াছে মনে করি না। সভয়ে জগদম্বিকার নাম স্মরণ করিয়া ইহা পাঠক পাঠিকার করে অর্পণ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য, এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমি মদীয় শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "দেবী-মাহাত্ম্যের" সাহায্য লইয়াছি। তাঁহার কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ এমন সুন্দর ও সরল হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে তাহা গ্রহণের লোভ আমি সংবরণ করিতে পারি নাই।

সাতক্ষীরা ভবন
কাশীপুর,
১৫ই আশ্বিন, ১৩১৬।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ শর্ম্মণঃ

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত ৺মাতৃদেবীর উদ্দেশে এই মাতৃ-মাহাত্ম্য অর্পণ করিলাম।

দুর্গা

১

আমি তোমাদের কাছে শ্রীদুর্গাদেবীর কথা বলি। এই কথা মার্কণ্ডেয় নামে এক ঋষি বলিয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ ঘর-সংসার ছাড়িয়া বনে বাস করিতেন, বাকল পরিতেন, ফল-মূল খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। আর দিবারাত্রি ভগবানের আরাধনা করিতেন। ধনে, মানে তাঁহাদের লোভ ছিল না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, অট্টালিকায় বাস করিব, এ প্রবৃত্তিও তাঁহাদের ছিল না। গাছের ফলে আর নদীর জলে কোন রকমে তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বোধ করিতেন। দিবারাত্রি ভগবানের চিন্তা করাই তাঁহাদের কাজ ছিল। তাঁহাদের গর্ব্ব, অহঙ্কার, দ্বেষ, ঈর্ষা একেবারেই ছিল না। ক্রোধ যে কাকে বলে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই শান্তভাবে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন ও সত্য কহিতেন। যেখানে তাঁহারা বাস করিতেন, তাহাকে লোকে সচরাচর ঋষির আশ্রম বলিত।

সেই সকল আশ্রমে বাঘ, হরিণ, গরু, সিংহ, বিড়াল, ইঁদুর, সমস্ত জন্তু এক সঙ্গে বাস করিত। এক জন্তু অন্য জন্তুকে হিংসা করিত না। পাপ কিংবা মিথ্যা সেই আশ্রমগুলির ধার দিয়াও যাইতে পারিত না।

এ হেন সকল গুণের, সকল পুণ্যের আধার ঋষি এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন কেন? জীবের মঙ্গলের জন্য। কেন না, এ জগতে তাঁহাদের পাইবার কিছু ছিল না। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তাঁহারা ধন, মান, যশ কিছুই চাহিতেন না। তবে একটি জিনিষ তাঁহারা সর্ব্বদা চাহিতেন। সে জিনিষটি আমাদের কল্যাণ। আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ঘর-সংসার ছাড়িয়াছিলেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ঘর-সংসারের সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ভগবানের নিত্য পূজা করিতেন।

কথাটা শুনিয়া তোমাদের কেমন একটা বিস্ময় বোধ হইতেছে, না? তা যদি হয়, তাহা হইলে এখন আর উপায় নাই। তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবে। বড় হইলে, ঘর সংসার করিলে কাহা-রও বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

তবে এটা তোমরা সকলেই শুনিয়া রাখ, সত্যই যাঁহাদের জীবনের ব্রত, সেই পুণ্যময় ঋষিদের বাক্য মিথ্যা নয়। শ্রীদুর্গার গল্প শুনিতে একটু বিচিত্র বোধ হইলেও জানিও তাহা মিথ্যা নয়। তাঁহার কথা ভক্তি-সহকারে শুন, তোমাদের অশেষ মঙ্গল হইবে।

প্রতি বৎসর শরৎকালে আমাদের ঘরে মা দুর্গার আবাহন হয়। তোমরা হয় ত বলিবে, "এ কেমন কথা? সকলের ঘরে ত মা আসেন না? এখন কয়জনই বা মায়ের পূজা করে?" তোমরা হয় ত বলিবে—"আমরা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে আগে কুড়ি পঁচিশ ঘরে মায়ের প্রতিমা আসিত, এখন একটি ঘরেও আসে না! কেহ পূজা করিতে পারে না বলিয়া মায়ের পূজা হয় না, কেহ করিতে চায় না বলিয়া হয় না! আবার এখন এমন লোক অনেক হইয়াছে, যাহারা মাকে মানে না, ঋষিবাক্যে আদৌ বিশ্বাস করে না।"

তা হউক, মা আসেন। আমাদের গ্রামে গ্রামে আসেন, ঘরে ঘরে আসেন। যে ভক্তি করে, তাহার ঘরে ত আসেনই, যে ভক্তি করে না, অথবা মাকে মানে না, তাহার ঘরেও আসেন। তোমরা ত জান না, তোমাদের হৃদয়ই এক একটি মায়ের ঘর। তোমরা এতকাল খোঁজ কর নাই। বর্ষে বর্ষে শরৎকালে খোঁজ করিয়া দেখিও, তা' হ'লেই বুঝিতে পারিবে।

হয় ত কেহ বলিবে, "মা ,ক শুধু আশ্বিনেই আসেন, আর সারা বৎসরটার ভিতরে একবারও আসেন না?" তা কেন—মা নিত্য— সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে আছেন। কিন্তু আমরা সকলে সব সময়ে তা'ত বুঝিতে পারি না! কিন্তু আমাদের উপর মায়ের কি কৃপা! কেন, তা জানি না, এ কৃপা কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাও জানি না। কত দিন চলিবে, তাও বলিতে পারি না—সমস্তই মায়ের ইচ্ছা—কত যুগ যুগান্তর হইতে বাঙ্গালার উপর মায়ের এই কৃপা চলিয়া আসিতেছে। এ কৃপা যেন বাঙ্গালার নিজস্ব। তাই মায়ের কথা আজ তোমাদের কাছে—বাঙ্গালার নরনারীর কাছে—বলিতে আসিয়াছি।

বঙ্গভূমি শ্যাম-বসন পরিয়া, কুমুদ-কহ্লারে কবরী সাজাইয়া, জলে-স্থলে তরঙ্গ তুলিয়া মাকে আবাহন করেন। চারিদিকে পুষ্পরূপে আনন্দ ফুটিয়া উঠে। স্থলে বায়ুভরে আন্দোলিত ফুল, জলে তরঙ্গভরে কম্পিত ফুল, আর তোমরা নবপ্রাণভরে সচল ফুল। এই সকল ফুলের ডালা লইয়া বঙ্গভূমি প্রতি শরতে মা দুর্গার আগমন প্রতীক্ষা করেন।

মানুক আর নাই মানুক, বঙ্গবাসী হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান সকলেই এই সময়ে যথাশক্তি আনন্দ অর্জন করিয়া থাকে।

যে ঠাকুর গড়িয়া মায়ের পূজা করে, সে আনন্দ পায়; যে না গড়িয়া পূজা করে, সে-ও আনন্দ পায়। যে মাকে ভক্তি করে না সে-ও পায়; যে মাকে বিদ্বেষ করে, সে-ও আনন্দ পাইয়া থাকে। কেহ ধর্মে, কেহ অর্থে, কেহ কামনাপূরণে, কেহ আত্মীয়-সন্দর্শনে—কেহ দানে, কেহ গ্রহণে—সকলেই অল্পাধিক আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে। তুমি নবসাজে সাজিয়া আনন্দ পাও, তোমার পিতামাতা তোমাকে সাজাইয়া আনন্দলাভ করেন।

আনন্দ—আনন্দ—আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে কেবল আনন্দস্রোত! আজ আমি তোমাদিগকে সেই আনন্দময়ীর সমাচার উপহার দিব।

২

অতি পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণের সুখের অবধি ছিল না।

রাজা ধার্ম্মিক হইলে তাঁহার প্রজারাও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

এই দুয়ে পরস্পরে কেমন একটা সম্বন্ধ আছে। সুরথ রাজার রাজত্বকালে প্রজারা সকলেই ধার্ম্মিক হইয়াছিল। কেহ কাহারও প্রতি দ্বেষ করিত না; এক জন অপরের ধনে লোভ করিত না; সকলেই নিজ নিজ উপার্জ্জনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণকে পালন করিত; এবং নিজ নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিত।

অতিথি অভ্যাগত আসিলে গৃহস্থ ভক্তিসহকারে তাহার সেবা করিত। দেবতা ও গুরুজনে তাহাদের অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।

ধার্ম্মিকের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও প্রসন্না হইয়া থাকেন।

এই জন্য সুরথ রাজার রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখী ছিল। সময়ে দেশে সুবৃষ্টি হইত, সুবর্ণবর্ণ শস্যভারে পৃথিবী সর্ব্বদা ভরিয়া থাকিত। আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এ সব কিছুই ছিল না। গৃহস্থের ঘর ধনধান্যে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। গাভী সকল প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। নদী সকল দিয়া সকল সময়েই নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইত; দীঘি-সরোবর সকল মৎস্যে পূর্ণ থাকিত। জলের উপরে জলচর পক্ষী সকল তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্য করিত। গাছে গাছে পাখীর গানে আকাশ ভরিয়া যাইত। সেই গানের সুরে সুর বাঁধিয়া সুস্থ বালক বালিকা সকল, সুমধুর গানে ও নৃত্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিত।

কিন্তু দেশের এ সুখের অবস্থা বেশী দিন রহিল না। রাজা সুরথের মনে অহঙ্কার জন্মিল। প্রথমে তিনি নিজে মাঝে মাঝে নগর হইতে বাহির হইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া আসিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেই খানেই দেখিতেন, প্রজারা সুখে আছে। যদি কোনও সময়ে কোথাও কোন প্রজার অসুখের কারণ হইত, রাজা তখনই তাহার প্রতীকার করিতেন। রাজার দৃষ্টির ভয়ে বিপদ প্রজাদের ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

এইরূপে কিছুকাল নিজে পরীক্ষা করিয়া রাজা যখন দেখিলেন, প্রজার গৃহে আর অমঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই, যখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কেবল শান্তি ভিন্ন আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন, এইবার আমার বিশ্রাম লইবার সময় আসিয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি পাত্র, মিত্র, অমাত্য, ভৃত্য এই সকলের উপর প্রজাদের তত্ত্ব লইবার ভার দিয়া কিছুদিনের জন্য পুরমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। পাত্রমিত্রেরাই তাঁহার হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল। তিনি এক একবার পুরমধ্য হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কাছে প্রজাদের সংবাদ লন, তাহারা একবাক্যে বলে, প্রজারা বেশ সুখে আছে। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আবার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

কিন্তু তা কি কখন চলে? তোমার ঘর, তোমার সংসার, তুমি না দেখিলে, না দেখিয়া শুধু চাকর বাকরের উপর ভার দিলে, কখন কি সংসার সুশৃঙ্খলে চলে? রাজ্য হইতেছে রাজার সংসার। সমস্ত প্রজা তাঁর সন্তান। তিনি প্রজাসকলকে যে চক্ষে দেখিবেন, অন্যে সেরূপ দেখিবে কেন? তাহার উপর রাজা ভগবানের অংশ! তিনি মহতী দেবতা—কেবল মানুষের রূপ ধরিয়া থাকেন। মানুষের রূপ ধরিয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি যে দিকে যে বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন, সেইদিকে সেই বিষয়েই কল্যাণ হইবে। রাজা সুরথ পুরো গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

যাইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিতেন। যখন তিনি প্রজাদের প্রতি স্নেহনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই দেশের যত অকল্যাণ—মারীভয়, অন্য রাজার ভয়, চৌরভয়, অগ্নিভয়—সব দূরে পলাইয়া যাইত। এখন ত আর তাহা নাই! রাজা প্রাসাদের ভিতরে থাকেন সুতরাং কর্ম্মচারীরা নিজেরা যাহা ভাল বুঝিতে লাগিল, তাহাই করিতে লাগিল। পাত্র মিত্র সকলেই ত আর খাঁটি লোক হইতে পারে না। সুতরাং সকলে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিল না। কাজেই লুকাইয়া রাজ্যে অকল্যাণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

দেশে একবার পাপ প্রবেশ করিলে দেশবাসী সকলকেই সেই পাপ অল্পবিস্তর স্পর্শ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছ প্রজা কেহই আর পূর্ব্বের মত ধার্ম্মিক রহিল না। রাজা ক্রমে কর্ম্মচারীদের চাটুবাক্যের বশীভূত হইলেন, কর্ম্মচারীরা এক বলিয়া এক করিতে লাগিল; প্রজাদের মধ্যে পরস্পরের আর সেরূপ সদ্ভাব, ভালবাসা রহিল না।

এমনি সময়ে এক অধার্ম্মিক অনাচার রাজা, কোথা হইতে আসিয়া, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। সেই অধার্ম্মিক রাজার সৈন্যগণও অনাচার-সম্পন্ন। তাহারা রাজার সঙ্গে দলে দলে সুরথের দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সেই অনাচারী প্রজা আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিল। ঋষিরা তাহাদিগকে যবন বলিয়াছেন। তাহারা নানা অখাদ্য খাইত, হিন্দুর পবিত্র আহারে তাহাদের রুচি হইত না।

দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা এক ঘর হইতে অন্য ঘর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম, এক নগর হইতে অন্য নগর, আগুন দিয়া পুড়াইতে লাগিল। শস্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল, দুগ্ধবতী গাভী সকলের প্রাণ বধ করিতে লাগিল। রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা সুরথ ভীরু ছিলেন না। তিনি এই উৎপাতের সংবাদ পাইয়াই নিজের সৈন্য-সামন্ত লইয়া শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। রাজার লোকবল বেশী ছিল। এই যবনরাজ তাঁহার আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব মনে করিল, তাই সে সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না। সে বুঝিল, কৌশলে রাজাকে হারাইতে না পারিলে চলিবে না। রাজার কর্ম্মচারীদের উৎকোচ দিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, লুকাইয়া লুকাইয়া প্রজাদের ভিতরেও বিবাদ বাধাইয়া দিল।

যখন রাজার কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মবল গেল, আর প্রজারা পরস্পর বিদ্বেষ করিয়া দুর্ব্বল হইল, তখন সে তাহাদিগকে নানালোভে বশ করিয়া আপনার পক্ষ করিয়া লইল। এবং সেই বিশ্বাসঘাতকদিগের সহায়তায় সহজেই রাজা সুরথকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য হরণ করিল।

ঋষি বলিয়াছেন—"সেই সকল যবনেরা রাজা সুরথের অপেক্ষা বলহীন হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল।"

পরাস্ত হইয়া রাজা নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবং রাজধানী বেড়িয়া একটু সামান্য মাত্র দেশ লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে সেখানেও থাকিতে দিল না। তাঁহার সেই অধার্ম্মিক দুরাত্মা অমাত্য সকল তাঁহাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া তাঁহার হাতী, ঘোড়া, টাকাকড়ি সব লুঠিয়া লইল, এবং তাঁহাকে একবারে ক্ষমতাহীন করিয়া ফেলিল।

এরূপ অবস্থায় তিনি আর দেশে কেমন করিয়া থাকিতে পারেন? ক্ষমতা গিয়াছে, ধন গিয়াছে, শুধু প্রাণটি এখনও যাইতে বাকী আছে। রাজা প্রাণ রাখিতে ঘর ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন।

এক দিন শীকারের ছল করিয়া তাঁহার প্রিয় ঘোড়াটিতে চড়িয়া তিনি নগর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাধের রাজধানী পিছনে পড়িয়া রহিল। নগর হইতে বাহির হইয়াই অশ্ব তাহার প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া ছুটিল। দেখিতে দেখিতে কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া গেল। সাঁতারিয়া কত নদী পার হইল, কত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিল তাহার সংখ্যা রহিল না। দূর—দূর—কত দূর গিয়া অশ্ব রাজাকে লইয়া এক গহন বনে প্রবেশ করিল।

৩

সেই বনে মেধস নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। রাজা সুরথ সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পথে আসিতে দেখিলেন, বিধর্ম্মীরা সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাপ দেশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল একটি স্থানে সে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে এই ঋষির পুণ্যনিকেতন শান্তিময় আশ্রম।

সে আশ্রমের শোভার কথা তোমাদের কেমন করিয়া বলিব? হৃদয়ে সে ভাব কই? প্রকাশ করিতে পারি, এরূপ কথা কই? সে ছবি আঁকিয়া তোমাদের নির্ম্মল চক্ষের উপর ধরিতে পারি, এমন ক্ষমতা কই? আমার সে শোভা দেখিবার চক্ষু নাই, বুঝিবার মর্ম্ম নাই, আঁকিবার তুলি নাই। বর্ণপাত্র অভক্তির মসীতে পূর্ণ করিয়াছি,

আমি কোন্ সাহসে পবিত্র ঋষির পবিত্র অধিষ্ঠান ভূমির চিত্র তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব? ব্যাঘ্রে ও গাভীতে এক ঘাটে জল খায়, মৃগশিশু সিংহের সহিত খেলা করে, ভেক সাপের ফণায় নৃত্য করে,—এ সকল কথা এখন কে বিশ্বাস করিবে? বৃক্ষ সকল অতিথিকে দেখিয়া শাখা দুলাইয়া সাদরে আহ্বান করে, কোকিল, পাপিয়া গাছ ছাড়িয়া অতিথির স্কন্ধে বসিয়া আবাহনগানে দিক পূর্ণ করে, এ কথা যে বলিবে এখনকার লোকে তাহাকে পাগল বলিতে পারে বৈ কি?

লোকে বলে বলুক, তোমরা কিন্তু তোমাদের নির্ম্মল চিত্তে কল্পনায় সেই ছবির একটি প্রতিবিম্ব তুলিয়া লও। নিজেরাই চিত্রকর হইয়া আশ্রমের শোভার মর্ম্ম অনুভব কর। তাহা হইলে বড়ই আনন্দ পাইবে। যাহারা এ সব গল্প বলিয়া মনে করে, উপন্যাস বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরই দেশের কত লোক এইরূপ গল্প রচনা করিয়া নিজেরাও আনন্দভোগ করিয়াছেন, পাঁচ জনকেও দিয়াছেন। এমন কি, আজিও দিতেছেন।

আশ্রমে মেধসমুনি স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া শিষ্যগণ বেদগান করিতেছিল। আশ্রমদ্বারে মৃগ, গাভী একত্র শুইয়া শুইয়া চক্ষু মুদিয়া রোমন্থন করিতে করিতে তাহারা যেন বেদগান শুনিতেছিল। হস্তী গানের তালে শুণ্ড দুলাইতেছিল, সিংহ অতি উল্লাসে কেশর কম্পিত করিতেছিল, পাখী নাচিতেছিল। এমন সময় সুরথ নরপতি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন।

যিনি ঋষি তিনি তিন কালের খবরই বলিতে পারেন। একস্থানে বসিয়া আছেন তবু পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে তাঁহার জানিতে বাকী থাকে না। তিনি চক্ষু মুদিয়াও সমস্ত দেখিতে পান। রাজাকে কখন না দেখিলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; এবং তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মুনির অনুরোধ—রাজা "না" বলিতে পারিলেন না। তিনি সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন শান্তিময় আশ্রমে বাস করিয়াও রাজা মনে শান্তি পাইলেন না। দিবারাত্রি যখন তখন তাঁহার রাজ্যের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তাঁহার সেই সোনার দেশ, সেই সোনার দেশে সোনার অট্টালিকা—সেই অট্টালিকার ভিতরের মণিমানিক্য, অতুল ধনরাশি তাঁহার হস্তী, অশ্ব, গো—ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন সমুদায় সবার উপর তাঁর প্রাণ হইতেও প্রিয়তর প্রজা—সকলে এক সঙ্গে প্রবল চিন্তারূপে ভিখারী রাজার মনটাকে আঁকাড়িয়া ধরিল। রাজা তাহাদের ছাড়িতে চাহিলে তাহারা ছাড়িতে চাহিল না।

রাজা কখন ভাবেন—"ভৃত্যগুলা আমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারাই কি না শেষে বিশ্বাসঘাতক হইয়া আমার রাজ্যকে শত্রুর হাতে ধরিয়া দিল! সেই সকল দুষ্টলোকের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়িয়াছে। তাহারা কি ধর্ম্মজ্ঞানে রাজ্যশাসন করিবে? তাহারা কি প্রজাদের সুখে রাখিতে পারিবে?" কখন ভাবেন, "আমার সেই প্রিয় হস্তী—আমাকে দেখিলে যে শুণ্ড তুলিয়া, পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড দেহটা দুলাইয়া আমার কাছে কত আনন্দ দেখাইত, সে কি বৈরীগুলার হাতে পড়িয়া সেরূপ সুখে আছে? আর কি কেহ তাহাকে সেরূপ করিয়া আদর করে, যত্ন করিয়া আহার দেয়?" কখন চিন্তা করেন—"ভৃত্যেরা পূর্ব্বে আমার অনুগত ছিল। এখন তাহারা উদরের দায়ে অন্য রাজার সেবা করিতেছে। প্রভু ও ভৃত্যের ভিতরে যে মমতা থাকা কর্ত্তব্য, তা তাহাদের নাই! প্রভু ভৃত্যকে বিশ্বাস করিবে না, ভৃত্যও প্রভুর কাজ আর নিজের মত ভাবিয়া করিবে না। যে যার নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিবে। এ উহার মুখ চাহিবে না। কাজেই আমোদে-প্রমোদে অগাধ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহাতে হইবে কি? সর্ব্বদা ব্যয় করিতে করিতে আমার অতিদুঃখে সঞ্চিত ধনরাশি ক্ষয় করিয়া ফেলিবে।"

রাজা সকল সময়ে কেবল এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তোমরা এখনও ভালরূপ জান না চিন্তার শক্তি কি? সে একবার মনকে আশ্রয় করিতে পারিলে, তাহাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন। বরং বাঘ ভালুককে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ কিন্তু চিন্তাকে মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ঋষিরা বলেন, চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তিনিই বড় যোদ্ধা, তিনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

রাজা সুরথ চিন্তার জ্বালায় অস্থির হইলেন। তিনি কখন উঠেন, কখন বসেন, কখন বা তপোবনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রাণে তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি রহিল না।

৪

এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দেখিলেন, সেই মুনির আশ্রমসমীপে এক জন লোক তাঁহারই মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তিও তাঁহার মত কোন দুঃখী হইবে বিবেচনা করিয়া, তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—"তুমি কে? এখানে তুমি কি জন্ত আসিয়াছ? তোমাকে শোকান্বিত ও বিমনার মত দেখিতেছি কেন?"

সে ব্যক্তি বলিল—"আমার নাম সমাধি। আমি জাতিতে বৈশ্য; ধনিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"তবে তোমার এ দশা দেখিতেছি কেন?"

সমাধি উত্তর করিলেন—"ধনের লোভে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণ আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে! তাহারা আমার সমস্ত ধন হরণ করিয়া লইয়াছে। তাই মনের দুঃখে আমি বনে আসিয়াছি।"

রাজা ভাবিলেন,—"মন্দ নয়; এ বনেও তাঁহার যোগ্য সঙ্গী মিলিয়াছে!" সেই তপোবনে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর সকলেই সুখী। তাহারা যে শুধু সুখী ছিল, তাহা নয়, দুঃখ যে কাহাকে বলে, তাহাও তাহারা জানিত না। সুতরাং রাজার অবস্থার মর্ম্ম তাহারা কেহই ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। রাজা তাহাদের সহবাসে সুখ পাইতেছিলেন না। এইবারে মনের দুঃখ বুঝিবার লোক মিলিয়াছে বুঝিয়া তিনি সমাধিকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিলেন—"আমিও তোমার মত সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। হারাইয়া এই বনে আসিয়াছি। তা' হ'লে এস, আমরা দুইজনে পরস্পরে সঙ্গী হইয়া বনে বাস করি।"

সমাধি বলিল—"তাই বা কেমন করিয়া করি? আমি এখানে থাকিয়া পরিবারগণের কোনও সংবাদ পাইতেছি না, তাহারা কে কেমন আছে, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন—"যে স্ত্রী, যে পুত্র অর্থলোভে তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্ত তোমার মন স্নেহে আবদ্ধ হইতেছে কেন?"

সমাধি বলিল—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক; কিন্তু কি করি? আমার মন ত কিছুতেই এ কথা বুঝিতেছে না! যাহারা ধনের লোভে আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি ত কোনও ক্রমে সেই স্ত্রী-পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্ত আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, চিত্ত বিকল হইতেছে। তাহারা আমাকে চায় না, অথচ তাহাদের প্রতি আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না। কেন যে এরূপ হয়, আমি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। আমি করি কি?"

সমাধির কথা শুনিয়া রাজার চৈতন্ত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"তাই ত! আমিই বা এত দিন কি করিতেছিলাম? কোথায় আমার রাজ্য, আর কোথায় আমার ধন? প্রজা প্রজা যে করিতেছি—সেই প্রজাই বা আমার কোথায়? রাজ্য শত্রুতে লইয়াছে, অমাত্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, প্রজাগণ এখন তাহাদের আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে আমার বলিবার আর কিছু নাই। তবু আমার আমার করিয়া তাহাদের চিন্তায় পাগল হইতেছি কেন?"

৫

রাজা সমাধিকে সঙ্গে লইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবন্! আমি আপনাকে একটি রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, উপদেশ দিয়া সেটি আমাকে বুঝাইয়া দিন। মনকে বশ করিতে না পারায় আমার যে দুঃখ হয়, ইহার কারণ কি? আমার রাজ্য শত্রুতে অধিকার করিয়াছে। বুঝিতেছি, দুঃখ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইব না, তথাপি সে রাজ্যের প্রতি আমার মমতা যাইতেছে না, ইহারই বা কারণ কি? এই বৈশ্যের পুত্রগণ, স্ত্রী, ভৃত্যগণ সকলে মিলিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। ইহার বন্ধুগণের কেহই এই দুঃসময়ে ইহাকে তাহাদের ঘরে স্থান দেয় নাই; অথচ এই ব্যক্তি তাহাদের জন্ত স্নেহে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমরা বুঝিতেছি, আমাদের নিজের বলিয়া কিছুই নাই, তবু আমরা দু'জনেই আমার আমার করিয়া অস্থির হইতেছি, ইহারই বা কারণ কি? আমাদের উভয়েরই ত জ্ঞান আছে! যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই ত এইরূপ দুঃখ করে, তবে আমরা করিতেছি কেন?"

ঋষি রাজার এই প্রশ্নে যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বলিলে তোমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে। শুধু তোমাদের কেন, আমাদের দেশে এখন কয়জনই বা এমন জ্ঞানী আছেন যে, ঋষিগণের পবিত্র উপদেশ বুঝিতে পারেন? বুঝিতে পারিলে আমাদের এত দুর্দ্দশাই বা হইবে কেন? কেহ বুঝিতে পারেন না, কেহ বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না! ফলে, প্রায় সকলেই ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সুতরাং ঋষি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের তাহার সামান্ত ভাবার্থ শুনাইব।

ঋষি বলিলেন—"তোমাদের জ্ঞান আছে, এ কথা কে বলিল?"

রাজা বলিলেন—"কেন প্রভু, আমাদের মন যে বলিতেছে!"

ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! তোমাদের যে জ্ঞান, এ জ্ঞান পশুপক্ষীতেও আছে! তবে তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তা' হ'লে তাহারাই বা জ্ঞানী হইবে না কেন?"

"এ কি কথা! ঋষির মতে পশু ও আমরা সমান হইলাম! কথাটা ত বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা ভুলেও মিথ্যা কহিতে জানিতেন না। তবে আমরা এতকাল যে জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি সেটা কি জ্ঞানই নয়? মুনিবর মেধস রাজাকে বলিতে লাগিলেন—"মনুষ্যগণ জ্ঞানী ইহা সত্য বটে; কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী, এমন নয়; পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেরই জ্ঞান আছে। ইহাকেই সাধারণ জ্ঞান বলে। ইহা মানুষেরও যেরূপ, ইতর প্রাণিগণের ও সেইরূপ। মা যেমন ক্ষুধায় কাতর হইলেও ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে আহার না দিয়া নিজে আহার করেন না, পক্ষিগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। সামান্য জ্ঞান-সত্ত্বেও ইহারা শাবকদের প্রতি কেমন মমতা দেখায় দেখ। নিজে ক্ষুধায় কাতর তথাপি শাবকের চঞ্চুতে নিজের মুখের আহার তুলিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে! আমরা যেমন সন্তানকে পালন করিতেছি; আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যখন আমরা অশক্ত হইব, তখন সন্তানগণও আমা-দিগকে এইভাবে পালন করিবে, এই আশাতেই না লোকে পুত্রগণের প্রতি মমতা দেখাইয়া থাকে, ইহা কি দেখিতে পাও নি?"

অনেকেই হয় ত বলিবেন—"এ কি কথা? কবে পুত্র আমাদের ভরণ-পোষণ করিবে, অশক্ত দেখিয়া সেবা করিবে, এই আশাতেই কি আমরা প্রাণপাত করিয়া পুত্রকন্যাদের পালন করিতেছি?" অনেক মা হয় ত বলিবেন—"আমার গোপাল আবার বাঁচিবে? বাঁচিয়া আমার সেবা করিবে? সে বাঁচিয়া সুখে থাক; আমি দেখিয়া মরি। তাহার সেবায় আমার কাজ নাই; আমি সেবা করিতে হয়, করিয়া যাই। তবে ঋষি সুরথ রাজাকে যে কথা বলিলেন, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

আমাদের অল্প জ্ঞান, আমরাই বা কেমন করিয়া ইহার উত্তর দিব? ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। এ উত্তর প্রশ্নকর্ত্তা নিজে যেমন দিতে পারিবেন, অন্যে সেরূপ পারিবে না। সাধুরা বলেন, সাধারণ মানুষের যে অপরকে ভালবাসা, সে নিজের সুখের জন্য, পরের জন্য নয়। ভাই নিজেকে ভালবাসেন বলিয়াই ভাইকে ভালবাসেন; পিতা ও মাতা আত্ম-প্রীতির জন্যই সন্তানকে স্নেহ-মমতা দেখাইয়া থাকেন।

যিনি শুধু ভালবাসিবার জন্যই তাঁহার ভাই-ভগিনী-গুলিকে ভালবাসেন, তিনি আমাদের সকলেরই ভাই; যে পিতা ও যে মাতা শুধু পুত্রকন্যারই মঙ্গলার্থে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধা-রণেরই জনক জননী। তাঁহাদের পুত্র-কন্যা তাঁহাদের কাছে যেরূপ স্নেহ ও মমতা পাইয়া থাকে, আমরা যদি কখন তাঁহাদের দ্বারস্থ হই, তাহা হইলে আমরাও সেই-রূপ স্নেহমমতা তাঁহাদের কাছে পাইবার প্রত্যাশা করি। সুখে আনন্দ, দুঃখে শান্তি—এই মমতা-ফুলের ডালা তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলিয়া রাখেন নাই। অনাথ, আতুর, যে কোন অতিথি যখনই তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হউক না কেন, তখনই তাহারা সেই অঞ্জলিভরা কুসুম-সৌরভে মত্ত হইয়া আসে। ইহার নাম দয়া।

সাধারণতঃ আকর্ষণে আমরা পুত্র, কন্যা, সহোদর, আত্মীয়-স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছি, তাহার নাম মায়া। এই মায়াই জগতের সমস্ত জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে!

রাজা সুরথ ঋষির তীব্র বাক্যে ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি সেই মহাপুরুষের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া করযোড়ে বলিলেন—"কেন এমন হয়? কে প্রভু এরূপভাবে আমা-দিগকে সংসারে লিপ্ত করিয়াছে?"

ঋষি বলিলেন—"মহামায়া। তিনি আদ্যাশক্তি। তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজ! এই মোহ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করিও না। এই মোহ অথবা মায়া আমাদিগকে সংসার-বন্ধনে জড়া-ইয়া রাখিয়াছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্! যাঁহাকে আপনি আদ্যাশক্তি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে?"

সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মানুষ যখন শান্তির জন্য লালায়িত হয়, যখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ঘর, বাড়ী, টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম কিছুতেই সুখ না পাইয়া সুখের একটি অক্ষয় ভাণ্ডার খুঁজিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহার মনে সময়ে একটি প্রশ্ন উঠে। "আমি সংসারে সুখ চাই; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে জ্বালা পাই কেন? আমি শীতল হইতে এ দেশে আসি; কিন্তু আসিয়া তাপ-জর্জ্জরিত হই কেন?"

প্রথম প্রথম মনে এই প্রশ্ন উঠিতে না উঠিতে আমরা আবার সংসারের মমতা-সাগরে ডুবিয়া যাই। আবার যখন শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন তরঙ্গের উপর মাথা তুলিয়া আবার এই প্রশ্ন করি। ক্রমে যখন এরূপ মনে হয় যে, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না পাইলে আমাদের আর নিস্তার নাই, তখন কোন এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় শক্তি কোথা হইতে কেমন করিয়া, আমাদিগকে এক পরমাত্মীয়ের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে! সেই মধুময়

পরমাত্মীয় জ্ঞানরত্নের উপহার লইয়া, কোন্ অনাদিকাল হইতে যে এক নিভৃত নিকুঞ্জে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার নাম গুরু। আমরা প্রাণের আগ্রহে যখন শ্রীগুরুদেবের নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করি, তখন তাঁহার কৃপায় মহামায়া যে কে, তাহার আভাষ পাই। আমাদের যাহার যেমন আগ্রহ, আমরা তদনুযায়ী সময়ের মধ্যে শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া থাকি। যে অতি ব্যাকুল, সে শীঘ্রই তাহার সন্ধান পায়; যে অল্প ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। আসল কথা, প্রাণে বিষম ব্যাকুলতা না জাগিলে তাঁহার সন্ধান মিলে না।

প্রথম প্রথম সুরথ রাজা মেধস মুনির আশ্রমে গিয়াও শান্তি পান নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়াও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। যে অন্ধ, তাহার চোখের উপর দিয়া সর্ব্বজ্যোতির আধার সূর্য্য চলিয়া গেলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। বিষয়ের প্রতি মমতা রাজার বুদ্ধিটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাই মেধসের মহিমা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। সমাধির কথা শুনিয়া তাঁহার যখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল, আর মুনির কথায় যখন তাঁহার চোখ ফুটিল, তখন তিনি বুঝিলেন, শান্তিধন সেই বাকল পরা ভিখারীরই কাছে লুকান রহিয়াছে। সেই শান্তির লোভে রাজা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন—তিনি কে?" ঋষি যে ভাষায় রাজা সুরথকে মহামায়ার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কেবল ভাবার্থ আমি তোমাদিগকে বলিব।"

ঋষি বলিলেন,—"মহামায়া পরমা জননী অর্থাৎ আদি মাতা। যখন এই জগৎ ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। যখন সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, তারা, নক্ষত্র, এই পৃথিবী কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মহামায়া, জগৎকে তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জগৎকে ধরিয়া আছেন, এই জন্ম তাঁহার আর এক নাম জগদ্ধাত্রী। তিনি ধারণ করিয়া না থাকিলে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এ জগতের লয় হইয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নিত্যা—অর্থাৎ সর্ব্বদাই তিনি বর্ত্তমান আছেন। এই জন্ম তাঁহার আর এক নাম সনাতনী। তিনি এই জগতের রাণী। মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই পৃথিবীতে যত জীব আছে, উহাদের ত কথাই নাই, এ জগতে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে যেখানে যত জীব আছে—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ সমস্তই তাঁহার প্রজা। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম ঈশ্বরী।"

ঋষি রাজা সুরথের কাছে মহামায়ার যে পরিচয় দিলেন, তাহা সকলে বুঝিলে কি? তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবে, অনেকেই কেন, প্রায় সকলেই বলিবে, কিছুই বুঝিলাম না। না বুঝাই সম্ভব। সুরথ রাজা নিজে জ্ঞানী ছিলেন, এইজন্য মুনি তাঁহাকে জ্ঞানীর মনোমত উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে এখন এমন জ্ঞানী অল্পই আছেন, যাঁহারা মেধস মুনির এই কয়েকটি কথা বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে এ উপদেশ ত আমাদের পক্ষে কার্য্যকর হইল না! আমরা যাহা জানিতে চাহিলাম, তাহা ত জানিতে পারিলাম না।

তাহা নয়। ঋষি সুরথ রাজাকে শুধু ওই উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা যাহা বলেন, যাহা করেন, সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য। সেই মঙ্গলময় ব্রাহ্মণ শুধু কি সুরথকে বুঝাইবার জন্যই উপদেশ দিয়াছিলেন? পার্শ্বে তাঁর নির্ব্বাক বৈশ্য সমাধি আগ্রহসহকারে উপদেশ শুনিতেছিল। সংসারে আবদ্ধ অথচ মুক্তিপ্রয়াসী কত জীব, আপন আপন ঘরে ঋষিবাক্য শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। ঋষি জানিতেন, তাহারা ত সুরথের মত জ্ঞানী নয়! ঋষি জানিতেন, দূর ভবিষ্যতে অনন্ত কাল-সাগরের পারে, এই কলিযুগের সংসারে, কত লোক তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিবে। তাহারাও ত সুরথের মত জ্ঞানী নয়! ঋষির সেই মধুময়ী বাণী আকাশতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যখন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, তখন ত তাহারা তাঁহার সেই উপদেশের মধুর ঝঙ্কারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না!

ঋষি তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া রাজা সুরথকে উপদেশ দিবার ছলে, সমস্ত জগতের জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "ভক্ত! আশ্বস্ত হও। সেই-সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রকাশিকা আদ্যাশক্তি, জগতের আদি জননী নারায়ণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও ঈশ্বরী শঙ্করী সময়ে সময়ে এই মর্ত্তলোকে আবির্ভূতা হন।" তাঁহার রচিত সংসারটিকে নষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে দানবের উৎপাত হয়। তখন ধর্ম্মের ক্ষয়, আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন অধর্ম্মের ভার এত অধিক হয় যে, মা ধরিত্রী আর তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তখন তিনি কাঁপিতে থাকেন ও কাঁদিতে থাকেন। সেই রোদনের সঙ্গে সঙ্গে সারা গগন ব্যাপিয়া, সমস্ত দেব-হৃদয় কাঁপাইয়া মায়ের মধুর নামের ধ্বনি

উঠে। ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা যখন সমস্বরে মাকে আবাহন করিতে থাকেন, তখন জগজ্জননী আর স্থির থাকিতে পারেন না। তখন সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুদের ধ্বংসের জন্য, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সনাতনী মা আমাদের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণা হন। শক্তিস্বরূপা সনাতনী আপনার বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া নারীরূপে আমাদের মধ্যে লীলা করিতে আসেন।

তখন তিনি পিতা মাতার কাছে নন্দিনী, ভ্রাতার কাছে ভগিনী, পতির কাছে জায়া, পুত্র-কন্যার কাছে জননী। তখন তিনি দীনের কাছে দয়া, তৃষিতের কাছে জল, রোগীর কাছে সেবা, ক্ষুধিতের কাছে ফল। তখন কত মূর্ত্তিতে যে মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা আর তোমাদের কি বলিব? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে, এমন শক্তি এ জগতে কার আছে?

তিনি আসিলেই জীবের সকল দুর্গতির অবসান হয়। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাই মহামায়া। ভক্তিসহকারে তাঁহার বিচিত্র কাহিনী শুন, তাহা হইলেই তিনি কে, আমাদিগের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে।

মুনি কহিলেন—"মহারাজ! জগৎ রক্ষার জন্য তিনি এক একবার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন।"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! কোন্ কোন্ সময়ে তিনি জীবের কল্যাণার্থ অবতীর্ণা হইয়াছিলেন?"

তখন মুনি মহামায়ার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬

একবার মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।

বিষ্ণু তখন অনন্ত শয্যায় শুইয়াছিলেন, এক মহা-সাগরে সমস্ত জগৎটা নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-কমলে বসিয়া জগৎটাকে আবার কেমন করিয়া গড়িবেন, সেই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মাথা দুইটা আকাশে ঠেকিয়াছে, চারিটা হাত চারিটা দিক্ অধিকার করিয়াছে। অত বড় গভীর সাগর তাহাদের হাঁটুও পর্য্যন্ত ডুবাইতে পারে নাই। সেই আকাশে-ঠেকা মাথার আকাশ জোড়া হাঁ। তাহার ভিতরের দাঁতগুলা এক একটা পাহাড়ের মত।

ব্রহ্মা তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। মনে মনে বুঝিলেন, "ইহাদের সঙ্গে আমি ত যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হরি! উঠ; দৈত্যভয়ে আমি ভীত হইয়াছি।"

হরি যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অসুর দুই জন ক্রমেই নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা মহামায়ার শরণাপন্ন হইলেন। মহামায়া যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর চক্ষুপলক অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। মহামায়া ইচ্ছা না করিলে ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। তাই ব্রহ্মা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মা পরমাজননী-জগদ্ধাত্রী! তুমিই যোগনিদ্রারূপে হরির নয়নকমল আশ্রয় করিয়া আছ। সেই নয়ন উন্মীলিত করিয়া দাও, হরিকে জাগাও।"

স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা দেখিলেন, বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহুদ্বয় এবং বক্ষদেশ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইল। ক্রমে দেখিলেন, সেই জ্যোতিঃ পুঞ্জীভূত হইয়া অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিল।

ব্রহ্মা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহামোহে সমস্ত সংসার ভরিয়া গেল। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাহা হইতে নিস্তার পাইলেন না। যোগনিদ্রায় কমলযোনির নয়ন দুটি আবৃত হইল।

এ দিকে জনার্দ্দন নিদ্রাভঙ্গে অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উঠিয়াই তিনি সেই দুই অসুরকে দেখিতে পাই-লেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা ভগবান্ হরিকে আক্রমণ করিল। বহুকাল ধরিয়া জনার্দ্দনের সঙ্গে সেই দুই দানবের যুদ্ধ হইল। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও তাহারা পরাস্ত অথবা ক্লান্ত হইল না। তখন মহামায়া তাহাদিগকে মোহ দ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিলেন!

মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা হরিকে কহিল, "তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদের কাছে বর গ্রহণ কর।"

জনার্দ্দন বলিলেন,—"বেশ, তোমরা যদি আমাকে বর দিতে চাও, তা হ'লে এই বর দাও, যেন আমার হাতে তোমাদের দু'জনেরই মৃত্যু হয়।"

বর-প্রার্থনা শুনিয়াই অসুর দুইটার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তাহারা ভাবিল, "তাই ত! কি করিলাম! ইচ্ছা করিয়া নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিলাম।"

তাহারা একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল, সমস্ত জগৎ জলরাশিতে পুরিয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা মহামায়ার মহামায়াতে মোহিত হইয়াছিল। সেই মায়ার ঘোরে দুই দানব স্থির করিল, হরিকে বরও দিব, অথচ তাহাকে প্রতারিত করিব। এই ভাবিয়া দুই জনে মুখামুখী করিয়া অনেক পরামর্শ করিল। তার পর হরিকে কহিল—"তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি। সেইজন্ত বরও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তুমি আমাদের মৃত্যুবর চাহিতেছ। তা ভালই করিয়াছ। তোমার হাতে মরিতে পারিলে আমাদের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না। আমরা মরিতে প্রস্তুত আছি। তবে তুমি এমন স্থানে আমাদের বধ কর, যেথানে জল নাই।"

দানব দুইজন মনে করিল, আমাদের বরও দেওয়া হইল, অথচ প্রাণও রক্ষা হইল। কেন না, সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটুও স্থান ছিল না, যেথানে জল ছিল না। জনার্দ্দন তাহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন—"তাহাই হউক।"

এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ সেই মহাসমুদ্রে আপনার জানুদ্বয় রক্ষা করিলেন; অসুর দুই জন সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার দুই জানু দু'টি মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে মধু ও কৈটভের ন্তায় কত দানবের যে স্থান হয়, তাহার সংখ্যা নাই! ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না। তখন জনার্দ্দন তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া উভয়কেই জানুর উপর পাতিত করিলেন এবং খড়্গ দ্বারা উভয়ের মস্তক ছেদন করিলেন।

সেই দুই দানবের শরীর দুইটা কত বড় ছিল শুনিবে? তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের দেহ হইতে এত মেদ বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া গেল! মধু-কৈটভের মেদে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী। মধুকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের আর এক নাম মধুসূদন।

মধুকৈটভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমলযোনির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, মহাসাগরের জলে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর দ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! তাই দেখিয়া তিনি আনন্দে জীবসৃষ্টি করিলেন! দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে আমাদের এই ধরণী ভরিয়া গেল!

মধুকৈটভের বিনাশ না হইলে পৃথিবীর সৃষ্টি হইত না। হরি না জাগিলে মধুকৈটভের বিনাশ হইত না। মহামায়ার কৃপা না হইলে জনার্দ্দন জাগিতেন না, অনন্ত শয়নেই শুইয়া থাকিতেন। শুধু মায়ের কৃপাতেই আমরা ধরণীতে স্থান পাইয়াছি। এস, আমরা সেই মাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া ঋষি-কথিত তাঁহার দ্বিতীয় বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করি।

৭

এ বারেও বহু পুরাকালের কথা। তবে মা এবারে অনেকটা আমাদের নিকটে আসিয়াছেন।

প্রথম যখন মায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন এক অনন্ত সাগরমাত্র বিদ্যমান ছিল। সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, তারা নক্ষত্র কিছুই ছিল না। মানুষ ও জীবজন্তুর কথা ছাড়িয়া দিই, দেবতাদের পর্য্যন্ত তখনও জন্ম হয় নাই। কেবল এক অন্ধকার—বিরাট অন্ধকার, সেই অনাদি সময়ে রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ের কথা—যখন একমাত্র নারায়ণ অনন্তশয়নে শুইয়াছিলেন, সেই আদিদেবের সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধ—সঙ্গে সঙ্গে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী মহামায়ার লীলা—জ্ঞানী মহাত্মা সকলেই তাহা কল্পনায় আনিতে অন্ধকারে ডুবিয়া যান। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমরা ইহার মহদর্থ কি বুঝিব?

তবে ঋষি-কথিত কাহিনী!—পৃথিবীর এই জন্মকথা শ্রবণে পুণ্য আছে—ভক্তিসহকারে শুনিলে, একদিন না একদিন তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। তখন মহামায়ার কৃপায় তোমরা ইহার অর্থ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় যুগে দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ তখন স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন। সূর্য্য, চন্দ্র তখন নবোল্লাসে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন! মন্দাকিনী তখনও পর্য্যন্ত মহেশ্বরের জটা অবলম্বনে হিমালয়ের শুভ্রশির স্নাত করিয়া ধরণীতে প্রবাহিতা হন নাই। বিষ্ণুপাদ হইতে উদ্ভূতা হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তিনি ব্যোম-গঙ্গারূপে আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া বিহার করিতেছিলেন। তারাফুল তখন সবে মাত্র ফুটিয়া স্বর্গের উদ্যান-নন্দনে শোভা পাইতেছিল, এমন সময় দেবরাজ্যে অসুরের উৎপাত আরম্ভ হইল।

এবারকার অসুররাজের নাম মহিষাসুর। তাহার সহিত দেবগণের একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অসুরদের অধিকারভুক্ত হইল।

অনন্তোপায় হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাহাদিগকে বিষ্ণু ও শিবের কাছে লইয়া

গেলেন এবং দেবগণের দুর্গতির কথা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। কমলযোনি বলিতে লাগিলেন—"প্রচণ্ড মহিষাসুর দেবগণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদিগের—এমন কি ঋষিগণের স্থানে—সেই প্রচণ্ড অসুর একা আধিপত্য করিতেছে। দেবতারা এখন তাহার ভয়ে মানুষের মত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ আপনাদিগের নিকটে কহিলাম। আমরা আপনার শরণ লইলাম। এখন কেমন করিয়া তাহার বিনাশ হয়, সেই উপায় বিধান করুন।"

এই কথা শুনিবামাত্র মধুসূদনের বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। "কি, এত বড় স্পর্দ্ধা। আমার প্রিয় দেবতাদিগের স্থান একটা দুর্ব্বৃত্ত অসুরে, অধিকার করিয়াছে!" ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের ক্রোধ—এ কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন, শ্রীমধুসূদন জগতের সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি দেবতাদের ভিতরে যেমন আছেন, তেমনি তোমার ভিতরে, আমার ভিতরে পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতির ভিতরেও আছেন। জগতে এমন জীব নাই, এমন স্থান নাই, এমন দৃশ্য নাই, যাহার ভিতরে মধুসূদন নাই। এইজন্য হিন্দুরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তোমরা সকলে এখনও কর কি না জানি না। যদি না করিয়া থাক, তাহা হইলে নিম্নের লিখিত শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিবে এবং প্রতি প্রভাতে ভক্তিসহকারে মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে শ্লোকটি উচ্চারণ করিবে। কিছু দিন করিলে দেখিবে, তোমাদের আর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না। ভুলেও মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির হইবে না। শ্লোকটি এই :—

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥
যেই কার্য্য নিষ্পাদন করেছি মধুসূদন।
যে কার্য্য করিব আমি আর।
নহে মম অনুষ্ঠিত, সে কার্য্য তোমার কৃত;
তুমি প্রভু, ফলভোগী তার।

তাই বলিতেছিলাম, মধুসূদনের ক্রোধের একটি গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্মা ও দেবতাগণের মর্ম্মকথায় অসুরগণের উপর যেমন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ত্রিলোক ক্রোধে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে শিব ক্রুদ্ধ হইলেন,। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা ক্রুদ্ধ হইলেন। জগতের সমস্ত জীবের ভিতর ক্রোধের সঞ্চার হইল। প্রকৃতি ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, প্রলয়-ঝড়ে আকাশ ব্যাপ্ত হইল, সমুদ্র ক্রোধে ফুলিয়া উথলিয়া উঠিল, স্থির হিমালয়ে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, ধরণী কম্পিতা হইলেন।

অতি কোপে মধুসূদনের মুখ হইতে অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ হইতে মহৎ তেজ বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের দেহ হইতে রাশি রাশি তেজ বাহির হইল। সেই সকল তেজ একত্র হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিল। দেবগণ দেখিলেন, যেন এক প্রকাণ্ড শৈল দিগন্তব্যাপিনী অগ্নিশিখায় স্নান করিতেছে।

সেই তেজোরাশি প্রভামণ্ডলে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। শঙ্করের তেজে তাঁহার মুখ, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু, ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদ রচিত হইল। এইরূপে অন্যান্য দেবগণের তেজে তাঁহার এক এক অঙ্গ নির্ম্মিত হইল।

আমাদিগের ক্রোধ অনেক সময়ে লোকের অনিষ্ট করিবার জন্যই উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেবতাদিগের ক্রোধ জীবের মঙ্গলের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল তেজ হইতে যে দেহ উৎপন্ন হইল, আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্ব্বমঙ্গলারূপে সেই দেহ আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণা হইলেন।

মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের ভয় ঘুচিয়া গেল; দেবতারা আনন্দিত হইলেন। চারিদিক্ হইতে মায়ের জয়গান উত্থিত হইল; আকাশগঙ্গায় উল্লাসের বন্যা ছুটিয়া গেল।

তখন মহেশ্বরপ্রমুখ দেবগণ মহামায়াকে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। শিব আপনার শূলের অনুরূপ একটি শূল গড়িয়া মায়ের হাতে দিলেন; কৃষ্ণও স্বীয় চক্রের অনুরূপ একটি চক্র প্রদান করিলেন; ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে আর একটি বজ্র উৎপাদন করিয়া মাকে উপহার দিলেন। এইরূপে দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্রের অনুরূপ আর একটি অস্ত্র রচিয়া আদ্যাশক্তিকে রণসাজে সাজাইলেন।

শুধু দেবতা কেন, সমস্ত জগৎ জগদ্ধাত্রীকে সাজাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। ক্ষীরোদসমুদ্র নানাবিধ অলঙ্কারে মায়ের অঙ্গ সাজাইয়া একখানি অবিনশ্বর বস্ত্র মাকে পরাইয়া দিল। জল-সমুদ্র একটি সুন্দর শঙ্খ, এক ছড়া প্রফুল্ল পদ্মের মালা ও একটি পরম সুন্দর লীলা-কমল উপহার প্রদান করিল। হিমালয় নিজের সিংহটিকে মায়ের বাহন করিয়া দিল।

৮

দেবদত্ত সাজে সজ্জিতা হইয়া, জগতের কল্যাণরূপিণী জননী, অসুরগুলাকে ভয় দেখাইবার জন্ত অট্টহাস্যের সঙ্গে একবার হুঙ্কার করিলেন। সেই ভীম হুঙ্কারে সমুদায় আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া গেল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল স্তম্ভিত হইল, সমুদ্রে বিষম তরঙ্গ উঠিল, পৃথিবী টলমল করিল, পর্ব্বত সকল কাঁপিতে লাগিল।

সেই শব্দ মহিষাসুর ও তাহার অনুচরগণের কানে গেল। তাহারা ত এরূপ শব্দ আর কখনও শুনে নাই! ইন্দ্রের বজ্রধ্বনি তাহারা বহুবার শুনিয়াছে; মহাসমুদ্রের প্রলয়কল্লোল অনেকবার বিষমগর্জ্জনে তাহাদের গৃহদ্বার আক্রমণ করিয়াছে; পর্ব্বতের বক্ষ-বিদারণ শব্দ কতবার তাহাদের কর্ণপটহে ঘা মারিয়াছে, কিন্তু এরূপ শ্রবণভেদী গম্ভীর হুঙ্কার আর কখনও তাহাদের শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে নাই।

মহিষাসুর শব্দ শুনিবামাত্র বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিল—"আঃ—একি?" তখন অসুরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। মহিষাসুরও অগণ্য অসুর-সৈন্ত সঙ্গে লইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল।

বোধ হয়, তাহার আকারটা মহিষের মত ছিল, তাই ঋষি তাহার মহিষাসুর নাম দিয়াছেন। তাহার সেনাপতি-গণের মূর্ত্তিও তাহার মত বিশ্রী ছিল। কাহার পায়ে মহিষের মত ক্ষুর, কাহারও বিড়ালের মত চোখ, কাহার পা দুইটা পিছনে, চোক দুইটা কপালে, কাহারও বা গায়ে ক্ষুরের মত ধারালো লোম,—এইরূপ জন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট নানা কুৎসিৎ অসুর জগন্মাতাকে আক্রমণ করিতে চলিল।

এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, পশুর সহিত যাহাদের আকারের তুলনা হইতে পারে। কাহা-রও ঠোঁট পুরু, কাহারও নাক চেপ্টা, কাহারও চুলগুলা ভেড়ার লোমের মত, কাহারও চোখের নীচের হাড় এত উঁচু, দেখিলে ঠিক যেন একটি দ্বিপদ হনুমান বোধ হয়, তা সে কত পূর্ব্বকালের কথা! তখন মানবদেহ সবে মাত্র রচিত হইতেছে। তখন অসুরগুলা যে জন্তুর মত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মহিষাসুর যখন সৈন্ত লইয়া দেবীকে অবলোকন করিল, তখন তাঁহার শরীরকান্তিতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছে, পদভরে ভূমণ্ডল অবনত হইয়া পড়িয়াছে, কিরীট গগনস্পর্শ করিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কারধ্বনিতে সমুদায় রসাতল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং ভুজ সহস্রবাহুর আকার ধরিয়া দিঙ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।

মায়ের এ বিশ্বরূপ কল্পনাতেও আনিতে আমাদের শক্তি নাই। একবার কুরুক্ষেত্রে মহামতি অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট দেহ ও স্বকীয় কান্তিতে ত্রিভুবন সমুজ্জল করিয়াছিল। কিরীট আকাশে ঠেকিয়াছিল! সেই চিরমধুর দ্বিভুজ মুরলীধর সখা অর্জ্জুনের চক্ষে একদিন সহস্রবাহু প্রসারিত করিয়াছিলেন। দেবতারা যে রূপ দর্শনের জন্ত ব্যাকুল, আমরা ক্ষুদ্রজ্ঞানে সেই রূপ কেমন করিয়া অনুমান করিব? কৃষ্ণসখা সে রূপের জ্যোতি বহুক্ষণ দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি সখার পূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন—"হে দেবেশ! হে জগতের নিবাসভূমি! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া যদিও আমি হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বরূপ—সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আমাকে দেখাও।"

এস ভাই! আমরাও সেই প্রকার করযোড়ে মাকে বলি—"মা! অসুরনাশিনী! অসুরকুলের সংহার করিয়া তোমার সেই চিরমধুর শ্যামরূপে ধরণীতলকে স্নিগ্ধ করিয়া এক হস্তে বর, অন্ত হস্তে অভয় লইয়া তোমার সন্তানগুলির সম্মুখে উপস্থিত হও। আমরা বালক-বালিকা, প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখি, আর উল্লাসে নৃত্য করি।"

অসুরগণ দেবীকে দেখিয়াই, চারিদিক্ হইতে এক সঙ্গে আক্রমণ করিল। কোটি কোটি হাজার রথ, কোটি কোটি হাজার গজ, কোটি কোটি হাজার ঘোড়া একেবারে চারিদিক্ হইতে পিপীলিকার মত মাকে ঘেরিয়া ধরিল। ঘেরিয়া সকলে একসঙ্গে মায়ের অঙ্গে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম! কোন অসুর তোমর দ্বারা, কেহ ভিন্দিপাল দ্বারা, কেহ মুষল দ্বারা, কেহ বা শলা, কেহ বা কুড়ালি লইয়া মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম। মা একাকিনী—শত্রু অসংখ্য। তথাপি মা শত্রুনিক্ষিপ্ত সেই অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসেই ছেদন করিলেন! অব-শেষে তিনি যখন দেখিলেন, প্রবল ঝড়ে সাগরের তরঙ্গের মত অসুর-সৈন্ত কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এক একটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রমথ-সৈন্ত সৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবীর নিশ্বাসে জন্মিয়াছে, সুতরাং দেবীর শক্তিও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা অসুর-সৈন্তের যুদ্ধ দেখিয়া স্থির থাকিবে কেন? তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবীর বাহন সিংহ—সেই বা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্থির

থাকিবে কেন? মহাশক্তির আধার হিমালয়ের নিকট হইতে সে আসিয়াছে। আসিয়া আদ্যাশক্তিকে বহন করিয়াছে। প্রমথগণ যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন সে কি কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিবে? সিংহও ক্রুদ্ধ হইল; তার কাঁধের কেশর কম্পিত হইয়া উঠিল: আর বনের ভিতর দাবানল যেমন লক্‌লক্ শিখা লইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়, সে-ও সেইরূপ অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবী কখন ত্রিশূল, কখন গদা, কখন খড়্গ লইয়া অসুরগুলাকে বধ করিতে লাগিলেন। কখন বা শক্তিবৃষ্টি করিয়া কোটি কোটি মহাসুর সংহার করিলেন। দেবীর ঘণ্টার শব্দে বিমোহিত হইয়া কতকগুলা অসুর মাটিতে আছাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলা নাগপাশে জড়াইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল। কাহার হাত গেল, কাহারও পা গেল, কাহারও বা দেহ-মধ্যভাগে কাটা পড়িল, আর কত মাথা যে ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল, তাহার সংখ্যা রহিল না। সিংহ চারিধারে ছুটাছুটী করিয়া অসুর গুলার মুণ্ড কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল।

বহুদিন ধরিয়া দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; এবং একে একে তাহার সেনাপতিগণকে বধ করিয়া সর্ব্ব-শেষে তাহাকে নিহত করিলেন।

প্রচণ্ড মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া প্রমথগণ আনন্দে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল। জগন্মাতার এই যুদ্ধ-মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিতে জগতের সমস্ত জীব যোগদান করিল। দেবগণ, ঋষিগণ দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান ধরিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন। সেই অম্লানবদনা সর্ব্বশক্তি-শালিনী মহিষমর্দ্দিনীর জয়গান বহন করিয়া সমীরণ দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া গেল।

৯

মহিষাসুরের বিনাশে জগতের সমস্ত তাপ দূর হইয়া গেল। ঋষিগণ ভক্তিভরে আদ্যাশক্তির পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা জগদ্ধাত্রি! প্রসন্না হও। তুমি প্রসন্না হইলেই জগতের কল্যাণ হয়। তুমি যাহাদের প্রতি করুণা কর, মানে, ধনে, যশে, তাহারা সকল লোকের পূজা পাইয়া থাকে। তাহাদের সংসারে দুঃখ ক্লেশ থাকে না। ব্যাধি আসিয়া তাহাদের যাতনা দিতে পারে না। অকালমৃত্যু তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের সুকৃতির তুলনা নাই। তাহাদের পুত্র-কন্যা বিনীত হয়, ভৃত্য প্রভুর বশীভূত হয়; ভার্য্যা পতিপরায়ণা হইয়া থাকে। বিপদে একমনে তোমায় স্মরণ করিলে তুমি প্রাণী সকলের ভয় দূর করিয়া দাও। দারিদ্র্য-দুঃখ-হারিণী দয়াময়ী! ভয়হারিণি অভয়ে! ভক্তই হউক অভক্তই হউক, মিত্রই হউক, শত্রুই হউক, সকলেরই জন্য তোমার চিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়া রহিয়াছে। হে বরদে! আমরা তোমার সেই করুণা ভিক্ষা করিতেছি। হে দেবি! তুমি তোমার অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সকল প্রকারে রক্ষা কর, সকল দিকে রক্ষা কর। আমাদিগকে রক্ষা কর, জীবকে রক্ষা কর, পৃথিবীকে রক্ষা কর।"

এই বলিয়া ঋষিগণ নন্দনবনের ফুল লইয়া মায়ের পূজা করিলেন, মায়ের অঙ্গ চন্দন-কুঙ্কুমে চর্চ্চিত করিলেন। তার পর ভক্তিভরে দিব্য ধূপ দ্বারা জগন্মাতার আরতি করিলেন।

ঋষি ও দেবতার পূজায় প্রসন্না হইয়া জগদ্ধাত্রী সহাস্য-বদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের কি বাঞ্ছিত আছে, তাহা প্রার্থনা কর, আমি আনন্দের সহিত তোমা-দিগকে তাহা দান করিতেছি।"

ঋষি ও দেবগণ কহিতে লাগিলেন—"প্রসন্নবদনে! তুমি যখন আমাদিগের সম্মুখে, তখন অন্য বর আর কি লইব? আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর মরিয়াছে। তবে যদি একান্তই আমাদিগকে তোমায় বর দিতে হয়, তাহা হইলে এই বর দাও যে, যখনই আমরা তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের বিপদ দূর করিয়া দিবে। আর এই বর দাও মা! যে মানব এই সকল স্তবে তোমাকে প্রসন্না করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি তাহাকে বিভব দিবে, সম্পদ দিবে, জ্ঞান দিবে। আর তাহার সংসারটিতে করুণা ঢালিয়া তাহাকে সকল প্রকারে সুখী করিবে!" এই স্থানেই দেবচরিত্র ও ঋষি-চরিত্রের মর্ম্ম অনু-ভব কর। নিজেদের জন্য বর লইতে গিয়া তাঁহারা জগজ্জন-নীর কাছে সমগ্র মানবের কল্যাণ কামনা করিলেন।—

'তাহাই হউক', বলিয়া মা দেবতাদিগের চক্ষের উপর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মা অদৃশ্য হউন, কিন্তু তিনি দেবতাদের কাছে বরা দিয়াছেন, প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। যে কেহ ভক্তিভরে আদ্যাশক্তির স্তব করিবে, মাতা তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দিবেন।

১০

তৃতীয় বারে মহামায়া আমাদের ঘরের কাছে আসিয়া-ছেন। এবারেও দুই প্রচণ্ড দানবের হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য মা আদ্যাশক্তি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

এই দুই দানবের নাম শুম্ভ ও নিশুম্ভ। তাহারা দুই ভাই। দুই ভ্রাতায় বিশেষ প্রীতি ছিল। কনিষ্ঠ নিশুম্ভ সর্ব্বপ্রকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভের অনুগত ছিল। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতারই সাহায্যে সেই প্রচণ্ড দৈত্য শুম্ভ ত্রিলোক জয় করিতে অগ্রসর হইল।

ত্রিলোকের ইন্দ্র অমরাবতীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। শুম্ভ নিজের সমস্ত অসুর-সৈন্য লইয়া প্রথমেই ইন্দ্রের রাজধানী আক্রমণ করিল। দেবসৈন্য ও অসুরসৈন্যে অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দেবতারাই পরাস্ত হইলেন; এবং একে একে সকলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিলেন। প্রথমেই ইন্দ্র পলাইলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হুতাশন একে একে সমস্ত দেবতা নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইলেন।

শুম্ভ যেমন ইন্দ্রের অধিকার কাড়িয়া লইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেবতাদিগের অধিকারও হস্তগত করিল।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য্যচন্দ্রকেও যদি নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইতে হইল, তবে কি সে সময়ে আকাশে সূর্য্যচন্দ্রের উদয় হইত না? তবে কি সমস্ত পৃথিবী সে সময় দিবারাত্রি অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত?

ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নয়। তবে ঋষিরা বলেন, দৈত্যদানবেরা যে সময় জগৎ অধিকার করে, তখন বাস্তবিকই জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন সূর্য্য থাকেন না, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহরাজগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন না। এক অন্ধকার—বিরাট অন্ধকার সমস্ত মেদিনীর উপরে অবাধে রাজত্ব করিতে থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, দানবের অধিকারভুক্ত জীব তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না।

দানবেরা অনেক প্রকার মায়া জানে। সেই মায়াবলে তাহারা নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া জীব সকলকে ভুলাইতে সমর্থ হয়। যখন চন্দ্র, সূর্য্য, ও গ্রহগণ আপন আপন স্থান ত্যাগ করিলেন, দানবগণও অমনি তাঁহাদের রূপ ধরিয়া সেই সকল পরিত্যক্ত স্থান গ্রহণ করিল।

আকাশে দানব-সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বাচলে উদিত হইয়া সন্ধ্যায় পশ্চিমাচলে অস্ত যাইতে লাগিল; দানবী তারায় অমার গগন আচ্ছন্ন হইল; পূর্ণিমার রজনী দানবচন্দ্র মাথায় ধরিয়া দানবী কৌমুদীর বসন পরিল।

দানবী-মায়া-মুগ্ধ মানব দেখিল, সূর্য্য উঠিয়াছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেবতা ও ঋষি জানিলেন, সমস্ত জগতে অন্ধকার—কি বিরাট বিশ্বগ্রাসী সর্ব্ববিনাশী অন্ধকার!

দেবতারা দৈত্যভয়ে মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে লুকাইয়া রহিলেন। শুম্ভ ত্রিলোকে একাধিপত্য করিতে লাগিল।

পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, অধিকারচ্যুত, স্বর্গ হইতে তাড়িত, ভয়কম্পিত দেবগণ মুক্তির অন্য উপায় না দেখিয়া জগন্মাতাকে স্মরণ করিলেন।

"বিপদ উপস্থিত হইলে যদি আমাকে তোমরা যথাবিধি স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকল বিপদ দূর করিয়া দিব।" মহামায়া দেবগণকে পূর্ব্বে এই বর দিয়াছেন। সেই বরের কথা দেবতাদের মনে হইল। মনে হইবামাত্র তাঁহারা হিমালয়ে গমন করিলেন, এবং সকলে সমবেত হইয়া মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন।

নমি দেবী মহাদেবী শিবানী প্রকৃতি।
ভদ্রা রৌদ্রা গৌরী ধাত্রী করি মা প্রণতি॥
নমি দুর্গা নমি কৃষ্ণা হে সর্ব্বকারিণী।
নমি মা কল্যাণরূপা নমি মা শর্ব্বাণী॥
সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া যে দেবী শব্দিতা।
চেতনা সকল ভূতে যিনি অভিহিতা।
বুদ্ধিরূপে সেই দেবী জীবের ভিতরে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥
নিদ্রা ক্ষুধা ক্ষান্তি তৃষ্ণা শান্তি জাতি মায়া।
শ্রদ্ধা লজ্জা তুষ্টি কান্তি বৃত্তি স্মৃতি ছায়া॥
জীবমধ্যে যিনি আদি দয়ারূপ ধ'রে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥
লক্ষ্মীরূপে মাতৃরূপে ব্যাপ্তিরূপে আর।
শক্তিরূপে জীবমধ্যে অবস্থিতি যাঁর॥
সংজ্ঞারূপে আবরিয়া নিখিল সংসারে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥

জগজ্জননীর স্তবে দেবতারা তন্ময় হইয়া গেলেন। ভক্তি-বিনম্র দেবতার কণ্ঠোচ্চারিত স্তুতি-গীতি করুণাময়ীর হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি আর ভক্তের চক্ষে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। জাহ্নবীতে স্নান করিবার ছল করিয়া তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"আপনারা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছেন?"

ঋষি এইখানে একটি অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সামান্যা রমণীজ্ঞানে দেবগণ বোধ হয়, পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তর দানে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু দেবীর প্রশ্ন ত নিরর্থক নয়! দুর্গী জগতের দুর্গতিনাশে অভিলাষিণী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দুর্গতিগ্রস্ত হতবুদ্ধি দেবগণ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ

হইলেন না। তাই বলিয়া কি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যাহত হইবে? দেখিতে দেখিতে পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে তাঁহারই অনুরূপ অন্য এক পরম রমণীর মূর্ত্তি বাহির হইয়া উত্তর করিলেন—"সমরে নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ও শুম্ভ কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকার হইতে তাড়িত হইয়া এই সকল দেবতা আমারই স্তব করিতেছেন।"

চক্ষের নিমিষে যেন কোথা হইতে কি হইয়া গেল! আকুলনেত্রে দেবগণ চাহিয়া দেখিলেন, হিমালয়-শিরে সুধাতরঙ্গিণী জাহ্নবীতীরে পর্ব্বতনন্দিনী গৌরী সহসা শ্যামরূপে ভুবন উজ্জ্বল করিয়া একহস্তে বর ও অন্য হস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি দেবগণের মস্তক ভক্তিভরে শ্যামার চরণপ্রান্তে অবনত হইল। ভগবতীর আশ্বাস-বাণীতে প্রীত হইয়া তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পার্ব্বতী কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, আদ্যাশক্তি ক্রমে আমাদের ঘরের কাছে আসিয়াছেন। জীবের ভয় ঘুচাইতে ভগবতী এবারে গিরিরাজের গৃহে অবতীর্ণা।

পর্ব্বতনন্দিনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজের শূন্য-ভবন পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ-সকল বিবিধ রত্নধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিল। অন্যান্য শৃঙ্গ সকল অসংখ্য বৃক্ষলতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইল; এবং পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীর মধুর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

১১

শুম্ভ-নিশুম্ভের দুইজন ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, কোথা হইতে এক অভিনব সলিল-তরঙ্গ পর্ব্বতের মূলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছে। সেই শুভ্রসলিলা তটিনীতীরে এক অপূর্ব্ব কাঞ্চন-কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই কাঞ্চন-কমলের সৌরভে সেই পার্ব্বত্য দেশের সমীরণ সুবাসিত হইয়াছে।

হিমালয়ের এই সহসা রূপপরিবর্ত্তনের কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাহারা দুই ভাই প্রথমে বড়ই বিস্মিত হইল। কতদিন ত তাহারা হিমালয়ের নিকট দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কই নীরস হিমালয়ে এরূপ রসপ্রবাহ আর কখন ত তাহারা দেখে নাই! শুম্ভের কৃপায় তাহারা ত্রিভুবনের সকল সুন্দর স্থান দেখিয়াছে, নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু হিমগিরির আজ যেরূপ শোভা, নন্দনেরও ত কখন তাহারা সেরূপ শোভা দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া দুই ভাই পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা দেখিল, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী অপরূপ শ্যামাঙ্গের শোভায় ভুবন আলোকিত করিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে বিচরণ করিতেছেন।

সেই কুমারীকে দেখিবামাত্র তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের রাজাকে সংবাদ দিল। বলিল—"মহারাজ! অতি মনোহরা একটি রমণী স্বকীয় শ্যাম-শোভায় সুশুভ্র হিমাচল সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাদৃশ পরম মনোহররূপ ত্রিভুবনে কেহ কোথাও দেখে নাই। ইনি কোন্ দেবী প্রথমে আপনি অবগত হউন; তাহার পর ইহাকে গ্রহণ করুন! একবার দেখিয়া আসুন, তাঁহার রূপপ্রভায় দশদিক্ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

চণ্ড ও মুণ্ড বলিতে লাগিল—"ত্রিভুবনে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, সমস্তই আপনি অধিকার করিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি করিরাজ ঐরাবত এবং ঘোটকশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা লাভ করিয়াছেন। নন্দনের পারিজাত আপনার অট্টালিকার প্রবেশ-পথে কল্প-কুসুম মাথায় লইয়া ছায়াদান করিতেছে। ধনেশ্বর কুবেরের নিকট হইতে আনীত মহাপদ্ম নামে নিধিরত্ন, সমুদ্রদত্ত উৎকৃষ্ট কেশরবিশিষ্ট অম্লান পদ্মমালা, বরুণ-দত্ত কাঞ্চনস্রাবী ছত্র—অপূর্ব্ব ভূষণ, অপূর্ব্ব বসন—সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে, এমন কি, হংসসংযুক্ত, রত্নরূপে পরিণত যে অদ্ভুত রথ পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ছিল, সেই বিমান-রত্ন এক্ষণে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণ আশ্রয় করিয়াছে। হে দৈত্যরাজ! ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সমুদায় যখন আপনি অধিকার করিয়াছেন, তখন কি জন্য এই কল্যাণী রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেছেন না?"

১২

চণ্ড-মুণ্ডের কথা শুনিয়া বিস্মিত দৈত্যরাজ সুগ্রীব নামক অনুচরকে আহ্বান করিলেন। সুগ্রীব নিকটে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই দণ্ডেই হিমালয় প্রদেশে গমন কর। এবং পর্ব্বতের অধিত্যকায় বিচরণশীলা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যের কথা জ্ঞাপন কর, এবং যাহাতে প্রীতমনে তিনি এখানে আগমন করেন, তাহার ব্যবস্থা কর।"

দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুগ্রীব হিমালয়ে গমন করিল। যাইয়া দেখিল, রক্তবস্ত্রপরিধানা প্রকৃতি-ভূষণা শ্যামা এক পরমরমণীর অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া

আছেন। পার্শ্বে সহস্র কাঞ্চন-দলে কমল ফুটিয়াছে; সম্মুখে জাহ্নবীতরঙ্গদত্ত অসংখ্য রত্নোপহার পতিত রহিয়াছে; পদতলে কুণ্ডলিত সিংহ সেই কোমল চরণের ভার ধরিবার জন্য যেন সর্ব্বশক্তি পুঞ্জীকৃত করিয়াছে।

জননী একহস্তে ভূমিসংলগ্ন ত্রিশূল ধরিয়া অন্য কর-কমল ঈষদুত্তোলিত করিয়া জগতে অভয় বিতরণ করিতেছিলেন। শ্রীচরণচুম্বিত-কেশরাশি মলয়-পবনে আন্দোলিত হইয়া গিরিশিখরে মেঘের তরঙ্গ তুলিতেছিল। নীল-নলিনাভ নয়ন ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ধারায় সমস্ত আকাশকে নীল-বর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় জগদ্ধাত্রী মানবীদেহে আপনার ভুবনব্যাপিনী মাধুরী উপভোগ করিতেছিলেন।

সুগ্রীব ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর সমীপে উপস্থিত হইল, এবং অতি কোমলভাবে মধুরবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল—"হে দেবি! দৈত্যরাজ শুম্ভ ত্রিভুবনের একাধিপতি; আমি তাঁহার প্রেরিত দূত; এখানে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিলেন—"কি জন্য আসিয়াছ বল।"

সুগ্রীব বলিল—"সেই দৈত্যরাজের কথা আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি। তিনি বলেন, 'এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমারই। দেবগণ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই নিখিল ভূমণ্ডলে যেখানে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন ছিল, সমস্তই আমার করতলগত হইয়াছে। দেবগণ, নাগগণ সকলে আমাকে প্রণাম করিয়া, সেই সকল রত্ন আমাকে উপহার দিয়াছেন। আপনিও স্ত্রী-রত্ন, সুতরাং আমার অধিকারে আনিবার যোগ্য। আমার পত্নী হইলে আপনি অতুল পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন; বুদ্ধি দ্বারা ইহা সমালোচনা করিয়া আপনি আমার অথবা আমার সমবিক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভের পত্নীত্ব স্বীকার করুন'।" প্রভুর উক্তি দেবীকে শুনাইয়া সুগ্রীব দেবীর উত্তরের প্রতীক্ষায় নীরব হইল।

দেবী কহিলেন—"তুমি সত্য বলিয়াছ। শুম্ভ সম্বন্ধে তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই! শুম্ভ ত্রিলোকের অধীশ্বর; নিশুম্ভও তাঁহারই তুল্য। কিন্তু এই বিবাহ বিষয়ে আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি কেমন করিয়া তাহা মিথ্যা করি?"

সুগ্রীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রতিজ্ঞা বলুন?"

পার্ব্বতী কহিলেন—"অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

"যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে, যে ব্যক্তি আমার দর্প চূর্ণ করিবে, যে ব্যক্তি আমার তুল্য শক্তিশালী, তাহাকেই আমি স্বামিত্বে বরণ করিব। অতএব অসুররাজ শুম্ভ, অথবা তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভ এখানে আসুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

এতক্ষণ দৈত্যদূত মিষ্টবাক্যে দেবীর সহিত কথা কহিতেছিল। দেবীর এই বিস্ময়কর বাক্য শুনিয়া, অবলার এই অসম্ভব অহঙ্কার দেখিয়া, তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে ত্রিলোকাধিপতির অনুচর, নিজেও দেবপরাভবের বল ধারণ করে, সে এক কোমলা কুমারীর গর্ব্ব সহ্য করিতে পারিবে কেন? ক্রোধে সুগ্রীব বলিয়া উঠিল—"হে দেবি! আমি দেখিতেছি, রূপের অহঙ্কারে তোমার মতিবুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। সাবধান! আমার সম্মুখে এরূপ কথা আর বলিও না। ত্রিভুবনে এমন পুরুষ কে আছে যে, শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? ইন্দ্র তাহার বজ্র লইয়া, বরুণ তাহার পাশ লইয়া, কুবের তাহার শক্তি লইয়া, যম তাহার দণ্ড লইয়া শুম্ভের বলের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও আমাদের ন্যায় দৈত্যগণের সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারে না। তুমি রমণী, তাহাতে একাকিনী; যুদ্ধার্থিনী হইয়া তুমি কিরূপে শুম্ভনিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইবে? আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা রাখ। এখনি শুম্ভনিশুম্ভের নিকট গমন কর। কেশাকর্ষণে হতগৌরবা হইয়া যাইও না।"

পার্ব্বতী দূতের কথায় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত বটেই। শুম্ভ-নিশুম্ভ যে বলী ও বীর্য্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কি করি বল, পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

সুগ্রীব বুঝিল, বিনা বলপ্রয়োগে এ রমণী শুম্ভ-ভবনে যাইবে না। বলিল—"তবে আমি দৈত্যরাজাকে এই কথা বলি?"

দেবী বলিলেন—"হাঁ! তুমি আমার দূত হইয়া সেখানে যাও; আমি যাহা যাহা বলিলাম, সে সমস্ত দৈত্যরাজকে বল। তিনি শুনিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত করিবেন।"

দেবীর উত্তর শুনিয়া সুগ্রীব বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। সে নিজেই একটা পৃথিবীজয়ী বীর, তাহার সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র কুমারী বলের গর্ব্ব করিতেছে, বীরশ্রেষ্ঠ শুম্ভকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ করিতেছে, ইহা কোন্ বীর সহ্য করিতে পারে? একবার সে মনে করিল, আমিই এই বালিকাটার কেশাকর্ষণ করিয়া দৈত্যরাজের কাছে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না! সে কেবলমাত্র

দূত হইয়া আসিয়াছে, তাহার যুদ্ধ করা নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইজন্য সে মনের রাগ মনেই চাপিয়া তাহার রাজার নিকটে গমন করিল, এবং শুম্ভ যেখানে দানবগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল।

১৩

শুম্ভ সুগ্রীবকে দেখিয়াই রমণীর বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন, এবং তাহার সঙ্গেই সে আসিল না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুগ্রীব করযোড়ে উত্তর করিল,—'মহারাজ! সে রমণী হয় উন্মাদিনী, না হয় গর্ব্বিণী। আমি তাহার নিকটে যাইয়া আপনার আদেশ জানাইলাম। শুনিয়া রমণী অবজ্ঞার সহিত বলিল,—'যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, সেই আমার স্বামী হইবে।' এই বলিয়া সে আপনাকে অথবা আপনার ভ্রাতাকে সমরে আহ্বান করিয়াছে। বলিয়াছে, শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ এখানে আসুন; এবং শীঘ্র আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

সুগ্রীবের মুখে অপরিচিতার কথা শুনিয়া সভাস্থ দৈত্যের দল হাস্য করিয়া উঠিল। তাহারা হাসিল, যেন তাহারা সুগ্রীবের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু শুম্ভ হাসিলেন না। যে যে ব্যক্তি স্বকীয় ক্ষমতা ও বীর্য্যবলে ত্রিলোক অধিকার করিতে সমর্থ, দেবতারা যাহার ভয়ে আত্মগোপন করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিতেও যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার ভিতরে দেবতাদিগেরও অধিক শক্তি বিদ্যমান। তবে দেবতা ও দানবে প্রভেদ এই, দেবতারা সত্ত্বগুণপ্রধান, আর দানবদিগের ভিতরে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য।

এই তিন গুণের বিষয় সম্যকরূপে বুঝা তোমাদিগের পক্ষে আপাততঃ কঠিন হইবে। তথাপি আমি এই গুণের কথা উল্লেখ করিলাম। এই সময় হইতেই তোমাদের এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে অন্ততঃ সামান্য কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তোমরা হয় ত দেখিয়াছ যে, তোমাদের বালকবালিকাদিগের মধ্যে চরিত্রগত কত প্রভেদ! যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে এইবার হইতে দেখিও, এবং সেই সঙ্গে আপনার দিকেও দৃষ্টি করিও। তাহা হইলে এই তিনটি গুণ সম্বন্ধে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তোমাদিগের মধ্যে দেখিবে, কেহ সদানন্দময়, কেহ অভিমানী, কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত, কেহ চঞ্চল, কেহ কর্ম্মকুশল,—সর্ব্বদাই কাজ করিতে ভালবাসে—কেহ অলস—কাজ করিতে চাহে না,—কাজের কথা শুনিলেই তাহার জ্বর আসে, কেহ পরকে দান করিয়া আনন্দলাভ করে, কেহ পরের নিকট হইতে লইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়; কেহ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে, আবার কেহ বা তাঁহাদের সর্ব্বদাই বিরক্ত করিয়া থাকে। একটু স্থিরতার সহিত দেখিলেই তোমরা তোমাদের মধ্যে এই চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। কেন এই পার্থক্য হয়, পরে বলিতেছি। আগে এই গুণের মহিমা শুন।

ঋষি বলেন—এই তিনটি গুণ লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। যে দিন জগৎ হইতে এই তিনটি গুণ তিরোহিত হইবে, সেই দিনই জগতের ধ্বংস হইবে। তখন এই পৃথিবী বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব, নদী, পর্ব্বত, আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা নক্ষত্র ও দেবতা কিছুই থাকিবে না।

আদ্যাশক্তি মহামায়া এই তিনটি গুণ লইয়াই তাঁহার এই বিশাল সংসার রচনা করিয়াছেন। তোমরা ত পূর্ব্বেই দেখিয়াছ, নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার কাতর আহ্বানেও তিনি জাগরিত হইলেন না। শেষে ব্রহ্মা স্তবে মহামায়ার আবাহন করিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি মধুকৈটভের নিধনে ভুবন সৃষ্ট হইল।

যিনি পরমেশ্বর, তাঁহাকে ঋষিরা নির্গুণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহামায়া গুণময়ী। তাঁহারই সাহায্যে ভগবান সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই মহামায়ার নাম আদ্যাশক্তি—আদিজননী।

সুতরাং সংসারের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে। এই ত্রিগুণ স্থলে আছে, জলে আছে, বায়ুতে আছে, পশুপক্ষী জীবে আছে, মানুষে আছে, দৈত্যে আছে, দেবতায় আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে আছে। উচ্চ দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকার একটি পরমাণু পর্য্যন্ত কেহই এই ত্রিগুণের খেলা হইতে নিস্তার পায় নাই।

তবে এই তিনটি গুণ সকল বস্তুতে সমান নয়। কাহাতে সত্ত্বগুণ অধিক, কাহাতে বা রজোগুণের আধিক্য, কাহাতে বা তমোগুণের প্রাধান্য।

নির্ম্মলতা সত্ত্বগুণের চিহ্ন, রজোগুণের চিহ্ন চঞ্চলতা; তমোগুণের অলসতা। এই তিন গুণের এই তিনটি প্রধান চিহ্ন। এই সকল চিহ্নের আবার নানারূপ। সে সমস্ত সবিস্তারে উল্লেখ করা এ ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, এ জগতে যাহা কিছু নির্ম্মল ও মধুরতাময়, তাহাই সত্ত্বগুণপ্রধান; যাহা চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল, তাহাতেই রজোগুণের আধিক্য, এবং যাহা গতিহীন ও

ক্রিয়াহীন, তাহাতে তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে।

সত্ত্বগুণ হইতে শান্তি, সুখ ও মধুরতা উৎপন্ন হয়; কামক্রোধাদি রিপু এবং সেই জন্ম চিত্তের অস্থিরতা ও শোকদুঃখাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; মোহ ও মত্ততা তমোগুণের ফল।

দেবতায় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, এই জন্ম তাঁহারা শান্তিময় ও সুখী। দানবে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য, এই জন্ম তাহারা ক্রোধী, লোভী ও চিরলালসাময়—জগতের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহাদের লালসা মিটে না সুতরাং দুঃখ ঘুচে না।

এইবারে মানুষ লইয়া কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বে পরস্পরের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্য করিতে বলিয়াছি। আবার সেই সঙ্গে নিজের নিজের চরিত্রের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি, এইবারে কতক বুঝিতে পারিয়াছ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণের যে কি গুণ, তাহা বোধ হয় অনুভব করিয়াছ।

তোমাদিগের মধ্যে যে বালকবালিকা সদানন্দময়, শান্ত, পরোপকারী, সত্যবাদী, গুরুজন ও দেবতায় ভক্তিযুক্ত এবং যে কুটিলতা, ক্রোধ ও লোভশূন্য, সে সত্ত্বপ্রধান। জানিও, দেবতার গুণ তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে ক্রোধী, লোভী, অভিমানী, চঞ্চল, দাম্ভিক, দৃপ্তপুরুষ প্রকৃতিক, তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। যে অলস, অকর্ম্মণ্য, কাজের নামে যাহার জ্বর আসে, বসিয়া বসিয়া খাইতে ভালবাসে, দিবারাত্রি ঘুমাইতে চায় অথবা বসিয়া বসিয়া পরনিন্দায় কালকাটায়, তাহাতে তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। জানিও ইহারা অসুরের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইবারে সকলে নিজের নিজের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্য করিয়া বুঝিবে, তুমি কোন্ স্বভাবসম্পন্ন —দেব কিংবা দানবীয়।

পূর্ব্বোক্ত গুণগুলিকে ভগবান্ গীতায় সম্পত্তি বলিয়াছেন। ধনমানাদি ঐশ্বর্য্যকে তিনি সম্পত্তি বলেন নাই। যদি তোমরা দৈবসম্পদের অধিকারী হও, তাহা হইলে তোমরা ক্ষুদ্র মানবাকারে দেবতা। আর যদি তোমরা আসুরী সম্পদের অধিকারী হও, তাহা হইলে—দুঃখ করিও না—তোমরা সুন্দর মানবদেহে দানবের হৃদয় লাভ করিয়াছ।

ইহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানবের ভিতরে এই দুই ভাব আছে। পূর্ণ দেবতা ও পূর্ণ দানব মানবের ভিতরে নাই। আর যদিই থাকে, তা আমাদের সাধারণ মানবের অজ্ঞেয়।

যে দেবভাবাপন্ন, তাহার ভিতরেও আসুরিক গুণ অনেক বিদ্যমান আছে। যে অসুরভাবাপন্ন, সে ব্যক্তিও অনেক দৈবীসম্পদের অধিকারী। দিবারাত্রি আমাদের ভিতরে এইরূপ দেব-দানবের যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা সকলেই অসুরভাব দূর করিয়া অন্তরে দৈবভাব প্রতিষ্ঠা করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছি। তোমরাও চেষ্টা কর। যখন অশক্ত বোধ করিবে, তখন মহামায়ার শরণাপন্ন হইবে। তিনি তাঁহার শক্তি দিয়া অসুরগুলাকে দূর করিয়া দিবেন। তখন তোমরা মাতৃভূমির বক্ষে নৃত্যশীল এক একটি দেবশক্তি, নিজ নিজ রূপপ্রভায় জন্মভূমির মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

দৈত্যরাজ শুম্ভ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নাদির অধিকারী হইয়াছিলেন। লোকচক্ষে তাঁহার পাইবার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তাঁহার বাসনার বিলয় হয় নাই। আরও কোথা হইতে কি যেন পাইবার জন্য সে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত। পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়াও তিনি আকাঙ্ক্ষার ভারে অবসন্ন হইতেছিলেন। এমন সময় চণ্ডমুণ্ড আসিয়া তাঁহাকে রমণী-রত্নের সংবাদ প্রদান করিল। অতৃপ্তলালসা রমণীরত্নের নাম শুনিবামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যদি কামনারই নিবৃত্তি না হইল, তখন অনন্ত ঐশ্বর্য্যেই বা সুখ কোথায়?

লালসাপূর্ণ হৃদয়ে অসুখী দৈত্যেশ্বর প্রতিমুহূর্ত্তেই সে বরবর্ণিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সুন্দরী তাঁহার আদেশ বহু সম্মানে শিরে ধরিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে সাগ্রহে আসিবে।

১৪

শুম্ভ সিংহাসনে বসিয়াই সুন্দরীর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুগ্রীব আসিয়া অশুভ সংবাদ প্রদান করিল। পার্ব্বতীর গর্ব্বকথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক হাসিল; কিন্তু শুম্ভ হাসিলেন না।

তাঁহার প্রচণ্ড দম্ভে আজ প্রথম আঘাত লাগিয়াছে। শুধু তাই নয়, ত্রিলোকের জীব—দেবদানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব—যাঁহার তেজের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই, সেই দুর্জ্জয় শক্তিকে ব্যাহত করিবার জন্য এক রমণী দণ্ডায়মানা হইয়াছে।

তাঁহাকে অবলা জ্ঞান করিতে দৈত্যরাজের সাহস হইল না। সুগ্রীবের কথা শুনিবামাত্র শুম্ভ বুঝিয়াছিলেন, অবলার কমনীয় কলেবরে ত্রিভুবন নাশিনী শক্তি লুকাইয়া, সেই রমণী তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভকে

সমরে আহ্বান করিয়াছে। সুগ্রীবাদি কুক্ষুদ্রবুদ্ধি দানব কেশাকর্ষণে রমণীকে ধরিয়া আনিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে, কিন্তু শুম্ভ তাহা পারিলেন না। অথচ সমরের আহ্বান পাইয়া বসিয়া থাকা তাঁহার ন্যায় বীরের অসম্ভব।

রমণীর বাক্য শুনিয়া, অদম্য লালসার পথে প্রতিহত হইয়া, যদিও ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল, তথাপি তিনি একান্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্য করিলেন না। সভাস্থ যে কোন এক জন বীরকে দিয়া রমণীকে বন্দিনী করিতে আদেশ দিলেন না।

সভাস্থ অসুরগণের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই উদ্ধতা রমণীকে ধরিয়া আনিবার জন্য দৈত্যরাজের আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল।

শুম্ভ তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দানব সেনানী ধূম্রলোচনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ধূম্রলোচন! তুমি নিজের সৈন্য-পরিবারিত হইয়া, হিমালয়ে যাও; এবং সেই দুষ্টার কেশাকর্ষণে তাহাকে বিবশা করিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর।"

সভাশুদ্ধ দানব রাজার কথায় বিস্ময়ান্বিত হইল। এক জন অবলাকে বন্দিনী করিতে এত আয়োজন।

কিন্তু রাজার কথায় কে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবে? ধূম্রলোচন সৈন্য লইয়া পার্ব্বতীকে বন্দিনী করিতে চলিল।

এখন হইতে আমরা মাকে দুর্গা নামে অভিহিত করিব। শুম্ভ নিজেই তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে জগন্মাতা চণ্ডিকার যে ত্রিভুবনের ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে প্রয়োজনবশে অনেক রূপ ধরিতে হইয়াছিল। দানবসকল মায়াবী। তাহারা যখন যেমন মায়া আশ্রয় করিয়া যুদ্ধার্থে মহামায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, মহামায়াও তখনই সেই প্রকার মায়ার প্রতিরূপে আপনার প্রাণ আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদের সংহার করিয়াছিলেন। সেই সকল স্বকীয় অনন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তিকে তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি পূর্ণা! অনন্তশক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাঁহার স্বকীয় অনন্তশক্তির কণামাত্রও হ্রাস হয় নাই! এ কথা শুনিতে বড় বিচিত্র! তোমরা আমরা জানি, ষোল আনা হইতে এক আনা বাদ পড়িলে পোনেরো আনা অবশিষ্ট থাকে, দুই আনা গেলে চৌদ্দ আনা। এইরূপ যতই বাদ পড়িবে, ততই ষোল আনা হইতে কমিতে থাকিবে। ষোল আনা বাদ পড়িলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু মহামায়ার লীলা বিচিত্র। তাঁহা হইতে এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্ত জীব, অনন্ত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা—এক কথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির আভাস লইয়া তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়ের শক্তিরূপ হইতে যে সকল দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারাও এক একটি অনন্তশক্তিধারিণী। তথাপি মা আমার যে অনন্ত সেই অনন্ত।

ঋষি বলিয়াছেন :—

পূর্ণমিদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এক পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিযুক্ত হইয়াও পূর্ণ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

সেই পূর্ণরূপিণী জননী এই প্রচণ্ড অসুর সংহারকালে জগতের জীবের দুর্গতি নাশ করিতে দশ হস্ত বিস্তার করিয়া, দশভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া, জীবের বিপদ দশদিকে দূর করিয়াছিলেন। সেই দুর্গতিনাশিনী দশভুজাকে আমরাও কোন্ অনাদিকাল হইতে দুর্গা বলিয়া আবাহন করিয়া আসিতেছি।

দেবীর এই লোমহর্ষণ যুদ্ধের বিবরণ ঋষি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই পুস্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই লীলাকাহিনী সমাপ্ত করিব।

১৫

প্রথমে ধূম্রলোচনের সহিত যুদ্ধ, এ যুদ্ধটা তাহার সৈন্যের সহিত দেবীর সিংহের যুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না, ধূম্রলোচনকে বড় একটা যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তাহার দম্ভ আস্ফালন মাত্রই সার হইয়াছিল।

সে ষাট হাজার দানবসেনা লইয়া দুর্গাকে বন্দিনী করিতে আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, দুর্গা পূর্ব্বমত হিমালয়ের অধিত্যকায় আপনার মনে বিচরণ করিতেছেন।

ধূম্রলোচন ভাবিয়াছিল, নিশ্চয়ই দৈববল কুমারীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছে। সুন্দরীকে সম্মুখে রাখিয়া দেবতারা পর্ব্বত-শৃঙ্গের অন্তরালে লুকাইয়া আছে। শুম্ভও তাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন—"সেই রমণীকে রক্ষা করিতে যদি কোন দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অথবা অপর কেহ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়, তুমি তাহাকেও বধ করিবে।"

ধূম্রলোচন দেবীকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল একটা কুণ্ডলিত সিংহ অধিত্যকার একস্থানে নিদ্রিতবৎ পড়িয়া আছে। সে সৈন্যগণকে

পশ্চাতে রাখিয়া নিজেই দুর্গার সমীপে উপস্থিত হইল; এবং অন্য কোন কথা না কহিয়া একেবারেই বলিল—"শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে চল।"

দুর্গা বলিলেন—"যদি না যাই?"

ধূম্রলোচন বলিল—"যদি প্রীতিসহকারে আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না কর, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া লইয়া যাইব।"

দুর্গা কহিলেন—"দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি আবার একা আগমন কর নাই, সঙ্গে কতকগুলা সৈন্য আনিয়াছ। তুমি নিজেও কম বলশালী নও—অনেক দেবতাকে যুদ্ধে হারাইয়াছ। তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাও, আমি আর তোমার কি করিব?"

দুর্গার এই কথা শুনিবামাত্র ধূম্রলোচন ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। নিকটস্থ হইয়া যেমন সেই দুরাত্মা অসুর দেবীর কেশ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি দুর্গা একটি হুঙ্কার প্রদান করিলেন।

এখন কোথায় দুর্দ্দান্ত অসুর ধূম্রলোচন? অসুর-সেনাগণ দূর হইতে দেখিল, তাহাদের সেনাপতি দেবীর হুঙ্কারে চক্ষের নিমেষে ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; এবং কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া দুর্গার প্রতি বাণ, শক্তি, কুঠার প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন সিংহ শুইয়া শুইয়া অল্প অল্প চোখ মেলিয়া রহস্য দেখিতেছিল। কিন্তু যেই দেখিল, ধূম্রলোচন মরিয়াছে, আর তার নায়কবিহীন সৈন্যগুলা দেবীর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সিংহ উঠিয়া একবার গা মোড়া দিয়া লইল, গোটাকতক হাই তুলিল, তার পর কেশর ফুলাইয়া সেই উচ্চ অধিত্যকা হইতে এক লম্ফে ধূম্রলোচনের সৈন্যগণের মধ্যে গিয়া পড়িল। পড়িয়াই আক্রমণে সে অসুরগুলাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চপেটাঘাতে সে কাহারও মাথাটা উড়াইয়া দিল, কামড় দিয়া কাহারও বা মাথা গুঁড়াইয়া ফেলিল। কাহারও হাত ছিঁড়িল, কাহারও পা ছিঁড়িল, নখে কোন অসুরের পেট চিরিল, কোন মহাসুরকে বুকে পিশিয়া মারিল; কম্পিতকেশরে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া কোন অসুরের বা রক্তপান করিতে লাগিল। অসুর-সৈন্য মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিধার কাজ নয় দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল।

ধূম্রলোচনের নিধনবার্ত্তা শুম্ভের নিকট পৌঁছিল। শুম্ভ শুনিলেন, বিনা অস্ত্রে রমণী তাঁহার মহাবল সেনা-পতিকে সংহার করিয়াছে, আর তার বাহন সিংহটা তাহার যাট হাজার সৈন্যকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহা শুনিয়াও তাঁহার সুমতি হওয়া উচিত ছিল। বুঝা উচিত ছিল, যাঁহার একটি বাহন যাটহাজার দানব-সেনাকে দূর করিয়া দিবার বল ধরে, সে রমণীর কত শক্তি। বুঝিয়া ক্ষমা স্বীকার করিয়া তাঁহার মায়ের শ্রীচরণে লুটিয়া পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দারুণ দম্ভ দৈত্যরাজকে সে কার্য্য করিতে দিল না। বরং এই যুদ্ধের সংবাদে তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চণ্ডমুণ্ডকে আহ্বান করি-লেন। এই চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই শুম্ভকে দুর্গার সংবাদ দিয়াই এই অনর্থ বাধাইয়াছে!

তাহারা নিকটে আসিলে দৈত্যরাজ তাহাদিগকে আদেশ করিলেন—"হে চণ্ড! হে মুণ্ড! এখনি তোমরা সৈন্যসামন্ত লইয়া হিমালয়ে গমন কর; আর সেই দুষ্টা রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া অথবা তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। যদি কেশাকর্ষণ কিংবা বন্ধন করিয়া আনিতে অপারগ হও, তাহা হইলে তোমা-দের সমস্ত অসুর-সৈন্যের সহিত মিলিয়া তাহাকে বধ করিবে। তার সেই দুরন্ত সিংহটাকেও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয় লইয়া আসিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে, তাহাকেও বধ করিবে।

১৬

শুম্ভের আজ্ঞা পাইয়া চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্য লইয়া দুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। মা এ বারে সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছেন। চণ্ড ও মুণ্ড সসৈন্যে তথায় উপ-স্থিত হইয়া দেখিল, সিংহবাহিনী মৃদুমধুর হাস্যে দৈত্যদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দুর্গাকে একাকিনী দেখিয়া উৎসাহের সহিত দুই ভাই তাঁহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। তাহারা দুর্গা ও সিংহ দুটিকেই ধরিয়া লইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। দুর্গাকে ধরা তাহারা বড় কঠিন কার্য্য মনে করে নাই। কিন্তু দুর্গাকে ধরিতে তাহার দুষ্ট সিংহটা যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধরিতে তাহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। শৃঙ্গে শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া দেখিতে দেখিতে কোন্ গুহাতে যে সেটা লুকাইবে, শত চেষ্টাতেও তাহারা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। চণ্ড ও মুণ্ডের সেইটিই যেন বড় ভাবনার বিষয় ছিল। এখন সিংহটাকে ভগবতীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে দেখিয়া তাহাদের বড় আহ্লাদ হইল। দুইটিকেই একসঙ্গে ধরিবার

সুযোগ দেখিয়া দুই ভাই দেবীর দিকে বেগে ধাবমান হইল। প্রচণ্ড অসুর-সৈন্য নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দুর্গার বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। তাঁহার যে সুন্দর বদন শত চন্দ্রের দ্যুতিতে এতক্ষণ ত্রিভুবন মোহিত করিতেছিল, অসুরের উপর ক্রোধে সহসা তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভ্রুকুটী কুটিল ললাট হইতে—

করালবদনা কালী, অসিপাশ দু'টি ভুজে তাঁর,
বিচিত্রমুণ্ডর করে চারুগলে নরশির হার;
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, শুষ্ক মাংস, অতীব ভীষণা,
বিলোল রসনা ভীমা অতিশয় বিস্তার বদনা;
কোটরে প্রবিষ্ট আঁখি সদা তাহে শোণিত স্ফুরণ,
দশদিক আপূরিত কি প্রচণ্ড ভৈরব গর্জ্জন;

আঁধারবরণা এক অপরূপা দেবী প্রাদুর্ভূ্তা হইলেন। প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতি বেগে দৈত্য-সৈন্যের উপরে পতিত হইলেন; এবং তাহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতী ধরিয়া সেই হাতী, তাহার পিঠের যোদ্ধা ও মাহুত—সমস্ত খাইতে লাগিলেন। এই রূপে ঘোড়সওয়ার সমেত ঘোড়া, সারথী সমেত রথ, যাহা যখন সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহাই মুখে পুরিয়া, কড়মড় করিয়া চিবাইয়া পেটে পুরিতে লাগিলেন। চণ্ড-মুণ্ড এ এক নূতন বিপদ দেখিয়া দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অসুর-সৈন্য লইয়া সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে আক্রমণ করিল।

দেবী তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সকল দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহারের ব্যাপার দেখিয়া অসুর সকল পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই সংহারিণী মূর্ত্তির নিকট হইতে কোথায় পলাইয়া তাহারা নিস্তার পাইবে? দেবী তাহাদিগকে হত্যা করিতে করিতে চণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ড অস্ত্র লইয়া দেবীর দিকে অগ্রসর হইল; এবং অবিলম্বেই ভ্রাতার দশা প্রাপ্ত হইল।

দুই মুণ্ড হস্তে লইয়া কালী দুর্গাকে উপহার দিলেন। সেই দুই মহাসুরকে নিহত দেখিয়া কল্যাণময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে বলিলেন, "যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, এইজন্য আজি হইতে হে দেবি! জগতে তোমার চামুণ্ডা নাম প্রসিদ্ধ হইল।"

১৭

এইবারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের পালা। চণ্ড ও মুণ্ডের নিধনবার্ত্তা শুনিয়াই দৈত্যরাজ দেবীর বধার্থ যেখানে যত দৈত্য ছিল, সকলকেই প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র সমরের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইল।

দৈত্য-সামন্তেরা তাহাদের সম্রাটের সহিত এই প্রচণ্ড যুদ্ধে যোগদান করিতে আসিল। কালক বংশীয়, মুর বংশীয়—এইরূপ নানা বংশের অসুরগণ যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল।

সেই অগণ্য সৈন্যের সেনাপতি হইয়া ভাই নিশুম্ভকে সঙ্গে লইয়া শুম্ভ দুর্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অতিভীষণ সেই সৈন্যকে আসিতে দেখিয়া দেবী ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ধরণী ও গগনের অন্তর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সিংহ ক্রোধে কেশর ফুলাইয়া অতি মহান্ শব্দ করিল। মা দুর্গতিনাশিনী ঘণ্টাধ্বনিতে সেই শব্দ দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন। বিস্তারিতবদনা চামুণ্ডা এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন যে, ভগবতী দুর্গার ধনুষ্টঙ্কার ও ঘণ্টাধ্বনি এবং সিংহের প্রচণ্ড গর্জ্জনও তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল।

বাস্তবিক দেবতারা অন্তরাল হইতে মায়ের এই যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অন্তরালে থাকিয়াই তাঁহারা ধূম্রলোচন ও চণ্ডমুণ্ডের বধে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু সমস্ত দৈত্যবল সঙ্গে স্বয়ং শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন, আদ্যাশক্তির যে শক্তিপ্রসাদে তাঁহারা এতদিন নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ সেই মাতৃদত্ত শক্তি প্রচণ্ড দানবের সংহারকার্য্যে মায়ের সাহায্যেই প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

দেবতাদিগের মানসে এই কথা উদিত হইবামাত্র, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আদ্যাশক্তিকে ঘেরিয়া ধরিলেন। যে যে দেবের যেমন রূপ, যাহার যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, সেই প্রকার রূপ ধরিয়া, ভূষণ পরিয়া, বাহনে আরূঢ়া হইয়া, সেই সেই দেবের শক্তিরূপা দেবীগণ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী; বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী সর্পবলয়া চন্দ্ররেখা-বিভূষণা মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী; শঙ্খ চক্র প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে, গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবিষ্টা নারায়ণের শক্তি নারায়ণী; ইন্দ্রের শক্তি ইন্দ্রাণী; কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ময়ূরাসনা কৌমারী—এইরূপ সর্ব্ব-দেবতার শক্তি শুম্ভসংহারে সহায়তা করিতে আদ্যাশক্তিকে

বেষ্টন করিলেন। শুম্ভ রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, তাঁহার প্রতিযোগিনী রমণী আর কেহ নহেন, তিনি সর্ব্ব-শক্তি পরিবৃতা সর্ব্বশক্তির সারভূতা স্বয়ং অপরাজিতা ঈশানী।

আদ্যাশক্তিকে সংহারে উদ্যতা দেখিয়া শুম্ভের ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রিলোকের উপর তাঁহার আধিপত্য। সুতরাং দৈত্যরাজ শুম্ভও অনন্ত শক্তিধর। আজীবন শক্তির সাধনায় তাঁহার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব সম্মুখস্থিতা শক্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে শুম্ভের পতিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অহঙ্কারই দৈত্যবলের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। শুম্ভ আপ-নাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর স্থির করিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যে দেবী হইতে তিনি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, অতি অহঙ্কারে, সেই ঈশ্বরীকে তিনি ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন। এখন তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব দেখিয়া শুম্ভের প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দুর্গার ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সমস্ত অসুরবল একত্র করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিলেন।

সে ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা আর কি করিব? সে বহুকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে সমগ্র জগতের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে নগর ছিল, সেখানে সাগর হইয়াছে; যেখানে সাগর ছিল, সেখানে নগর বসিয়াছে। কত তৃণ শৈলে পরিণত হইয়াছে; কত শৈল সাগরে ডুব দিয়াছে; কত তারা কক্ষচ্যুত হইয়াছে।

জগতে কিছুকাল ধরিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল কে জিতিবে? কোন্ শক্তি একে অন্যের বিনাশসাধন করিবে? দৈবী না দানবী?

উগ্রকর্ম্মা দানব বহুবার ভগবতী শক্তিকে বিধ্বস্তপ্রায় করিয়াছিল। বহুবার বিরাট অন্ধকার আলোককে উদরস্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। দেবতারা একান্তে বসিয়া বহুবার আত্মনিধন আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইয়াছিলেন।

বহুবার তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দানব মরিয়াও মরে না। মরিয়া, আবার কেমন করিয়া দ্বিগুণ বল লইয়া বাঁচিয়া উঠে! দ্বিগুণ বলে সে আবার মহামায়ার দিকে ধাবিত হয়! তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কোন দানব রক্তবীজ। তাহার মৃত্যু তাহার জীবন হইতেও অধিকতর ভয়াবহ! ইন্দ্রানীর বজ্রে, নারায়ণীর চক্রে, মাহেশ্বরীর ত্রিশূলে কতবার সে গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতে পড়িল; কিন্তু তাহার রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িবামাত্র, প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তাহারই তুল্য প্রভাব, তাহারই তুল্য দেহশক্তি লইয়া এক এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। মৃত্যুতে এক রক্তবীজ শত শত রক্তবীজে পরিণত হইল!

অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া জগন্মাতা এই সকল দৈত্যকুলের সংহার করেন। রক্তবীজকে বধ করিতে তিনি দেবী চামুণ্ডাকে বদনবিস্তার করিতে আদেশ করেন। রক্তবীজের দেহ হইতে যে সকল শোণিতবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা তিনি পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং সে সকল রক্ত-বিন্দু হইতে অন্য যোদ্ধা উৎপন্ন হইবার উপায় রহিল না। দুর্গা নানা অস্ত্র দিয়া রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন, আর চামুণ্ডা কেবল রক্তপানে নিযুক্তা রহিলেন। রক্তবীজ শস্ত্রদ্বারা আহত ও রক্তহীন হইয়া অবশেষে ভূতলে পতিত হইল। এইবার তাহার মৃত্যু ঘটিল।

ইন্দ্রাণী প্রভৃতি যে সকল দেবী দুর্গাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহাদের নাম অষ্ট-মাতৃকা। এই মাতৃকাগণের শক্তি-সাহায্য লইয়া তিনি নিশুম্ভকে বধ করিলেন।

শুম্ভ এইবারে মহামায়ার সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাণতুল্য ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যেশ্বর মহাক্রোধে দেবীকে আক্রমণ করিলেন। সঙ্কট বুঝিয়া অষ্টশক্তি মাতৃরক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় দুর্গাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। করালবদনা চামুণ্ডা অসিপাশ হস্তে লইয়া, মুণ্ডমালা গলে পরিয়া দুর্গদ্বার রক্ষিণীর ন্যায় মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শুম্ভ দুর্গার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বলাবলেপ দুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥

বলগর্ব্ব দুষ্কর্ম্মিনীতে দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। অতিমানিনী হইয়াও তুমি অপরের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র দুর্গা কহিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।"

এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ, আমার বিভূতিরূপা এই সকল মাতৃগণ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

যেমন মায়ের মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব বাক্য বহির্গত হইল, অমনি অষ্টমাতৃকা—মায়ের দেহে লয়প্রাপ্ত হইলেন। মা দুর্গা একাকিনীই রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নিজের যে ঐশ্বর্য্যবলে আমি ক্ষণপূর্ব্বে বহুরূপে অবস্থিতা ছিলাম,

সে ঐশ্বর্য্য এই আমি আত্মদেহে বিলীন করিলাম। এক্ষণে যুদ্ধে আমি একাকিনীই রহিলাম; তুমি স্থির হও।"

একদিকে দেব, অন্যদিকে দানবগণ দাঁড়াইয়া ঐশ্বরিক ও দানবী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতে লাগিল।

শুম্ভ অনেক সময়ে দুর্গাকে বিব্রত করিয়াছিলেন। শুম্ভের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল দেবী যেরূপ ছিন্ন করিতে লাগিলেন, শুম্ভও সেইরূপ দেবী-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

কঠোর তপস্যায় শুম্ভ এই অসীম শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তপস্যার ক্ষয় না হইলে ত তাহার বিনাশ হইবে না। ইহা ভগবানের বিধি। এই জন্য দুর্গা তাহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু মৃত্যু দৈত্যরাজের সন্নিকট হইয়াছিল, কাল তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। দৈত্যরাজ অবশেষে নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে এক সময় দুর্গাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া বিনাশের জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। কেশাকর্ষণে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

সতীর কেশস্পর্শমাত্র তাঁহার সর্ব্বশক্তির বিলয় হইল। বজ্রশক্তি যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, শুম্ভেরও শক্তি সেইরূপ দুর্গার দেহে লীন হইয়া গেল। এই অবকাশে দেবী শূলদ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদারিত করিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিক্ষত দৈত্যরাজ প্রাণহীন হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্ব্বতা পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শুম্ভের নিধনে জগৎ প্রসন্ন ও সুস্থ হইল; আকাশ নির্ম্মল হইল; উল্কাবর্ষী মেঘ শান্ত হইল; এবং নদী সকল প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবগণ পরম আনন্দিত হইলেন; গন্ধর্ব্বগণ গানে, অপ্সরাগণ নৃত্যে সমস্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিলেন। সুখদ বায়ু প্রবাহিত হইল; সূর্য্যের তৃপ্তিপ্রদ কিরণ উল্লাসে ধরণীকে স্নান করাইল।

ঋষি সুরথ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ এই আমি তোমাকে দেবীমাহাত্ম্য কহিলাম। এই বিষ্ণুমায়া বা মহামায়ার প্রভাবের তুলনা নাই। সেই মহামায়া দেবী তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং তোমাদিগের ন্যায় যাহারা বিবেকের অহঙ্কার করে—এইরূপ অন্যান্য জনগণকে, মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও মোহিত করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে মোহিত করিবেন। হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন কর।"

মেধস মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরথ ও সমাধির শোকসন্তাপ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়েই সেই তপস্বী ও ব্রতধারী ঋষিকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে এক নদীতটে শ্রীদুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ হোম ও তর্পণাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পূজায় পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বর দান করিয়াছিলেন।

ভগবতীর বরে রাজা তাঁহার হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; এবং উভয়েই দিব্যজ্ঞান ও অনন্তশান্তি লাভ করিলেন।

আমাদের দেশে বর্ষে বর্ষে ভগবতীর যে পূজা হয়, রাজা সুরথই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তবে শুনা যায়, বসন্তকালে তিনি শ্রীদুর্গার পূজা করিতেন। অযোধ্যাপতি ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শরৎকালে মায়ের আবাহন করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি শরতে আমাদের দেশে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবাহন চলিয়া আসিতেছে।

মহামায়ার এই চরিত্র শ্রবণে পুণ্য আছে। মা নিজেই বলিয়াছেন,—যাহারা ভক্তিসহকারে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবে না, বিপদ থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, প্রিয়বিয়োগ ঘটিবে না। আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ও ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত; ইহাই কল্যাণের পথ।

এই আমি তোমাদিগের নিকট শ্রীদুর্গার বিচিত্র কাহিনী বর্ণন করিলাম। এ কাহিনী বাস্তবিকই বিচিত্র। বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে ইহাকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু ভক্তগণ, মায়ের এই অদ্ভুত চরিত্র আপনারা শুনিয়া ও অপরকে শুনাইয়া সমস্ত জীবন আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, যশ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দীনবেশে মহামায়ার এই মহাশক্তির লীলা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। লোকনিন্দা তাঁহারা কানে তুলেন নাই, অত্যাচার গ্রাহ্য করেন নাই, অভক্ত তার্কিকের শুষ্ক তর্কে তাঁহারা বিচলিত হন নাই।

সহস্র বাধা, সহস্র বিঘ্ন, কত যুগপ্রলয় অতিক্রম করিয়া, মহামায়ার ইতিহাস-কথা এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুর স্মৃতিসরোবরে চিরপ্রফুল্ল কমল-মাধুর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও হিন্দু তাহা ভুলিতে পারিল না।

তাহারা এখনও মনে করে, দশদিগ্ব্যাপিনী শক্তি লইয়া সনাতন ধর্ম্মের বীজমন্ত্র এই মৃন্ময়ী দশভুজার

হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাই মাতৃভক্ত পূজাকে ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে জগজ্জননী দুর্গতিনাশিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন—

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

হে শরণাগতদুঃখনাশিনী দেবি, তুমি প্রসন্না হও। হে অখিল জগতের জননী, তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও; সমুদয় জগৎ পালন কর; হে দেবি তুমি চরাচর জগতের ঈশ্বরী।

ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া গিয়া চিরদিন জগতের কল্যাণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন। কেবল বলিয়াছেন—সমুদয় জগৎ পালন কর।

শ্রীদুর্গার আগমনে তোমরা ঢাক-ঢোলের বাদ্যে আনন্দ প্রকাশ কর, ক্ষুধার্ত্ত মায়ের প্রসাদ প্রাপ্তির আশায় আনন্দ প্রকাশ কর; গৃহস্থ তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তোমরা ত জান না—ওই উপবাসী শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ শ্রীদুর্গার প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া, একখানি তালপত্রের পুথি পাঠ করিতে করিতে কি অতুল আনন্দ উপভোগ করেন! ওই তালপত্রের পুথিটি শ্রীদুর্গার লীলাকথায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ সেই লীলাগানে তন্ময়। সেই পবিত্র কাহিনী বর্ণনায় পাছে একটিও পবিত্র অক্ষর ভ্রষ্ট হয়, সেই ভয়ে সংযতচিত্ত ভক্ত পুস্তিকায় নিবদ্ধ-দৃষ্টি—সংসার ভুলিয়া রহিয়াছেন! ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার কাছে আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, লোক-কোলাহল কতবার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে গিয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!

এস ভাই, আমরাও সকলে মিলিয়া ভক্তগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগন্মাতার আবাহনকল্পে করযোড়ে বলি:—এস দুর্গে, এস জগদম্বিকে নারায়ণী! সংসারক্লেশদগ্ধ তোমার পুত্রকন্যাগুলির কল্যাণসাধনের জন্য একবার আমাদিগের গৃহে এস। এস মা কল্যাণরূপে, সম্পদ্‌রূপে, সিদ্ধিরূপে; এস মা প্রতিষ্ঠারূপে, লক্ষ্মীরূপে, শক্তিরূপে; এস মা তোমার চিরপ্রিয় বালকবালিকার পরমপ্রিয় মাতৃরূপে। শ্রীচরণস্পর্শে আমাদিগের গৃহ পবিত্র কর। ভক্তি, প্রীতি, চেতনা ও শক্তি দান করিয়া আমাদিগের সংসারকে দেবসংসারে পরিণত কর। তোমার কৃপায় তোমার ভক্তগণের গৃহে চিরসুখ চিরশান্তি বিরাজ করুক্।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বাস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সমাপ্ত।

60r